সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

চতুস্ত্রিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ২১০০৲ দুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা হয়।—

(ক) বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত। মূল্য—সাধারণ পক্ষে ২৷৷০ সদস্য পক্ষে ১৷৶০

(খ)	মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ		১৲	৸০
(গ)	ঋতু-সংহারম্ (মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ)	” গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৲	১৲
(ঘ)	পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ)	” বিধুভূষণ সরকার	।৶০	।৶০
(ঙ)	উত্তরপাড়া-বিবরণ	” অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	।০	।০
(চ)	ভারত-ললনা	” রামপ্রাণ গুপ্ত	৷৵০	৷৵০

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত **মন্দিরা** পরিষৎকে দান করিয়াছেন। মূল্য ৷৷০

পরিষদের সাধারণ-ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাঁহার রচিত **ভাষাতত্ত্ব** (১ম ও ২য় খণ্ড) দান করিয়াছেন। মূল্য ১৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি-প্রণীত **গৌড়ের ইতিহাস**, ১ম খণ্ড—হিন্দু রাজত্ব—১৲ এবং ২য় খণ্ড—মুসলমান রাজত্ব ১৷৷০।

"অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী" ও "রস-মঞ্জরী"

যাঁহারা বৈষ্ণব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের "গীতগোবিন্দ," "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ, মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদাবলী-পূর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিকা, পদ-সূচী, রস-সূচী ও শব্দ-কোষ-সম্বলিত "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" ও রস-শাস্ত্রে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভানুদত্তের রস-মঞ্জরীর বিস্তৃত ভূমিকা, সূচী ও রস-বিশ্লেষণ-সম্বলিত সুমধুর পদ্যানুবাদ পাঠ না করিলে চলিবে না। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'বাঙ্গালা ও সংস্কৃত' শাখার বি, এ, পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা-সূচক অভিমত হইতে কয়েক পঙ্ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে; এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"—রবীন্দ্রনাথ

"এই সকল অপরিচিত পদ-কর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্ব-রস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"—প্রবাসী

"রস-মঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে। সেই বিবরণী অপূর্ব্ব কবিত্ব-রসে মণ্ডিত। * * * রস-শাস্ত্রবিষয়ক এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।"—ভারতী

"অনুবাদে সতীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বর্দ্ধিতই হইয়াছে। এই রস-মঞ্জরীতে কেবল আদিরসেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়া রুচি-সংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ করি।"—হিতবাদী

মূল্য যথাক্রমে ২৲ টাকা ও ৸০ আনা।

গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত প্রেসে ও ঢাকেশ্বরী মিল পোঃ (ঢাকা)
শ্রীযুক্ত যতীনচন্দ্র রায়, এম, এ, ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দীন চণ্ডীদাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

[৩৬২ পত্র]

তথা রাগ

বিচিত্র আসনে বসিলা সুন্দরী
রাধার মন্দির ঘরে।
বিনোদিনী রাই কহেন তাহাই
অধিক আদর করে
বিয়োগী দেখিয়া নবীন কিশোরী
বিবিধ মিঠাই আনি।
শাকরই ক্ষীর ঝুনা নারিকেল
চিনি চাঁপাকলা ফেনী॥
আনি বিনোদিনী রাজার নন্দিনী
যোগাই তাহার কাছে।
পুন পুন কহে এ[ ]প বদনে
তবে বহু সুখ আছে॥
হাসিয়া রমণী কুলের কামিনী
কহেন উত্তর বাণী।
এ সব মিষ্টান্ন দুজনে পাইব
একেলা না লব আমি॥
এ কথা শুনিয়া বৃকভানুসুতা
হাসিয়া হাসিয়া বলে।
তোমার আদর পরম যতনে
শাস্ত্রের লিখন-সারে॥
অভ্যাগত আগে পূজন যজন
এই সে মানিয়ে ভালে।
হয়ে নয়ে দেখ মনে বিচারিয়া
সকল জনাতে বলে॥
কহেন উত্তর হইয়া............
সেই সেও নবরামা।
আগে আস্ত শয্যে করি আলিঙ্গন
জানিব তোমার প্রেমা॥
চণ্ডীদাস বলে অপরূপ দেখ
অসীমা যাহার লীলা।
দুঁহে পরস্পর একুই সমসর
বাহু পসারিয়া নিলা॥ ১০৪৬॥

[৩৬৩ পত্র আরম্ভ]

রাগশ্রী

রাধারে ধরিয়া কোরে লইল মনের সরে
আলিঙ্গন করে নব রামা
শ্রীঅঙ্গ পরশ পাই সো নব কিশোরী রাই
জানল পরশরস প্রেমা॥
কপট করিয়া ছলা জানিল ( ) কালা
জানি ধনী সো অঙ্গ পরশে।
জানিল কালিয়া কানু ছুইতে আপন তনু
আপনা আপনি ভালবাসে

উঘাড়িয়া প্রেমরস আপনি পায়ল রস
ঐছন কপট রস লেহ।
হাসি সুধামুখী রাই পিয়ার বদন চাই
তোমার চরিত বড়ি এহ॥
বিনোদ মোহন বেশ তার কিছু নাহি লেশ
এ সব রাখিয়া আইলে কোথা।
ধরিয়া নারীর বেশ বান্ধিলে লোটন কেশ
কেমতে আইলে তুমি এথা
হাসিয়া কহেন হরি শুনহ কিশোরী গুরি
তোমার বচন নহে আন
তোমার বচন ধরি আন না করিল আমি
ধরিল নারীর বেশ ঠান॥
লিয়া নিকেতন ঘরে আনন্দে বেহার করে
কত সুখ কহনে না যায়।
শূন্য মন্দির ঘরে দুজনে বেহার করে
দণ্ডীদাস দুহুঁ গুণ গায়॥ ১০৪৭॥

রাগ সুহই

আনন্দে নাহিক ওর।
কিশোর কিশোরী আপনা বিসরি
সুখের নাহিক ওর॥
ফেরাফিরি বাহু চান্দে যেন রাহু
গিলল গগন মাঝে।
তৈছন পীরিতি করত এ রতি
রণরতি দুহে বাজে॥
যেমন শশক সোঁসর কিশোরী
সিংহের সমান কান
শশ[ক] ধরয়ে কতেক পরাণ
সে জন কি জিয়ে টান॥
রতি রণ কাজে মন্দির সমাঝে
রতন-শেযের পরে।
দুহুঁ দুহাঁ সুখ বাঢ়ল আনন্দ
বিরল মন্দির ঘরে॥
হুঁহুঁ সে শবদ রসের আমোদ
উথলে রসের ঢেউ।
সহিতে নারয়ে রসের গরিমা
পরাণ কাড়িয়া লেউ॥
এক সুখে কত সুখ উপজল
বাঢ়িল দুজনে রণ।
সমর জিনিতে নাহিক শকতি
বিনোদিনী কিছু কন
হে দে হে নাগর চতুর শেখর
পঙ্কজ কি সয়ে টান
অলির দংশনে পঙ্কজ কম্পিত
দীন চণ্ডিদাস গান॥ ১০৪৮॥

রাগ কানড়া

উঠহ নাগর রায়।
দিবস গমন এ নহে করণ
কহিয়ে তোমার পায়॥
তেজহ সমর শুন সুনাগর
আর সে উচিত নয়ে।
শাশুরী ননদী আসি দেখে যদি
এই আছে মনে ভয়ে॥
জানি বা দেখয়ে পাড়ার পড়শী
বিষম লোকের কথা।
তুরিতে গমনে চলি যাহ তুমি
রহিতে [নার]য়ে এথা॥
যেমতে আইলে ধরি নারীবেশ
ঐছন চলিয়া যাহ।
শীতের বসন উঠল টানি…
………কাথেতে লহ॥

এ বোল শুনিয়া নাগর চতুর
কলসী লইয়া কাখে।
বাহির হইল আয়ল…

[৩৬৪ পত্র আরম্ভ]

…গত ভরিয়া দেখে ॥
কেহো গোপরামা উলটিয়া চাহে
একলা যুবতী যায়।
গোকুলের নহে কন গোপ রী…
…য়া নয়নে চায় ॥
কাহার ঘরণী রূপের তরণী
আয়ল মন্দির হতে।
কখন না দেখি এ পথে আসিতে
বিষম লাগিল চিতে ॥
করে কানাকানি বরজ রমণী
এ জন কাহার মায়্যা।
[চণ্ডীদাস বলে] চিনিতে নারিবে
কে যায় এ পথে বায়্যা ॥ ১০৪৯

শুনিতে সুস্বর মুরুলীর রব
শ্রবণ পাতল তায় ॥
তরুয়া কদম্বে দাণ্ডাই ত্রিভঙ্গে
রসিক নাগর কান।
গৃহ কাজে নাহি গমন মনোহর
শুনিতে শুনয়ে আন ॥
শ্রবণ ভরিয়া মন মজাইয়া
শুনল বাঁশীর গীত।
গৃহে কাজ মোর ছারখারে জাউ
ইহাতে লাগল চিত ॥
কেমন বাঁশীর গীত আলাপনে
শ্রবণে পশিল যবে।
কি জানি কঠিন এ পাপ [প]রাণ
ধৈরজ না রহে তবে ॥
বৈঠল কিশোরী সব পরিহরি
গৃহকাজ রহে দূরে।
শ্রবণ পরশি শুনি সেই বাঁশী
চণ্ডীদাস মন ঝুরে ॥ ১০৫০ ॥

রাগ নটনারায়ণ

নিজ বেশ ছাড়ি রসিক মুরারি
বান্ধল বিনোদ চূড়া।
নানা আভরণ অঙ্গের ভূষণ
নানা মালতির বেড়া ॥
কনক বলয়া নানা রত্ন মণি
মাণিক তাহার মাঝে।
বিনোদ নাগর বিনোদ বেশেতে
নানা অভরণ সাজে ॥
মোহন মুরুলী ধরিয়া করেতে
বায়ই নাগর রায়।

রাগ গড়া

আন ছলা করি জলেরে যাই।
সো নব কিশোরী বরজ রাই ॥
কনক গাগরি লইয়া কাঁখে।
ঐছন চলল যমুনা মুখে ॥
চলিতে না পারে সুখের সরে।
যেন রসভরে খসিয়া পড়ে ॥
পুলক ন মানল সকল তনু।
উথলি উথলি চলত তনু ॥
হেরল নাগর তরুয়া মূলে।
দুহে দুহা ভেল কটাক্ষ হেলে ॥

বঙ্কিম নয়নে নয়নে মেল।
রস-পর-কথা দুজনে ভেল॥
সঙ্কেত করল কদম্ব বনে।
এখানে থাকিব মনের সনে॥
ঐছন যুগতি করিয়া সারা।
নারীবেশ ধর তেমতি পারা॥
লইবে কটোরা পুরিত করি।
তৈল হলদি লইবে হরি॥
গুপতে গমন করিবে ভালে।
যেমত কো জন লখিতে নারে॥
এই সে সঙ্কেত করল রাই।
যমুনার জল লইয়া যাই॥
নবীন কিশোরী চলল ঘরে।
চণ্ডীদাস দেখে আখের পরে॥ ১০৫১

[৩৭৬ পত্র]

…র উপাসনা স্থান।

রাধানাম দুই বর্ণ কেবল আমার মর্ম্ম
তুমি সে রূপসী অনুপাম॥
তুমি নয়নের তারা তিলে কতবার হারা
কেবল পরাণ সমতুল।
দেখিলে জুড়ায় আঁখি নহে বা মরিয়া থাকি
তুমি সে আমার হ ( ) মুল॥
তুমি সে ভজন মোর কে জানে মহিমা তোর
এক মুখে কহিলে কি হয়।
তোমার তুলনা তুমি রমণীর শিরোমণি
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস কয়॥ ১০৭৭॥

যতিশ্রী

বামেতে বসিলা রাই অতি অনুপাম।
নীলমণি বেড়ে যেন বিজুরির দাম॥
কনকর শিল মাঝে নীলের দাপুনি।
মেঘ মাঝে উপি রহে যেমত দামিনী॥
বৃন্দাবন আলো করে দুহার ছটাতে।
দেখিয়া সকল জন হইল মোহিতে॥
বরজ রমণী তুমি কুসুম সুগন্ধ।
বাছিয়া বিছায় শেযে ঝরে মকরন্দ॥
নিজ নিজ কুটীর করয়ে ফুল সাজ।
মণিমন্দির শোভিছে তার মাঝ॥
বিচিত্র পালঙ্ক পরে সোনার তুলিচা।
সুরঙ্গ পাটের তুলি সুরঙ্গ মালিচা॥
কুঙ্কুম চন্দন আর আতর গুলাল।
মৃগমদ সৌরভ উঠে যার ভাল॥
তথিপর শুতলি পুতলি নবগুরি।
আনন্দে বেহাররসে কিশোর কিশোরী॥
মাতল মদন রসে চতুর মুরারি।
মদন আলস ভরে পড়ে শ্রমবারি॥
ঐছন করল কেলি শ্যাম মধুকর।
পঙ্কজ পাইলে যেন পীরিতি ভ্রমর॥
তৈছন কুসুম (—)–কানু বসিয়া।
ব্রজবধূ রসে মধু পিবই মাতিয়া॥
……………নাগর ময় কান।
ঐছন পীরিতি দীন চণ্ডীদাস গান॥ ১০৭৮॥

———

কানড়া সুই

ঐছন পীরিতি করিয়া এ রীতি
নাগর রসিক বরে।
হরষ বদনে কহল বচনে
প্রেমের পীরিতি শরে॥

গুপত পীরিতি করে নিতি নিতি
কেহ সে নাহিক জানে।
মধুর মঞ্জুরি কহে.........
পুরিয়া কার স্থানে॥
গেলা নিশাপতি হইল বিহান
রহিতে উচিত নহে।
নব নব রামা তেজি গৃহ ধামা
যাইতে উচিত হয়ে॥
গেলা চান্দ স্থানে হইল বিহানে
শুনহ নাগর কান।
হরষে বিদায় কর মহুরায়
ইহাতে না কর আন॥
সভারে কহল হরষ বদনে
চলিতে গৃহের মাঝ।
এথা গোচারণে বালকের সনে
চলিলা নাগররাজ॥
নিজ নিজ গৃহ করল পয়ান
যতেক ব্রজের রামা।
গুরুজনা কেহ নাহি জানে এহ
গুপত রসের প্রেমা॥
নিজ গৃহ কাজে চলয়ে সভাই
আপন গৃহের মাঝ।
কহে চণ্ডীদাস না হয় বেকত
জানল কি রীতি কাজ॥ ১০৭৯॥

[৩৭৮ পত্র]

.........ছিল সখীর সহিত
করিতে রসের রঙ্গ॥
কেহো বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে............।
তেজি আবর্ত্তন হইয়া বিমন
ঐছন গেলা সে চলি॥
কেহো বা আছিল শিশু কোলে করি
[মুখে] দিয়া তার স্তন।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেলা ভ্রমে
বৃন্দাবন পানে মন॥
কেহো বা আছিল রন্ধন করিতে
অমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণ মুখী হয়া মুরুলি শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥
কেহো বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিন্দ।
যেন কেহ আসি চোরাই লইল
মানসে কাটিয়া সিন্ধ॥
চমকিত হয়া উঠিল জাগিয়া
বসন খসিয়া পড়ে।
চণ্ডীদাসে কহে ডাকাতিয়া বাঁশী
পাইয়া তাহার চাড়ে॥ ১০৮২॥

সুই সিন্ধুড়া

গোপরাস কহিল এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্ম রাত্রি হয় তথি॥

রাগ মঙ্গল

কোন সখী করে বেশে[র] বন্ধনে
পদ অভরণ করে।
করের কঙ্কন নপুর বলিয়া
আপন চরণে পরে॥

কেহো পরে এক নয়ানে অঞ্জন
কুণ্ডল পরল এক ।
ভালের সিন্দুর চিবুকে পরল
দেখ হয় পরতেক ॥
গলে গজমতি হার মনোহর
পরিছে নিতম্ব মাঝে ।
বাহু অভরণ যে ছিল ভূষণ
তাহাই করেতে সাজে ॥
ঐছন আপন বেশ পরিপাটি
করিয়া সকল জনে ।
হরষ হইয়া রাধারে লইয়া
চলি যায় নিধুবনে ॥
সুস্বর শুনিয়া মুরুলির রব
অনুসর চলি যায় ।
আস্ত আস্ত বলি সঙ্কেত বলিয়া
শ্রবণে শুনিতে পায় ॥
প্রেমভরে যত আহির রমণী
গলিছে নয়নধারা ।
অঙ্গ প্রফুল্লিত গদগদ স্বরে
পাইয়া প্রেমরস-সারা ॥
যা করে তা করু গৃহে গুরুজনা
নাহিক তাহার ভয় ।
পরিবাদ মালা গলায়ে পরেছি
রসময়ী ইহা কয় ॥
নিজ পতি তেজি চলি[ল] গোপিনী
নাহিক কিসের ভয় ।
কৃষ্ণমুখী হয়া বৃন্দাবন-পুরে
চলি যায়ে অতিশয় ॥
রাই মাঝে করি যায় যত গোপী
গাইছে কানুর গুণে ।
বনে নানা জন্তু বৈসে ভয়ঙ্কর
কিছুই নাহিক মনে ॥
ঐছন চলল বরজ রমণী
বৃন্দাবন পানে দিয়া ।
চণ্ডীদাস কহে উর্দ্ধমুখী সভে
যাইছে হরষ হয়া ॥ ১০৮৩ ॥

সুই সিন্ধুড়া

প্রবেশিল যত আহীর রমণী
গভীর বনের মাঝে ।
নিধুবনে বসি নাগর হরষি
নটবর বেশে সাজে ॥
চম্পকলতা তাহে আগে হয়া কহে
নাগর কাছেতে গিয়া ।
কহেন সকল রাধার গমন
হরষিত কিছু হয়া ॥
কত দূরে রাই গমন মাধুরি
শুনি নাগর শুনি ।

[৬৯০ পত্র]

স্থির মান ভাই আপন চিত্ত ॥
তাহারে মিলাব তোমার সঙ্গ ।
তবে মোর নাম···রঙ্গ ॥
এ কথা শুনিতে হরষ কানু ।
পুলক হইল সকল তনু ॥
তাহারে হেরিতে ভৈগেলুঁ ভোর
সুখের অবধি নাহিক ওর ॥
তৈখনে পড়িল অঙ্গের ধড়া ।
বিথার হুইল মাথার চুড়া ॥
নপুর পড়িল ধরণীতলে ।
এ সব বচন কহিল তোরে ॥
চণ্ডীদাস বলে চরণতলে ।
সুবল ইহার জানিল মুলে ॥ ১৮৬৯ ॥

ধানশী

হেদে হে সুবল সখা　আচম্বিতে দিল দেখা
　　চিত্রের পুতলী হেন বাসি।
কিবা সে অঙ্গের ভঙ্গী　কনকপুতলি রঙ্গী
　　মন্দ মধুর কৈল হাসি॥
সে কথা পড়িল মনে　আমার মরমে জানে
　　কুটিল নয়ন কর বাঁকা।
দেখিতে তাহার রঙ্গ　অবশ করিল অঙ্গ
　　শুন ভাই মরমের সখা॥
সে হইতে তনু মোর　মদনে হইল ভোর
　　প্রাণ মোর স্থির নাহি মানে।
তোমায় কহিল এহ　বিচার করিয়া কহ
　　বেদনা কহিল তোর স্থানে॥
হাসিয়া সুবল কয়　শুন তুয়া রসময়
　　রসিক নাগরি দিব আনি।
তবে সে আমার নাম　সুবল বলিয়া গান
　　নিসন্দে জানিহ তুমি॥
কালিয়া নাগর কহে　সকলি কহিল তোরে
　　মরম সরম সব কথা।
বুঝিয়া যে কর তুমি　কি আর বলিব আমি
　　বড়ই হইল হিয়ার বেথা॥
ভাল ভাল বলি কহে অতি স্নেহ প্রেমমোহে
　　চল ভাই নিজ ঘরে যাই।
সুবল সংহতি যাই　নন্দের মন্দিরে আই
　　দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গাই॥ ১৮৬২॥

তুড়ি রাগ

কহেন সুবল তবে মধুর বচন।
ইহার বিচার ভাই কহিব এখন॥
নিভৃতে বসিল গিয়া কৃষ্ণের সঙ্গতি।
সুবল কহেন কিছু শুন যদুপতি॥
বৃষভানুপুরে যাব একটী বিচার।
মনে মনে কহে বাক্য রচিলা সুসার॥
যাইব তথায় যদি শুন বনমালি।
ইহার রচনা কিছু নিবেদন করি॥
ধরিব কনহু ছলা, হব পাটদার।
তবে বৃষভানুপুরে করিয়া সুসার॥
নানা অবতার লিখ মৎস্য কূর্ম্ম আদি।
বরাহ নৃসিংহরূপ এই বিবিধি॥
লিখিব বাউন...তি রাম।

[৬৯১ পত্র আরম্ভ]

ভৃগুরাম বলরাম লিখিব অনুপাম॥
শ্রীনন্দ যশোদা লিখি তরুলতা।
নানামত জীব হাথে লিখিয়ে সর্ব্বথা॥
পশ্চাতে লিখিয়ে রূপ নবঘন শ্যাম।
চতুর মুরুলি ধরি বেশ অনুপাম॥
সেই চিত্রপট দেখাইব সভা শেষে।
পট দেখি মুগধ হরষ হয় যিসে॥
এই তন্ত্র মন্ত্র করি বসাই রাধা।
ইহাতে অন্যথা নহে না করিব বাধা॥
দীন চণ্ডীদাস বলে অনুমানি।
চিত্রপট দেখি যেন লাগয়ে মোহিনী॥

॥ ১৮৬৩

শ্রীনট

ভাল ভাল বলি　নাগর শেখর
　　সুবল পানেতে চায়।
লিখ চিত্রপট　হইয়া নিকট
　　মোর মনে হেন ভায়॥
আনিয়া কাগত　পট করি সুত
　　যাহার উপমা নহে।

আনি তুলি কাঠি লিখিতে লাগল
অতি সে সুবল মোহে ॥
নানা অবতার মৎস্য কূর্ম্ম আদি
নানা তরু জীব করি।
নানা পক্ষগণ লিখিল তৈখন
তাহা কি কহিতে পারি ॥
মৎস্য কূর্ম্ম আর নৃসিংহ অবতার
বরাহ মুরতি সারা।
বামন শ্রীরাম আর ভৃগুরাম
রোহিণীনন্দন পারা ॥
তিন রাম রূপ লিখিলা স্বরূপ
শ্রীনন্দ যশোদা আদি।
তরুলতা যত লিখিলা বেকত
আর সে যমুনা নদী ॥
নানা পক্ষগণ লেখিলা তৈছন
নানা জীব করি মেলা।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
আনন্দ রসের খেলা ॥ ১৮৬৪ ॥

ধানশ্রী

তবে আর পট লিখিলা নিকট
নবঘন শ্যাম রূপ।
দেখিতে কি দেখি পিছলয়ে আখি
আনন্দ রসের কূপ ॥
জলদ বরণ যেন নব ঘন
চরণে নপুর দিল।
নখচন্দ্র দশ যেন শশধর
অতি সে উজর ভেল ॥
রতন নপুর চরণ উপর
সোনার বসন সাজে।
কটি মাঝে কিবা ঘাঘর কিঙ্কিণি
কলহংস পারা বাজে ॥
সুনাভি গভীর অতি সে মধুর
কুন্দ কন্দর শোভা।
কুঞ্জর সোসর কুম্ভ পরিসর
তৈছন দেখিতে আভা ॥
তাথে সুলেপন মলয় চন্দন
মৃগমদ তাথে সাজে।
সুগন্ধ পাইয়া অলিকুল যত
তাহাতে আসিয়া মজে ॥
সুবাহু গঠন সুবল মোহন
বলয়া বিরাজে ভাল।
কর দুটী যেন হিঙ্গুল সমান
দশ চান্দ শোভে তার ॥
...পদক করে ঢল ঢল
বনমালা শোভে তায়।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল শোভিত
যেন দীন......

[৭১২ পত্র আরম্ভ]

.... দোহে সে পুলক
অতি সে আনন্দ পায়ে ॥
চলল সুন্দরী যেথা সহচরী
সুবল যেখানে আছে।
নবোঢ়া মিলন হইল তখন
মিলি বিনোদিনী কাছে ॥
সুবল জানল সকল মরম
চিত্তের আনন্দ বড়ি।
চণ্ডীদাস তাথে আনন্দ অপার
সুবল চরণে পড়ি ॥ ১৯০৩ ॥

শ্রীরাগ

চলল যমুনা সিনান আশে।
সহচরিগণ রাধারে পুছে॥
দেখিলে বনের দেবতা কৈছে।
কেমন বরণ ভূষণ তৈছে॥
কেমন মুরুতি কহ না রাধে।
কত সুখ কৈলে মনের সাধে॥
কেমন দেবতা কোন বা স্থান।
কেমন মুরুতি কি তার নাম॥
রাধা কহে তবে সভার আগে।
শুনহ শ্রবণে ঐছন রাগে॥
পুজল নৈবেদ্য সুগন্ধ ফুলে।
তিঁহ সে থাকেন বটের মূলে॥
.........মুরুতি কায়া।
দেখিতে না পাই কনহুঁ ছায়া॥
যখন পুজল নৈবেদ্য ফুলে।
.........ঘনে বুলে॥
শব্দ শুনিতে কাঁপল দেহ।
না দেখি মুরতি শব্দ এহ॥
....দেখি রূপ।
উঠিল লহরি ভয়ের কূপ॥
তরাসে এ অঙ্গ শৈবাল ফুলে।
...............যেমন টলে॥
...............মোর অঙ্গ তৈছন হয়
বড়ই অন্তরে লাগল ভয়॥
বন............কানে।
নাহিক মুরুতি কহিল মনে॥
কহে রসবতী সুন্দরী রাধা।
পূজ...সেখানে...করিয়া সাধা॥
একেলা গেলড়ি দেবের স্থানে।
তোমরা এথানে রহিলে কেনে॥
কহে সহচরী রাধার পাশে।
কহিলা সুবল আমার কাছে॥
আন জন গেলে দেবার ক্রোধ।
আমরা পাইল মনের বোধ॥
তেই সে না গেলুঁ তোমার সাথে।
আমরা রহিলুঁ এই সে পথে॥
হাসি রসবতী নবীন রাই।
দীন চণ্ডীদাস এ গুণ গাই॥ ১৯০৪

তুড়ি রাগ

সহচরী বলে ভালে শুন নব রামা।
না দেখ মুরুতি রতি বনচারী নামা॥
এ কথা শুনিয়া রাধা হাসিতে লাগল।
বনচারী দেবে কতি দেখিতে না পালা॥
চলিলা যমুনা স্নানে সহচরী সনে।
স্নান করি রসবতি চলিলা ভবনে॥
নিজ নিকেতনে গুরা করিল পয়ান।
ভাবিতে লাগিলা সেই রূপের আখ্যান॥
নাগর বটের মূলে আছয়ে বসিয়া।
নব ঘন পথ চাহি সুবল লাগিয়া॥

[৭১১ পত্র আরম্ভ]

হেনক সময়ে আসি সুবল মিলিল।
চিত্রপট কথা সকল কহিতে লাগিল॥
নাগর হরষ বড় সুবলের বোলে।
আনন্দে সুবল লয়া করিলেন কোলে॥
তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে।
বহু মূল্য হেম মণি দিলে তুমি দানে॥
হে...মণি রত্ন কত খুঁজিলে সে পাই।
প্রাণ সমতুল বস্তু দিলে মোর ঠাই॥
কিনিলে আমার মন প্রেমডোর দিয়া।

ইহাকে অধিক কিবা সুখী হইল পায়্যা॥
চণ্ডীদাস কহে কিছু করিয়া বিনয়।
পূর্ব্বরাগ সখা উক্তি এই রস কয়॥ ১৯০৫॥

রাগ কাফি

কহিতে লাগিল তবে রাজা পরীক্ষিত।
কহ কহ মুনিবর আকর্ষিল চিত॥
প্রেমরস কথা শুনি অমৃতের ধারা।
কোন প্রয়োজন উক্তি কহ মুনি সারা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা নৈমিষারণ্যেতে।
গরুড় পুরাণ কথা শুনিলে তুরিতে॥
ষাটি সহস্র মুনি শুনি কহে খগরাজ।
অষ্টাদশ পুরাণ কথা দেখি পাখমাঝ॥
বিস্মিত হইলা ব্যাস দেখি পক্ষরাজ।
অষ্টাদশ পুরাণ লেখা পাখের সমাঝ॥
গরুড় পুরাণের কথা আর বৈবর্ত্ত।
বিষ্ণুপুরাণ কথা আর শ্রীভাগবত॥
চারি পুরাণ যাটি সখা উক্তি হয়ে।
পূর্ব্বরাগ নবোঢ়ার কথা কহিল নিশ্চয়ে॥
সুবল মিলন আর পূর্ব্বকথা শুনি।
নানামত পুরাণ কথা রসতত্ত্ব আনি॥
শ্রীভাগবতে আছে সখার গণন।
রাধিকার নাম তত্ত্ব পরম কথন॥
বিস্তার না কৈল ব্যাস রাখিলা গোপনে।
সাঁঠিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল যতনে॥
এ ষট্‌সম্বাদ কথা [অ]পূর্ব্ব কথন।
পিক সনে শুক পক্ষ কহেন বচন॥
পিক কহে শুনিলাঙ পূর্ব্বরাগ কথা।
সখা উক্তি নবোঢ়ারস রতিগুণগাথা॥
আর কিছু কহ শুক শুনিয়ে শ্রবণে।
অমৃত বচন কথা শুনি একমনে॥
শুক কহে শুন পিক আর এক শ্রেণি
যুগল মধুররস অমিয়ার খণি॥

দীন চণ্ডীদাস কহে সমুদ্রের কণি॥ ১৯০৬

অথ বিপ্রলম্ভ

উল্লাস

সুই রাগ

এক দিন বসি নাগর রসিয়া
বসিয়া চাপার বনে।
কহে বিনোদিনী হরষ বদনী
চাহিয়া পিয়ার পানে॥
আজু সে তোমার বেশ বনায়ব
বসিয়া চাঁপার বনে।
তবে সে পুরব মনরথ কাম
শুনহ নাগর কানে॥
তুলি বনফুল হার বনাওল
তুলব সুন্দরী রাই।
চন্দনের চাঁদ ভালে পরা...
পিয়ার বদনে চাই॥
পুন শশধর কিবা সে শোভল
চাচর কুন্তল আটি।
পাটুআর ডোরী ......দোফেরী
বান্ধল সে পরিপাটি॥
নানা ফুলদাম বেঢ়ি অনুপাম
এ গজ মুকুতা ছড়া।
দুসারি মালি.........

[৭৫০ পত্র আরম্ভ]

…শেষ নিশি　　দ্বিতীয় পহরে
দেখিল স্বপনে এই।
দেখিতে দেখিতে　　ঘুম দূরে গেল
কাতরে চলিল সেই॥
তেজিল শয়ন　　কচালি নয়ন
বৈঠল শেজের মাঝ।
ননদীর ভয়ে　　বাহির না হই
বুঝিল আপন কাজ॥
সেই হতে মোর　　হিয়া জর জর
পরান হইল সারা।
বল বল দেখি　　কেমন উপায়
করিমু কেমন ধারা॥
মোর মন সেই　　এমত হইল
যেমন বাউল প্রায়।
পুন কর জুড়ি　　কহেন বচন
দীন চণ্ডীদাস তায়॥ ১৯৯৯॥

রাগ সুই সিন্ধুড়া

কহিমু কাহার আগে।
তুমি যে বেথিত　　তথির কারণে
কহিল তোমার লগে॥
যে দিন দেখিল　　কদম্বের তলে
চাহিয়া অকাজ কইনু।
সেই দিন হতে　　অঙ্গ জর জর
না জানি কি ফল পানু॥
গৃহপতি জনে　　বিষ সম দেখি
লোকের বচন রুঠা।
বুক দুরু দুরু　　কেমন করয়ে
এ বড়ি বিষম লেঠা॥
জা…কুল শীল　　আর কিবা রয়
বেক…………।
……………　　করে কানাকানি
তুলএ দারুণ রব॥
কিসের………　　…………
……………।

শ্যাম বিহনে　　জীবন না রহে
এ অঙ্গ হইল ঢল
সজ……………………
ঐছন পীরিতি লেহা।
কানুর পীরিতি　　যে জন করিল
তাহার পুড়এ দেহা॥ ২০০০॥

শ্রীনটু

কাহারে কহিব মরম কথা।
উগারিতে নারি হিয়ার বেথা॥
যে হয় ব্যথিত তাহারে কই।
মরম বেদনা কহিল এই॥
ঘরে পরে হল্য কলঙ্ক সারা।
তনু তিয়াগিব এমতি ধারা॥
কেন বা চাহিল কালিয়া পানে।
হিয়া জর জর মরম স্থানে॥
কে এত সহিব বিষম তাপ।
জলে গিয়া দিব দারুণ ঝাঁপ॥
ননদী বচনে কুশের কাঁটা।
চণ্ডীদাস কহে বিষম লেঠা॥ ২০০১॥

কাফি কানড়া

কি কাজ করিমু　　আপন খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে।
এ ঘরে বসতি　　নহিল নহিল
এমতি হইল কেনে॥
যেমন বাউল　　হরিণী তরাসে
খাইলে ব্যাধের বাণ।
তেমত করিল　　অবলার প্রাণ
ইহাতে নাহিক আন॥
পরের পরাণ　　হরিতে নাগর
পাতয়ে কতেক ফান্দ।
কোন কুলবতী　　পীরিতি করিয়া
এ চিত্তে ধৈরজ বান্ধ॥
[৭৫০ পত্র শেষ]

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

শব্দ-সংগ্রহ

[১৩৩৩, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

নবম বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহ সম্বন্ধীয় শব্দ।

ক—পা'ড়্।

খ—কোনাচ্।

গ—শামরুল।

ঘ—রুইও।
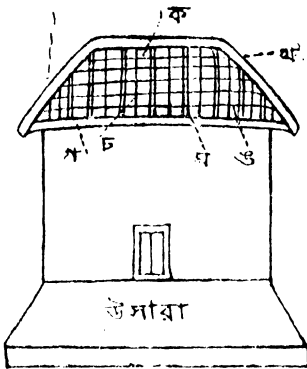
ঙ—সাঁড়োক, কাবারি, বাখারি।

চ—শিতুলি, ছিটুলি।

উসারা—বারান্দা।

মড়কোঁচা—ঘরের মাথা।

ধা'ড়।

শরদল।

কুমুরী।

কড়ি।

তীর।

সাতীর।

নিম্‌তীর।

তিলেট।

হাত্‌শোড়ো।

বোঠোনি।

বোঠ্যে।

বাতা।

নামাড়।

ভোঁড়।

পেলা।

পাড়ুল।

ঢালু।

ডুম্‌নি।

কব্‌জা।

টিলে কব্‌জা।

ছাঁচ্।

থাড়্।

দীর্ঘ।

ঝুনকাঠ।

বেনী বাতা।

পিঠ বাতা।

ধুল।

কেওড়—কপাট।

চৌকাঠ।

খুঁটি।

কুড়সি—খুঁটির বোঠোনি (বসিবার স্থান)।

মাথ্‌লা—খুঁটির মাথা।
বারজালা—জানালা।
মুরি—দেওয়ালের গায়ের ক্ষুদ্র ছিদ্র।
তাক।
কোলঙ্গা।
আল্‌গুনি—আল্‌না।
দেওয়ালের পাট—স্তর, থাক।
আন্দারে—ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণার জায়গা।
রেল—রেলিং।
গোরোট—ভিত্তি।
কাঠাম্—আকার।
হুড়্‌কে—ঘরের দরজা বন্ধ করিবার বাঁশের খিলবিশেষ।
খিল।
শাঙ্গা।
গোঐড়।
ছাঞ্চে—যেখানে চালের জল গড়াইয়া পড়ে।
পিছ্‌কাণ্ডা, পিছেড়্—ঘরের পিছন্ ধারে।
আন্দি সান্দি—ঘরের ভিতরের একেবারে কোণের আঁধার অংশ।
দুয়োর—ঘরসংলগ্ন ঘরের বাহিরের অংশ।
লাছ—বাড়ীর বাহিরে যাইবার সদর রাস্তা।
দুয়ার—ঘরের দরজা।
ধারি—উষারার প্রান্তভাগ।
বারান্দা—গৃহের বাহিরের খোলা বসিবার জায়গা।
হাঁড়্‌শিল—যে ঘরে ভাত খাইবার হাঁড়ি থাকে।
চুলোশাল, চালা—যেখানে ভাত রাঁধা হয়।
দহলিজ্—বৈঠকখানা।
দরমা—ছোট মুরগী রাখিবার ঘর।
আঁতুরঘর—যে ঘরে সন্তান প্রসব হয়।
চোর কুঠরী—সিঁড়ির তলার ঘর।
পরচালা—ঘরের দেওয়ালের বাহিরের অংশ হইতে যে একটী ছোট নূতন চাল্ তৈয়ারী করা হয়।
গোয়াল—যে ঘরে গরু রাখা হয়।
খরোটী—ঘরের দেওয়াল লেপন করা।
শুঁচ—ঘর লেপিয়া পরিষ্কার করা (শৌচ)।
ঘোলানী—শুঁচ দিবার নিমিত্ত মাটি জলের সহিত মিশাইলে যে পদার্থ তৈয়ার হয়।
লাতা—যে একটা ছোট ছেঁড়া কাপড় ঘোলনীতে ডুবাইয়া শুঁচ্ দেওয়া হয়।
উটুনো—একটা ঘরের চাল প্রস্তুত করা।
ঘর উদ্‌লান্—চাল পুনরায় ছাওয়াইবার জন্য চালের পুরাণ খড় কাড়িয়া (বার করিয়া) ফেলাইয়া দেওয়া।
বাড়োই—যে ঘর ছায়।
নাগর ছাওয়ানী—পুরাণ ছাওয়ানীর উপর ছাওয়া।
ছিটে দেওয়া বা গুঁজা দেওয়া—চালের মাঝে মাঝে দু'এক গোছা খড় গুঁজিয়া দেওয়া।
কোঠা—মাটির এক প্রকারের দোতালা ঘর।
চিলে কোঠা—এক প্রকারের দোতালা ঘর।
বাদামে কোঠা—এক প্রকারের দোতালা ঘর।
পাথাপেড়ে কোঠা—মাটির এক প্রকারের দোতালা ঘর।

নবম বিভাগ

পাড়াগাঁয়ের খাবার

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিবারাত্রে খাবার বিভাগ।

নাস্তা বা মুড়ি খাওয়া—সূর্য্য উঠিবার একটু

পরেই খাওয়া হয়। (অভ্যাগতকেই কেবল নাস্তা দেওয়া হয়)।

কড়কড়ো ভাত—সকালে পূর্ব্বদিনের রক্ষিত শুক্‌না ভাত (প্রায়ই ছোট লোকেরা খায়)।

বাসিভাত—পূর্ব্বরাত্রে জল দিয়া ভিজান ভাত। দুই ঘণ্টা বেলা হইলে খাওয়া হয় (শ্রমজীবীরা ইহা প্রায়ই খায়)।

পানি খাবার বা জল খাবার—বেলা ১১।১২টার সময় মুড়ি বা গুড় দ্বারা জল খাওয়া।

গরম ভাত—দুপুর বেলা হইতে ৩ট পর্য্যন্ত সর্ব্বা-প্রথম মধ্যাহ্নভোজন।

রেতের ভাত—২।১ ঘণ্টা রাত হইলে আবার যে ভাত খাওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পল্লীগ্রামে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের খাবার জিনিষ।

মুড়ি—চাউল হইতে প্রস্তুত হয়।

ভুজো, মুড়্‌কি, উথ্‌ড়ো—খই ও গুড়দ্বারা প্রস্তুত হয়।

খই—ধান হইতে প্রস্তুত হয়।

হুড়ুম—ধান হইতে প্রস্তুত হয়।

ফুটকলাই—কলাই ভাজিয়া তৈয়ার হয়।

গুড় ছোলা—গুড় ও ছোলা মিশাইয়া তৈয়ার হয়।

মুড়ির লাড়ু—মুড়ি ও গুড় মিশাইয়া তৈয়ার হয়। (মুড়ির গোলাকার ডাব্‌-বিশেষ)।

কাঁকলাড়ু—খই ও গুড় মিশাইয়া তৈয়ার হয়।

নারিকেল খণ্ড—নারিকেলশাঁস ও চিনি মিশাইয়া তৈয়ার হয়।

সিন্নি—যে কোনও মিঠাইকে বলে।

পেটেলী—পাটালী ; গুড় হইতে তৈয়ার হয়। পাটা (তক্তার) উপর ফেলাইয়া করা হয়।

আদর্‌কী—চিনি হইতে তৈয়ার হয়।

তিলুয়া—চিনি ও তিলে তৈয়ার হয়।

কদ্‌মা—চিনি হইতে প্রস্তুত এক প্রকার মিঠাই।

মুণ্ডা—চিনি ও ছানা হইতে তৈয়ার একপ্রকার মিঠাই।

বুঁদিয়া—চিনি, ঘি ও ব্যাসম হইতে তৈয়ার একপ্রকার মিঠাই।

রসকরা—চিনি ও নারিকেল হইতে তৈয়ার এক প্রকার মিঠাই।

রসগোল্লা—চিনি ও ছানাদ্বারা প্রস্তুত এক-প্রকার মিঠাই।

পানতোয়া—মোয়া (খোয়াক্ষীর), ঘি ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই।

মতিচুর ও মিহিদানা—ঘি, চিনি ও ব্যাসমদ্বারা প্রস্তুত মিঠাই।

জিলাপী—ঘি বা তৈল, চিনি বা গুড় এবং কড়াইর ডাল-বাটা দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই।

কাচাগোল্লা—চিনি ও ছানা হইতে প্রস্তুত মিঠাই

লবাদ্‌—খাজুরের রস হইতে তৈয়ারী হয়।

পুয়ো, বড়া—তালের মাড়ি ও চাউলের আটা (চেলেটা) ও সরিষার তৈলে ভাজিয়া প্রস্তুত।

পাকান্‌ মালপোয়া—চাউলের আটা, গুড় ও

ঘি বা সরিষার তেলে ভাজিয়া প্রস্তুত।

আন্দরসা—চাউলের আটা, গুড় ও তেলে ভাজিয়া তৈয়ারী।

তালের সিম—চাউলের আটা ও তালের মাড়ী হইতে তৈয়ার হয়। আকার সিমের মত।

তালের হাতচাপড়ি—তালের মাড়ি ও আটা দ্বারা হাতে চাপড়াইয়া তৈয়ার হয়।

গুড়পিঠে—গুড় ও আটা মিশাইয়া প্রস্তুত।

তেলপিঠে—তালের মাড়ি, তেল ও আটা দিয়া প্রস্তুত।

সরুচিকুলি—গমের ময়দা হইতে তৈয়ার হয়। চিতাও বা আঁশকে চাউলের আটা হইতে প্রস্তুত পুরু গোলাকার পিঠে।

উল্টোপিঠে—চাউলের আটা হইতে তৈয়ার হয়। উল্টাইয়া তৈয়ার করা হয়।

ছিটেপিঠে—গমের ময়দা হইতে ছিটাইয়া ছিটাইয়া তৈয়ার হয়।

পাতমোড়া—তালের মাড়ি ও আটায় মিশাইয়া পাতার দ্বারা মুড়িয়া তৈয়ার হয়।

গুঁজা—চাউলের আটা হইতে তৈয়ার হয়। (গুঁজিয়া গুঁজিয়া সাঁই দেওয়া হয়)।

তিলসাই—তিল গুঁড়া করিয়া উহার সহিত গুড় মিশাইলে তৈয়ার হয়।

বেগুনসাই—বেগুন পুড়াইয়া উহার সহিত ডিম মিশাইলে তৈয়ার হয়।

ফুলুরি—কলাইয়ের গুঁড়া ও জলে মিশাইয়া তেলে ভাজিলে তৈয়ার হয়।

ভাঁড়চুর—আখের রসকে জ্বাল দিয়া শক্ত করিয়া তৈয়ার হয়।

ক্ষীর—চাউল, গুড় ও জল মিশাইয়া জ্বাল দিলে তৈয়ার হয়।

ঝাল—চাউলের আটার খমীর করিয়া গুড় ও জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া উহা ডাব্‌ডাব্‌ করিয়া দিলে তৈয়ার হয়।

জাও—চাল, লবণ ও জল মিশাইয়া তৈয়ার হয়।

আঁখিয়া—আটার খমীর করিয়া গুড় ও জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া, ঐ খমীর মুঠা মুঠা করিয়া গোলাকার করিয়া গুড়ে দিলে তৈয়ার হয়।

ফিন্নি—আটা ও চিনি, কি গুড় জলে মিশাইয়া জ্বাল দিলে তৈয়ার হয়।

হালুয়া—ফিন্নির মত তৈয়ারী হয়।

পরোটা—গমের ময়দা, ঘি ও চিনি দ্বারা তৈয়ার হয়।

গড়গড়ে—আটার খমিরের গোলাকৃতি।

জুলা—রুটি তৈয়ারের জন্য গড়গড় চেপ্টা করিয়া গোলাকার খাদ্য।

ছাতু—গম ভাজিয়া পিষিয়া তৈয়ার হয়।

ধুকি—চাউলের আটা হইতে তৈয়ারী হয়।

ফুলবড়ি—মসুরি কলাই হইতে তৈয়ারী হয়।

বড়ি—মাষকলাই হইতে তৈয়ারী হয়।

পালো—আটা হইতে তৈয়ারী হয়।

ক্ষিরসে—দুধ হইতে তৈয়ারী হয়।

ঝালবড়া।

পাঁপড়।

বেগ্‌নি।

দালপুরী।

আলুর দুম।

মাউত গুড়—জলের মত গুড়।

বালিগুড়—বালির মত কর্‌করে শুক্‌না গুড়।

আমানী—বাসী ভাত খাইয়া ফেলিয়া যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে বলে (কাঁজি)।

সুরুয়া—ঝোল।

কোলিয়া—খোঁড়ো, কি কুমড়ার সহিত ছোলা কলাই মিশাইয়া রাঁধিলে হয়।

পোলাও—পলান্ন, পল (মাংস) মিশ্রিত ভাত।

খোস্কাভাত—সাধারণ ভাত।

কুরমা—মাংসে প্রস্তুত।

কাবাব—মাংসে প্রস্তুত।

কোপ্তা—মাংসে প্রস্তুত।

গোস্তাত ভুনা—মাংস ভাজা (ভুনা—ভাজা)।

ঝালুন—তরকারী।

আণ্ডা—ডিম্ (অণ্ড-শব্দ)।

আণ্ডা বিরুন (বের্‌হান)—ডিমভাজা।

বায়জা (ডিম) বা আণ্ডা বেরেস্তা—ডিম ভাজিবার অন্য প্রণালী।

(বেগুনের) খোগিনী—বেগুন পুড়াইয়া আণ্ডার সহিত ভাজিলে তৈয়ার হয়।

আলু, মাছ বা কলাই শানা—ভর্‌তা করা।

শাক চড়চড়ি—শাক ও জাল-মাছে রাঁধা।

খাটা শানা—তেঁতুল খাটা লবণের সহিত জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়া যায়।

আলুর দুম—আলু গোটা রাখিয়া রাঁধিবার প্রণালী।

কলাই সিজেন—সিদ্ধ করা।

দালের জুস—দাল্ না খাইয়া উহার উপরের দালহীন অংশ খাওয়া।

একাদশ বিভাগ

পল্লীজীবনের উৎসব ও সামাজিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপার।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

বিয়ে, শাদী—সাধারণ বিবাহকে বলে।

নিকে, নিকা—স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রীলোক পুনরায় বিবাহ করিলে সেই বিবাহকে নিকা বলে।

আকোদ্, আগোদ্—স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া গেলে পুনরায় যে বিবাহ হয়।

স্বামীর বিভিন্ন নাম :—

পুরুষ—স্বামী, সাধারণ স্ত্রীলোকে নিজের স্বামীকে বলে।

ভাতার—একজন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের স্বামীকে সাধারণ ঠাট্টা, কি খারাপ ভাবে বলে।

দামান—স্ত্রীলোকে অপরের স্বামীকে বলে।

দুলা—নববিবাহিত স্বামী।

বর—বিবাহ করিতে উদ্যত স্বামী।

নওশাহ— ঐ ঐ।

স্ত্রীর বিভিন্ন নাম :—

বিবি—স্ত্রী।

জানানা—সাধারণ স্ত্রীলোক।

মাগ—সাধারণ লোকে খারাপ ভাবে অপরের স্ত্রীকে বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন শব্দ।

ঢোল ফুল—ঢাকঢোলের বাজাইয়া বিবাহ হওয়া।

শারাই—মুসলমানের শরিয়ত অনুসারে বিবাহ হওয়া।

সুমুদ্ পাতান—বিবাহের সম্বন্ধ করা।

ঘটোক্—যে সম্বন্ধ বা বিবাহের কথা চালায়।

ঘটকভালি—সমুদ পাতান।

ল সুমুদে—বিবাহের সম্বন্ধের জন্য বরপক্ষের লোকের কন্যাপক্ষের বাড়ীতে যাওয়া।

ঘর বর দেখা—কন্যাপক্ষের লোকের বরের বাড়ীতে যাইয়া বর ও বরের বাড়ী দেখা।

দিন ফেলান—দিন নির্দ্ধারিত করা।

লগুন—বিবাহের দুই দিন আগে বরপক্ষের লোক কন্যাপক্ষের বাড়ীতে কাপড় গহনা ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকে। ইহাকে লগুন বলে।

থুব্‌ড়ো ভাত—বিবাহের আগের দিন কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের বাড়ীতে বর ও কন্যাকে নিজের নিজের বাড়ীতে আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে যে ভাত খাওয়ান হয়।

রীত রসুম—দেশে প্রচলিত সমস্ত প্রথা পালন।

মিরাসুন—যে সঙ্গীতব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর ভিতর বিবাহের সময় গান করে।

নহবৎ বাজান—উঁচু জায়গার উপর বাজনা বাজান।

হোল্‌দে খ্যাড়্—বিবাহের আগের দিন পিতামহ, মাতামহ ও ভগিনীপতিকে ডুলিতে চরাইয়া ঢোল বাজাইয়া সমস্ত গ্রাম ঘুরান হয় ও হলুদ ও রং ছিটান হয়।

গাওকুশী—বিবাহের আগের দিন বর ও কন্যা-পক্ষের বাড়ীতে যে ভোজ হয়।

উঠে আসা—ক'নের বরের বাড়ী যাইয়া বিবাহ করা।

চোড়ে যাওয়া—বরের ক'নের বাড়ী যাইয়া বিবাহ করা।

শিয়ারা—যাহা দ্বারা বরের মাথা সাজান যায় ও তাহাতে ২।১টা ফুল থাকে।

চৌদোল—যে সুসজ্জিত আসনের উপর চড়িয়া নওসাহ (বর) ঢোল, ফুল, ঝাড়, মশাল, হাওয়াই, চোর্‌খি, বুম, কদুম, পটোকা, ফনাশ প্রভৃতি আতস-বাজীর সহিত সমস্ত গ্রাম ঘুরে।

গাঁগোস—সমস্ত গ্রাম বরকে ঢোল বাজাইয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান।

বরাত
ম্যামান } বরযাত্রী

ডুলি, মাফা, পাল্কী—যানবিশেষ।

বিবি—বরের যে সব স্ত্রীজাতীয় আত্মীয় ডুলি ও পাল্কীতে চড়িয়া বরের সঙ্গে ক'নের বাড়ী যায়।

কাহার, বেহারা—পাল্কীবাহী ব্যক্তি।

ব্যাগার—বিনা পারিশ্রমিকে জিনিষপত্র বহনকারী ব্যক্তি।

সিদে—বরের বা কন্যার পক্ষের লোকেরা বেহারাদিগের খোরাকস্বরূপ যাহা দেয়।

মদের ইলিম্—পাল্কীবাহীদিগকে মদ খাইবার জন্য যে পয়সা দেওয়া হয়।

সাত পাক্—বরের ক'নের বাড়ী যাইয়াই প্রথমে সাত পাক ঘুরা।

আলুম তালা—ঘুরিবার পর ক'নের বাড়ীর আঙ্গিনার মাঝখানে চারিদিকে বড় বড় কুঞ্চি (সরু বংশদণ্ড) পুঁতিয়া

যে আসন ও বিছানা পাতা হয় (স্থাপন করা হয়)। বর সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া সরবৎ খায়।

তখ্‌ত (সিংহাসন)—তৎপরে বর—নওশাহ (নবশাহ-বাদশাহ)-দহলিজে (বৈঠক-খানায়) যেখানে আসন পাতা থাকে, সেখানে বরযাত্রীর মাঝে বসে।

তখ্‌তের কাপড়—যে কাপড় দ্বারা নওশার আসন আবৃত থাকে।

অজু করা—বর ও বরাতদিগের হাত পা মুখ ধৌত করা।

সরবৎ, শর্‌বোৎ—চিনি ও গোলাপ-মিশ্রিত সুমিষ্ট জল।

বিরিদান—পান রাখিবার আধার।

পানের খিলি—মসলা সহ এক একটা তৈয়ারী পান।

হুঁকা খাওয়া } ধূমপানবিশেষ।
তামাক খাওয়া }

হুঁকা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কথা—

গর্‌গরা—হুঁকার নামবিশেষ। পিতলের তৈয়ারী।

ফোরসি— ঐ ঐ।

সটকা— ঐ ঐ।

নারিকেলের হুঁকা—নারিকেলের খোলার তৈয়ারী।

নৈয়চে—হুঁকার যে অংশের উপর কল্কি থাকে, সেই লম্বা কাষ্ঠময় অংশ।

চিলুম—কল্কি।

তাওয়া—চিত্‌রে কল্কি।

গুল—যে তামাক খাওয়া হইয়াছে, তাহার পোড়া অংশ।

টিকে, গুল—ইহা পুড়াইয়া তামাক খাওয়া হয়।

কাঁই—চিলুমের ভিতর তামাকের যে অংশ লাগিয়া থাকে।

নুটি, লুটি—খড়কে চিলুমের মাথার মত গোল করিয়া পুড়াইয়া তামাক খাওয়া হয়, ঐ খড়কে নুটি বলে। এইরূপে বিভিন্নরূপে তামাক খাওয়া হয়।

নাস্তা—তৎপরে সন্দেশ, রুটি, ফিন্নি যাহা মেহমানদিগকে খাইতে দেওয়া হয়।

খানা—তৎপরে 'ভোজ' খাওয়া।

দেন্‌মোহর—কয়েক শত বা হাজার টাকা বর কর্ত্তৃক বিবাহের সময় ক'নের নিকট ঋণ স্বীকার করা।

আগোদবস্ত—বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করা, বিবাহ।

আগোদ্‌বোস্ত পড়ান—বিবাহ পড়ান।

গওয়া—বিবাহ হইল, তাহার সাক্ষী (ক'নে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে) এই কথা যিনি প্রকাশ করেন।

উকীল—বিবাহ পড়াইবার সময় যে ব্যক্তি, ক'নে রাজী হইয়াছে বলিয়া ক'নে-পক্ষ সমর্থন করেন।

মোল্লা বা কাজী—যিনি বিবাহ পড়ান।

খোত্‌বা—বিবাহ পড়ানের পরেই কোরান শরীফের কিয়দংশ পড়া।

মোনাজাত—সকলে বর ক'নের উপর আশীর্ব্বাদ জন্য প্রার্থনা করে।

কাজারী—বরপক্ষের নিকট হইতে ক'নের গ্রামের লোকেরা মস্‌জিদ বা স্কুলের জন্য যাহা কিছু আদায় করে।

জুলুয়া—স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর মুখ দেখান।

বাঁসোর ঘর—যে ঘরে স্ত্রী-পুরুষে প্রথম রাত্রি যাপন করে।

হাজ্রি—সন্দেশ ও রুটি, যাহা কন্যাপক্ষের লোকে বরপক্ষকে বিবাহের পর দেয়।

নীছার—বরাতেরা বিবাহ হইয়া গেলে বরের পিতাকে আনন্দ প্রকাশের জন্য যে টাকা কড়ি দেয়।

বো-হাজরি, বৌভাত—বৌ (বধূ) প্রথমে শ্বশুরালয়ে যাইলে সেখানে তিন দিনের দিনে যে উৎসব হয়।

মুখ দেখানি—নূতন বধূর মুখ দেখিয়া যে টাকা দেওয়া হয়।

আটমঙ্গলা—বৌ প্রথমে শ্বশুরালয়ে তিন দিন থাকিবার পর নিজের বাপের বাড়ী যায়। তখন জামাতাও ঐ সঙ্গে যাইয়া আট দিন থাকে। তাহাকে আট-মঙ্গলা বলে।

দুলা, দামানমিয়া—আটমঙ্গলায় যাইলে তখন সকলে জামাইকে ঐ নামে ডাকে।

বাদ্‌গোস্তী—জামাতা তার বাড়ী আসিয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে যায় ও কিছুদিন থাকে।

সালামী—বর বাদ্‌গোস্তীর শেষ দিন ক'নের আত্মীয় স্বজনকে সালাম করিয়া মিঠাই ও কিছু অর্থ দিয়া যায়। ঐ অর্থের দ্বিগুণ আবার ক'নে যখন বাপের বাড়ী হইতে দান যৌতুক লইয়া শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন দিতে হয়।

নবোশ্‌তে, ন-বোশ্‌তে—কন্যার বাপের বাড়ী হইতে দান যৌতুক লইয়া শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া।

বিবাহ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা,—

দোজবেরে—যে পুরুষের ১ম স্ত্রী মারা গিয়াছে ও ফের ২য় পত্নী গ্রহণ করিয়াছে।

তেজবেরে, ত্যাজবেরে—যে দ্বিতীয় স্ত্রী মরিলে ৩য় স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে।

নোতুনি, নোতুনি—নূতন বৌ, যার এখনও ছেলে হয় নাই।

কাঠবাপ্—যে স্ত্রীলোক ১ম স্বামী মরিবার পর ২য় স্বামী গ্রহণ করে, তাহার পূর্ব্বস্বামীর ছেলেগুলি নব স্বামীকে কাঠবাপ বলিবে।

রাড়্‌বেওয়া—বিধবা স্ত্রীলোক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের জন্মসম্বন্ধীয়।

সাধ্‌ভাত—যুবতী স্ত্রীলোককে তাহার সর্ব্ব-প্রথম সন্তান প্রসব করিবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে তাহার আত্মীয়গণ ধুম্‌-ধামের সহিত ভোজ করিয়া যে ভাত খাওয়ায়।

পোয়াতি—যে স্ত্রীলোক গর্ভিনী।

আঁতুর ঘর—যে ঘরে সন্তান প্রসব করে।

কামান—সন্তান প্রসব হইলে প্রসূতি ও সন্তানকে কামাইয়া দেওয়া।

আজান্ দেওয়া—ছেলের কাণে খোদাতালার প্রশংসাসূচক বাণী শুনান।

আঁতুর বেরেন—প্রসূতি যখন বাহির হইয়া সংসারের সমস্ত কাজকাম করিবার ক্ষমতা পায়। কেন না, এতদিন সে অপবিত্র ছিল।

ভুঁজোন—ছেলের মুখে ভাত দেওয়া উৎসব।

আঁকিকা—ইস্‌লাম ধর্ম্মের শাস্ত্র অনুযায়ী ছেলের নামকরণ-উৎসব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ক) শাস্ত্র অনুযায়ী নাম থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্বন্ধ রাখিয়া ছেলে পিলের ডাকনাম রাখা হয়, যথা :—

কটা—যে ছেলের রং শাদা হয়।

কটী—যে মেয়ে-ছেলের রং শাদা হয়।

কেলে—যে ছেলের রং কাল হয়।

ভুঁদা, ভুঁদু—যে ছেলে ছোট বেলায় ভোঁদাল বা মোটা থাকে।

ফড়িং—যে ছেলে ছোট বেলায় খুব সরু দুর্ব্বল-কায় হয়।

খুদা—ছোট ছেলের সাধারণ নাম।

খুদী—ছোট মেয়েছেলের সাধারণ নাম।

আকালে, আকাই—যে ছেলের দুর্ভিক্ষের (আকালের) বৎসর জন্ম হয়।

আকালী—যে মেয়েছেলের দুর্ভিক্ষের বৎসর জন্ম।

গাজ্‌লু—যার ভয়ঙ্কর বর্ষার দিনে (গাজোলে) জন্ম।

বানু—যার বন্যার সময় জন্ম হয়।

খুদী—যে মেয়েছেলেকে যমের নিকটে খুদ্ দ্বারা কিনা হয়।

খুদু—যে ছেলেকে যমের নিকটে খুদ্ দ্বারা কিনা হয়। (খুদ্—চাউলকণা)।

এককড়ি—যে ছেলেকে একটি কড়ি দ্বারা যমের নিকট কিনা হয়। যতটি কড়ি দ্বারা যমের নিকট হইতে ছেলেকে কেনা হয়, কড়ির সেই সংখ্যানুসারে ছেলের নাম। যথা,—
দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচু বা পাঁচ-কড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি।

(খ) ছোট বড় হিসাবে সাত-ভাইয়ের নামকরণ।

বড়—প্রথম ভাই।

মাইতোর বা মেজো—দ্বিতীয় ভাই।

ল, ন—তৃতীয় ভাই।

সেজে, শায়লে—চতুর্থ ভাই।

ফুল—পঞ্চম ভাই।

খুদে—ষষ্ঠ ভাই।

ছোট—সপ্তম ভাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলমানী নাম।

খত্‌না বা মুসলমানি—লিঙ্গাগ্র ছেদন উৎসব।

হাজাম—যে লিঙ্গাগ্র ছেদন করে। (ছোট বেলায় পুত্রের লিঙ্গাগ্র ছেদন প্রত্যেক মুসলমান পিতার অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কানফুড়া (ফোড়া) উৎসব।

কানফুড়া—একটী পিতল, কি সোনার বালী ছোট মেয়েছেলের কানে ফুড়িয়া দেওয়া হয়

গড়গড়ে—কানফুড়া হইলে সমাগত পাড়ার ছেলেগুলিকে আটার খমীরের যে এক রকম গোল পদার্থ তৈয়ার করিয়া সিন্নি বা সন্দেশ সহ দেওয়া হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পল্লীগ্রামে প্রচলিত উৎসব।

(নিম্নলিখিত উৎসবের সহিত মুসলমান শাস্ত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই)

লবান, নবান—নবান্ন, ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে নূতন ধান্সের নবান্ন।

সাঁক্রাত—পৌষ সংক্রান্তির উৎসব, পৌষ মাসের শেষে হয়।

পোয়্গুলি বা কাজি সাহেবের খানা—১লা মাঘ মাঠের সমস্ত ধান তোলা হইলে ও বাড়ী আসিলে গ্রামের লোকে এক জায়গায় মাঠে ভোজ খায়।

ক্ষীর—এক জায়গায় সকলে মিলিয়া মস্‌জিদের সাম্‌নে ক্ষীর পাক করিয়া উৎসব করার নাম। ইহা মুসলমানেরা বৃষ্টি হইতে দেরী হইলে প্রায়ই করে। সাধারণতঃ মুসলমানের রোজা (উপবাস ব্রত) শেষ হইলে তাহার পরদিন যে উৎসব হয়, তাহাকে ক্ষীর বলে।

খোদায়ী খানা—ভাল ফসল হইলে যে কোনও ব্যক্তি যে খানা করিয়া গ্রামের লোকদিগকে খাওয়ায়, সেই খানাকে খোদায়ী খানা বলে।

ব্যারা—ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতি বারে হইয়া থাকে। জলে যাহাতে ছেলে না ডুবে, সেই উদ্দেশ্যে ইহা করা হয়। মুসলমানেরা ইহাকে "খেয়াজ খিজির"ও বলে।

সোদ্‌গুর পীর—কোনও সৎগুরু (পীরের) উদ্দেশ্যে (যে পীর জীবিত নাই) উৎসব করার নাম।

মাদার—একটা লম্বা বংশদণ্ডে নানা রংয়ের কাপড় জড়াইয়া নাচান হয়, ইহাকে মাদার নাচা বলে।

আমুতি—একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় অনেক লোক জমা হইয়া, একজন পালোয়ান আর একজনের সহিত কুস্তি করে, এই দৃশ্যকে আমুতি বলে।

পীর পৌরি—পরব উৎসব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাড়াগাঁয়ের আমোদ-প্রমোদ, সঙ্গীত ও গান সম্বন্ধীয় শব্দ।

লোট্‌-ও—এক প্রকারের প্রচলিত গান।

বেইলো, বেহুলা— ঐ ঐ।

যাত্রা— ঐ ঐ।

কবি— ঐ ঐ।

ইহার দুই ভাগ—কবি ও খেউর।

জংনামা—মুসলমানের গীত। অধুনা লুপ্ত।

কীর্ত্তন—হিন্দুদিগের ভিতর প্রচলিত দেবতার গুণগান।

সত্যপীরের গান—যে গানে পীরের (সাধু পুরুষের) মহিমা বর্ণন হয় (প্রায় লুপ্ত)।

মিরাসুন—বিবাহের সময় সঙ্গীতব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা যে গান করে।

ঝুমুরী—যে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা অশ্লীল গান করে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত ব্যক্তিদিগকে শুনায় (প্রচলিত)।

বাই খ্যাম্‌টা—যে দুষ্টা স্ত্রীলোকেরা গান করে (প্রচলিত)।

পাল্লা—৫২৩ বিভিন্ন গানের দলের প্রতি-
যোগিতায় গান করা।

রং ঢং করা—গানের মধ্যে দ্ব্যর্থসূচক রহস্য-
কর গান করা।

সং করা—গানের মাঝে মাঝে তামাসা করা।

ছড়া কাটাকাটি, বোল্ কাটাকাটি—গানের
আসরে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করিয়া
গান করা।

দুয়ার ধরা—অনেকে এক সঙ্গে গান করা।

দ্বাদশ বিভাগ

পল্লীগ্রামে প্রচলিত ব্যায়াম ও খেলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) বালকদিগের শারীরিক ব্যায়াম সকল।

হাডুডুডু। সুন্দাড়ী। থইদই।
দয়াখয়া। রবোরবি। ডবাডবি।
সোনা পোঁতাপুঁতি। সাকো
ড্যাঙ্গাডেঙ্গি। গুটি দিয়াদিয়ি। সিন্দুর
টুপাটুপি।

টিক্ লিয়ালিয়ি=জলে সাঁতরাইয়া খেলিতে
হয়।

ঝালঝুল্লি—গাছে ঝুলিয়া মাটিতে পড়া।

আনিমুনি—ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করা।

তাঁত বুনাবুনি— ঐ ঐ।

ঘোঁড়া ঘুঁড়ি।

(খ) লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধীয়—ডাংগুলি। টিয়ে
খেলা। তীর কাম্টা। ছোল্লড়ি।

(গ) বালকদিগের মানসিক ব্যায়াম।

বাঘ্ বক্রী। এক বাঘ। মোগল
চাল্। বার পেঁতে। তিন পেঁতে।
গোপা গোপি। ন পেঁতে। নাকি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকাদিগের ব্যায়াম।

(ক) ছোট বালিকাদিগের শারীরিক ব্যায়াম।

ইচিং বিচিং।

এই খেলা খেলিতে বালিকারা
নিম্নলিখিত গান করে :—

ইচিং বিচিং জামাই চিচি,
ফুল ফুটেছে থকা থকা তাতে
বড় কড়ি।
আড়াই মাসে ডিম্ পেড়েছে, লটে গাছের
বুড়ি।
লটে রে হট মট শাউনেরি শীষ
হেনা ঠাকুর বর দিয়েছে,
খারোই মারোই বিষ।
পঞ্চার মা ধান কুটো পঞ্চা খায় খুদ্
বাঁশতলাতে ঘুঘু ডাকে পঞ্চারে পুত।
বল্লো ফাজেলা পুরুত।

আগাডুম্ বাগাডুম—

এই খেলা খেলিতে নিম্নলিখিত
গান গাওয়া হয়।

আগাডুম বাগাডুম ঘোড়াডুম সাজে,
ডান মোন্‌তোর ঘোঁগোর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে গগন পুব,
গগনে আছে অণ্ডি বণ্ডি:টীয়া টশকুন
বড্ডির বায়ুন
হেঁচকে পাথ রাই রথ্ রাজা তুই
তাইতো বল্লে গীতের 'মতু'ই।

আলুন বালুন—ইহা খেলিতে নিম্নলিখিত গান

গাওয়া হয়,—

আলুন বালুন চালুনখানি,
মেইদি গাছের গুড়ি ;
সাত টাকা দিয়ে বিয়ে কর্‌লাম
খাঁদি লাকি ছুঁড়ি।
খাঁদা হোক বোঁচা হোক তাও আমি পরি,
সানোক সানুক ভাত খায় ঐ জ্বলুনে মরি,
বোল্‌ 'ফাজেলা' কি করি।

আতালি পাতালি।

নিম্নলিখিত গান গাওয়া হয়,—

আতালি রে পাতালি
শাম গেল শাতালি।
শামেদেরই বো-চুটি পথে বসে কাঁদে,
কেঁদ না মা কেঁদ না গুড় ছোলা দিব,
গুড় ছোলা খাব না মা বাপ্‌দের বাড়ী যাব,
বাপ দিলে হল্‌দি
মা দিলে ঝারি ;
চট করে মা বিদায় কর
রথ চলেছে ভারী।
ই রথে যাব না মা উল্টো রথে যাব,
দুই সতীনে কাঁটাল কিনে,
মিলে মিশে খাব
গাব গুবাগুব গাব ;
ফাজেলা এইতো আমি খাব।

আলফুল।

(খ) বালিকাদিগের মানসিক ব্যায়াম।

চাক্‌ চাকুলা—ইহার নিম্নলিখিত গান।

চাকরে চাকুলা,
বেঁশের পাতা পাকুলা,
ধান ভান্‌তে শিকুলা।
চরক তুলে মার্‌তে বাং
পুকুরে পাঁচ খান,
ক্যালা ক্যালা গাছখান।
মাগুর মাগুর মাছখান,
'ফাজু' চায় সবখান।
"ভাবু" হেসে আটখান।

দান দিয়াদিয়ি।

ধাপাঘটিং।

(গ) খেলাতে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী :—

খেলাপাতি—ভবিষ্যতে কিরূপে গৃহস্থালী ও ঘরকন্না করিতে হইবে, তাহা খেলা-পাতি নামক খেলার মধ্যে ছোট বেলায় অতি সামান্য জায়গার মধ্যে গৃহস্থালীর আস্‌বাব ও খাবার জিনিষের মত নানা প্রকারের জিনিষ লইয়া খেলা করিয়া বালিকারা বেশ বুঝিতে পারে। এই সব দেখিয়া বোধ হয় যে, আমাদের ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের মধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রাকৃতিক নিয়মে কিণ্ডার গার্টেনের মত কার্য্য হইয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খেলায় হার্‌জিত।

চাঁদ, চিক্‌, হাঁড়ি — এক দল বা একজন আর একদল—বা জনকে হারাইয়া দিলে পরাজিত পক্ষকে অপর পক্ষ চাঁদ, চিক্‌, হাঁড়ি লাগায়।

ত্রয়োদশ বিভাগ

বিভিন্ন প্রকারের শব্দসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন প্রকারের জন্তুকে ডাকিবার বিভিন্ন শব্দ।

হাম্বা আয়—হ্যা হই—গোরুকে ডাকিতে লোকে বলে।

আতু আয়—কুকুরকে ডাকিতে লোকে বলে।

আর্‌রা আয়—ছাগলকে ডাকিতে লোকে বলে।

আফুর্‌রা—ছাগলকে	ঐ	ঐ।
কড়ে কড়ে আয়—হাঁস	ঐ	ঐ।
তোই তোই—হাঁস	ঐ	ঐ।
আতিতি আয়—মুরগিকে	ঐ	ঐ।
পুষ্‌ পুষ্‌—বিড়ালকে	ঐ	ঐ।

হ-হ, র-র—গরুকে থামাইতে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোন জন্তুকে তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

হুশ্‌—মুরগিকে তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

ছেই—কুকুর তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

লিই—ছাগল তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

বিল্‌—বিড়াল তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

হাট্‌—হাঁস তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

দিগ্‌ দিগায়—গরু তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপমা সহিত রংয়ের বিভিন্ন নাম।

কালোভোঁম্‌রা, কালো কিশ্‌কিশে, কালো ইহুঁটি, কালো ধানষুনো—অতিরিক্ত কালো।

লাল বীম, লালভবোক্‌, লাল সুরাখ, লাল টুকটুকে—খুব লাল।

সাদা বগ্‌বগে, সাদা ধপ্‌ধপে, সাদা ফট্‌ফটে, ধলো বুরাক্‌, ধলো দুধ—খুব সাদা।

কাঁচা হর্‌হরে—খুব সবুজ।

তর্‌তরে কাজোল জল—উজ্জ্বল কজ্জলবর্ণ-বিশিষ্ট জল।

পুড়িয়ে ঝাইকল্লা—পুড়াইয়া কালো ছাই করা।

আঁধার ঘুরঘুটো—খুব অন্ধকার।

সমাপ্ত

মোল্লা শ্রীরবীউদ্দীন আহমদ্‌

কবীন্দ্র রমাপতি*

কবীন্দ্র রমাপতি চন্দ্রকোণার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম দেওয়ান গঙ্গাবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতামহের নাম রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাবিষ্ণু কাঁথির নিমকমহালের দেওয়ান ছিলেন। গঙ্গাবিষ্ণুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম দেওয়ান রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনিও নিমকমহালের দেওয়ান ছিলেন। রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সদাচারী গৃহস্থ ছিলেন। চন্দ্রকোণার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ আচারে ব্যবহারে ও সামাজিকতায় তৎকালের আদর্শ ছিল।

গঙ্গাবিষ্ণু বেশী দিন দেওয়ানী-কার্য্য করিতে পারেন নাই। দারুণ সঙ্গীত-পিপাসাই তাঁহার কাল হইল। তিনি সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া, উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষা মানসে ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ দেওয়ানী পদে বাহাল হইলেন।

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি দক্ষতার সহিত বহুকাল যাবৎ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতি উন্নত ছিল এবং পরোপকারে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতে ভালবাসিত। আর্ত্তের সেবা, বুভুক্ষিতে অন্নদান, অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়নের রীতিমত ব্যবস্থা, তিনি তাঁহার বাসস্থান চন্দ্রকোণা ও কর্ম্ম-স্থান কাঁথিতে করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই চন্দ্রকোণায় বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হয় এবং দানশীলতা ও বদান্যতার জন্য তাঁহারা চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চন্দ্রকোণায় ইহাঁদের প্রাসাদতুল্য বসতবাটী ইনিই নির্ম্মাণ করাইয়া যান।

বাঙ্গালা ১২৩০ সালে সমুদ্র হইতে এক বিশাল তরঙ্গাভিঘাত আসিয়া হিজলি কাঁথিকে বিষম বিপন্ন করিয়া তুলে। দেওয়ান রামকৃষ্ণ এই সময় নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া এবং নিজ সঞ্চিত অর্থরাশির সদ্ব্যবহার করিয়া প্রায় ৩০।৪০ হাজার নরনারীকে আসন্ন মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার যোগ্যতার ও পরহিতৈষণার পুরস্কারস্বরূপ সরকার বাহাদুর "খেলাৎ" দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজসরকার হইতে সম্মান লাভের পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া গঙ্গাবিষ্ণু চন্দ্রকোণায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণও একজন সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর ছিল। মহম্মদ বক্স ও আসমৎ উল্লা নামক দুইজন পশ্চিমদেশীয় প্রসিদ্ধ কলাবৎ এক সময় যদুপুরের রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। রায় মহাশয় সরকারী কাননগোঁইর কার্য্য করিতেন এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। দেওয়ান রামকৃষ্ণ আমন্ত্রিত হইয়া যদুপুরে গায়কদিগের

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৩শ বর্ষের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গুণগাথায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে চন্দ্রকোণায় লইয়া যান এবং ৫।৬ বৎসর কাল তাঁহাদিগকে সেখানেই রাখিয়া দেন।

কবীন্দ্রের যখন জন্ম হয়, তখন দেওয়ানবাড়ীর অবস্থা খুব স্বচ্ছল। দানে, মানে, সমৃদ্ধিতে, সঙ্গীতালোচনায় তাঁহাদের গৃহ তখন সর্ব্বদাই সরগরম থাকিত। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে ইঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কবীন্দ্রের বয়স যখন ৭।৮ বৎসর, তখন একদিবস অপরাহ্নে তাঁহার পিতা গঙ্গাবিষ্ণু একটী জটিল রাগিণীর আলাপচারি করিতেছিলেন এবং তাহা আয়ত্ত করিতে বিশেষ বেগ পাইতেছিলেন; অবশেষে সন্ধ্যার সময় তিনি একটু হতাশ হইয়াই আহ্নিকের জন্য উঠিয়া পড়েন। বালক রমাপতি এই অবকাশে পিতার পরিত্যক্ত রাগিণীটা আলাপ করিতে থাকেন। ঠাকুরঘর হইতে গঙ্গাবিষ্ণু আলাপ শুনিয়া মনে করিলেন, তাঁহার কোন সাকরেদের এই কার্য্য। তিনি আহ্নিক শেষ করিয়া চুপি চুপি বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পুত্রেরই এই কার্য্য; তিনি অন্তরালে থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন যে, আলাপটি অনেকটা তাঁহার অনুরূপই হইতেছে। রমাপতি পিতার পুনরাগমনের সময় বুঝিয়া যেমনই পলাইতে যাইবেন, গঙ্গাবিষ্ণু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, সাহস দিয়া সস্নেহে পুত্রকে উৎসাহবাক্যে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, যেন সে প্রত্যহই তাঁহার নিকট সঙ্গীতের পাঠ লয়। এই সময় হইতেই কবীন্দ্রের সা রি গা মা সাধা সুরু হইয়া গেল। পরবর্ত্তী ৫।৭ বৎসরের মধ্যে কিশোর রমাপতির কণ্ঠে তাঁহার পিতার অর্জ্জিত বহু রাগরাগিণী স্ফূর্ত্তিলাভ করিল। পূর্ব্বোক্ত খাঁ সাহেবদ্বয়ের আগমনে চন্দ্রকোণার বাটীতে মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইল—গঙ্গাবিষ্ণুর গুণপণা ও কালোয়াৎগণের কস্‌রৎ একত্রে মিলিত হইয়া প্রতিভাশালী রমাপতির উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ দুবে নামক প্রসিদ্ধ ওস্তাদ্, বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ গায়ক শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মৃদঙ্গী রামমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এ সময় গঙ্গাবিষ্ণুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেন এবং সকলেই রমাপতিকে বিশেষ স্নেহ সহকারে তাঁহাদের "চাল" দিয়াছিলেন। এইরূপে জীবনের প্রথম প্রভাত হইতেই রমাপতি বীণাপাণির মধুর ঝঙ্কারের মধ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসীতেও ইনি কৃতবিদ্য হন।

দেওয়ান রামকৃষ্ণের সহায়তায় রমাপতি কাঁথির নিমকমহালের মির-মুনসির পদে বাহাল হইয়াছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ইনি অধিক দিন কার্য্যে বাহাল থাকিতে পারেন নাই। নিমকমহাল উঠিয়া যাইবার কথায় তিনি পূর্ব্ব হইতে চাকুরী লাভের চেষ্টায় কাঁথি ত্যাগ করিয়া যান এবং ময়ূরভঞ্জের রাজসরকারে ও সুজামুঠা মাজনামুঠা সেরেস্তায় কার্য্য করিতে থাকেন। ময়ূরভঞ্জে থাকার সময় তিনি উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করেন এবং উড়িয়া সঙ্গীতও রচনা করেন।

এক সময়ে তিনি সমস্ত চাকুরি ছাড়িয়া দিন কয়েক নিজ বাটীতেই অবস্থান করিতে থাকেন এবং আপনার বৈঠকখানার ঘরে একটি গানের আখড়া স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের সহিত

সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে থাকেন। চন্দ্রকোণার বিশ্বম্ভর দাস ওরফে বিশুদাস ইঁহার সাকরেদগণের মধ্যে বেশ নামজাদা ওস্তাদ হইয়াছিলেন। বিশুদাস ইঁহার বাটীতে গরুর রাখালি করিত ও জাতিতে বৈষ্ণব ছিল।

এই সময় রমাপতি বর্দ্ধমান রাজসেরেস্তায় চাকুরি গ্রহণ করেন এবং কাজেই চন্দ্রকোণায় তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বিশুই তথাকার "মওড়া" রাখিতে লাগিল এবং কবীন্দ্রের সাকরেদ-গণও বিশুকেই ওস্তাদ করিয়া, তাহার নিকট গলা ও হাত সাধিতে লাগিল।

চন্দ্রকোণা বর্দ্ধমানরাজের জমীদারি। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর রমাপতির গুণপনার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমানে লইয়া গেলেন এবং জমীদারির দেওয়ানপদে বাহাল করিয়া, একজন প্রধান পার্ষদ করিয়া, সর্ব্বদাই তাঁহার সাহচর্য্যে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অধিরাজ বাহাদুর বাস্তবিকই একজন গুণগ্রাহী ছিলেন এবং নিজেও জ্ঞান ও গুণের চর্চ্চা করিয়া দেশে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তিনি সমগ্র মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া, সাধারণে প্রচার করিয়া দেশের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। হিন্দুধর্ম্মের আচার ও ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার অধ্যাপকগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার শতাধিক প্রশ্নের মীমাংসা করাইয়াছিলেন এবং পরে স্বয়ং সেগুলির সমাধান করিয়া "প্রশ্নোত্তরমালা" নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নসমূহের সবগুলিই অতি অপূর্ব্ব এবং প্রশ্নোত্তরমালাখানি পড়িলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবল সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা ছিলেন। বর্দ্ধমানে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই রমাপতির আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু অধিরাজ বাহাদুরের আশ্রয়ে তাঁহার সকল অভাবই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যহই রমাপতি নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

একদা অধিরাজ বাহাদুরের একটা খেয়াল চাপিল। এটাকে হয় ত শুধু খেয়াল বলিলে চলে না। উপনিষদের ক্ষত্রিয় রাজর্ষিদিগের অনুরূপ ব্রহ্মবাদী গুরু হইবার ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগের নিকট (এ সময় মহাভারত অনুবাদ লইয়া তাঁহার সভা ব্রাহ্মণপণ্ডিতে পরিপূর্ণ ছিল) কথা পাড়িতেই একবাক্যে সকলে "ভাষ" দিলেন যে, অধিরাজ বহাদুরের ইচ্ছা শাস্ত্রবাক্যের প্রতিকূল নহে। আর যায় কোথা? প্রথমেই সভাপণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়কে ব্রহ্মমন্ত্র দিতে চাহিলেন। তত্ত্বরত্ন মহাশয়ও নিজের "ভাষ" এড়াইতে না পারিয়া দীক্ষা লইলেন এবং অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি, পরমেশ্বর বেদরত্ন প্রভৃতি সভাস্থ বহু পণ্ডিতই শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। অবশ্য এ ব্যাপার গুপ্তভাবেই সম্পাদিত হইতে লাগিল। সুতরাং সমাজের ভয় ইহাতে রহিল না। ইহাতে পারলৌকিক লাভলোকসান সহসা বুঝা না গেলেও, শিষ্যবর্গের বর্গহারে যে দক্ষিণার

মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ইহলোকের স্বচ্ছলতা আনিয়া দিল, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই; সুতরাং নূতন গুরুকরণের ফল যে তাঁহারা হাতে হাতেই পাইতে লাগিলেন, তাহা একরূপ অবিসম্বাদিত সত্য। কাঁজেই শিষ্যসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং রাজসেরেস্তার যাবতীয় কর্ম্মচারীও শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল। প্রতি সন্ধ্যায় শিষ্য ভোজনের ধূম পড়িয়া গেল। কৃপাসিন্ধু অধিরাজ বাহাদুর একাধারে অন্নবস্ত্র-শিক্ষাদীক্ষাদাতা গুরু হইয়া মুক্তহস্তে শিষ্যবর্গের যাবতীয় অভাব মোচন করতঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সভামধ্যে একদিন কথা পড়িল, দেওয়ান রমাপতি কেন অধিরাজ বাহাদুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন না। কথাটা অধিরাজ বাহাদুরের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। দেওয়ানকে তলব পড়িল, দেওয়ানও হাজির হইলেন এবং সকলেই তাঁহাকে যুক্তি তর্কে ফেলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম রমাপতি নির্ব্বাকেই অবস্থান করিতেছিলেন, কেবল অধিরাজ বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বেই দীক্ষা লইয়াছেন, সুতরাং দুইবার দীক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই এবং ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু বিধায় অন্য কোন জাতি ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে না। অনেক তর্ক, অনেক বিতণ্ডা চলিতে লাগিল—গাধি-নন্দন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি হইতে কবীর, নানক, সুরদাস পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখান হইল যে, গুরুগিরি শুধু ব্রাহ্মণের একচেটিয়া নহে, উপযুক্ত হইলেই গুরু হইতে ও করিতে পারা যায়। রমাপতি "বাগ" মানিলেন না এবং অধিরাজ বাহাদুরও একটু বিরক্ত ভাব দেখাইলেন। রমাপতি নিঃস্ব হইলেও তাঁহার হৃদয়ের বল অসামান্য ছিল। তিনি অধিরাজ বাহাদুরের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া, রাজসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—একবার অধিরাজ বাহাদুরের অনুমতি লইবার অপেক্ষা রাখিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে রাজবাটীর সিংহদ্বারও তাঁহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল।

এই ঘটনার এই পরিণতি হইবে, অধিরাজ বাহাদুর তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যহই মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার রমাপতি আবার ফিরিয়া আসিবে, তাঁহার তলবের অপেক্ষা রাখিবে না। কিন্তু তাহা হইল না, রমাপতি ফিরিলেন না।

এ দিকে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রমাপতির জঠরে ও ইজ্জতে রীতিমত লড়াই সুরু হইয়া গিয়াছে। তার উপর তখন ছেলেমেয়ে লইয়া বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। এ সময় একটী ব্যাপারে মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে আর না ডাকিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দিল্লী হইতে একজন বিখ্যাত নর্ত্তকী ও গায়িকা বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং রাজ-বাটীতেও তাঁহার আমন্ত্রণ হইয়াছে। মুজরার দিনস্থির হইল। বাইজির ফরমাস হইল, ময়দার উপর কিংখাবের চাদর বিছাইয়া আসর করিতে হইবে। মুজরার সহিত ময়দার কি সম্পর্ক, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না—সকলেরই মাথা ঘুরিয়া গেল। অধিরাজ বাহাদুরও ঠিক করিতে পারিলেন না—গুঁড়া ময়দা, কি ঠাসা ময়দা দিয়া আসর হইবে। এই সমস্যার মীমাংসার জন্য রমাপতির ডাক পড়িল। কারণ, বাইজিকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে রাজসভার

গুণজ্ঞতা ও কায়দার ব্যত্যয় ঘটিবে। লোকের উপর লোক ছুটাইয়া অধিরাজ বাহাদুর রমাপতিকে আনাইলেন।

আসরের কথা উঠিতেই রমাপতি বলিলেন যে, গুঁড়া ময়দার উপর ফরাস বিছাইয়া আসর করা হউক। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, সভাস্থলেই তাহা বুঝা যাইবে, এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই। অধিরাজ বাহাদুর কিন্তু নাচঘরের অর্দ্ধেকটা গুঁড়া ময়দায় ও অর্দ্ধেকটা ঠাসা ময়দায় আসর করিবার আদেশ দিলেন। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত অধিরাজ বাহাদুর সপার্ষদে উপবেশন করিলেন—নর্ত্তকীও আসরে নামিয়াই পায়ের দ্বারা মালুম করিয়া গুঁড়া ময়দার দিকেই সদলে বসিল। গীতবাদ্য আরম্ভ হইল, নর্ত্তকীর গুণপণায় সকলেই মোহিত হইয়া গেল। অবশেষে নর্ত্তকী অপূর্ব্ব অঙ্গসঞ্চালনে নৃত্য করিতে করিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সভাস্থ সকলকে সেলাম করিতে করিতে অধিরাজ বাহাদুরের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য শেষ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। অধিরাজ বাহাদুর তাহার গুণপণার তারিফ করিয়া উঠিলেন। নর্ত্তকী যেন অপ্রসন্নতার গুপ্ত হাসি হাসিয়া, নিজের পায়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ও হস্তখানি হতাশের ইঙ্গিতে হেলাইয়া পিছনের তালচীকে নিম্নস্বরে কহিল যে, এখানে কেহই সমঝদার নাই। রমাপতি তখনিই বাইজিকে সরিয়া যাইতে বলিয়া, ফরাস উঠাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্যেরা ফরাস উঠাইলে দেখা গেল যে, বাইজীর নাচের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের মৃদুগুরু আঘাতে একটী শতদল পদ্ম গুঁড়া ময়দার উপর অঙ্কিত হইয়াছে। সভায় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। অধিরাজ বাহাদুর বুঝিলেন, আজ শুধু রমাপতির জন্যই তাঁহার সভার বজায় হইয়া গেল। সেই অবধি অধিরাজ বাহাদুর রমাপতিকে একজন অন্তরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন এবং পরে ইহাঁকে "কবীন্দ্র" উপাধি দানে বিশেষ সম্মানিত করেন।

কবীন্দ্রের কণ্ঠস্বর অতি সুললিত ছিল—যন্ত্রসহযোগে গাহিলে সকলেই যেন আকৃষ্ট হইয়াই তথায় সমবেত হইত।

কবীন্দ্রের রচনাশক্তিও অতি অসাধারণ ছিল। তিনি যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। দেবদেবীবিষয়ক ও অন্যান্য সাময়িক ঘটনা লইয়া তাঁহার অনেক সঙ্গীত পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ১২৬৯ সালে "মূল সঙ্গীতাদর্শ" নামে একখানি সঙ্গীতপুস্তক তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানির মধ্যে অবশ্য তাঁহার সকল সঙ্গীত প্রকাশিত হয় নাই; এখনও এ দেশে তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত সঙ্গীত রহিয়াছে। পুস্তকখানিতে তাঁহার পিতা ও পিতামহের রচিত কয়েকটী পদ আছে এবং "কদু কর্ত্তৃক" রচিত গীতগুলি তাঁহার পত্নী করুণাময়ী দেবীর রচিত। আমরা পরে আলোচনাকালে দেখাইব, কি ভাবের গৌরবে, কি ভাষার ছটায় কবীন্দ্রের সঙ্গীতগুলি কত উচ্চ ধরণের।

কবীন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবন অতি মধুময় ছিল। করুণাময়ী তাঁহার অনুরূপ পত্নী ছিলেন —পতিপত্নী উভয়েই কাব্যরসে মগ্ন থাকিতেন। সঙ্গীতের রস ও রচনা লইয়া উভয়ের মধ্যে পাল্লা চলিত। করুণাময়ীর ন্যায় আদর্শ গৃহিণী পাইয়া কবীন্দ্রের জীবন চিরবসন্তময়

হইয়া উঠিয়াছিল এবং সাংসারিক অভাব অভিযোগের মধ্যেও কদাচিৎ রসোচ্ছ্বাসে ভাটা পড়িত। বাঙ্গালা ১২৭৯ সালের ২১শে ভাদ্র কবীন্দ্রের পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

এ স্থলে কবীন্দ্রপত্নী করুণাময়ীর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহা না বলিয়া রাখিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। শ্রীমতী করুণাময়ী বাঁকুড়া জেলার লেগো নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ গ্রামেই তাঁহার মাতুলালয় ছিল এবং তাঁহার মাতুল একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি মাতুলের নিকটেই থাকিতেন এবং তাঁহার নিকটেই করুণাময়ীর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষালাভ হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব মেধাদর্শনে মাতুল তাঁহাকে সরস্বতী বলিতেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। সংস্কৃতেও নানারূপ কবিতা লিখিয়া তিনি বর্দ্ধমান রাজসভা হইতে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও কন্যাগণের প্রাথমিক শিক্ষালাভও তাঁহার নিকটেই হইয়াছিল। রন্ধনেও তাঁহার অশেষ সুখ্যাতি ছিল। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম তিনিই সম্পাদন করিতে ভালবাসিতেন। তাৎকালিক পাকা গৃহিণীর প্রধান অঙ্গ টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ এবং বালকচিকিৎসায় তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।

সঙ্গীতেও তিনি কবীন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহার রচিত পদ "মূল সঙ্গীতাদর্শে" স্থান পাইয়াছে। তিনি সেতার, এস্রাজ ও পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন। কবীন্দ্রের মৃত্যুর পর বিখ্যাত সেতারী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকোণার বাটীতে তাঁহাকে মাঝে মাঝে সেতার শুনাইয়া যাইতেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বর্দ্ধমানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন তাঁহার উৎসাহেই হইয়াছিল এবং পাড়ার মেয়েছেলেদিগকে তিনি ধরিয়া তথায় পাঠাইয়া দিতেন এবং নিজেও তথায় শিক্ষকতা করিতেন। বাঙ্গালা ১২৯৭ সালের ১৫ই ভাদ্র করুণাময়ী পরলোক গমন করেন।

কবীন্দ্রের বংশ-লতিকা
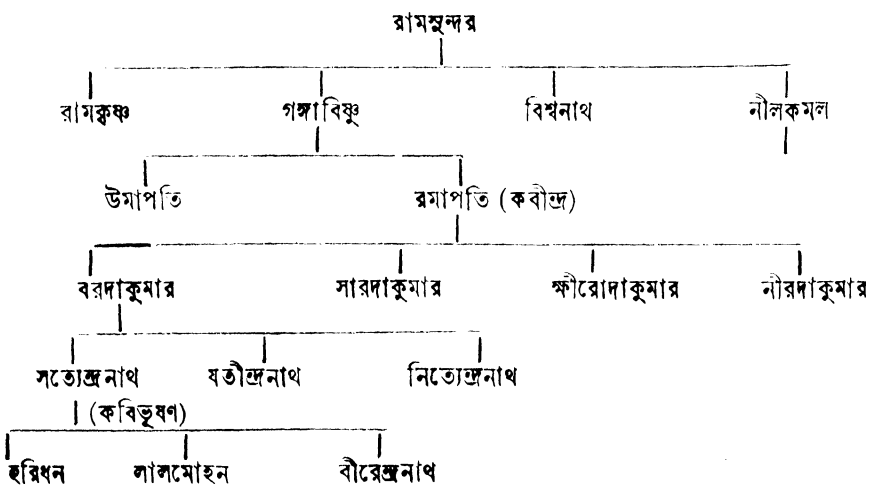
কবীন্দ্রের কাব্যকথা

সঙ্গীতের প্রাণ রস, কথা তাহার অঙ্গ ও সুর তাহার স্বচ্ছল-পেলব গতির সুচারু রেখাপাত—ভাব, ভাষা ও সুরে গান মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে। এ তিনটীর অপূর্ব্ব সমাবেশ সঙ্গীতে না থাকিলে চলে না, সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, কিছুরই সামঞ্জস্য থাকে না। কবীন্দ্র-প্রণীত "মূল সঙ্গীতাদর্শ" নামক পুস্তকখানিতে যে কয়টী সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এ তিনের সুন্দর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গীতই ছিল আমাদের কবীন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ও সাধনা—সঙ্গীতের মধ্যেই ছিল তাঁহার অস্তিত্ব এবং এই সঙ্গীতেই তাঁহার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া যে সকল উৎকৃষ্ট ও বাঙ্গালা দেশে অপ্রচলিত রাগরাগিণী তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার লোকান্তর গমনের পর লুপ্ত না হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে হিন্দী ভাষার শব্দসঙ্কট হইতে সুরগুলিকে উদ্ধার করিয়া, তিনি বঙ্গভাষার পূত মন্দাকিনীধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির প্রথমাংশে এক একটী করিয়া হিন্দী গান বা তাহার "কর্‌তব্" (ইহাকে কি আজকালের স্বরগ্রাম বলা যাইতে পারে?) ও তৎপরে অবিকল সেই সুরে বাঙ্গালা গান লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে ব্রহ্ম, শ্যামা, কৃষ্ণ ও ভবানীবিষয়ক অনেক সঙ্গীত আছে এবং নানাপ্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সাময়িক ঘটনা লইয়াও কতকগুলি উপভোগ্য রচনা আছে। কি গাহিবার সময়, কি পড়িবার সময়, কবীন্দ্রের রচনাগুলি যেন আপনিই ভাসিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, জোর করিয়া টানিয়া তান মিশাইতে হয় না। কি নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে, কি কৃষ্ণ কালী ভবানীবিষয়ে, সর্ব্বত্রই গানগুলি সম্পূর্ণরূপে ভাবাশ্রয় করিয়া যেন মানসপটে ছায়াচিত্রের ন্যায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে।

উপনিষদের "নেতি" ভাবে ব্রহ্মবিষয়ে কবীন্দ্র গাহিতেছেন (৪নং),—

রাগ মেঘ—তাল চৌতাল।

মন সাধন কর তাঁর, যিনি হন ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচর
জ্ঞানমনঅগোচর নয়ন না পায় দেখিতে।
নিরাকার নিরাধার, সর্ব্বজীবমূলাধার, নাণ্স্থূল নির্ব্বিকার
রোগ শোক ন অপেক্ষতে ॥১
ন শ্যাম ন শ্বেত, ন নীল ন পীত, সত্ত্বরজস্তমত্রিগুণাতীত,
পরমব্রহ্ম সৎস্বরূপ জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত।
নক্ষত্রাদি গ্রহচয়, যাঁহার নিয়মে রয়, ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত
ব্যাপিত জলে স্থলে অন্তরীক্ষেতে ॥২

আবার সত্ত্বগুণে তাঁহার স্তুতি করিতেছেন (৬নং),—

কেন তাঁর উপাসনা মন কর না,
যাঁর করুণা হয় ভবভয় নিবারণ, মায়ামোহবারণকারণ

বিতরণ করেন যিনি যার যেমন মনোবাসনা।
যাঁর নিয়মে রয় চরাচর, দিবা নিশির কর, ভ্রমেন নিরন্তর
সকল গুণের আধার, যাঁর মহিমা নয় বর্ণনগোচর,
সুখময় সুধাকর জগদাধার, পরিহার মানেন বলিতে
যাঁহার গুণ রসনা॥

হোরি গানে চন্দ্রমণ্ডল অবধি ফাগ ছড়াইয়া কবি গাহিতেছেন (১০নং),—

সারঙ্গ—কাওয়ালী।

নব সাজে প্যারী বিরাজে হরিষে হরিসমাজে
রঙ্গে লয়ে ব্রজরাজে।
পীতধড়া স্বীয় অঙ্গে ধরি, আপনি হইলেন বংশীধারী
সাদরে সাজায়ে কিশোরী রসরাজে
শ্যামাসখী আরো সখী সখা সাজিছে
তাল মৃদঙ্গ আরো ডম্ফ বাজিছে
রাধা ত্রিভঙ্গ শ্যাম গৌরাঙ্গ, উঠিল চন্দ্রে আবীরতরঙ্গ,
ঢাকিল রমাপতির অঙ্গ রঙ্গ মাঝে॥২

শ্রীমতীকে শ্যামের ও শ্যামকে শ্রীমতীর সাজে সাজাইয়া কবীন্দ্র, হরিসমাজে এক অপূর্ব্ব রসের স্বজন করিয়াছেন। আবার লোকলাজে সঙ্কুচিতা রাধার হইয়া গাহিতেছেন (১৬নং),—

ইমন—একতালা।

বারণ কর মনচোরেরে আসিতে সজনি।
একে অবলা আমি সরলা, তাতে ঘরে ননদি সাপিনী
দিবস রজনী আছে সহবাসে মরি ত্রাসে পাছে ভাবে
মনে যাহা না জানি॥
লাজে মরিব হইলে লোকে জানাজানি
রমাপতি ভাবে কি ভয় চন্দ্রবদনি॥

এই "মনে যাহা না জানি"র মধ্যে যাহা কিছু অন্তর্নিহিত আছে, তাহা শুদ্ধ ভাবুকেরই উপলব্ধির যোগ্য।

কৃষ্ণের কালো রূপে মোহিতা রাধার ভাবে কবীন্দ্র গাহিতেছেন (৩৫নং),—

ভক্তাবলী কানড়া—কাওয়ালী।

কালরূপে গেল সকল,
হরিল কুল মান বঙ্কিম নয়নে বাঁশির গানে
হইল প্রাণ আকুল।

চরণে চরণ অঙ্গ হেলাইয়া বামে,
　　প্রতি অঙ্গে মোহিত করিছে কামে
ইচ্ছা হয় ত্রিভঙ্গ ললিত ঠামে বান্ধা থাকি চিরকাল ॥
আ মরি কিবা পীত বসন হয়েছে অঙ্গের শোভা মনলোভা
তার অভরণে নবঘনে যেন তড়িত আভা
　　এ রূপে কুল বাঁচাব কিরূপে
　　মজিলে মন পড়িব বিরূপে
　মোহন বশে যদি এ কুল নাশে
　লাজ ধৈর্য্য-ধর্ম্ম থাকেন লক্ষ্মী যান বালাই
　　তাহে ভয় নাই
　মিলাইলে বিধি নিরবধি
　　পাইব শ্যামনিধি
কুলেতে কি কাজ তবে কুলে থাকি হইয়া গো কুলবতী
যদি হন অনুকূল এ ব্রজপতি মিলে দ্রুতগতি
　ভণয়ে রমাপতি যাবে না কুল গোকুল ॥

এই গানটী সুরে, রচনায় ও ভাবে অতি সুন্দর হইয়াছে। তাই এ গানটী লইয়া একটা ব্যাপার হইয়াছিল। বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী একবার রাজবাটীতে গাহিতে আসিয়াছেন—অধিরাজ বাহাদুর সপার্ষদে শুনিতেছেন। গোবিন্দ ঐ গানটী গাহিতেছেন—অধিরাজ বাহাদুর শুনিয়া খুসি হইতেছেন, গোবিন্দকে তারিফ দিতেছেন—গোবিন্দ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানারকমে গাহিয়া সকলের ধন্যবাদ পাইতেছেন। অধিরাজ বাহাদুরের প্রসন্নতার কারণ, এ গানটী তাঁহারই রমাপতির রচিত এবং গানটী এত প্রসারতা লাভ করিয়াছে যে, গোবিন্দ অধিকারীর মত প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাও অপরের গান বলিয়া আসরে গাহিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। কিন্তু গানের শেষে যখন গোবিন্দ নিজের নামে ভণিতা দিলেন, তখনই ত অধিরাজ বাহাদুরের চক্ষুঃস্থির। তিনি অবাক্ হইয়া রমাপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন—মনে করিতে লাগিলেন, বুঝি বা রমাপতিই গোবিন্দের গান এত দিন স্বনামে চালাইয়া আসিতেছেন। রমাপতিও নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কারণ, গোবিন্দ অধিকারীর ন্যায় গুণী লোকও এরূপ গান রচনা করিতেও ত পারেন? অধিরাজ বাহাদুর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গোবিন্দকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও কহিলেন, গানটী অতি পরিপাটি হইয়াছে। গোবিন্দ বিনীতভাবে উত্তর করিল,—এইখানেই, এই আসরেই সে এই গানটী সদ্য রচনা করিয়া গাহিয়াছে। অধিরাজ বাহাদুর একটু হাসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে, তাহা হইতেই পারে না। এ গান যে তাঁহার সভায় তিন চারি বৎসর চলিয়া আসিতেছে আর ইহার রচয়িতা তাঁহারই সভাসদ কবীন্দ্র রমাপতি। কবীন্দ্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, সুচতুর গোবিন্দ তাঁহার

পদধূলি লইয়া, আসরে ফিরিয়া গিয়া কবীন্দ্রের ভণিতা দিয়া গানটী পুনরায় গাহিয়া দিলেন।

কবীন্দ্রের রচিত প্রত্যেক গানেই কিছু না কিছু বিশিষ্টতা আছে। তাৎকালিক কবিগণ উৎকৃষ্ট শব্দ-বিন্যাস, অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষাদি শব্দালঙ্কারের অত্যধিক সমাদর করিতেন। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, দাশরথি, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির রচনার মধ্যে অনুপ্রাস শ্লেষ ইত্যাদির অজস্র ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিন্তু স্থানে স্থানে এরূপ রচনায় অর্থ-নিষ্কাশন কঠিন হইয়া উঠে, এক এক সময় অলঙ্কার রক্ষা করিতে গিয়া অর্থসঙ্কটের সৃষ্টি হইয়া যায়। কবীন্দ্রের যে এরূপ বিচ্যুতি ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। উদাহরণস্বরূপ শ্যামাবিষয়ক এই গানটী (৩০নং) উদ্ধৃত হইল।

দেশমল্লার—ঢিমে তেতালা।

কে নাচিছে সমরে বামা লাজ না সম্বরে
সুবেশা যুবতী সুলজ্জিতা রূপবতী সতী দাঁড়াইয়া বেষ্টিতা অমরে।
গোরা নহেন সাপক্ষ, রথির নাহি সাপেক্ষ, শবাসনে সাধে স্ববাসনা,
বক্ষে দাঁড়ায়ে কম্পাণি, ভূমে পড়ে শূলপাণি, সুরেশ্বরী যাঁর শিরোপরে॥১
সহর বিরাজে রণে, সিহরে বীরা যে রণে, কি সাহসে যুঝিছে সহাসে,
যে বল ধরে অবলা, বর্ণনে না যায় বলা, মহাবল শমন যায় ডরে॥২ ইত্যাদি

এ স্থলে "গোরা" শব্দের অর্থ ভাল বুঝা যায় না। মনে হয়, গোরা সৈন্যের প্রভাব ও প্রতাপের কথা তৎকালে খুব প্রচারিত ছিল এবং সেহেন গোরার সাহায্য না লইয়াও দেবীকে যুদ্ধে জয়ী দেখান হইয়াছে। সুতরাং গোরার যখন উল্লেখ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে "কম্পাণি" ও "সহরের"ও উল্লেখ করিতে হইয়াছে। 'কম্পাণি' ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ও 'সহর' কলিকাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এ দিকে কিন্তু দেবীপক্ষেও "কম্পাণি" শব্দে (কং নরমুণ্ডং পাণৌ যস্যাঃ) নরমুণ্ডধারিণী ও "সহর" হরের সহিত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এরূপ রচনায় কাব্যের কতদূর উৎকর্ষ হয়, বলা যায় না; কিন্তু প্রাচীন কবিদের এরূপ শব্দ-খেয়াল বিরল নহে।

যমকের পারিপাট্যে এ রচনাটি অতি উৎকৃষ্ট। গঙ্গা ও অন্নপূর্ণার আশ্রয় লইতে কবীন্দ্র গাহিতেছেন (৮২ নং),—

বাগেশ্রী—আড়া।

এখন বাসনা করি, এখানে বাস না করি, সমাধি হইগো শিবে।
আমার অশিবে বিনা শিবে কেবা বিনাশিবে
যথা উপাসনাশয় তথা উপাস না সয়
করিয়াছি পূর্ণাশয়, লব অন্নপূর্ণাশ্রয়।

কেন থাকি নিরাহার, করি গঙ্গানীরাহার, কালদণ্ড দুর্নিবার
অনিবার নিবারিবে ॥
ত্যজি সংসার সং-সার, করিব সৎসঙ্গ সার
বিপদে শ্রীপদ সার, অন্য সকলি অসার ;
শিববাক্যেতে মন দেহ, ইথে করো না সন্দেহ, রমার এ পাপ দেহ
শেষে গঙ্গাতে ভাসিবে ॥

অনুপ্রাসের চমৎকারিত্ব এই রচনাটিতে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিবার যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় কবীন্দ্র গাহিতেছেন (৩০ নং),—

খাম্বাজ—চৌতাল।

পীতবসন নীলকায়, বহিছে মন্দ অনিল তায়
রূপ জলদ বিদ্যুল্লতায়, করিয়াছে বিমোহিত মণীতে।
আহা মরি মন হরে মণিহারে, তার শ্রেণী হেরে বকশ্রেণী হারে,
দিবারে নারি উপমা সে নীহারে, সেই অবনত এ অবনীতে ॥
কপোল দীপ্ত আলোক অলকে, মোহিত হতেছে ত্রিলোক তিলকে,
হেরে মন হয় পুলক পলকে, মজায় অপাঙ্গভঙ্গিতে,—
সঙ্গে যুবতী কিবা রূপবতী, তাহার রূপের তুলে রতি রতি
ও পদপ্রান্তে রেখ ব্রজপতি, গতিহীন রমাপতি পতিতে ॥

কেবলমাত্র ভাষার পারিপাট্যে নহে, ভাববৈচিত্র্যেও কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতে উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা প্রভৃতি নায়িকার মনোহর বর্ণনা পাওয়া যায়। বিস্তৃতিভয়ে এখানে উল্লেখ করিলাম না।

সাময়িক ঘটনার সরস বর্ণনায় কবীন্দ্র যেন সিদ্ধহস্ত। বিধবাবিবাহ, প্রেমরা খেলা, রেলগাড়ী, লাইব্রেরি (মেট্‌কাফ হল), টেলিগ্রাফ, বর্দ্ধমানরাজের নবনির্ম্মিত কাছারি-বাটী প্রভৃতির বর্ণনা শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ আনন্দ দান করে এবং বর্ণনার উৎকর্ষতায় ঘটনাগুলি যেন মানসপটে ছায়াচিত্রের মত সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে। বিধবাবিবাহে (১৪৭ নং) গাহিয়াছেন,—

বিভাস—আড়খেমটা।

যে তরঙ্গ উঠেছে বিদ্যাসাগরে
কত রঙ্গ হবে নগরে।
আদৌ প্রেমামৃত, বদনচন্দ্রাকৃত, লাবণ্যলক্ষ্মীযুত,
হবে উদ্ভব কুচ ঐরাবত বিধবারূপ রত্নাকরে ॥
এ তরঙ্গ প্রকাণ্ড, ব্যাপ্ত কোরে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার বেগ গেল ইংলণ্ড,

যে এ পক্ষেতে রত পায় অমৃত, বিষ হতেছে পক্ষান্তরে ॥
শুনিতেছি অদ্যাবধি, মন্থন বারিধি, সে দেবাসুরের বিধি ;
এতে দেব বিরোধী নিরবধি, কেবল যা করিবেন ঈশ্বরে ॥
ঈশ্বর যাতে অনুকূল, দেব তাতেই প্রতিকূল, এ বিবাদের এই মূল ;
কোরে গুণবিধান দিতেছে টান বিধি মন্থর পরাশরে ॥
দেখ্‌চি করে পরীক্ষে, এ বিবাহের পক্ষে, সাপক্ষ আছেন অনেকে ;
বিধবা সহাস্যে আছে বসে, হাত দিয়ে কজ্জলাধারে ।
দেখে ভাসে রঃ পঃ বঃ, কথা কেমনে কব, এ সম্ভব কি অসম্ভব,
বিচারানুসারে হলে পরে আগে দেখিব পরে পরে ॥

দেব বিরোধী, দেব প্রতিকূল—স্বর্গীয় স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। কাজলনাতা লইয়া বিধবা বসিয়া আছেন, এ দৃশ্যটী তৎকালের সমর্থক দলকে কিরূপ কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাহা দেখিবার বিষয়। এরূপে তাঁহার সাময়িক গানগুলি বাস্তবিকই বিশেষ উপভোগ্য।

একটী গানে তিনি খোসের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (১৫১ নং),—

ভীমপলাসী—মধ্যমান।

এতো কি যন্ত্রণা দিতে হয় ওহে দয়াময়।
নহে খোসের সময়, অঙ্গ খোসে রস-ময় ॥
দিলেন খল ব্যাধি বিধি, দুঃখের নাহি অবধি,
নখাঘাত নিরবধি, না করিলে নয়।
শয়ন অতি সন্তর্পণ, সেবন খর-তপন,
নাহি জানি কতো পণ, অঙ্গেতে ক্ষত উদয় ॥
শয্যা হয়েছে ঐশ্বর্য্য, নির্লজ্জ অন্তর বাহ্য,
রোদন করে না গ্রাহ্য, শুন পরিচয়।
দিবনিশি হায় হায়, পড়ে আছি নিঃসহায়
রমাপতির সহায়, প্রভু নিত্য নিরাময় ॥

খোসে যিনি ভুগিয়াছেন, এ গানের প্রত্যেক কথাটি তাঁহার বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকথিত দীক্ষার জন্য চাকুরি ত্যাগ করিয়া করুণাময়ীকে ডাকিয়া কহিতেছেন (৯০নং),—

অন্তঃপুরে করিব প্রস্থান চল মন আমার,
গমনে সুগম অতি মুহূর্ত্তেক ব্যবধান।
কেন মজি হলাহলে, কলহাদি কোলাহলে,
যাত্রা কৈলে অবহেলে, পাইব নির্জ্জন স্থান ॥

সিংহাসনে প্রয়োজন, কি আছে হে প্রিয়জন,
কর শয্যা তৃণাসন, কাষ্ঠাদির উপাধান।
ইথে করো না সন্দেহ, আত্মযোগেতে মন দেহ,
পঞ্চরত্নাবৃত দেহ মৃত্যুঞ্জয়ে কর দান॥
হোতাচার্য্যে রাখ বলে, সমাংস আহুতি হলে,
কর্ম্মকুম্ভ শান্তিজলে, মৃড়াগ্নি করে নির্ব্বাণ॥
দীন রমাপতি কয় দিনগত পাপক্ষয়,
করুণাময়ীরে ডেকে, ক্রিয়া কর সমাধান॥

অভাবের তাড়নায় কবীন্দ্র "লগনের চন্দ্র" অধিরাজ বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন (১৫২ নং),—

আহার বিহনে শীর্ণ হলো পরিবার।
বিশেষতঃ বসন নাহিক পরিবার॥
বাসের কষ্টেতে বসে রজনী পোহাই।
নিদ্রাবশে অলসে সঘনে উঠে হাই॥
এখন করি কি কন কহিলে কারকে।
সকাতরে তার তরে কহি বিচারকে॥
ঘরমধ্যে বসে হেরি গগনের চন্দ্র।
কে খণ্ডিবে ইহা বিনা লগনের চন্দ্র॥

ইহার পর "সঙ্কেত পত্রিকা"য় (১৫৩ নং) আরও বিশদভাবে দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কবীন্দ্র, মানবজীবনের সাতটী বিভিন্ন অবস্থার কথা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সঙ্গীতটী পাঠ করিলে মহাকবি সেক্ষপীয়রের As You Like It নাটকের Seven Stages of Life শীর্ষক উক্তিটী মনে হয়। অবশ্য একটী অন্যটির প্রতিবিম্ব নহে, তবুও স্থানে স্থানে বেশ ঐক্য দেখা যায়। কবীন্দ্র গাহিতেছেন (১৪৪ নং),—

খাম্বাজ—একতালা।

কেমন কপাল, শুন হে কৃপাল, গেল কাল টানাটানিতে।
বলতে নাহি সরে মুখ, কারে বলে সুখ, কিছু নারিলাম জানিতে॥
দেখি নাক জ্ঞানে, কিন্তু লয় মনে, আদ্য টানাটানি সূতিকাভবনে,
দ্বিতীয়েতে টানাটানি স্তন পানে, শুনিয়াছি কানাকানিতে॥
তৃতীয়েতে অধ্যাপক টানাটানি, আর বালকের সনে হানাহানি,
জানাজানি তারা না মানে কখনি, গুরুমহাশয়বাণীতে॥
চতুর্থেতে টানাটানি এইবার, স্ত্রীপুত্রাদি লয়ে গৃহ পরিবার,
বসনভূষণ আদি অলঙ্কার হলো পার মহাজনিতে॥

পঞ্চমেতে হলো রাজার শোষণী, ঘরের কবাট ধরে টানাটানি,
এই পাপটানে হলো ধর্ম্মে হানি, পুত্র বিরত জানিতে ॥
ষষ্ঠেতে টানয়ে এ দিকে শমন, অপর দিকেতে টানে বন্ধুজন,
সপ্তমেতে হলে দেহ বিসর্জ্জন, টানিবেক নানা প্রাণীতে ॥ ইত্যাদি।

মহাকবি এইরূপ বলিয়াছেন,—(Act II, Sc. vii)

"At first the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms.
Then the whining school-boy, with his satchel,
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the canon's mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances ;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon,
With spectacles on nose, and pouch on side ;
* * Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything."

কবীন্দ্র ইংরাজী জানিতেন না ; সুতরাং সাদৃশ্যটী বিস্ময়জনক। ইংরাজ কবি ব্রাউনিংএর সহিত ইঁহার কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁহার শব্দচাতুর্য্য, ভাববৈচিত্র্য ও চিন্তাশীলত ইঁহার কবিতার অনেক স্থলে দেখা যায়। কবি ব্রাউনিংএর ন্যায় ইনিও কবি-পত্নী লাভ করিয়াছিলেন।

কবীন্দ্রের আগমনী গীতগুলি আজিও বৈষ্ণব ভিখারিরা গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ায়। তিনি যে অনুবাদকুশল ছিলেন, তাহা "মূল সঙ্গীতাদর্শ" পুস্তকের ৫৪, ৫৫, ৭১,

৭২, ৭৫ ও ৭৬ সংখ্যক গীতগুলি পড়িলেই জানা যাইবে যে, কিরূপ ছত্রে ছত্রে সুন্দর অনুবাদ হইয়াছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত ও কবিতা হইতে কবির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু দিনের আলোক যেমন রন্ধ্রমধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্ধকার গৃহস্থিত ব্যক্তিকে দিনের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দেয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও কবীন্দ্রকে বিশদভাবে প্রকট না করিলেও তাঁহার কবিত্বের উচ্চতা ও সারবত্তা জানাইয়া দিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কবীন্দ্র আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব ও স্বরচিত। তাঁহার এই যৎকিঞ্চিৎ কাব্যাংশ যে প্রাচীন বাঙ্গালার ভাব ও ভাষা বিশুদ্ধরূপে বজায় রাখিয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কবীন্দ্রপত্নী করুণাময়ী দেবী যে সঙ্গীতকুশলা ও রচনানিপুণা ছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে। জীবনের নশ্বরত্ব ও ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহার গানগুলিতে বেশ পরিলক্ষিত হয়। সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি গাহিতেছেন (১১১নং),—

সুরট মল্লার—মধ্যমান।

মন আর মিছে কর অভিমান।
ভবপার বড় ভার জান না সন্ধান॥
দেহ হবে ছিন্ন ভিন্ন, গৃহাদি হবে অরণ্য,
সঙ্গী কেহ নহে অন্য, একা হবে প্রাণ॥
তুমি বা কে কে তোমার, তুমি দুঃখ ভাব কার,
ত্রিভুবন অন্ধকার, মুদিলে নয়ন।
এই যুক্তি সার কর, তারিণীচরণ ধর,
যাহাতে ভবসাগর পাবে পরিত্রাণ॥
সাংসারিক কর্ম্ম সব, অনিত্য মায়ায়োদ্ভব,
সব ত্যজি ভাব শিব উক্তি গুণগান।
ভক্তি ভাবে দুর্গা বল, না ভাবিহ কালাকাল,
করুণার হবে সফল, জনম নিদান॥

অন্তিমের জন্য জগদম্বাকে জানাইতেছেন (১১২নং),—

সুরটমল্লার—মধ্যমান।

জগদম্বে তব মনে আছে গো কত।
সদা প্রাণ সশঙ্কিত কর যা হয় উচিত॥
অসাধ্য সাধনা যত, সকলি তোমার হাত।
এ দীনে করিতে মুক্ত, ভার কি হয়েছে এত॥

তিন জগতের সার, ও পদে রেণু যার।
এ পাপী আত্মাতে তার, কেন বা এত বিরত ॥
বুঝি কৃপণ প্রকাশে, কিম্বা ছলনা আভাসে,
কিম্বা মম কর্ম্মদোষে, হলো না সম্মত ॥
অন্তে সহ মৃত্যুঞ্জয়, উভয়ে হয়ে উদয়,
করুণারে বিতরিও, করুণাধন কিঞ্চিত ॥

এরূপে তাঁহার প্রত্যেক গান সুন্দর সরল ভাষায় রচিত হইয়া হৃদয়ের সরল ভাব অকপটে ব্যক্ত করিয়াছে। কখন কখনও কবীন্দ্রের গানের উত্তর ঠিক সেই সুরে ও তালে, কিন্তু বিপরীত বিষয় বর্ণনায় দিয়াছেন। শবদর্শনে কবীন্দ্র যাহা গাহিলেন (৮৭নং), সন্তান জন্ম উপলক্ষ্য করিয়া তাহার বিপরীত দৃশ্য করুণাময়ী (৮৮ নং) গাহিয়াছেন।

কবিদম্পতির নিম্নলিখিত গান দুইটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীরাধা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্যামের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, কিন্তু শ্যাম-সমাগমের সকল আশাই প্রভাতাগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইতেছে, এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া কবীন্দ্র বেহাগে গাহিলেন,—

সখি শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল।
শর্ব্বরীভূষণ খদ্যোতিকা তারা, ঐ দেখ সখি আভাহীন তারা,
নীলকান্তমণি হলো জ্যোতিহারা, তাম্বূলের রাগ অধরে মিশাল।
ঐ দেখ সখি শশাঙ্ককিরণ, উষার প্রভায় হলো সংকীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃসমীরণ, কুসুমেরি হার শুখালো—
শিখী সুখে রব করিছে শাখায়, পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়,
পতির বিচ্ছেদে উন্মাদিনী প্রায়, কুমুদিনী হাস্য বদন লুকাল ॥
বিহঙ্গমগণ করে উদ্বোধন, বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ বেদন, বুঝি বিধি ঘটাল,—
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়, এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়,
দেখ বৃক্ষচয় হলো অশ্রুময়, শর্ব্বরী সুখবিলাস ফুরাল ॥

রমাপতির এ গানে করুণাময়ী বিরহবিধুরা রাধার এই বিসদৃশ অবস্থা সহিতে না পারিয়াই যেন শ্যামের শুভাগমন-সংবাদে শ্রীরাধাকে উল্লসিত করিয়া গাহিতেছেন,—

সখি শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পূরিল মধুপঝঙ্কারে, কোকিলের সুরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ,স্পন্দন করিছে অপাঙ্গ অঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ, কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে মাতিল ॥

মলয় অনিল প্রলয় রহিত, বিহরে বিরহে প্রণয় সহিত,
সহসা হইতে অহিত রহিত, তারে কে শিখাল,—
এই হতেছিল চাতকের ধ্বনি, জলদে জলদে বলিয়া অমনি,
আজি বুঝি তার দুঃখের রজনী, সজনি পোহাইল ॥
ফলিল তাহার আশা তরুবর, হেরিয়ে নবীন নীল জলধর,
আশাংশু চকোর সুধাংশু কিঙ্কর, বিধিকৃত কালে বিধুরে পাইল,
ব্যথিতা করুণা সকরুণে কয়, নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়,
তাই দুঃখান্তে সুখের উদয়, বিয়োগ-নিশির ভোগ ফুরাইল ॥

উপরিউক্ত দুইটি গান মূল সঙ্গীতাদর্শে স্থান পায় নাই, সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী রচনা। একজন বৃদ্ধের নিকট সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। আমাদের এ দেশে এই গান দুইটি পার্ব্বতী পরমেশ্বরের ন্যায় করুণা ও রমাপতিকে একত্রে অবিচ্ছিন্নে প্রতীয়মান রাখিয়াছে। তাঁহার আগমনী গীতগুলিও মেয়ের জন্য মায়ের প্রাণের আবেগে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে।

পরিশেষে আমার নিবেদন যে, কবীন্দ্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ কবিভূষণ মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে আমাদের এই আলোচনার সুযোগই হইত না। সত্যেন্দ্র বাবুই তাঁহাদের পৈতৃক বসতবাটীতে এখনও যাতায়াত করিয়া থাকেন। তিনি বর্দ্ধমানের অধিরাজ প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

কবীন্দ্রের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ।

১

পরজ একতালা।

কেশব আমায় কর হে পার।
তোমা বিনা ভবে আর কে আছে আমার ॥
আমার নাহি কিছু পুণ্য, পূর্ব্ব পুণ্য শূন্য,
পাপাত্মার পাপ, পাপে পরিপূর্ণ,
নিলাম হে শরণ, যা কর চৈতন্য,
সকলি হরি হে তোমারি ভার ॥
আমি শুনেছি শ্রবণে, ভাগবত পুরাণে,
অহল্যা মানবী ঐ চরণের গুণে,
ধীবরের তরী, স্বর্ণ করিলে হরি, রাখিতে ঘোষণা জগতে,—
(যেমন) ধ্রুব যায় বন, করিতে সাধন,
সঙ্গে তুমি হরি, করিলে গমন,
রমাপতির মন, ঐ শ্রীচরণ চরণেতে স্থান দাও হে এবার ॥

ভক্তি ভাবে যেই ভাবে তব পদ
থাকে না তাহার বিষাদ বিপদ,
সতত প্রসাদ প্রমোদ আহ্লাদ, তাই পদাশ্রিত রহিল তোমার ॥

কে নাচিছে রণরঙ্গিনী
নবজলধরবরণী, করে লয়ে অসি, ওমা মুক্তকেশী
হাসি হাসি নাশে দানব অমনি ॥
বামা বয়সে নবীনে, অথচ প্রবীণে
কুলবতী বামা দুকূলবিহীনে
হুঙ্কার শ্রবণে, ভয়ে মরি প্রাণে, অথচ যে বামা ভুবনমোহিনী ॥
(বামার) তৃতীয় নয়ন প্রচণ্ড তপন
দহে রিপুগণ যেন হুতাশন,
রমাপতির মন আনন্দে মগন, প্রেমে পুলকিত স্মৃতি সরোজিনী

৩

আগমনী।
যাও গিরি ত্বরা করি আনিতে উমারে।
আর কি হেরিব না গো প্রাণের কন্যারে॥
বৎসর হইল পূর্ণা, আনিবারে অন্নপূর্ণা,
কেনই বা মনে কর না, কি ঐশ্বর্য্য ভরে ॥
তোমারে কত কহিব, জান ত জামাতা ভব,
স্বভাবে পাগল ভাব, কে তুষিবে মায়েরে,—
উমা যে কহিয়ে গেল, কবে আর আনিবে বল.
বিস্মৃত হলে সকল, আমার কপাল ফেরে ॥
(উমার) আসিতে হয়েছে মন, পথ করে নিরীক্ষণ.
তাহাতেই মার প্রাণ সদাই বিদরে,—
করুণা বিনয় করি, কহে গিরির পদে ধরি,
যাত্রা কর শীঘ্র করি, শিবের কৈলাস পুরে ॥

৪

শুধুই গো তোমারি রাণি, বিষাদ বলিয়া নয়,
উমার বিচ্ছেদে দেখ বিষাদ বিশ্বময়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু পক্ষী আদি করে

উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময় ॥
দেখ দেখি তরুগণ, সবে আনত বদন,
বিষাদ ভরেতে যেন পৃথ্বীগত হয়,—
আকাশেরো তারাগণ, শিশির রূপেতে যেন
করে অশ্রু বিসর্জ্জন, নিশীথে ধরায় ॥
আর দেখ ধরাধর, ঝরিতেছে অশ্রুধার,
অনিবার হৃদে তার, বিচ্ছেদ না যায়, —
রমাপতির এই মনে, হরপার্ব্বতীরে এনে,
সফল করি নয়নে, হেরে তাহাদের উভয় ॥

৫

বেহাগ একতাল।

কব কি গিরিবর

প্রাণেরি নন্দিনী জনমত্বঃখিনী, বারেক তাহারে মনে নাহি কর।
না জানি কি ভাবে মনেতে ভাবিলে,
সোনার প্রতিমা পাগলেরে দিলে,
তুহিতা বলিয়ে তত্ব না করিলে, পাষাণে বাঁধিয়া অন্তর ॥
নিশীথে শয়নে ছিলাম যখন,
হেরিলাম আমি অতি কুস্বপন,
তদবধি মম স্থির নহে মন, কাতর যে নিরন্তর,—
সে মুখকমল মলিন অতি,
চলিবার আর নাহিক শকতি,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগেন ভগবতী, ক্ষুধাতে হইয়ে কাতর ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা জরাজীর্ণ বাসে,
অবশেষে উমা আসে মম পাশে,
কিছু খেতে দে মা বলে উমা ভাষে, ধরে তুটি মম কর ;
ক্ষীর সর ননী লয়ে সযতনে,
দিতেছিলাম আমি উমারি বদনে,
রমাপতি ভণে নিদ্রাভঙ্গ সনে, চেয়ে দেখি সব অন্ধকার ॥

৬

ভৈরবী।

কবে আর আন্‌বে গিরি গৌরীরে আমার ঘরে।

বাছারে না হেরে আমার, প্রাণ যে কেমন করে ॥

সম্বৎসর গত হল, বারেক ও না আনা হল,

মায়ের প্রাণে সইবে কত বল,—

তনয়া জামাতা ঘরে, রয়েছে বৎসর ধরে,

করুণার মাথার কিরে, আনগে তিন দিনের তরে ॥

ইহা ছাড়া আরও অনেক গান পাওয়া যায়, যাহা রমাপতির রচিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু তাহাতে ভণিতা না থাকায় এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়

"অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"*

পদাবলী-সাহিত্যে সুপরিচিত, রসশাস্ত্রে সুরসিক, ভাষাতত্ত্বে অভিজ্ঞ, পরমশ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' নাম দিয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বহু কবির অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কতকগুলি পদ, পূর্ব্বপ্রকাশিত অনেক পদের সংশোধিত পাঠান্তর, 'অভিরাম' প্রভৃতি আটাশ জন নূতন কবির অনেকগুলি পদ এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকজন কবির কয়েকটী পদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকসমাজ এই গ্রন্থের কিরূপ সমাদর করিয়াছেন, বলিতে পারি না ; তবে রায় মহাশয় এই গ্রন্থে যেরূপ পাণ্ডিত্য, গবেষণা, রসজ্ঞতা ও বিচারণার পরিচয় দিয়াছেন, পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনার ধারায় তাহা অভিনব, এ কথা বোধ হয় জোর করিয়াই বলিতে পারি।

১। পদরত্নাবলীর ভূমিকায় বিদ্যাপতির পদ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহার পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। "কবিশেখর," "চম্পতি," "ভূপতি," "বল্লভ" প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত বহু পদ আমরাও পাইয়াছি; সেগুলি বিদ্যাপতির নামে গ্রহণ করিলে, সুবিচার হইবে বলিয়া মনে হয় না। রায়শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদাবলীতে আমরা 'কবিশেখর' ভণিতা পাইয়াছি। 'শেখরদাস' ভণিতাও আছে।

"অখিল লোচন তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দকন্দে"

এবং

"কি করব জপ তপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে"

পদ দুইটী আমরা "চম্পতিপতি" ও "চম্পতি" ভণিতাযুক্ত পাইয়াছি। আবার—

"মদন কুঞ্জ ত্যজি চলল চতুর দূতি
বকুল কুঞ্জে চলি গেল"
"সখি হে বুঝি কহসি কটু ভাষা"

এবং

"রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরি
মিলল কানুক পাশে"

ইত্যাদি গান "ভূপতিনাথে"র ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে। "বল্লভদাস", কেবল "বল্লভ"

* ১৩৩২, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এবং "হরিবল্লভ" ও "রাধাবল্লভ" ভণিতারও বহু পদ রহিয়াছে। এগুলিকে কোন মতেই বিদ্যাপতির বলিতে পারা যায় না।

আমরা নিম্নে রাধাবল্লভের ভণিতাযুক্ত একটী নূতন ধরণের পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নাই রূপ নাই লেখা কার সুত কার সখা
তিঁহো কৃষ্ণ কোথা তার স্থান।
ত্রিদশের পিতা কেবা আজ্ঞা কৈল কার সেবা
কোন কৃষ্ণ উলুকবাহন॥
নাগশয্যা কেবা কৈল বায়ন অর্থ কেবা হইল
কোন কৃষ্ণ হৈল ধানকী।
বানর সকল সনে কে বধিল দশাননে
কোন কৃষ্ণ তারিল জানকী॥
কেবা বাসুদেবের বালা * * * *
কেবা হইল ব্রহ্মঋষি মুনি।
অক্রূর আনিল কারে কে বধিল কংসাসুরে
কার ভাবে কান্দেন গোপিনী॥
কেবা রাধিকার সুত ব্রজে হইলা অদভুত
কোন কৃষ্ণ শ্রীদামের মাঝে॥

সির্জ্জন তার পরে সমরে বধিল কারে
তখন রাধিকা ছিল কোথা।
হরে কৃষ্ণ নামে নামে কে দিল যোগাজ্ঞা ধামে
মধ্যখানে তিহো কার সুতা॥
কেবা নবদ্বীপে আসি শচীগর্ভে পরকাশি
নাম কৈল বত্রিশ অক্ষরে।
এক নামে * * শ্রীরাধাবল্লভে ভণে
বৈরাগ্য বলিয়ে যুগান্তরে॥

২। পদরত্নাবলীর ভূমিকায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, আমরা ইতিপূর্ব্বে "ভারতবর্ষ" (১৩২৯ পৌষ) পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন বটে (১৩২৯ চৈত্র), কিন্তু তাহাতে আমাদের সন্দেহ দূর হয় নাই।[১]

১। ১৩৩০, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষে আমরা এই সন্দেহ জানাইয়া বিষয়টীর পুনরালোচনা করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় আর তাহার উত্তর দেন নাই।

চণ্ডীদাসের কয়েকটী নূতন গান আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের এই সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভারতবর্ষে (ভাদ্র ১৩৩১) তাঁহার দুই একটী গান ও আমাদের এই সন্দেহের কথা পুনরায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। আলোচনার সুবিধার জন্য সেই একটী গান এখানেও প্রকাশিত হইল। এই গানটীর প্রথম চারিটী চরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে। আমাদের সংগ্রহের মধ্যে চরিতামৃতের দুইটী পদের উল্লেখে —

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর" ॥
(শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যস্য নৃত্যপদং)

এবং

"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও" ॥
(শান্তিপুরে মুকুন্দস্য নৃত্যপদং)

এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, পদ দুইটী প্রাচীন মহাজনের পদ। প্রথমটী যে বিদ্যাপতির, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় পদটী কাহার, এত দিন তাহা জানা ছিল না। সম্প্রতি আমরা চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত দ্বিতীয় পদটী সম্পূর্ণ পাইয়াছি,—

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥
দিবা নিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাই তাহা উড়ি যাই ॥
হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনমদুখিনী ॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা ॥
অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল ॥

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, চণ্ডীদাসের শ্রীমন্মহাপ্রভুর আস্বাদিত গানই পরবর্ত্তী সংগ্রহগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, উপরিউক্ত পদ হইতে আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হইতেছে। নীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাসের অনেক গানেই উপরিউক্ত গানের সুর ধ্বনিত হইতেছে। আমরাও এই সুরেরই অনেকগুলি নূতন গান পাইয়াছি, সুতরাং পদাবলীর চণ্ডীদাস যে

মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁহার গানই মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন, এবং পরবর্ত্তী সংগ্রহগ্রন্থেও তাঁহারই গান সংগৃহীত রহিয়াছে, ইহা বেশ ভালরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। রায় মহাশয় ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া পদরত্নাবলীতে চণ্ডীদাসের অনেক গানে অন্য কবির ভণিতা দেখিয়াই সেই নামেই ছাপাইয়া দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিদ্যাপতির গান লইয়া যেরূপ বিচার করিয়া প্রকৃত রচয়িতা স্থির করিয়াছেন, চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সেরূপ কিছু করেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে, পদাবলীর চণ্ডীদাস জাল! (এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় নিবেদন করিয়াছি)। পদরস-সার অথবা পদরত্নাকরে থাকিলেই যে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, অন্ততঃ এ সম্বন্ধে বিচার আলোচনা হওয়া উচিত ছিল।

৩। রায়শেখর, চন্দ্রশেখর, এবং শশিশেখরের ভণিতাযুক্ত পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গানই পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁদের অনেক গান প্রায় সকল কীর্ত্তনীয়াগণের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে (১৭৭১ শকাব্দায়) "পদ-কল্পলতিকা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের মলাটে লিখিত আছে (বানান অবিকল রাখিলাম),—

পদকল্পলতিকা।

ফলতঃ

প্রাচিন পদ কর্ত্তা মহাশয়গণ রচিত শ্রীগৌরচন্দ্র
প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক পদ

সম্প্রতি

শ্রীযুত গৌর মোহন দাস

দ্বারা

সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতার রাজেন্দ্র যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল॥

শকাব্দা ১৭৭১

এই পুস্তকখানিতেও শেখর কবিগণের অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে। আমরা শশি-শেখরের একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম।

"ইয়াদী কীর্দ্দি গুণসমুদ্র শত সাধু শ্রীরাধা।
সত্নদারস্থ চরিত তস্য পুরাহ মম সাধা॥
তস্য খাতক হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরী।
কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং লিখনং সুকুমারী॥
ঠামহি তব প্রেম দুর্ল্লভ লইনু কর্জ্জ করি।

ইহার লভ্য পাইব দিব্য প্রেম অখিল ভরি ॥
একুনে তিন বাঞ্ছা পূরণ পরিশোধ কলিযুগে।
ইহার সাক্ষি ললিতা সখি শত মঞ্জরী ভাগে ॥
তারিখ তস্য দ্বাপরস্য শশিশেখরে লিখিলাম।
করুণা করহে রাধে প্যারী এই খত লিখি দিলাম ॥"

"রাধে জয় রাজপুত্রি মম জীবনদয়িতে" পদটী পদরত্নাবলীতে "বদনের" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যতদুর স্মরণ হয়, এই পদটী স্বর্গীয় রসিকদাস কীর্ত্তনীয়ার মুখে আমরা "শেখরের" বলিয়া শুনিয়াছি। "বঙ্গবাসী"র সংগৃহীত "সংগীতসারসংগ্রহে"ও এই পদটী শেখরের ভণিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

রাধে জয় রাজপুত্রি মম জীবনদয়িতে।
যাও যাও বঁধু যত বড় তুমি জানা গেল তুয়া চরিতে।

*   *   *   *

গত রাত্রৌ যদভূন্মম দুঃখং শৃণ্‌ সরলে।
বধিরে হম কিয়ে শুনায়সি তাহে শুনায়বি বিরলে ॥

*   *   *   *

কোপং ত্যজ পদমর্পয় মৃদুকিশলয়শয়নে।
তোমা দরশনে শরীর জ্বলিছে ফিরি যাহ তার সদনে ॥

*   *   *   *

এই ধরণের পদ প্রায় শেখরকবিগণেরই নিজস্ব, ইহা বদনের কিরূপে হইবে? পদ-রত্নাবলীতে দুইবার "গুণনিধি বট" কথা আছে, সুতরাং দ্বিতীয় চরণের আমাদের উদ্ধৃত পাঠান্তরটী সংগত বলিয়া মনে হয়। গানের শেষে ভণিতা এইরূপ,—

"শাস্তিং কুরু   দন্তৈর্দংশ
কোপং ত্যজ রুচিরে।
তথা ফিরি যাহ   পুন দংশিবে
সুখ পাবে কহে শেখরে ॥"

৪। যদুনাথের সুবল-মিলনের যে পদগুলি পাওয়া যায় নাই বলিয়া পদরত্নাবলীতে সংগৃহীত হয় নাই, আমরা সেগুলি পাইয়াছি,—অন্ততঃ সেই ধরণের পদ। একটী পদ ও পদাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(ক) "সুবলে করিয়া সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে রসময় বিদগধ শ্যাম।
রাধাকুণ্ডতীরে আসি কুসুমকাননে বসি শোভা দেখে অতি অনুপাম ॥
বৃন্দাদেবী হেন কালে আসি সেই স্থানে মিলে চম্পক কুসুম করে করি।
সুবলেরে সমর্পিল তিঁহো কৃষ্ণের অঙ্গে দিল উদ্দীপনে রাধার মাধুরী ॥

প্রেমে চতুর্দ্দিগে চায় অরুণ লোচন তায় পুলকে পুরিল প্রতি অঙ্গ।
ধরিয়া সুবলের করে কহে গদগদস্বরে মিলাইয়া দেরে রাইএর সঙ্গ ॥
শূন্য হেরি সর্ব্বক্ষণ তাঁহা বিনে বৃন্দাবন মোর মন তাহার ধিয়ানে।
যদি নাহি আসে প্যারি রাধা রাধা রাধা বলি যদুনাথ ত্যজিবে পরাণে ॥

এই গানের পর—

(খ) রাধা রাধা বলি নাগর পড়ে ভূমিতলে।
বাহু পসারিয়া সুবল শ্যাম নিল কোলে ॥

এই কলি দুইটী আছে। তাহার পর "তুক গান" আরম্ভ হইয়াছে। যথা,—

'গা তোল রে চূড়াধারী। বনে নাই তোর রাধা প্যারী ॥
হায় আমি কি করিলাম। কেনে রাধার কুঞ্জে এলাম ॥
চাঁপার ফুল তোর হাতে দিলাম।
প্যারী মনে পড়াইলাম ॥ ইত্যাদি

তার পর আছে,—

ধীরে ধীরে রাধার নাম জপে কৃষ্ণকানে।
রাইনাম পরশিতে পাইল চেতনে ॥

আবার তুক গান; শেষে ভণিতা এইরূপ,—

রাধা আনি দিব সুবল বলিল।
যদুনাথ দাসের মনে আনন্দ বাড়িল ॥

৫। শ্যামানন্দ, শ্যামচাঁদ, শ্যামদাস ও জগদানন্দের পদ অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। জগদানন্দের আক্ষেপ অনুরাগের যে পদটী পদরত্নাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম চরণটী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। যে কবি জগদানন্দ পরবর্ত্তী কবিদের সুবিধার জন্য 'অমল' 'বিমল' 'কোমল' 'কমল' ইত্যাদি মিলাত্মক শব্দের অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি যে "কেন গেলাম জল ভরিবারে,............ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে," এইরূপ মিল করিবেন, এ বিষয়ে রায় মহাশয়ের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। আমরা ইহার পাঠান্তর পাইয়াছি,—

"সই কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধছলে কদম্বের তলে ॥"

পদরত্নাবলীতে গোবিন্দদাসের "হের কি দেখিগো বড়াই কদম্বের তলে" এই গানটী উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং জগন্নাথের পদের মধ্যে "বড়াই হের দেখ রঙ্গ চায়্যা" এই গানটী উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা জগন্নাথের "হের কি দেখিয়ে গো বড়াই কদম্বের তলে" এই শীর্ষক একটি গান পাইয়াছি। বংশীবদনেরও একটি গানের প্রথম চরণটী এইরূপ, পরে উদ্ধৃত করিব।

ঠাকুর নরোত্তমেরও অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। বংশীবদনের বলিয়া "দানলীলার" (পদরত্নাবলী, ৩৬৯ সংখ্যক পদ) যে পদটি পদ-রত্নাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই পদটি গোবিন্দ-দাসের। সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গণেশদাসের মুখে "দান গানে" গোবিন্দ দাসের এই পদ বহুবার শুনিয়াছি। আমাদের সংগৃহীত পুথি হইতে গানটী অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

এইমনে বনে, দানী হইয়াছ, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজবালা সনে, কিসের রভস রঙ্গ॥
এমন আচার নাহি কর ডর, ঘনাইয়া আসিছ কাছে।
গুরু বর আগে করিব গোচর, তখন জানিবে পাছে॥
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিলাজ কানাই আমরা পরের নারী।
পর পুরুষের পবন পরশে সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ পান কর কনক ধূমে।
কাম-সাগরে কামনা করহ বেণীবদরিকাশ্রমে॥
সূর্য্য উপরাগে সহস্র সুন্দরী ব্রাহ্মণে করাহ সাথ।
তবু হয় নহে তোমার শকতি রাই অঙ্গে দিতে হাত॥
গোবিন্দ দাসের বচন মানহ, না কর ঐছন ঢঙ্গ।
যেই নাগরী ও রসে আগরী, করহ তাকর সঙ্গ॥

এই গানের চতুর্থ চরণে "কাচের পুতলী সোনার বরণে ছুঁইলে বদলে পাছে" কোন কোন কীর্ত্তনীয়ার মুখে এইরূপ পাঠান্তর শুনিয়াছি। পদরত্নাবলীর বংশীবদনের পদটীতে ছন্দেরও মিল নাই, লঘুত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদীতে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পদের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ গোবিন্দ দাসেরই আর একটী পদ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

তোঁহারি হৃদয়, বেণীবদরিকাশ্রম উন্নত কুচগিরি জোর।
সুন্দর বদনছবি কনক ধুম পিবি ততহি তপত জীউ মোর॥
সুন্দরী তোঁহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গোরী আরাধনে কাঁহা চলি যাওব তুঁহু সে তিরথময়ী গোরী।
সুন্দর সিন্দুর মৃগমদ পরশল এহি সুরযগ্রহ জানি।
তুয়া পদনখ দ্বিজরাজহি সোঁপলু সুন্দরী সহস্র পরাণী॥
কামসায়রে পুনঃ সহজই নিমগন কাম পুরবী তুঁহু রাই।
শ্যামর বলি অব চরণে না ঠেলবি গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

বংশীবদন, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, অনন্তদাস, বংশীদাস, প্রেমদাস, রামচন্দ্র, গিরিধর, নরহরি, বল্লভদাস প্রভৃতির বহু পদ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত পদের পাঠান্তর ইত্যাদিও অনেক পাইয়াছি। কবি বংশীদাসের ভজনরত্নাবলী প্রভৃতি দুই একখানি পুস্তকও পাইয়াছি।

৬। পদরত্নাবলীতে কানাই খুঁটিয়ার একটী গান আছে, রায় মহাশয় ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন। আমরা যত দূর জানি, ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর উৎকলদেশীয় একজন ভক্ত। বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে আছে.—

"জয় জয় কানাই খুঁটিয়া শিখি মাহিতি গোপীনাথাচার্য্য।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আছে,—

"এইমত নানা রঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হইলা॥

কানাই খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছেন ব্রজেশ্বরী॥

* * * *

* * * *

কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলায় ঘরে যত ছিল ধন॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ হইল।
পিতামাতা জ্ঞানে দোঁহে নমস্কার কৈল॥

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, কানাই খুঁটিয়া তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে একজন পরম ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাঁহার সৌভাগ্য—গর্ব্বের সামগ্রী। অনুসন্ধান করিলে হয় ত এই ভক্ত কবির বিস্তৃত জীবনী এবং আরও পদাবলী আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমরা এ দিকে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পদরত্নাবলীতে অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণের পদের মধ্যে "যে দেশে আছিল বাঁশী সে দেশে মানুষ নাই" (৬০৩ সংখ্যক) এই যে পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে, চণ্ডীদাসের "কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী" (নীলরতন বাবুর সংগৃহীত ২৬৫ সংখ্যক পদ) এই পদটীর দুইটী চরণের সঙ্গে ইহার দুইটী চরণের অবিকল মিল আছে, ভাবেরও সামঞ্জস্য আছে। তথাপি পদ-রত্নাবলীর—"মন চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে" এই গানটীর ধারা দেখিয়া "যে দেশে আছিল বাঁশী" এই গানটীও আমাদের কানাই খুঁটিয়ার বলিয়া মনে হইয়াছে। মহাপ্রভুর সময় পুরীধামে চণ্ডীদাসের গানের বিশেষরূপ আলোচনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আশ্চর্য্য নহে, কানাইএর গানের মধ্যে চণ্ডীদাসের সুর বা গানের অবিকল দুই একটী চরণও পাওয়া যাইবে। "যে দেশে আছিল বাঁশী" গানটীর ভণিতা এইরূপ,—

বাঁশী হৈল প্রাণের বৈরী জীবনে কি আশা।
কানের ভিতর কানাইএর বাঁশী পাতিয়াছে বাসা॥

ভণিতার এই "কানাই" শব্দটীকে আমরা দ্ব্যর্থসূচক শ্লিষ্ট শব্দ বলিয়া মনে করি। পদরত্নাবলীর

এই দুইটী গান মিলাইয়া পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই দুইটী গানের বিষয়বস্তু ও রচনার ধারা প্রায় অভিন্ন।

উদ্ধব, শিবরাম, রাধামোহন, মাধব এবং সুরদাসের অনেকগুলি গান আমরা পাইয়াছি। আমাদের মনে হয়, এই পদকর্ত্তা মাধবেরই "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল আজিও গায়কেরা গান করিয়া থাকেন। দ্বিজ পরশুরামেরও একখানি শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল আছে, এ গ্রন্থখানিও প্রকাণ্ড, এবং ইহাও গায়কেরা গান করিয়া থাকেন। "মাধবী" ভণিতাযুক্ত "রসপুষ্টি মনোশিক্ষা" নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। মাধবীর পদও আছে।

৭। পদরত্নাবলীতে নটবর দাসের একটীমাত্র গান উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রায় মহাশয় কানাই খুঁটিয়ার মত ইহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পদকল্পতরুতেও নটবর দাসের একটী পদ আছে।

আমাদের মনে হয়, নটবর দাসের বহু পদ আছে। আমরা নিম্নে যে একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ প্রধান প্রধান ভক্তগণের প্রত্যেকেরই বন্দনা-গান রচনা করিয়াছিলেন। আমরা ইহাঁর পাণ্ডবগীতার অনুবাদ পাইয়াছি। নিম্নে একটী পদ ও অনুবাদের একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

তুমি মোর সখাবর সকল আনন্দকর সখাতে পরম শ্রেষ্ঠা মোর।
তোর গুণ গান করি রাধাভাবে ভাব ভারি সুবল বলিয়া নাম তোর॥
আরে মোর গৌরীদাস পণ্ডিত।
তুমি মোর প্রাণধন তোমাতে মোর সদা মন তুমি মোর গোপীতে মণ্ডিত॥
অম্বিকাতে বাস হবে আমার সনে থাকিবে বিগ্রহেতে দুই ভাই স্থিতি।
কহিতে কহিতে প্রভু স্থির নহে মন কভু আমার আমার করে নিতি॥
কহে দাস নটবরে বহু সাধ মনে করে আমারে করহ তুমি সঙ্গী।
রূপের সঙ্গিনী কর এই নিবেদন ধর কর মোরে চরণেতে রঙ্গী॥

পাণ্ডবগীতার অনুবাদ,—

শল্য কহে শুন সবে কৃষ্ণরূপগুণ।
কহিব আনন্দ মনে সভে মিলি শুন॥
জয় জয় কৃষ্ণ গুণমণি।
রূপগুণ কি কহিব কিবা আমি জানি॥
জিনিয়া অতসীপুষ্প রূপ মনোহর।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু পীত পট্টধর॥
দাস নটবরে নতি করয়ে গোবিন্দে।
ভয় মাত্র নাশ হয়ে কহিনু সানন্দে॥

৮। পদরত্নাবলীতে নূতন প্রকাশিত পদকর্ত্তা বলিয়া রায় মহাশয় যে কয়জনের নাম দিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বকথিত ১৭৭১ শকে প্রকাশিত "পদকল্পলতিকা" গ্রন্থখানিতে তাঁহাদের মধ্যে কাশীদাস, বীরবাহু, রাজচন্দ্র ও ভাগবতানন্দের নাম পাওয়া যাইতেছে। ঐ ঐ পদকর্ত্তার পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত পদ কয়েকটীও অবিকল তাহাতে মুদ্রিত রহিয়াছে। কেবল ভাগবতানন্দের পদের দুইটী চরণ পদকল্পলতিকায় অতিরিক্ত আছে,—(১ম দুই চরণের পর),—

"জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধাকান্ত।
জাগহে রসিকবর কিশোরীপ্রাণনাথ॥

১৩৩১ সালের ৬—১২ সংখ্যক "বীরভূমি" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় ভাগবতানন্দের দুইটী পদ প্রকাশ করিয়াছেন। আর কাশীদাসের পদেও একটু গোলযোগ আছে। পদরত্নাবলীতে যেখানে আছে,—

বিলাসে গোবিন্দ প্রেম আনন্দ সঙ্গে নব নব রঙ্গিনী।

পদকল্পলতিকায় সেখানে দেখিতে পাই,—

"নাচে সুনাগর রাইকরে কর অধরে বেণুবর শোহিনী।

পদরত্নাবলীতে ইহার পরে যে দুইটী চরণ আছে, পদকল্পলতিকায় তাহা নাই। বাকী সমস্তটুকু একরূপ।

৯। পদরত্নাবলীতে "কুবের আনন্দ" পদকর্ত্তার একটী পদ আছে, পদটী গৌরাঙ্গবিষয়ক। আমরা দাস কুবের নামক একজনের ভণিতাযুক্ত একটী গৌরাঙ্গবিষয়ক বাউলের গান পাইয়াছি। দাস উপাধি বৈষ্ণবের সার্ব্বভৌমিক, সুতরাং কুবের আনন্দ ও দাস কুবের এক জনও হইতে পারেন। এমনও হইতে পারে যে, ছন্দের অনুরোধে 'আনন্দ' এখানে অন্তর্হিত হইয়াছে। এ কালেও কবিতার মিল খুঁজিতে খুঁজিতে অনেকেরই আনন্দ লোপ পায়, ইহা প্রায় বহুজনবিদিত। আনন্দের পরিবর্ত্তে কুবেরের পূর্ব্বে দীনতাসূচক দাস আসিয়া স্থান লইয়াছে, ইহাও অস্বাভাবিক না হইতে পারে। পদাবলীর সঙ্গে বেমানান্ হইলেও গানটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

যদি দেখতে পাই গউরময় সকলি।
গউর আমার বসন ভূষণ গউর নয়নপুতলী॥
গউর আমার নয়ানের তারা'
গউর-চান্দে গগন-চান্দে চান্দে চান্দ তারা'
মনহরা তার রূপ দেখে তুলি ;
গউর আমার জপের মালা গউর গলার মাদুলী।
নয়নের অঞ্জন গউর'
গউর নলক উল্কি তিলক চন্দ্রহার গউর'

নাক্‌ছবি গউর চাঁপকলি ;
গউর আমার সোনার সিঁতি মুক্তামতি ঝল্‌মলি ॥
গউর ঝুমক ঢেরী ছন্দ
গউর আমার খাড়ু বাজুবন্দ'
গউর টিক্‌লী গলার হাঁস্‌লী ;
গউর ঝটকা গজরা কোমড়বেড়া বরপাটা গো বিলকুলি !
গউর নথ, সাতলহর মালা,
চুলবান্ধা দড়ি গউর পইছে পউলা,
দু হাতের চুড়ি কাঁচুলী (আমার গউর)
দাস কুবের বলে নিদেন কালে পাই যেন চরণধূলি ॥

১০। তরুণীরমণ ও দীনবন্ধুরও অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে।

১১। পদরত্নাবলীতে "অজ্ঞাত পদকর্ত্তাগণে"র রচিত কতকগুলি পদ আছে। এগুলির মধ্যে "সে বন কতই দূর," "ওরে বাঁশী কেমন কর্‌ব্যারে," "বৈল নিঠুরের আগে," "কুশলের কি কাজ ওহে নাথ," "সে বেশ তোমার কৈ কৈ হে," "ব্রজে চলহে ব্রজেশ্বর," "ওহে নাথ সেই তো আইলে" প্রভৃতি পদগুলি "তুক্কো" বা "তুক" বা "পল্লব" গান। এগুলি একজনের রচিত নহে, কোন সুরসিক কবিত্বপ্রতিভাবান্ কীর্ত্তনীয়া হয় ত গান গাহিতে গাহিতে ভাবের মুখে অনুপ্রাসযুক্ত মিলাত্মক দুইটী "আখর" দিলেন, দলের লোক সেটী মনে করিয়া রাখিল বা তিনিই আসর হইতে বাসায় আসিয়া তাহা লিখিয়া রাখিলেন। এইরূপে হয় তিনিই, নয় ত তাঁহার পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক অপর একজন কীর্ত্তনীয়া সেই আখর দুটী শিখিয়া গাহিতে গাহিতে তাহার সঙ্গে আবার আর দুটী আখর যোগ করিয়া দিলেন, এইরূপেই তুক্কো গানের সৃষ্টি হয়। বিপ্র পরশুরাম বা দ্বিজ মাধব-রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কালীচরণ দাস প্রভৃতি নানা কবির রচিত দানখণ্ড, নৌকা-খণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও দুই একটী ধুয়া-গান কীর্ত্তন-গানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এই সমস্ত গানে প্রায় ভণিতা থাকে না। এই ধরণের ভাঙ্গা গানগুলিও অনেক স্থলে তুক্কোয় পরিণত হইয়াছে, এবং যে সম্পূর্ণ গানগুলি কিম্বা শ্রুতিমধুর পয়ার বা ত্রিপদীর যে খানিকটা অংশ কীর্ত্তনীয়াগণ ঐ সব মঙ্গলগ্রন্থ হইতে গানের সুবিধার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ তাহাই ভণিতাহীন পদ বলিয়া আপন আপন সংকলিত গ্রন্থে চালাইয়া দিয়াছেন ; সেগুলি এখন অজ্ঞাত পদকর্ত্তার পদ বলিয়া চলিতেছে। প্রাচীন ঝুমুর গান হইতে তুক্কোর সুরের সৃষ্টি হইয়াছে। পরমানন্দ অধিকারীর তুক্কো খুব প্রসিদ্ধ ছিল। পাঁচালীর প্রসিদ্ধ কবি দাসু রায়ের— "দেবতা আর অসুরে
জামাই আর শ্বশুরে"
দোহাগুলি তুক্কোরই পরিণতি। কীর্ত্তন গানে "কথা", "দোহা", "আখর", "তুক", "ছুট" প্রভৃতি

কতকগুলি সংকেত প্রচলিত আছে, বারান্তরে এই সমস্ত বিষয় আলোচনার ইচ্ছা রহিল। যদুনাথ দাসের গানের মধ্যে আমরা প্রসঙ্গত তুক্কোর নমুনা দিয়াছি।

১২। ইতিপূর্ব্বে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট মহাশয় কিছু কম-বেশী প্রায় পৌনে দুই শত পদকর্ত্তার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার পদরত্নাবলীতে আরও ২৮ জনের সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে যথেষ্ট নহে,—যাঁহারাই প্রাচীন পুথির খবর রাখেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। আমরা যে অতি সামান্য লোক—আমরাই আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে পুরাণ পুথি সংগ্রহ করিতে গিয়া ডাঃ সেন ও রায় মহাশয়ের সংগ্রহের পরে আরও বত্রিশ জন নূতন পদকর্ত্তার নাম ও গান সংগ্রহ করিয়াছি। নিম্নে ইহাঁদের নাম প্রকাশ করিলাম। পদ এবং পরিচয় যদি পারি, পরে প্রকাশ করিব।

পদকর্ত্তাগণের নাম

১। অকিঞ্চন দাস, ২। উদয়াদিত্য, ৩। কান্ত দাস, ৪। কৃষ্ণবিহারী, ৫। গঙ্গারাম, ৬। গোকুলানন্দ ঠাকুর, ৭। গোপীচরণ দাস, ৮। জগদানন্দ ঠাকুর, ৯। জয়নারায়ণ, ১০। দামোদর, ১১। দেবানন্দ, ১২। নসীরাম, ১৩। নয়নানন্দ ঠাকুর, ১৪। নীলকণ্ঠ, ১৫। ব্রজনাথ, ১৬। ভগীরথ, ১৭। ভবানীদাস, ১৮। মহাদেব, ১৯। মাণিকচাঁদ ঠাকুর, ২০। মুকুন্দ, ২১। যাদবিন্দ, ২২। যুগল, ২৩। রতন, ২৪। রামনারায়ণ, ২৫। রোহিণীনন্দন, ২৬। ললিতা দাস, ২৭। লালু নন্দলাল, ২৮। শোভারাম, ২৯। স্বর্ণলালী, (মহিলা কবি), ৩০। সেবাচান্দ, ৩১। হরিদাস, ৩২। হৃদয়রাম।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা

বৌদ্ধধর্ম্ম বলিলে এখনও আমরা অনেকেই একটি নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মান্দোলনের কথাই মনে করিয়া লই। বুদ্ধদেবের নামের দ্বারা পরিচিত হওয়ায় বহুশতাব্দব্যাপী ধর্ম্মধারাটির শাখাগুলির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। কিন্তু যুগে যুগে, দেশে দেশে, নানা আচার্য্যের নব নব মত ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভাবের ফলে প্রাচীন বুদ্ধমত কত যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা এখন আর লক্ষ্য না করিলে চলে না। আধুনিক পণ্ডিতদিগের এশিয়াব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে, শুধু ঔদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য, এই দুইটি বিভাগে ফেলিতে পারিলেই বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যাপারটিকে বুঝিতে পারা যায় না। ইহাদের উভয়েরই মধ্যে আবার পরম তত্ত্ব ও অবান্তর বিষয় লইয়া মতভেদ হওয়ায় অসংখ্য উপশাখার সৃষ্টি হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই দর্শন ও শিল্পকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত করিয়াই স্থগিত হইয়া যায় নাই—তাহার প্রভাব নূতন দর্শন ও শিল্পের জন্ম দ্বারা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রবন্ধে আমি বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতে চাই না। আমার উদ্দেশ্য, বাঙালী বুদ্ধদেবকে কি চোখে দেখিয়াছে এবং তাঁহাকে ও তাঁহার নামে পরিচিত ধর্ম্মসমাজগুলিকে সাধারণ বাঙালী কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা। আমরা দেখিতে পাই, সকল সময়ে বাঙালী বুদ্ধদেবের মতকে অনুকূল ভাবে গ্রহণ করে নাই। একদিকে যেমন খাঁটি বৌদ্ধপ্রভাব বেশ প্রবল ছিল, অন্য দিকে আবার বিপক্ষতাও চলিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজে বুদ্ধদেব নিজে অবতাররূপে গৃহীত হইলেও তাঁহার মতকে বেদবিরোধী বলিয়া "পাষণ্ডমত" বলিতেও বাঙালী বিরত হয় নাই।

মোটামুটি প্রাচ্যভারতের সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্ক কিছু বেশী ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধদেব নিজে মগধে সম্বোধিলাভ করেন। রাজগৃহ তাঁহার অতি প্রিয় স্থান ছিল। তাঁহার দুইজন প্রধান শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন মগধের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার জীবনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম যে, এ দেশে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অনুমান মাত্র করা যাইতে পারে। কোন কোন প্রাচীন পালিসূত্র রাজগৃহেই রচিত হয় বলিয়া জানা যায়; যথা—রত্নমেঘসূত্র।

মৌর্য্যসম্রাট্ অশোক প্রিয়দর্শী নাম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের বহু স্থানে তাঁহার নিজের রাজ্যমধ্যে পর্ব্বত বা স্তম্ভগাত্রে বহু ধর্ম্মলিপি লেখাইয়াছিলেন। এরূপ লিপি লেখান প্রাচীন ভারতে বেশ চলিত ছিল। এ পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা দেশের সীমার মধ্যে তাঁহার কোনই লিপি পাওয়া যায় নাই। সুদূর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশগুলিতে লিপি স্থাপিত করিয়া শুধু পূর্ব্ব-

দিকৃটি বাদ দিবার কারণ কি ? তিনি "বুধসি ধংমসি সংঘসি" (ভাবরু লিপি) তাঁহার "গৌরব ও প্রসাদের" কথা জানাইয়া বলিয়াছেন যে, "এ কেঞ্চি ভগবতা বুধেন ভাসিতে সবে সে সুভাষিতে বা," সুতরাং তাঁহার সময়ে যদি বাঙ্‌লায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে, তবে ত্রিরত্নের গৌরব ও বুদ্ধদেবের সুভাষিত বাঙালীর নিকটও মর্য্যাদা লাভ করিত, সন্দেহ নাই।

অশোকের সময়ে ও তাঁহার কিছু পরে প্রাচীনপন্থী বৌদ্ধগণ বাঙ্‌লা দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে বড় একটা জানা যায় না। একটি কথা লক্ষ্য করিবার মত। বৌদ্ধদের প্রাচীন ১৬ জন স্থবিরের মধ্যে বাঙালীও ছিলেন দেখা যায়। একজনের নাম ছিল কালিক, ইঁহার বাড়ী তমলুকে। ইনি কোন্ সময়ের লোক, তাহা জানিবার উপায় নাই। ইঁহার বর্ণনা এইরূপ পাওয়া যায়,—Kalika belongs to Tamralipti, wears a golden ear-ring and sits surrounded by a circle of eleven hundred *arhats* (Mem. of A. S. B.—vol. I, no. 1, p. 2). আর একজনের নাম বনবাসী, ইনি রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহানিবাসী ছিলেন। ইঁহার বর্ণনা এইরূপ করা হইয়াছে, —Vanavasi—belongs to Saptaparni Guha, has two hands, one holding a fly-whisk of yak's tail and the other with a painted index finger, and sits surrounded by a circle of one thousand and four hundred *arhats* (Ibid., p. 2.) ইঁহারা প্রাচীন স্থবিরপন্থী ছিলেন, তাহা বেশ বোঝা যায়। ইঁহাদের প্রভাব বোধ হয় কম ছিল না। কারণ, একজনের ১১ শত ও অন্য জনের ১৪ শত অর্হৎ ছিল, সুতরাং এই সংখ্যার উপযোগী শ্রাবক নিতান্ত কম থাকিবার কথা নয়। এই স্থবিরদের প্রভাব বাঙ্‌লা দেশে কতটা ও কতদিন ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তবে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতেও আমরা সমতটে প্রাচীন স্থবিরপন্থীদিগকে দেখিতে পাই।

গুপ্ত-সম্রাট্‌দিগের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয় বলা যাইতে পারে। সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প প্রভৃতিতে এক যুগান্তর আসিয়া পড়ে। পরমভাগবত গুপ্তসম্রাটেরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করিতেন না, রাজসাহায্য না পাইলেও বৌদ্ধ প্রভাব, বিশেষতঃ বৌদ্ধশিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বাঙ্‌লাদেশে গুপ্তসম্রাট্‌দিগের যে সব অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু প্রাচ্যভারতের শিল্প-চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মই বেশী সাহায্য করিয়াছিল। গুপ্তদিগের আমলে বাঙ্‌লা দেশের লোকেরা বৌদ্ধশিল্পের মধ্য দিয়া বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করিত, তাহার নিদর্শন ভাগলপুরের নিকট সুলতানগঞ্জের তাম্রনির্ম্মিত দণ্ডায়মান বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ও দক্ষিণবঙ্গের শিববাড়ীতে প্রাপ্ত উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। এই দুইটি মূর্ত্তিতেই শিল্পীর কলাকৌশলের সঙ্গে বুদ্ধের অন্তর্ভাবের চমৎকার মিলন ঘটিয়াছে।

বুদ্ধ সম্বন্ধে যতই প্রকৃত কথা লোকের অজ্ঞাত থাকিতে লাগিল, ততই তাঁহার নাম ও কাজের সঙ্গে নানা মায়া ও অলৌকিকতা জড়াইতে লাগিল। চম্পায় রচিত "লঙ্কাবতারসূত্রে"

এরূপ উক্তি আছে। খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে রচিত "বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা"য় সুমাগধা অবদান নামে একটি কাহিনী আছে। ইহাতে দেখা যায়, প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পূর্ব্বে জৈন প্রভাব ছিল, পরে বুদ্ধের অনুশাসন প্রচারিত হয়। এই কিংবদন্তী কত দিনের প্রাচীন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে পৌণ্ড্রদেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কথা পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন ধরণের। সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ "দিব্যাবদান" হইতে আমরা জানিতে পারি, অশোকের সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আজীবিক ও জৈনদিগের খুব প্রভাব ছিল। বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইবার জন্য তাঁহার আকাশপথে চলাচলের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোঝা যায়, তখন লোকে বুদ্ধদেবের প্রকৃত মহত্ত্বের কথা ভুলিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বাহ্য বিভূতি আরোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে বহু চীনা ভ্রমণকারী এ দেশে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের বিবরণ হইতে তখনকার মতামত জানা যায়। তখন কান্যকুব্জের প্রচলিত মতকে আদর্শ ধরিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম আর আগেকার মত প্রবল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে চলিতে পারে নাই—তাহাকে দেব-বাদীদিগের সঙ্গে আপোষ করিতে হইয়াছিল। তাই কান্যকুব্জের রাজার উৎসবে বুদ্ধ, শিব ও সূর্য্য সমানভাবে সম্মান পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে বাঙ্‌লাদেশে বৌদ্ধমত যেরূপ প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও সেইরূপ প্রভাব দেখা যায়। ইউয়াঙ্-চোয়াঙ্ যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বরং বড় বড় রাজধানী-গুলিতে বৌদ্ধমন্দির অপেক্ষা দেবমন্দিরই বেশী ছিল বলিয়া জানিতে পারি। তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ২০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কিন্তু শতাধিক দেবমন্দির; সমতটে ৩০।৩২টি সঙ্ঘারাম, কিন্তু শতাধিক দেবমন্দির; তাম্রলিপ্তিতে ১০টি সঙ্ঘরাম, কিন্তু বহু দেবমন্দির, আর কর্ণসুবর্ণে ১০টি সঙ্ঘারাম, কিন্তু ৫০টি দেবমন্দির উক্ত পরিব্রাজক নিজেই দেখিয়া গিয়াছিলেন।

একটি বিষয় আমরা বড় একটা লক্ষ্যই করি না যে, বুদ্ধদেবের বহু পরের যুগেও চারিদিকে বৌদ্ধপ্রভাবের মধ্যে বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বর্ত্তমান ছিল। ইহাদের মধ্যে দেবদত্তের সম্প্রদায়ের কথাই বিশেষ করিয়া মনে হয়। ইহারা গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন বুদ্ধের পূজা করিত; কিন্তু শাক্যমুনি-বুদ্ধের বিরোধী ছিল। সেই জন্য "বৌদ্ধ"সমাজে ইহারা ধিক্কৃত হইয়াছে। ইহারা এই বৌদ্ধবিপক্ষতা বহুদিন বজায় রাখিয়াছিল। ফা-হিয়েনের সময়ে ৪০৫ খৃঃ অব্দে শ্রাবস্তীতে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল (Leggeএর অনুবাদ, ২২শ অধ্যায়)। তখন বাঙ্‌লা দেশে ইহারা ছিল কি না, জানা যায় না। কিন্তু খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণে ইহাদের তিনটি মঠ ইউয়াঙ্-চোয়াঙ্ দেখিয়া গিয়াছিলেন (Beal's Records, ii, p. 201; Beal's Life, p. 131; Watters—On Yuan Chwang, II, p. 191)। সুতরাং কোন কোন অঞ্চলের বাঙালী বহুদিন পরেও বুদ্ধের মতকে গ্রহণ করে নাই দেখিতে পাইতেছি।

কর্ণসুবর্ণে যে শুধু বৌদ্ধবিরোধী সম্প্রদায় আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহা নহে, এখানকার রাজা শশাঙ্কও নাকি দারুণ বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহাকে বৌদ্ধদের গ্রন্থে খুবই নিন্দিত ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধরাই তাঁহার স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। তিনি নাকি বৌদ্ধ পাইলেই মারিয়া ফেলিবার জন্য ভৃত্যদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। যথা,—

আ সেতোরা তুষারাদ্রেবৌর্দ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।
যো ন হন্তি স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যশিষন্নৃপঃ॥

Systems of Buddhistic Thought—Yamakami, Sogen p. 16.

আর তিনি নাকি বৌদ্ধদিগের পরমপবিত্র বোধিদ্রুমটিকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আরও ইউয়াঙ্-চোয়াঙের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন হীনযানের কোন কোন শাখা তাঁহার সময়ে বাঙ্লা দেশের কোন কোন জায়গায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—যেমন সম্মিতীয় শাখা। সকল বৌদ্ধসম্প্রদায়ই আত্মবাদ পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সম্মিতীয় সম্প্রদায় পুদ্গল-বাদ* স্বীকার করিতেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের পূজার কথা আমরা জানিতে পারি। চীনা পরিব্রাজক ই-চিং সমতটের যে রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন। বোধ হয়, সপ্তম শতাব্দী হইতেই প্রাচীন হীনযান ত্যাগ করিয়া বাঙালীরা ক্রমে মহাযান মতকে অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইউয়াঙ্-চোয়াঙ্ সমতটে প্রাচীন স্থবিরমতাবলম্বী শ্রমণদিগকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর ৪০ বৎসরের মধ্যেই ই-চিং আসিয়া সমতটে মহাযানের প্রভাব দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ প্রভাব ক্রমেই কমিয়া যাইতেছিল বুঝিতে হইবে।

সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-বিহার নালন্দায় যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি বাঙ্লার সমতটের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত সে কালে নাকি ছিল না। আচার্য্য শীলভদ্র শুধু যে বৌদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বহু দিক্ও দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ-প্রধানেরা যে হিন্দুর শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিতেন, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের নানা শাখার মধ্যে খুব প্রীতিকর সম্বন্ধ যে ছিল, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন সম্প্রদায় হইতে যখন নূতন শাখার উদ্ভব হইত, তখনই পরস্পর অনৈক্য ও বিদ্বেষভাব দেখা যাইত। নূতন যুগের নূতন চিন্তার খাতিরে মহাযানীরা প্রাচীন হীনযান হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিল—তাহারা প্রাচীন পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছিল। কালে মহাযানের একটি শাখা সহজযান নাম ধারণ করিয়া প্রাচীন সকল মতকেই উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল।

* The view approaching the doctrine of a permanent Soul is pudgalavāda.—Central Conception of Buddhism by Stcherbatsky, p. 70.

একবালে তাহাদের প্রভাব বাঙলা দেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া এখানে তাহাদের কথা ও মতামত একটু আলোচনা করিলে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা ক্রমে কোন্ দিকে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

সহজপন্থীরা এতদূর অবধি গিয়াছে যে, তাহাদের বলিতে বাধে নাই যে, পরমতত্ত্ব স্বয়ং বুদ্ধেরও অগোচর রহিয়াছে, আর এ বিষয়ে বুদ্ধের সঙ্গে ইতর লোকের তফাৎ নাই।

বুদ্ধোঽপি ন তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ—(সহজবজ্রের দোহাকোষের অদ্বয়বজ্রের টীকা)। বুদ্ধদেবের নিজেরই যখন এই অবস্থা, তখন বুদ্ধপন্থীরা যে ইহাদের হাতে সহজে অব্যাহতি পাইবে না, তাহা ত বোঝাই যায়। শ্রীহেবজ্রে পাওয়া যায়,—

রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥ (বৌদ্ধগান ও দোহা—পৃঃ ৪)

সহজযানীরা সুপ্রাচীন শ্রমণপন্থীদের ও শ্রাবকযানের নিন্দা করিতে ত্রুটি করে নাই।

বেল্লঃ দশশিষ্যঃ যদা ভিক্ষুঃ কোটিশিষ্যা যদা স্থবিরো যো দশবর্ষোপসন্নঃ। তে সর্ব্বে কাষায়ধরবস্ত্ররূপমাত্রস্প্রব্রজ্যাং গৃহ্নন্তি। তেন দেশনভিক্ষণশীলক্ষমাঃ চরন্তি। ন তথতত্ত্বমাজানন্তি। শঠকপটরূপেণ সত্ত্বান্ বিহেঠয়ন্তি। যদুক্তং ভগবতা পশ্চিমে কালে পশ্চিমে সময়ে ময়ি পরিনিবৃতে পঞ্চকষায়কালে চ। যে ভিক্ষবো মম শাসনে ভবিষ্যন্তি তে সর্ব্বে শঠকপটরতা ভবিষ্যন্তি তথা গৃহারম্ভে সতি কৃষিবাণিজ্যরতাঃ সর্ব্বপাপকর্ম্মাণি করিষ্যন্তি। শাসনবিড়ম্বকাঃ যে পূর্ব্বে মারকায়িকাঃ তে সর্ব্বে শ্রমণরূপেণাবতরিষ্যন্তি। তত্র মধ্যে সঙ্ঘস্থবিরান্তে সাঙ্ঘিকোপভোগং হরিষ্যন্তি ইত্যাদি বিস্তরঃ।

ন তেষাং বোধিস্তৎকথং। যে শ্রাবকযানমাশ্রিতাস্তেষামুক্তলক্ষণেন ভঙ্গঃ। ভঙ্গাৎ পুনর্নরকং যান্তি। অথ শিক্ষারক্ষণমাত্রেণ বিনয়োক্তলক্ষণায়াঃ স্বর্গোপভোগমাত্রং ভবতি। ন পুনর্বোধিরুত্তমা। কুতঃ যতঃ স্থবিরার্য্যানন্দঃ পরিনিবৃতস্তদা তেন ন কস্যচিৎ সমর্পিতঃ শ্রাবকে বোধিরুপদেশঃ স্যাৎ।—(বৌ. গা. দো.—পৃঃ ৮৮)

সহজবাদীদের কাছে ঐতিহাসিক বুদ্ধের কোন মূল্য ছিল না। তাহারা আবার মহাযানীদের মত বুদ্ধকে অলৌকিক ও অবতার বলিয়াও স্বীকার করিত না। মহাযানীদের শূন্যবাদ সহজযানে দেহবাদের সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। মানুষের মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক বুদ্ধের আর কোন দরকার নাই, ইহাদের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিলে প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ ছাড়া এই বৌদ্ধধর্ম্ম যে কিরূপ, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আগমশাস্ত্রে আছে,—

দেশনীয়দযোগেন বুদ্ধোঽদ্বয়কল্পিতঃ।
পরমাচিন্তযোগেন ন বুদ্ধো নাপি অদ্বয়ঃ॥ (বৌ-গা-দো, পৃঃ ৫৭)

যেমন পরবর্ত্তী কালে কবীর, দশরথপুত্র মানবদেহধারী রামকে স্বীকার না করিয়া,

আত্মারামকেই পরমতত্ত্ব হিসাবে মানিয়াছেন, সেইরূপ ইহারাও বাহিরের বুদ্ধকে না মানিয়া নিজের দেহের মধ্যস্থিত বুদ্ধের কল্পনা করিয়াছে। এই ব্যাপার হইতেই একটি প্রবল mystic চিন্তা ও সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে।

দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই ॥—সরোজবজ্রের দোহাকোষ।

দেহস্থিতং বুদ্ধত্বং...।—অদ্বয়বজ্রের টীকা।

(বৌ-গা-দো, পৃঃ ১০৭)

বীণাপাদ নামক চর্য্যাপদরচয়িতা যে "বুদ্ধ নাটকের" (বৌ-গা-দো, পৃঃ ৩০) কথা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা নির্ব্বাণ-ঘটিত একটি আধ্যাত্মিক গুহ্য ব্যাপার বুঝায়। তাহা ঐতিহাসিক বুদ্ধের নির্ব্বাণ নহে, শূন্যবাদসম্পর্কিত একটি মানসিক অবস্থা মাত্র।

এই সম্পর্কে সহজযানীরা বোধি লাভ করাকে দেহবাদের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছেন। ইহাকে তাঁহারা 'মহামুদ্রা' বলিয়াছেন। ইহার সঙ্গে বুদ্ধের নিজের সম্বোধির কোন সম্পর্ক নাই।

বোহি কি লাভই এণ বি দেহে।—কৃষ্ণাচার্য্যের দোহাকোষ।

মনুষ্যদেহং বিহায় দেহান্তরেণ বোধির্ন স্যাৎ।—ঐ টীকা মেখলা (বৌ-গা-দো, পৃঃ ১৩২)। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই সুর ধরিয়াই কি "দেহের মাঝে বৃন্দাবনের" কল্পনা করিয়াছেন?

বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকাশ্যে লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ছদ্মবেশী বৌদ্ধমত চলিয়াছিল, তাহার মধ্যে ধর্ম্মপূজাই বোধ হয় প্রধান। এই ধর্ম্মের উদ্দেশে রচিত সাহিত্যেও বুদ্ধকে বহু কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে পাওয়া যায়,—

ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান।—(পৃঃ ৫৭)

অনেকে মনে করেন, ইহা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু সিংহলে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা প্রাচীন হীনযানের অনুবর্ত্তী। সুতরাং হীনযানের কথা মহাযানপ্লাবিত বঙ্গে লোকের মনে ছিল কি না, সন্দেহের বিষয়। ঐ বইয়ের কথাতেই আমরা পাই যে, এ লঙ্কা পূর্ব্ব দিকে ছিল, দক্ষিণ দিকে নয়—

পুব দিগ মাঝে কনকলঙ্কা পার। (পৃঃ ৯১)

সুতরাং এ জায়গা যে কোথায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। ভৌগোলিক তথ্য হিসাবে এরূপ কথার কোন মূল্য নাই।

কিন্তু রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থে আমরা দুইটি কথা পাই, যাহা দ্বারা বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্মকে ইঙ্গিতে বুঝান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়,—

ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে।

ইহা ঠিক জয়দেবের "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং" কথাগুলির সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যায়। অথচ শূন্যপুরাণের ধর্ম্মঠাকুরের নিজেরই আবার যজ্ঞ করা হইয়াছিল। শূন্যপুরাণের এই ধর্ম্মরাজ শব্দে বোধ হয় বুদ্ধদেবকেই বুঝাইতেছে।

আবার আমরা পাই,—

বেদশাস্ত্র শ্রীনিরঞ্জনর পাএ।—(পৃঃ ৯৩)

যজ্ঞ ও বেদের এই অবস্থা হইতে গৌতম বুদ্ধের কথাই মনে হয়। কারণ, বেদ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা বুদ্ধদেব ভিন্ন আর কাহারও মতে দেখা যায় না। এখানে অবশ্য জৈনদের কোন কথা আসিতেছে না।

শ্রীধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার বাহন উলূকের কথাও একটু বলা দরকার। ইনি আবার ধর্ম্মদেবতার বাহন মাত্র নহেন, প্রধান মন্ত্রীও। এই পরম অদ্ভুত জীবটিকে বাঙালীরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এখনও ঠিক করা যায় নাই। এ বিষয়ে আমার যাহা মনে হইয়াছে, তাহা আলোচনার জন্য পণ্ডিতদিগের দরবারে পেশ করিলাম। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ও শিল্পে বুদ্ধদেবের সঙ্গে নাগরাজদের খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দেখা যায়। ইঁহারা অনেক সময়ে বুদ্ধের স্তব করিয়াছেন ও কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। নাগরাজদিগের মধ্যে একজনের নাম ছিল উলূক। "মহাব্যুৎপত্তি" গ্রন্থেও (Mem. A. S. B., vol, IV. no. 2, p. 166) উলূকের নাম আছে। উলূকের অর্থ করা হইয়াছে "the clear sighted." প্রাচীন বাঙ্‌লা গ্রন্থে কীর্ত্তিত উলূকেরও এই গুণটি দেখা যায়।

এখানে আর একটি বিষয়ের একটু আলোচনা হওয়া দরকার। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপূজার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমরা মনে করিতাম, সমস্তটা ধর্ম্মসাহিত্যে সুধু বুদ্ধেরই কথা আছে। আমার মনে হয়, এখন এ মত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে। ধর্ম্মসাহিত্যকে আমরা দুইটি ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। প্রথম, রামাই পণ্ডিত প্রভৃতির উলূক বাহন ধর্ম্মের কথা, দ্বিতীয়, লাউসেন-সম্পর্কিত ধর্ম্মরাজের গীত। প্রথমটিতে যে বৌদ্ধপ্রভাব আছে, তাহা উপরে আলোচনা করা গেল। কিন্তু "লাউসেনী দাড়া" একেবারে নিছক সূর্য্যপূজার কথা, উহাতে বৌদ্ধপ্রভাবের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। গ্রহভরণ, ধর্ম্মের ঘোড়া, পাদুকা পশ্চিমে সূর্য্যের উদয় দেওয়ান প্রভৃতি সূর্য্যের সঙ্গে বেমানান হয় না। এখনও বাঙ্‌লা দেশের বহু জায়গায় সূর্য্যকে 'ধর্ম্ম', 'গোসাঞি' প্রভৃতি বলিতে শোনা যায়। অন্য একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপার আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারি না। ধর্ম্মকে আমরা সাহিত্যে যেরূপভাবে পাইয়াছি, শিল্পে সেরূপভাবে পাই নাই। ধর্ম্মকে ধবলবর্ণ বলা হইয়াছে, তাঁহার যা কিছু সবই ধবল বলা হইয়াছে, তাঁহাকে নিরঞ্জন ও নিরাকার বলা হইয়াছে, অথচ ধর্ম্মের মূর্ত্তিগুলি যে কত অদ্ভুত রকমের, তার ঠিকানা নাই। কোথাও ধর্ম্ম কচ্ছপাকৃতি, কোথাও ঝিঁকের আকারের, কোথাও খালি মুণ্ডাকার। অথচ বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধ শিল্পীর হাতে কি চমৎকার কাজ হইতে পারিত, তাহা আমাদের অজানা নাই। ধর্ম্মের ঐ সব রূপ দেখিয়া এক একবার সন্দেহ হয়, কোন্ লৌকিক জাতিগত চিহ্নকে (totemistic symbol) বৌদ্ধায়িত করা

হইয়াছে কিনা। কচ্ছপাকৃতিকে কেহ কেহ বৌদ্ধস্তূপের রূপক বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মের অন্যান্য রূপগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া বোধ হয় সহজ নহে। যাহা হউক, এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙালী ধর্ম্মকে সাহিত্যে যেরূপ ধারণা করিয়াছে, শিল্পে তাহা করে নাই।

ভারত ইতিহাসের মধ্যবর্ত্তী যুগে যখন প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার হইয়াছিল, তখন হিন্দুধর্ম্ম নূতন জীবনলাভের চেষ্টা করে। তাহার ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের দুইটি শাখা খুব প্রবল হইয়া উঠে,—(১) বৈষ্ণব ধর্ম্ম, (২) শৈব ধর্ম্ম। ইহারা দুইটিতেই বৌদ্ধধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও নিজ নিজ ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে টানিতে চেষ্টা করে। ইহার ফল বাঙ্‌লা দেশে কিরূপ হইয়াছিল, এখন তাহাই দেখা যাক্।

শিবঠাকুরের ইতিহাস অতি বিচিত্র। অনেকেই মনে করেন, তিনি ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রাচীন রুদ্রদেবতা ব্রাত্যদিগের পূজ্য ছিলেন, তিনি কি করিয়া মহাযোগী ও মহাদেব হইলেন, সে এক মহা রহস্যময় ব্যাপার। এখানেই শেষ নয়, অদ্বৈতবাদীদের "শিবোঽহং" মন্ত্রের প্রেরয়িতারূপে যে শিব উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার বিবর্ত্তন বড় সহজ ব্যাপার নয়।

বুদ্ধদেবের সাধনার কথা মনে হইলে যোগপন্থা ও জ্ঞানবাদের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক এবং এ দুইটি বিষয়েই বুদ্ধের সঙ্গে শিবের অনেকটা মিল আছে।

১৩শ শতাব্দীর বাঙালী কবি রামচন্দ্র কবিভারতী বাঙ্‌লা দেশ ছাড়িয়া সিংহলে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। সেখানকার রাজা তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন ও তাঁহাকে "বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী" উপাধি দেন। তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম "ভক্তি-শতকম্"। ইহার প্রথমকার শ্লোকটিতেই বুদ্ধ ও শিবের একত্ব একেবারে পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে :—

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচঃ
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্যা হেতুরনন্তসত্ত্বসুখদা নাম্না কৃপামাধুরী
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে॥

এই ধারণা শুধু কবির নিজের একার, না তখনকার বাঙালীরও ইহাই মত, তাহা বুঝিয়া ওঠা শক্ত। কারণ, আমরা দেখি, প্রাচীন যুগের বাঙালী বৈশ্যসমাজে যে উচ্চ আদর্শের শিব 'মহাজ্ঞান' লাভের জন্য পূজিত হইতেন, তাঁহার জায়গায় মধ্যযুগে ভাঙড় ও চাষ-আবাদী শিবের গানই বাঙ্‌লা দেশে খুব বেশী করিয়া চলিয়াছিল।

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত এই যে, কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ অথবা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাযানীদের বহু দেবী শিবের নিজের শক্তিতে বা শৈব-মণ্ডলে আসিয়া পড়িলেন। তারা, ভ্রূকুটী, বাগীশ্বরী প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালে শিবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কোথাও

চণ্ডী, কোথাও মনসা, কোথাও শীতলা, কোথাও সরস্বতী প্রভৃতিরূপে দেখা দিলেন। এই সম্পর্কে বাঙ্‌লা দেশে প্রচলিত তন্ত্রগুলিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার যে, উহাতে বুদ্ধদেবের কোন কথা আছে কি না। অক্ষোভ্য, মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি মহাযানী দেবতার উল্লেখ তন্ত্রে পাওয়া যায়, সুতরাং বুদ্ধের সম্বন্ধে তন্ত্রের ধারণাটি কি ছিল, তাহা আমাদের জানিতে আগ্রহ হইবারই কথা।

পালরাজদিগের সময়ে বাঙ্‌লাদেশ স্বপ্রতিষ্ঠ হইল। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা দেশ বাহির হইতে নানা প্রভাবের অধীনে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন বাঙ্‌লার নিজস্ব শিল্প ও শাস্ত্র সুধু দেশে নয়, ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু জায়গায় ছড়াইয়া গেল। পালরাজারা নিজেরা বৌদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের নিকট অবনতমস্তকে থাকিতেন, এ কথা তাঁহাদের অনুশাসন হইতেই জানা যায়। তাঁহারা "পরমসৌগত" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, অথচ "নারায়ণ-মন্দির" ও "পাশুপত সমাজ" স্থাপনেও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মারীচী, কেহ বাগীশ্বরী, কেহ অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির ভক্ত ছিলেন জানা যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহারা কি মনে করিতেন, জানিবার উপায় নাই। এই সময়ে "বুদ্ধভট্টারক-মুদ্দিশ্য" অনেক ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দান-ধ্যান করা হইত, কিন্তু তবু গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে দেশের সাধারণ লোকদের মন সচেতন ছিল কি না, জানা যায় না। মধ্যযুগের মহাযানীদের একটি মন্ত্র (formula) এই সময়কার অনেক মূর্ত্তিতে খোদিত দেখা যায়,—

যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতঃ।
হ্যবদত্তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ॥

কিন্তু যে হেতুবাদের গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ তখনকার বাঙালীর চিন্তা ও কর্ম্ম হইতে পাইবার উপায় নাই। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেবের পরিবর্ত্তে অসংখ্য দেব-দেবী ও পূজা-পার্ব্বণাদিতেই লোকেরা আসক্ত হইয়াছিল। এই যুগে বুদ্ধের মূর্ত্তি অপেক্ষা মহাযানের ও বজ্রযানের দেব-দেবীর মূর্ত্তিই বেশী দেখা যায়। তবে এই বুদ্ধমূর্ত্তি-গুলির শিল্পসৌষ্ঠব প্রশংসার যোগ্য বটে। একটি বুদ্ধমূর্ত্তি বিক্রমপুরের এক স্থানে এখনও লোকে পূজা করিতেছে; কিন্তু তাহাকে বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া কেহ জানে না, তাই তার নাম দিয়াছে "চিন্তামণি ঠাকুর।"

পালরাজদিগের সময়ে বাঙ্‌লাদেশে সিদ্ধাচার্য্যদিগের প্রভাব খুব প্রবল ছিল। তাঁহাদের অনেক কথা ও গান মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া বাঙালী-মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি যে সব সিদ্ধার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও অনেক সিদ্ধা ছিল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙালী ছিল। এরূপ কয়েক জনের নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি। প্যারীর "মুসে গীমে" নামে শিল্প-সংগ্রহের বৌদ্ধবিভাগে অনেকগুলি মহাসিদ্ধার চিত্র ও মূর্ত্তি সংগৃহীত আছে। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল উধিলি, তার বাড়ী ছিল দেবীকোটে; এই দেবীকোট উত্তরবঙ্গে ছিল। আর এক জন ছিল,

পুতলি। আর একজনের নাম নাগবোধি। মেকোপ নামে আর এক জন সিদ্ধার কথা পাওয়া যায়—ইহাদের সকলেই বঙ্গবাসী বলিয়া অভিহিত। আর এক জনের নাম ছিল কপালিক, ইহার বাড়ী ছিল রাজপুরী, ইহা বঙ্গদেশে কি না, এখনও ঠিক হয় নাই (Guide-Catalogue du Musée Guimet—Les Collections Bouddhiques—J. Hackin, Paris. 1923, pp. 98-108)। এই সব সিদ্ধাচার্য্য বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইলেও, বুদ্ধদেবের বড় একটা ধার ধারিতেন না।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই বাঙ্‌লাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শৈব ধর্ম্মের প্রসার হইতে আরম্ভ হয়। হিন্দু রাজারাও এই দুই ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করায় বৌদ্ধধর্ম্ম আর মাথা তুলিয়া চলিতে পারে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে নাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা হরিবর্ম্মদেব বৌদ্ধ ও জৈনদিগের "ধর্ম্ম-সংমর্দ্দনকারী" বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন, এবং তাঁহার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্টের অনুসরণে প্রাচীন মীমাংসা-সূত্রের ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী রচনা করিয়া তাহার নাম দেন "তৌতাতিত-মত-তিলকম্।" ইহা তৌতাতিত বা কুমারিল ভট্টের তন্ত্র-বার্ত্তিকের একখানি প্রসিদ্ধ টীকা। যে কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ পাষণ্ডগণের মস্তক উদূখলে চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার এরূপ উপযুক্ত অনুশিষ্যও যে সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন, তাহা মনে হয় না। কুমারিল ভট্টের আর একটি কথায়ও বঙ্গীয় শিষ্যদের নিশ্চয়ই মত ছিল। তিনি তাঁহার "তন্ত্রবার্ত্তিকে" (Benares Sanskrit Series, p. 171) লিখিয়াছেন,—বৌদ্ধশাস্ত্র 'অসাধুশব্দভূয়িষ্ঠ' বলিয়া উহার শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হয় না; মাগধ অপভ্রংশ উহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া, 'অসত্য শব্দ' ব্যবহার করায় উহার 'অর্থসত্যতা' আর কিরূপে হইতে পারে আর তার 'অনাদিতা'ই বা কিরূপে স্বীকার করা যায়? এরূপ চমৎকার যুক্তি নিশ্চয়ই বৌদ্ধবিরোধীদের রুচিকর হইয়াছিল।

পালরাজদিগের সময় হইতেই বাঙ্‌লা দেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাঙ্‌লা দেশে প্রাপ্ত এই সময়কার বাসুদেবমূর্ত্তিগুলি বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাঙ্‌লার ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের গোড়ায় এই বাসুদেবীয় বা ভাগবত বৈষ্ণবধর্ম্মকে দেখিতে পাই। পালরাজদের মন্ত্রী গুড়ব মিশ্র গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করেন। মদনপালদেবের রাজসভায় মহাভারত পাঠ হইত। সপ্তগ্রামে যে কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত কতকগুলি মূর্ত্তি ছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তখনও বোধ হয়, বুদ্ধকে বিষ্ণুর একটি অবতার বলিয়া বাঙালী স্বীকার করিয়া লয় নাই।

বাঙ্‌লার সেনরাজদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এই সময়ে রাজারা একই সঙ্গে পরমভাগবত ও পরমমাহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যাহা হউক, বাঙ্‌লায় এক নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেখা দিল, যাহার ফলে পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার মধ্যে রাধা প্রবেশ

লাভ করিয়া ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর চিত্তকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক, এই নব বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের স্থান দেওয়া হইল—বাঙ্‌লা দেশেও জয়দেব এই কাজ করিলেন। বুদ্ধকে প্রাচীনতর হিন্দুরা নিন্দাই করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বৌদ্ধাচার্য্যদিগকে "পাষণ্ড" ছাড়া আর কিছু বলিতেন না। এখন বৌদ্ধদের সঙ্গে সন্ধি হওয়ায় অন্ততঃ বুদ্ধদেবকে আর তাঁহারা অনাদর করিলেন না। বৈষ্ণবেরা মধ্যযুগের মহাযানীদের অসংখ্য দেবদেবীকে গ্রহণ না করিয়া, একেবারে স্বয়ং বুদ্ধকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। লোকের মনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাই বুদ্ধদেব যে যজ্ঞনিন্দা ও পশুবধ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, শুধু তাহার জন্যই তাঁহাকে আর নিন্দা করিতে পারিতেছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব বাঙালী কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দে"র পদে আছে,—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।

বুদ্ধের কারুণ্যই জয়দেবকে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করিয়াছিল; তাই তিনি "কারুণ্যমাতন্বতে" বলিয়া আর একবার বুদ্ধদেবকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতী বুদ্ধের বেদনিন্দার জবাব দিয়াছেন (ভক্তিশতকম্) :—

যত্র ছাগ-তুরঙ্গ-মারণবিধির্বেদোঽপি ত্বং নিন্দসি
প্রেম্না প্রাণভৃতামতঃ সকরুণস্ত্বত্তো মহাত্মাপরঃ।
এবং তে গুণসম্পদো ন বিষয়া বুদ্ধেরমুরাত্মনাং
তে মূঢ়া প্রলপন্তি হন্ত সুগতো মদ্বেদনিন্দত্যয়ম্॥

বিষ্ণুর অবতারদিগের মধ্যে একটি সাধারণ সূত্র এই আছে যে, কোন দৈত্য বিনাশ বা সঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্যই উহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধ সেরূপ কোন কাজের জন্য আসেন নাই। এ কথা হিন্দুরা ভুলিয়া যায় নাই। তাই বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের সঙ্গে বুদ্ধের উল্লেখের মধ্যেই ঐ তফাৎটুকুর একটু আভাস হিন্দুকবির কাব্যে পাওয়া যায়। ১৪শ শতাব্দীর কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—

বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন।—কৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ২৩৫।

হিন্দুকবি বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানিয়াও আবার বলিতেছেন যে, তিনি নিজেই নিরঞ্জনের ধ্যান করিতেন। বুদ্ধের ধ্যানের সম্বন্ধে এ ধারণা করিবার অধিকার বাঙালী কবি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন?

জয়দেবের বুদ্ধ-বন্দনার পর বাঙালীসমাজে ধর্ম্মপূজকেরা ও বৈষ্ণবেরা বুদ্ধকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্‌লার লৌকিক শাক্ত-সাহিত্যে প্রকারান্তরে বুদ্ধের নিন্দাই পাওয়া যায়, যদিও ঐ সকল গ্রন্থকার বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের

নামে প্রচলিত ধর্ম্মপূজাবিধানে (পৃঃ ১৩০) পাওয়া যায় যে, "কৃষ্ণের দশ অবতারে"র মধ্যে বুদ্ধও একজন ছিলেন, তাই "বৌদ্ধের (বুদ্ধের) পুষ্পং জয় ।" বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে (আদি, ২য় অধ্যায়) পাওয়া যায়,—

"বুদ্ধরূপে দয়াধর্ম্ম করহ প্রকাশ ।"

শাক্তেরা কিন্তু বুদ্ধকে এ ভাবে দেখেন নাই। মাধবাচার্য্যের "জাগরণে" (চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৩১১, পৃঃ ৭) আছে,—

বৌদ্ধ অবতারে প্রভু জগতমোহন।

কবিকঙ্কণও তাঁহার "চণ্ডী"তে (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬২) লিখিয়াছেন,—

"ধরিয়া পাষণ্ড মত, নিন্দা করি বেদপথ, বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ ।"

এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বুদ্ধদেব লীলাবশতঃ পাষণ্ডমত অবলম্বন করিয়া বেদবাদ-বিরোধীদিগকে মোহাবিষ্ট করিয়া, তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাহাতে পরিশেষে বেদপন্থীদেরই জয় হইয়াছিল এবং বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল। এই কথাটি তলাইয়া দেখিলেই ব্রাহ্মণ্যপন্থীরা বুদ্ধকে কেন খাতির করিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে বাঙালীর আর একটি ধারণা এই যে, পুরীর জগন্নাথ আসলে বুদ্ধদেবেরই মূর্ত্তি। এই ধারণার বিস্তৃত ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। হয় ত বৌদ্ধ ত্রিরত্নকেই হিন্দুরা জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা বানাইয়া লইয়াছে। কিন্তু কোন প্রাচীন পুরাণেই বোধ হয়, এই হিন্দু ত্রি-মূর্ত্তির একত্র পূজার ব্যবস্থা নাই।

রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্মপূজাবিধানে" আমরা বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে যেখানে বুদ্ধের কথা আছে, সেখানেই জগন্নাথের উল্লেখ দেখিতে পাই,—

নবম মূর্ত্তিতে হরি জগন্নাথ নাম ধরি
জলধির তীরে কৈলা বাস।
প্রশাদ কোরিয়া দান নরে লিলে সন্নিধান
সমনেরে করিলে নৈরাশ ॥—(পৃঃ ২০৬-৭)

আবার— দশ মুরুতে গোশাঞি বলালে জগর্নাথ।
নিমের পৃতিম গোশাঞি সুবর্ণের দুটি হাত ॥—(পৃঃ ২১৪)

আর এক জায়গায় স্পষ্টতঃই জগন্নাথকে বুদ্ধ নাম দেওয়া হইয়াছে,—

জলধির তীরে স্থান বোদ্দরূপে ভগবান্
হয়্যা তুমি কৃপাবলোকন।
প্রশাদ করেতে দিয়্যা নরে শন্নিধান লিয়্যা
কৈলে তুমি নৈরাস সমন ॥—(পৃঃ ২০৮)

শুধু যে সাহিত্যেই এই ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে; শিল্পেও ইহা স্থায়িত্ব লাভ

করিয়াছে। কাশিমবাজারের ব্যাসপুরে কেশবেশ্বর নামে এক শিবের মন্দির আছে। ইহা ১৮১১ খৃঃ নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের গায়ে ইটের উপর নানা প্রকার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্ত্তি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দশাবতারের যেখানে বুদ্ধমূর্ত্তি থাকিবার কথা, ঠিক সেইখানে জগন্নাথের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, এই মন্দিরটি একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, সুতরাং এ বিধানের মূলে হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী কিছু থাকা সম্ভব নহে। বনবিষ্ণুপুরে প্রচলিত দশ অবতারের চিত্রযুক্ত গোলাকার খেলার তাসগুলিতে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার ঠিক আছে, কেবল বুদ্ধের স্থান জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে দেওয়া হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মধ্যযুগের বাঙালীরা বুদ্ধকে ভাল চোখে দেখিলেও বুদ্ধের দয়া ছাড়া আর কোন গুণের সন্ধান তাঁহারা পান নাই। বুদ্ধের আসল মত হেতুবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুদ্ধের ধর্ম্মকে তাঁহারা স্বস্তির সহিত সহ্য করিতে পারিতেন না। বুদ্ধের মহিমা কোন রকমে স্বীকার করিয়া লইয়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সমসাময়িক বৌদ্ধদিগকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না। বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে মানিলেন বলিয়া বাঙ্লা দেশে বৌদ্ধপ্রভাব কমিয়া গেল; তখনও যাহারা প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমত বজায় রাখিয়াছিল, তাহারা বৈষ্ণবদের অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই বৌদ্ধ-বিদ্বেষ বহু জায়গায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে (আদি, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে লেখা হইয়াছে,—

> তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
> দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
> জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
> ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
> পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
> বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥

ইহা দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুকে বড় এবং বোধ হয়, ধ্যানাবস্থাপন্ন বৌদ্ধদিগকে ছোট করিতে যাইয়া পরমসহিষ্ণু বৈষ্ণব গ্রন্থকার বৈষ্ণবতাই দেখাইয়াছেন বটে! বুদ্ধের প্রশংসা করিয়া বৌদ্ধদের অনর্থক নিন্দা করা হইয়াছে! বৈষ্ণবেরা অবৈষ্ণবদিগকে "ব্যর্থ জন" বলিয়াছেন, এবং তাঁহারা যাহাদিগকে পাষণ্ড বা পাষণ্ডী বলিতেন, বৌদ্ধরাও সেই দলের মধ্যেই ছিল।

বৈষ্ণবদের এই বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কারণ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। বৈষ্ণবেরা মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া মনে করিতেন (পদ্মপুরাণ, উত্তর, ৬২।৩১)। এই জন্য বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক ॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥—চৈ, চ, মধ্য, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই গ্রন্থেই (মধ্য, ৯ম পরি) দেখা যায়, চৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণে বাহির হন, তখন এক জায়গায় তখনকার বৌদ্ধদের সাক্ষাৎ পান ও তাহাদের তর্কপ্রধান নবমতের খণ্ডন করেন,—

পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে ॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ—অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিলা প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥
বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রস্থান সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জা-ভয় ॥

বিশ্বম্ভর দাসের "জগন্নাথ-মঙ্গল" গ্রন্থে মধ্যদেশের দুই ব্রাহ্মণ-সন্তানের গল্প আছে, তাহাদের একজন "বৌদ্ধ নাস্তিকের" সংস্পর্শে আসিয়া বিষ্ণুপূজা ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই গল্প হইতে বৌদ্ধদের সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহা একটু জানা যায়,—

বৌদ্ধ নাস্তিক এক মিলিল তাহারে।
বুদ্ধি হত করাইল কুমার্গ বিচারে ॥
* * * * *
বিষ্ণুপূজা ছাড়ি হৈল বিষয়েতে রত।—(পৃঃ ১৪৭)

বেদবাহ্য বলিয়া বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধদিগকে একেবারে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ ও শবরদের সামিল করিয়া, মানবসমাজের কলঙ্কস্বরূপ বৌদ্ধদের কথা তাঁহারা অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—

তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥—চৈ, চ, মধ্য, ৯ম পরি।

একজন বাঙালী কবি কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে,

মথুরার বৌদ্ধপ্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্যই কৃষ্ণের অবতার দরকার হইয়াছিল। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাস। তাঁহার রচিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসে" [সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ] বিষ্ণুর ২২টি অবতারের মধ্যে বিংশ অবতার কৃষ্ণ।

বিংশতি শ্রীমধুপুরে কৃষ্ণ অবতার।
বেদনিন্দাকারী বৌদ্ধ করিলে সংহার ॥—(পৃঃ ৩)

বৌদ্ধরা হেতুবাদী ছিল বলিয়া ভক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা তাহাদিগকে তন্ত্র দিতে রাজী হইতেন না। "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" আছে,—

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন জাপয়েৎ ॥

এককালে বাঙ্‌লা দেশের বৈশ্যগণের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার বেশী ছিল, এবং উহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ প্রভাব বজায় রাখিয়াছিল, এইরূপ অনেকে মনে করেন। "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকেও" এ ধরণের কথাই পাওয়া যায়,—

......বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব।

এই জন্যই কি বৌদ্ধবিদ্বেষী নিত্যানন্দ বণিক্‌দিগের উদ্ধারে চেষ্টিত ছিলেন বলিয়া জানা যায় ?—

বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।

এক সময়ে বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়ে হিন্দু-তান্ত্রিকতা খুব প্রবল হইয়াছিল জানা যায়। হিন্দু-তান্ত্রিকতার সঙ্গে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার কোন সম্পর্ক ছিল কি না এবং হিন্দু তান্ত্রিকেরা বৌদ্ধদিগকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা একটু আলোচনা করা যাক্।

হিন্দু তান্ত্রিকেরা তাঁহাদের বিদ্যাকে কুলবিদ্যা নামে অভিহিত করেন। এই 'কুল' শব্দের অর্থ বড় একটা পরিষ্কারভাবে কোথাও দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। দুই চারিটি দেব দেবী ছাড়া হিন্দু তান্ত্রিকেরা বৌদ্ধদের সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু বলেন নাই। অথচ 'কুলসেবা'র কথা তাঁহাদের গ্রন্থে খুবই আছে। সহজযানীদের একজন পাণ্ডা ছিলেন ডোম্বী হেরুকপাদ। তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম 'সহজসিদ্ধি'। ইহা শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য পাইয়াছেন। ইহাতে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহাতে হিন্দুতন্ত্রকে বৌদ্ধতন্ত্র-সম্পর্কিত মনে হইতে পারে। এই গ্রন্থে আছে,—

কুলসেবাৎ ভবেৎ সিদ্ধিঃ সর্ব্বকামপ্রদা শুভা।

কুলগুলির সংখ্যা পাঁচ,—অক্ষোভ্য, বৈরোচন, অমিতাভ, রত্নসম্ভব ও অমোঘসিদ্ধি, এই পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ হইতেই কুলের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই ইহাদিগকে কুলেশ বলিয়া থাকে।

অক্ষোভ্য বজ্রমিত্যুক্তং অমিতাভঃ পদ্মমেব চ।
রত্নসম্ভবো ভাবরত্ন বৈরোচনস্ত আগতঃ।
অমোঘ কর্ম্মমিত্যুক্তং কুলান্যেতানি সংক্ষিপেৎ॥—("উত্তরা", জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)।

প্রাচীন হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থ পাওয়া খুব শক্ত। এখন যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ পরবর্ত্তী কালের সংগ্রহগ্রন্থ, মৌলিক রচনা নহে। এই পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। বহু চেষ্টায় "গায়ত্রীতন্ত্রে"র ৫ম পটলে দেখিতে পাই, উহা বৌদ্ধ প্রভাব একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই,—

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৌদ্ধমতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু পল্লবং।

তবু এই গ্রন্থ বৌদ্ধদের নিন্দা করিতে একটু দ্বিধা বোধ করে নাই,—

১। বেদে বৌদ্ধে বিবাদোঽস্তি বেদোক্তং প্রতিপালয়েৎ।
বৌদ্ধোক্তং রাজশার্দ্দুল দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

২। চৌরো বৈ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মধ্যে বৌদ্ধ ইতি স্মৃতঃ।

বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, অনীশ্বরতা, শিখাধ্বংসন্যায় প্রভৃতি তান্ত্রিকেরা সহ্য করিতে পারেন নাই,—

১। বৌদ্ধাঃ শূন্যতাবাদিনঃ।—জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, শ্লোক ১৭

২। বৌদ্ধো বদতি রাজেন্দ্র ঈশ্বরো নাস্তি নাস্তি বৈ।
অহমেবেশ্বরঃ সাক্ষাদিতি বৌদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ॥—গায়ত্রীতন্ত্র

৩। কুতঃ স্বর্গো কুতো ভোগো নষ্টঃ কো বা হতো নৃপ।
ত্যক্ত্বা দেহং যযৌ শক্তির্মরণং তেন কথ্যতে॥
ইতি বৌদ্ধস্য রাজর্ষে যথা বাক্যমলীকবৎ।
যথা বহ্নেঃ শিখাধ্বংসং সর্ব্বেষাং ধ্বংসমুচ্যতে।
ইহৈব নরকঃ স্বর্গঃ কা কথা পরজন্মনি।—গায়ত্রীতন্ত্র

৪। আত্মানন্দময়ো জীবঃ কলা শ্রীরন্তরাত্মনঃ।
সদা জীবেতি জীবেতি কথ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
তৎ কথমাত্মনো ধ্বংসো বৌদ্ধবাক্যেন ভূপতে।
শিখাধ্বংসমিতি ন্যায়াদিতি বৌদ্ধস্য মূর্খতা॥—গায়ত্রীতন্ত্র

বৌদ্ধেরা দশ দণ্ডের মধ্যে ভোজন করিত বলিয়া ও তাহারা বলিদান নিষেধ করিত বলিয়া তান্ত্রিকেরা উহাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন—

১। দশদণ্ডাভ্যন্তরে রাজন্ ভোজনং স্বর্গমুচ্যতে।
সংত্যজ্য আত্মতা ভোগে নষ্টঃ কো বা হতো নৃপ॥

২। বলিদানং বেদসিদ্ধং নিষিদ্ধং বৌদ্ধবাক্যতঃ।

এই প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাঙ্‌লা দেশে বুদ্ধকে

স্বীকার করিয়া লইয়া, বৌদ্ধদিগকে অস্বীকার করিবার একটা প্রবৃত্তি ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের মধ্যে বরাবর দেখা গিয়াছে। এইরূপ চিন্তার ফলে লোকের ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, এ দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। মোগল-সম্রাট্ আক্‌বরের সভায় ভারতবর্ষের সকল ও ইউরোপের দুই একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক দেখা যাইত। তাঁহারা সম্রাটের ইবাদাৎ-খানায় বিচার বিতর্ক করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের কোন কথা পাওয়া যায় না। আবুল ফজল তাঁহার আইন্-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৌদ্ধদের কোন সন্ধান পান নাই এবং শুধু আরাকানে বৌদ্ধেরা বাস করিত। এ সংবাদ তিনি নিশ্চয়ই বাঙ্‌লা দেশের লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সাধারণ বাঙালীর ধারণা বুঝিতে পারা যায়। অথচ সেই সময়েই প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম চলিত ছিল। লামা তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। ১৬০৮ খৃঃ বুদ্ধগুপ্তনাথ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অল্প পরিমাণ প্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তারানাথের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত 'বুদ্ধপুরাণ' নামে এক গ্রন্থ লেখেন, উহাতে সেনবংশের কয়েকজন রাজার ইতিহাস ছিল। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু লেখা হইয়াছিল। গ্রন্থ না পাওয়ায় কোন খবর জানিবার উপায় নাই।

কতকগুলি অপ্রকাশিত বাঙ্‌লা পুথিতে এমন একটু একটু খবর আছে, যাহা আমাদের কাজে লাগিতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থ না পাওয়ায় মোট কথা যাহা জানা গিয়াছে, তাহা লইয়া বেশী আলোচনা সম্ভবপর নহে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুথিগুলিতে কি ছিল, তাহা জানিবার কৌতূহল তৃপ্ত করিবার উপায় নাই। বাঙালী হিন্দু কবিরা যে বুদ্ধদেবকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই, তাহার প্রমাণ রাধামাধব ঘোষের "বৃহৎসারাবলী" নামক বাঙ্‌লা ভাষার বৃহত্তম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি খাঁটি পৌরাণিক বৈষ্ণব অবতারের ন্যায় বুদ্ধদেবের লীলাও বর্ণিত আছে। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থের বুদ্ধলীলা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, চূড়ামণিদাস নামক একজন লেখকের একখানা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ আছে—তাহাতে নাকি চৈতন্যদেবের জন্ম হওয়ায় বৌদ্ধদেরও আনন্দিত হওয়ার কথা আছে। এই গ্রন্থ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে আরও খবর জানা যাইতে পারে। ১৬৮৯ খৃঃ রচিত রামজীবন বিদ্যাভূষণের "সূর্য্যমঙ্গল" খানি অতি বিরাট্ গ্রন্থ। ইহাতে সূর্য্যোপাসক আচার্য্যগণের হস্তে বৌদ্ধ হাড়িদের নির্য্যাতন বর্ণিত হইয়াছে (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দীনেশ সেন, পৃঃ ১৬৩)। ইহাও আমরা পাই নাই। কুচবিহারনিবাসী গোবিন্দ দাস নামে একজন লেখকের গ্রন্থে নাকি বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় (উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, ৩য় গৌরীপুর অধিবেশন, ১৩১৬, কার্য্যবিবরণ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১২৫)। এ সম্বন্ধেও আর খবর পাওয়া যায় নাই। মগদের দেশে লিখিত "বুদ্ধওয়াং" বা বুদ্ধরঞ্জিকা নামে একখানা বাঙ্‌লা গ্রন্থ আছে, ইহা ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হইবে। ইহাতে বুদ্ধদেবের চট্টলভ্রমণের কাহিনী লিখিত আছে

("ভারতবর্ষ"—অগ্রহায়ণ, ১৩২৮)। বৌদ্ধগ্রন্থকার এ অদ্ভুত খবর কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। এখানেও বুদ্ধদেব "বায়ুভরে রথে আরোহণ" করিয়া 'আর্কান' গিয়াছিলেন।

শ্রীরমেশ বসু

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৬এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়-লিখিত "কবীন্দ্র রমাপতি" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়, এড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা; ২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, ১৯।১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কালিয়া-ভাণ্ডার (গৈলা, বরিশাল); প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—৩। শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনাথ গুহ বাহাদুর এম এ, বি এল, ১৮ রামমোহন দত্ত লেন, ভবানীপুর।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। উপহারদাতা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুস্তক—১। কবিকঙ্কন চণ্ডী (২য় খণ্ড); মেসার্স মুলজী জেঠা কোং—২। শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রানুভাষ্যম্ ১ম পাদ, ৩। ঐ, ২য় পাদ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর যে সাহিত্য-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সভা সম্প্রতি উঠিয়া যাওয়ায় ঐ সভার অন্যতম কর্ত্তৃপক্ষ এবং স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পরিষদের পুস্তকালয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য সাহিত্য-সভার পুস্তকাগারের সমস্ত পুস্তক এবং এগারটী আলমারী ও একটি টেবিল পরিষদে দান করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় সমস্ত পুস্তক ও আলমারী আসিয়াছে, আর যদি কিছু বাকী থাকে, তাহা ক্রমশঃই আসিবে। সাহিত্য-সভাটি বহুদিনের, উহা উঠিয়া যাওয়া দেশের পক্ষে অগৌরবের কথা। উহা থাকিলে অনেক সহিত্যসেবীর একটা মিলন-স্থান হইত। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর বাঙ্গালা সাহিত্যের ও এই সভার বিশেষ অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, কুমার শ্রীযুক্ত প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এবং সাহিত্য-সভার কর্ত্তৃপক্ষগণকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ঐ সভার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু

বাহাদুর সাহিত্য-সভার পক্ষে এবং পরিষদের পক্ষে এই পুস্তকালয়টি পরিষদে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই এই মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।”

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—“আজ একটি অত্যন্ত শোকের কথা আপনাদের জানাইতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার রায় অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর এম এ গত কল্য অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন; ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও তিনি একসঙ্গে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি নানা স্থানে কার্য্য করিয়া পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ইন্সপেক্টার জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন হন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সকল জায়গায় কাজ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার আগমনের পর হইতে পরীক্ষার বিশৃঙ্খলা একেবারে দূর হইয়াছিল। ছাত্রমহলে তিনি অতি প্রিয় ছিলেন। তিনি কত পরিশ্রম করিতেন, তাহা অনেকেই জানেন না। ১০টার সময় Strong roomএ প্রবেশ করিয়া,ভিতর হইতে তাহা বন্ধ করিয়া ৪৷৷০টা পর্য্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বণ্টন করিতেন। কাজের দায়িত্ব এত বেশী ছিল ও তজ্জন্য এত ভাবনা চিন্তা করিতে হইত যে, তাহাতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ কাজ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হন। তিনি বৎসরে দুই মাস ছুটী পাইবেন, এই সর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবারও তিনি ছুটী লইয়া মিহিজামে তাঁহার নিজ বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন। গত পরশ্ব দিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং আসিয়া কল্য Arts Facultyর meeting করিয়াছেন। সেনেটের meetingএর ৩।৪ দফা কাজ হইয়াছে, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। আমরা গিয়া দেখি যে, তখন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। তিনি পরিষদের একজন প্রবীণ ও হিতৈষী সদস্য ছিলেন। তিনি সকল বিষয়েই বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়া কাজ করিতেন, কর্ত্তব্য পালনে কাহারও খাতির রাখিতেন না। তিনি সোজা পথ ছাড়া বাঁকা পথে চলিতে জানিতেন না। তিনি একজন প্রকৃত কর্ম্মী ছিলেন। তিনি আমার বন্ধু, আত্মীয় ও প্রতিবেশী ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান অপূরণীয়। দেশের শিক্ষিত জন-সাধারণ, বিশেষতঃ ছাত্রগণ, যাঁহাদের সহিত তিনি মিলিত হইতেন, সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখিত এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি জানাইতেছে।” এই বলিয়া তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

“বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য, কর্ত্তব্যপরায়ণ,সত্যনিষ্ঠ ও সদালাপী রায় অবিনাশচন্দ্র বসু মল্লিক এম এ, পি আর এস বাহাদুরের পরলোকগমনে দেশের শিক্ষাবিভাগের, বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজের যে ক্ষতি

হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে এবং এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই সাধারণ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাভিভূত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত চুণীবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। স্বর্গীয় অবিনাশ বাবুর সহিত ৺রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে তাঁহার পরিচয় হয়। তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। তাহাতে তিনি বলিতে পারেন যে, অবিনাশ বাবুর মত সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি দেশে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শেষে তাঁহার সহিত অল্পবিস্তর বন্ধুতাও হইয়াছিল। অতঃপর এই শোক-প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

৩। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়-লিখিত "কবীন্দ্র রমাপতি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বাল্যে তাঁহাদের দেশে রমাপতির অনেক গান শুনিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　　　শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৩০এ মাঘ ১৩৩৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—'ছাতনায় চণ্ডীদাস' বিষয়ে বক্তৃতা।

বক্তা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ।

সভাপতি মহাশয় অদ্যকার বক্তা রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুরের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে জানাইলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে, বিশেষতঃ গণিত জ্যোতিষে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় তাঁহার কৃতিত্ব সুপরিচিত। প্রত্ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা এই বোধ হয় প্রথম। আমরা জানিতাম—চণ্ডীদাস নান্নুরের, তিনি বলেন ছাতনার। তিনি এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয়।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর তাঁহার "ছাতনায় চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় ফুল্লরা, অট্টহাস, বহুলাক্ষী প্রভৃতি কয়েকটি পীঠভূমি দর্শন করিয়াছেন এবং বিগত সোমবার সমস্ত দিন মহাকবি চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুরে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, শ্রদ্ধাস্পদ প্রবন্ধলেখক মহাশয় যে সমস্ত স্থান ও বিষয় ছাতনায় আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই নান্নুরে বর্ত্তমান। চণ্ডীদাসের ভিটার ভগ্নাবশেষ, তাঁহার আরাধ্যা দেবী বাসুলীর মন্দির (যে দেবীর নাম লইয়া বর্ত্তমান সময়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে), রামী রজকিনীর বস্ত্র বিধৌত করিবার পাটা (যাহা এক্ষণে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে), রামীর বাসভবন প্রভৃতি কবি চণ্ডীদাসের স্মৃতি-বল্লরী-বিজড়িত যাবতীয় স্মৃতি-চিহ্নের অবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া কবির জন্মভূমি নান্নুর এখনও পথিকের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। নান্নুরের নিকটবর্ত্তী কীর্ণাহার গ্রামে চণ্ডীদাসের বিটপীবল্লরী-সমাচ্ছন্ন সমাধিস্তূপ এখনও বিরাজিত। যে কিংবদন্তী, জনপ্রবাদ, লোকমত, বিশ্বাস এবং স্মৃতিচিহ্ন বহুকাল হইতে কবির কবিতা-বিজড়িত হইয়া সুদৃঢ় মূল সহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা এক্ষণে প্রত্নতাত্ত্বিকের আনুমানিক গবেষণায় শিথিলমূল হইবে, ইহা কল্পনারও অতীত। বিশেষতঃ, কবির কবিতার মধ্যে নান্নুর ছাড়া ছাতনার নামগন্ধও নাই। লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধটি যে গভীর গবেষণাপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন যে, তিনি যেন নান্নুরে ও কীর্ণাহারে গিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার দুই স্থানের অবগতির সামঞ্জস্য করিয়া একটি সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই জন্য শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের একবার নান্নুরে নিশ্চয়ই যাওয়া দরকার।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ মহাশয় বলিলেন যে, কোন্ স্থানে কবির জন্ম ; নান্নুরে--না ছাতনায়,তাহা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। যাহাতে প্রকৃত সত্য এই উপায়ে আবিষ্কৃত হয়, তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু করিলে দেশের বিশেষ উপকার হয়।

ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, এল্-এল্ ডি, সি আই ই মহাশয় বলিলেন, ১৩২১ বঙ্গাব্দে পরিষৎ হইতে ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' বাহির করিয়াছেন, ১৩১১ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় 'চণ্ডীদাস-চরিত' বাহির করিয়াছেন, আবার ১৩২৫ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত করালীকিঙ্কর সিংহ মহাশয় চণ্ডীদাসের এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই এত অল্পদিনের মধ্যে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ বাহির হইতেছে, ইহা ঠিক নহে। এই বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরওয়ানা লইয়া একটা অনুসন্ধান করা উচিত। বীরভূম বা বাঁকুড়া—নান্নুর বা ছাতনা—এই প্রশ্ন লইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিতে হইবে।

অনুসন্ধানে যে সব নূতন নূতন উপকরণ পাওয়া যাইবে, তাহা লইয়া বহুল বিচারের আবশ্যক। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সম্প্রতি বাঁকুড়াবাসী হইলেও তিনি আমাদের রত্নপ্রসবিনী আরামবাগ মহকুমার লোক; অতএব তাঁহার বাঁকুড়ার পক্ষপাতিত্ব-দোষ দেওয়া চলিবে না। তিনি প্রকৃত সত্যেরই আবিষ্কারে এত যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। পরিষৎ হইতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হউক যে, তিনি এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করুন এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীর নূতন সংস্করণ সম্পাদন করুন। তিনিই এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ছাতনায় গিয়াছিলেন, সেখানে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বলিয়া তখন কিছু জানেন নাই। বাসুলীর কথাও শুনেন নাই। নান্নুরের ও ছাতনার মূর্ত্তি দুইটিতে ঐক্য নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু পেন্সন লইয়া যে এত পরিশ্রম স্বীকার করিতে পারিয়াছেন, ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রবন্ধ লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে এই বয়সে যে কত স্থানে যাতায়াত করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহা দেখিবার ও দেখাইবার বিষয়। শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকেই 'চণ্ডীদাস' সম্পাদনের ভার দেওয়া হইবে। আমরা আশা করি, তিনি প্রচলিত সকল মত সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাসের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ করিয়া দিন। এই বই-এর চাহিদা বড়ই বেশী। যতই দিন যাইতেছে, ততই এই চণ্ডীদাসের বই সম্পাদনের ব্যাপার কঠিন হইয়া পড়িতেছে। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় পদাবলী-সাহিত্য ভাল বোঝেন, তাঁহার উপর চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদনের ভার দেওয়া উচিত। তিনিও যতদূর সম্ভব, সে বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে নান্নুরে ভ্রমণ করিয়া চণ্ডীদাস সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২২এ ফাল্গুন ১৩৩৩, ৬ই মার্চ্চ ১৯২৭, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর-প্রদত্ত বিশ্বরূপ সেনের তাম্র-শাসন এবং (খ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়-প্রদত্ত পাথরের গোলা ও প্রস্তরমূর্ত্তি, ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, (খ) ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (গ) কালীকুমার বসু এবং (ঘ) হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, মহাশয়-লিখিত "দীন চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ, ৮। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত সদস্যগণের সম্মুখে বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনখানি উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, সুসঙ্গের অধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুর এই তাম্রশাসনখানি আমাদের উপহার প্রদান করিয়াছেন। তিনি এক দিন সংবাদ পান যে, ঢাকার কোনও এক কর্ম্মকারের দোকানে একখানি তাম্রশাসন গালাইয়া বিক্রয় করা হইতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি উক্ত দোকানে গিয়া এই তাম্রশাসনখানি ক্রয় করেন এবং পাঠোদ্ধারের জন্য শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারি-লাল চৌধুরী ডি এস্ সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহার নিকট হইতে উহা আমার হস্তগত হয়। আমি এখানি পাঠ করিয়াছি। ইহার মধ্যে অন্যান্য বিষয়গুলি তেমন প্রয়োজনীয় না হইলেও কতকগুলি গ্রামের নাম বিশেষ প্রয়োজনীয়। এবং সেই গ্রামের চৌহদ্দিগুলি নিতান্ত মূল্যবান্। তাম্রশাসনের এই অংশের কোনই ক্ষতি হয় নাই এবং ইহার যে অংশ কাটিয়া বিক্রয় করা হইয়াছে, সকল তাম্রশাসনেই তাহা প্রায় একরূপ। তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই তাম্রশাসন দানের জন্য সুসঙ্গাধিপতিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের প্রদত্ত ৪টি পাথরের গোলা, ১টি বিষ্ণুমূর্ত্তির ভগ্ন নিম্নাংশ ও একটি মাটির দ্রব্য প্রদর্শিত হইল—সভাপতি মহাশয় প্রদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৫। অতঃপর নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল,—১। প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ২। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। কালীকুমার বসু এবং ৪। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয়ের দ্বারা আমাদের নিকট একটি সুবর্ণ-পদক পাঠাইয়া দিয়াছেন। "হিন্দুরাজত্বে রাঢ়" বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে এই পদক দেওয়া হইবে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার পরীক্ষক থাকিবেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, সি আই ই
,, নিখিলনাথ রায় বি এল
,, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
,, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

পদকের নাম—"হরপ্রসাদ সুবর্ণ-পদক"। এই পদক দানের জন্য শ্রীযুক্ত অবিনাশ বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয় "দীন চণ্ডীদাস" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের পূজনীয় সভাপতি মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রথমে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। তৎপরে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমার মনে হয়, দীন চণ্ডীদাস নামে আরও এক চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন। মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের গান শুনিতেন, তিনি যে সকল গান শুনিতেন, তাহাই পদকল্পতরুতে মহাজন-কর্তৃক সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। "বাসলী কহায়", "বাসলী বরে", "বাসলীগণ" এইরূপ ভণিতা প্রাচীন চণ্ডীদাসের নিদর্শন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু দীন চণ্ডীদাসের যে পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এই পুথি আবিষ্কৃত না হইলেও পদাবলী হইতে দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব নহে। ইনি পদকল্পতরু সংগ্রহের পূর্ব্বের এবং নরোত্তমদাসের পরের লোক। ইঁহার রচনা তত উৎকৃষ্ট নহে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় পরস্পর এ বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন। পরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　　　শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, ৪ পঞ্চাননতলা লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী; প্র—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, সম—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, ৪৫এ গড়পার রোড; প্র—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই, সম—ঐ, সদ—৩। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, কসবা, বীরভূম; প্র—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম—ঐ, সদ—৪। শ্রীযুক্ত সুবোধলাল মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিপুর হাউস', ১১৫ শিবপুর রোড, হাওড়া; প্র—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, সম—ঐ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত ইউ সেন গুপ্ত, ৫।৬ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ; প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—ঐ, সদ—৬। শ্রীযুক্ত সুকুমার-রঞ্জন দাশ এম এ, ৬৮বি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, ৭। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ দত্ত, জগন্নাথ দত্ত লেন, গড়পার, ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন এম এ, বি এস্-সি, রীচি রোড, কালীঘাট; প্র—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম, সম—ঐ, সদ—৯। শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর ঘোষ, ৯ টাউনশেণ্ড রোড, ভবানীপুর; প্র—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম—ঐ, সদ—১০। শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, ৬ সরকারবাড়ী লেন, বাগবাজার; প্র—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, সম—ঐ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ৭ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড; প্র—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, সদ—১২। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, ১৩।২ তারক চাটার্জি লেন, ১৩। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিত্র বি এ, এটর্ণি, ৩২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম ঐ, সদ—১৪। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন, ৩৭সি বেলেঘাটা মেন রোড; প্র—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, সম—ঐ, সদ—১৫। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার গুপ্ত, ৪১ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদ—১৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র, গোপাল চাটার্জি ষ্ট্রীট, কাশীপুর; প্র—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি, সম—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদ—১৭। শ্রীযুক্ত বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ এম এ; প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, সদ—১৮। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল, উকীল, মজঃফরপুর।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, উপহৃত-পুস্তক,—(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৩য় ভাগ (পিরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ); শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ

দত্ত,—(২) জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব, (৩) গীতায় ঈশ্বরবাদ, (৪) উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব), (৫) কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর ; শ্রীযুক্ত সুজননাথ মিত্র মুস্তোফী—(৬) উলা বা বীরনগর, (৭) ঐ ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৮) কুরুপাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে—(৯) শ্রীশ্রীশুকমুখামৃতকথা (৬ষ্ঠ সংখ্যা) ; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়—(১০) খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মবিধিঃ (মূল লাটিন সমেত) ; শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র—(১১) নামকরণ বা বাঙ্গালা নামের তালিকা ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়—(১২) ব্যুৎপত্তিমালা, (১৩) ঐ ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১৪) সাধক কমলাকান্ত, (১৫) স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের জীবনবৃত্তান্ত, (১৬) নরনারায়ণ, (১৭) সাধন-প্রসঙ্গ, (১৮) দাদাভাই নৌরজী, (১৯) মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা, (২০) জীবনালেখ্য ; শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—(২১) মহাভারতরহস্য বা জীবত্বের পথপরিচয়, (২২) শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের ফেলোশিপের লেক্‌চার, (হিন্দুদর্শন) ১ম বর্ষ ; শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়—(২৩) চিন্তামণি ; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—(২৪) ঠাকুর-মার ঝুলি, (২৫) ঠা'নদিদির থলে, (২৬) ঠাকুরদাদার ঝুলি, (২৭) দাদামশা'য়ের থ'লে ; শ্রীযুক্ত দামোদরদাস খান্না—(২৮) শ্রীগোবিন্দনিবন্ধাবলী, শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য—(২৯) দ্রোণাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাশ—(৩০) বিধবা-বিবাহ, (৩১) বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী—(৩২) তুলসীদাসী রামায়ণ, (৩৩) শ্রীমহাভারতের বৃহৎ সূচী, (৩৪) কৃষ্ণাবতার-রহস্য, (৩৫) হিন্দু-কণ্ঠহার, (৩৬) ভূদেব-চরিতম্ ; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন—(৩৭) কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ, (৩৮) পঞ্চগীতা, (৩৯) শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—(৪০) The Social History of Kamarupa, Vol. II ; The Superintendent, Govt. Printing, C. P., Nagpur—(৪১) The Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in the Central Provinces and Berar ; The Surveyor General of India—(৪২) General Report of the Survey of India, 1925-26 ; The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(৪৩) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1925—26, (৪৪) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No 29 (Specimen of Calligraphy in the Delhi Museum of Archaeology) ; শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—(৪৫) Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol. I (Calcutta University) ; শ্রীযুক্ত জে সি ব্যানার্জ্জী—(৪৬) Our Present Vice-Chancellor and the King's English ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি—(৪৬) Little Visits with Great Americans, Vol. I, (৪৮) Do. Vol. II, (৪৯) Friendship, (৫০) The Secret of Salvation, (৫১) The Mighty Atom, (৫২) Blackwood's Magazine, 1923, (৫৩) Do. 1925, (৫৪) Silas the Conjurer—His Travels

and Perils, (৫৫) Queen Victoria, (৫৬) The Straight Religion, (৫৭) How God Answers Prayer, (৫৮) Goldsmith (John Morley), (৫৯) Balzac's Rare Stories No 2, (৬০) Bengal Celebrities, (৬১) The Young Visiters, (৬২) Red Gauntlet, (৬৩) Confluence of Opposites, (৬৪) Dracula's Guest, (৬৫) Aedithai's Lovers, (৬৬) Seven Stories, (৬৭) The Scottish Workings of Craft Masonry, (৬৮) Unconquered, (৬৯) Moon of Isreal, (৭০) The Virgin of the Sun, (৭১) Broken Earthen Ware, (৭২) Idyls of the King, Vol. II, (৭৩) The Common Law, (৭৪) The Personal History of David Copperfield, (৭৫) Tales of the Caliphs, (৭৬) A Primer of Assyriology, (৭৭) Christianity and Christian Science, (৭৮) The Last of the Barons ; The Secretary, Smithsonian Institution—(৭৯) Solar Activity and Long-Period Weather Changes, (৮০) Opinions Rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature, (৮১) The Distribution of Energy over the Sun's Disc ; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(৮২) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, 23rd Session, 1926, Vol. XXIII. (৮৩) Do. 24th Session, 1927, Vol. XXIV.

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

২৭এ ফাল্গুন ১৩৩৩, ১২ই মার্চ্চ ১৯২৭, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬।৹টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"জ্ঞান-উৎপাদ--প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" বিষয়ে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রথমেই রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস বাহাদুর বলিলেন,—আপানারা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন, আমাদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মানপ্রাপ্তিতে শুধু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নহে—সমগ্র বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীজাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, তাঁহাকে এই সম্মান প্রদান-কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সলর্ লর্ড লিটন মহোদয় যে সকল শ্রদ্ধাজ্ঞাপক প্রশংসার কথা বলিয়াছেন,

তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই সংবাদ পত্রে পড়িয়াছেন। তাঁহার এই সম্মানে আমরা সকলেই বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছি। পরিষদের সদস্যগণের এবং বঙ্গবাসী মাত্রেরই পক্ষ হইতে আমি এ জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন করিতেছি।

প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আপনারা আমাকে যে ভাবে সম্মান দেখাইলেন, এ জন্য আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। লর্ড লিটনও আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন, এ জন্য তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের আবেদন অনুসারে কলিকাতা করপোরেশন সাহিত্য-পরিষৎকে ২৫০০০৲ টাকা দানের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। এ জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কলিকাতা করপোরেশনকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই সময় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্ণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার 'জ্ঞান-উৎপাদ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কয়েকজনে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকের সহিত আলোচনা করেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধ শুনিয়া আজ আমরা অনেক নূতন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলাম। তবে এক সঙ্গে অনেক কঠিন বিষয়ের আলোচনা করিয়া লেখক মহাশয় আমাদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। আমার অনুরোধ, এই সকল বিষয়ে তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত কি, তাহা তিনি আমাদিগকে শুনাইবেন। আমি পরিষদের পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশিষ্টভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　　　শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩৩৩, ১৯এ মার্চ্চ ১৯২৭, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"প্রজা-নিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব" বিষয়ে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, সমাজ ও জাতি সম্বন্ধে জ্যোতিষের প্রভাব, এই বিষয়টি অতিশয় শক্ত। আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ গণপতি সরকার এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এ বিষয়ে ডাক্তারী মত যথেষ্ট আছে; বিশেষজ্ঞগণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ইউরোপ ও এদেশে ইহার অনেক চর্চ্চা হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় যখন পরিষদের সম্পাদক ছিলেন, তখন পরিষদে জ্যোতিষ-শাখা স্থাপিত হয়। এই শাখার উদ্দেশ্য—দেশমধ্যে ফলিত জ্যোতিষের প্রচার, আলোচনা ও সাধারণের মধ্যে উহা সহজবোধ্য করা। আমরা পরিষদে ২।৩টি বক্তৃতার দ্বারা এই উদ্দেশ্য প্রচারের চেষ্টা করিয়াছি। অদ্যকার এই বিষয়ের আলোচনা সেই জ্যোতিষ-শাখারই নির্দ্দেশমত। তৎপরে তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিঃশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ধর, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ও প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপ-পীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ২১০০৲ দুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা হয়।—

			সাধারণ পক্ষে	সদস্য পক্ষে
(ক)	বৃন্দাবন-কথা	শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত। মূল্য—	২৷৷০	১৸০
(খ)	মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ	১৲	৸০
(গ)	ঋতু-সংহারম্ (মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ)	" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৲	১৲
(ঘ)	পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ)	" বিধুভূষণ সরকার	৷৶০	৷৶
(ঙ)	উত্তরপাড়া-বিবরণ	" অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৷০	৷০
(চ)	ভারত-ললনা	" রামপ্রাণ গুপ্ত	৵০	৵

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত **মন্দিরা** পরিষৎকে দান করিয়াছেন। মূল্য ৷৷০

পরিষদের সাধারণ-ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাঁহার রচিত **ভাষাতত্ত্ব** (১ম ও ২য় খণ্ড) দান করিয়াছেন। মূল্য ১৲ ,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি-প্রণীত **গৌড়ের ইতিহাস**, ১ম খণ্ড—হিন্দু রাজত্ব—১৲ এবং ২য় খণ্ড—মুসলমান রাজত্ব ১৷৷০।

"অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী" ও "রস-মঞ্জরী"

যাঁহারা বৈষ্ণব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের "গীতগোবিন্দ," "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদাবলী-পূর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিকা, পদ-সূচী, রস-সূচী ও শব্দ-কোষ-সম্বলিত "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" ও রস-শাস্ত্রে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভানুদত্তের রস-মঞ্জরীর বিস্তৃত ভূমিকা, সূচী ও রস-বিশ্লেষণ-সম্বলিত সুমধুর পদ্যানুবাদ পাঠ না করিলে চলিবে না। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'বাঙ্গালা ও সংস্কৃত' শাখার বি, এ, পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা-সূচক অভিমত হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে; এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"—রবীন্দ্রনাথ

"এই সকল অপরিচিত পদ-কর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্ব-রস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"—প্রবাসী

"রস-মঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে। সেই বিবরণী অপূর্ব্ব কবিত্ব-রসে মণ্ডিত। * * * রস-শাস্ত্রবিষয়ক এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।"—ভারতী

"অনুবাদে সতীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বর্দ্ধিতই হইয়াছে। এই রস-মঞ্জরীতে কেবল আদিরসেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়া রুচি-সংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ করি।"—হিতবাদী

নূতন পরিষদ্‌গ্রন্থ

গিজো (GUIZOT) লিখিত

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

রিপন কলেজের ভাইস্‌-প্রিন্সিপাল

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম-এ অনূদিত

মূল্য—সদস্যপক্ষে—১৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১।০, সাধারণপক্ষে—১॥০

ন্যায়দর্শন

বাৎস্যায়ন ভাষ্য—চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

এই খণ্ডে নানা প্রসঙ্গে নানা দার্শনিক তত্ত্বের এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল গ্রন্থাবলম্বনে বিচারপূর্ব্বক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশদ ভাষায় আলোচনা করা হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইহার টিপ্পনীর অনেক অংশ পাঠ করিয়া দার্শনিক বিষয়ে অনেক বিচার ও সিদ্ধান্ত জানিতে পারিবেন। ইহার বিস্তৃত সূচীপত্র পাঠ করিলেও অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। নানাদর্শনপরমাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—"বঙ্গভাষায় এইরূপ পাণ্ডিত্য ও বিচারপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ আর হয় নাই, সংস্কৃতেও অধুনা হয় নাই।"

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১॥০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৸০, সাধারণের পক্ষে ২৲ টাকা।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত

তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত

এবং

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

মূল্য—সদস্য-পক্ষে ।৶০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ॥০, সাধারণের পক্ষে ॥৶০।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পরিষদ্‌ মন্দিরে পাওয়া যায়—

নবপ্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত

গ্রন্থকর্ত্তা কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যদেবের জীবিতকালে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কৃষ্ণমঙ্গল অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে এই গ্রন্থ অমূল্য—ইহাতে প্রাচীন রাঢ়ের ভাষার যথেষ্ট নমুনা রক্ষিত হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৷৹ ও সাধারণের পক্ষে ১৷৷৹।

পরিষদের চিত্রশালার প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতির ইংরাজী সচিত্র বিবরণী

HANDBOOK TO THE SCULPTURES IN THE MUSEUM OF THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

(WITH TWENTY SEVEN PLATES)

BY

MANOMOHAN GANGULI, B.E., M.R.A.S., &C,

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৩৲; শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৩৷৹; সাধারণের পক্ষে ৬৲।

রসকদম্ব

কবিবল্লভ-বিরচিত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ সম্পাদিত। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ রসের অবতারণা করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম-তত্ত্ব সুললিত কবিতায় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেরও পূর্ব্বে লিখিত এবং অপূর্ব্ব-প্রকাশিত। সম্পাদক মহাশয়দ্বয় গ্রন্থে বৃহৎ ভূমিকা, গ্রন্থের ভাষা-টীকা এবং শব্দসূচী সংযোজনা করিয়া প্রাচীন সাহিত্যালোচনাকারিগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মূল্য পরিষদের সদস্য পক্ষে ১৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৶৹ এবং সাধারণ-পক্ষে ১৷৹।

কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং
শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল,

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়-লিখিত মুখবন্ধ সমেত।

এই অপূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বহু জ্ঞাতব্য কথা সুললিত পদ্যে লিখিত হইয়াছে। মূল্য—সদস্য-পক্ষে ৸৹; শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৸৶৹; সাধারণের পক্ষে ১৲।

মাথুর কথা

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-প্রণীত

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা সমেত

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মথুরার ধারাবাহিক সচিত্র ইতিহাস।

মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে ২৷৹।

পদক ও পুরস্কার

বর্ত্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে

পদক

	পদক	প্রবন্ধ
১।	হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক	নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র।
২।	হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক	হিন্দু-রাজত্বে রাঢ়।
৩।	তরলাসুন্দরী সুবর্ণপদক	বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কাজ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস।
৪।	রামগোপাল রৌপ্য-পদক	'এষা' কাব্য সমালোচনা।
৫।	অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)	কনকাঞ্জলির বিশেষত্ব।
৬।	অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (খ)	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র
৭।	জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক	মাইকেলের ছন্দ।
৮।	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক	মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা।

পুরস্কার

	পুরস্কার	প্রবন্ধ
১।	আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)	শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।
২।	গগনচন্দ্র পুরস্কার (৫০৲)	স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। কেবল ৬ষ্ঠ বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য প্রবন্ধ সাধারণে লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি ৩০এ মাঘ, (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮) তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ ১লা আশ্বিন
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-সম্পাদিত ও পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে, [illegible] ই চণ্ডীদাসের পদাবলীর এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে। অধ্যাপক রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয়গণ এই গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন। এই গ্রন্থ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মুদ্রিত হইবে। যাঁহারা এই গ্রন্থ লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নামে ১৲ এক টাকা পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন।

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

দীন চণ্ডীদাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

[বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকার দুই সংখ্যায় দীন চণ্ডীদাসের যে সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বরের পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। সেই পুথিখানা খণ্ডিত, এবং স্থানে স্থানে অতিশয় অস্পষ্ট। তাহার প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠার পাঠ এই পত্রিকার ১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২২ পৃষ্ঠা হইতে ২২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ২২৩ ও ২২৪ পৃষ্ঠার অনেক স্থানে কোন পাঠই উদ্ধৃত করিতে পারা যায় নাই। তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ নম্বরের পুথিতেও এই পালাটীই পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে উক্ত অস্পষ্ট স্থানগুলির যে পাঠ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত হইবে। ২৩৮৯ নম্বরের পুথির প্রথম পদটী ৪৮০ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; ইহার প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠায় ৪৮০ হইতে ৪৯৭ সংখ্যানির্দ্দিষ্ট ১৮টী পূর্ণ পদ এবং পরবর্ত্তী পদটীর মাত্র পাঁচ পঙ্‌ক্তি পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ২৯৪ নম্বরের পুথিতে এই পদগুলি ১, ২ ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে উক্ত ১৮টী পদের পরেও প্রায় ৫০টী নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাও ধারাবাহিকরূপে এই স্থানে প্রকাশিত হইল।]

[২৩৮৯ নম্বরের পুথির ৪৯৮ সংখ্যক পদ (১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং ২৯৪ নম্বরের পুথির ১৯ সংখ্যক পদ।]

পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী
আর না জানয়ে কেহ।
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন এ নহু নহু॥
পীরিতি শত গুণ শত শত করি
তার লাখ গুণ যেই।
তার এক কণা গোপীগণ পায়ে
আর না জানয়ে কোই॥
তার লাখ গুণ শত শত হয়ে
তবে সে যে জন রয়।

মণিফণিগণ যত ভক্তগণ
কণিকা পীরিতি হয়॥
পূর্ণ ষোল কলা জানয়ে মরম
সেই সে কিশোরী রাই।
এক শত গুণ তাহার মরম
আমি সে জানিয়ে নাই॥
তার এক কণা শত শত ভাগ
এ নন্দ যশোদা জানে।
কোটিকে গোটিক তার এক বিন্দু
আছয়ে কাহার স্থানে॥

চণ্ডীদাস বলে এ কথা শুনিতে
দেবের হইল সুখী।
দেবের বচন করিল রচন
ব্যাসমুনি ইহা লেখি ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দ বচন শুনি কহে কিছু শূলপাণি
কহে কিছু দেব ভগবান।
তোমার অপার লীলা যার গুণে পশু শিলা
তরু পুলকিত ইহা জান ॥
তোমার পীরিতি বহুমূল।
এমন পীরিতি খনি কখন নাহিক শুনি
এবে সে জানিল এতদূর ॥
এমন সম্পদ সুখ বিহি ভেল বৈমুখ
মনে ছিল রাখিব গোপনে।
তাহার কারণে মোরা করিল অনেক ধারা
এমন বলিয়া কেবা জানে ॥
আপনে গোলোক হরি তাহা প্রীত পান করি
মো সভা হইনু বঞ্চিত।
প্রভু কহে বেরি বেরি শুন ত্রিলোচনধারী
সব দেবে হইবে বঞ্চিত ॥
চল সভে মর্ত্ত্যভূমি জনম লভিব আমি
বসুদেব দৈবকী উদরে।
লয়া নন্দ যশোমতি গোকুলে রাখব তথি
ব্রজলীলা রচিব সুন্দরে ॥
আন আন অবতারে নানামৃত লীলা ধরে
ব্রজের মহিমা কিছু শুন।
লইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঙ্গে
রাই দরশন আশ হেন ॥
অন্য অবতার কালে অসুর বধিল হেলে
রসতত্ত্ব না জানিলুঁ কিছু।

অষ্ট রস অষ্ট গুণে ইহা লাগি আস্বাদনে
আর যত উপরস পিছু ॥
প্রধান এই অষ্ট রস ইহাতে জগত বশ
প্রেম প্রীত ইহার মাধুরি।
এই রস তত্ত্বখানি জানে সেই বিনোদিনী
চণ্ডীদাস না জানে মাধুরি ॥ ২০ ॥

ছের ছটাক বহির্নিকট
রস রস বেদবান।
চন্দ চন্দক ভানু পুষ্কর
দ্বিতিক প্রধান আন ॥
বিপুলক বিত্তিক প্রেম বহির্নিক
উদণ্ড চারি ছয় লোভা।
কায় কামার্ত্তক রোহিণী নির্ল্লট
জটপট় সাত্তিক শোভা ॥
মদয়ত প্রাণ তপতিরোহিতা গুণ
নয় নয় ছয় করি জান।
বসুমতি বসধাই এ সব জানত
নব নব করি ইহা মান ॥
আট রস চৌসট তরতম নির্ল্লট
আট আট বসু বেদে।
গুণ গুণ প্রেখিলা গুণ গুণ কর
সাত সাত সট খেদে ॥
বেদ বেদ তযু গুণ তহি আগর
যো ইহা জন সুজান।
রসে রসে মেলত লোয় গুসর
চণ্ডীদাস গণত সুঠান ॥ ২১ ॥

এক সায়র তাহার উপর
অমিয়া সিন্ধুঘটা।

সিন্ধু পাশে পাশে　　তাহার নিকটে
আয়ল রসের ছটা ॥
প্রেমের কাছেতে　　মোহের বসতি
মোহের সমুখে লেহা।
লেহার উপরে　　এক মেওয়া আছে
তাতে এক আছে গেহা ॥
সেই সে গেহার　　এ নয় দুয়ার
তাতে হংস আছে জোড়ে !
সেই মেওয়া ফল　　সায়রে গলিয়া
কণিক কণিক পড়ে ॥
তার কণা আশে　　ডুবি সেই হংসে
চুনি চুনি খায় কণা।
সেই সে কণার　　শত গুণ লাগি
বিরিঞ্চি বাসনাপণা ॥
তিন গুণে সেই　　মেওয়ার বসতি
যে গুণ যে জন ভজে।
সেই গুণে থাকে　　মেওয়ার উপরে
যে রসে যে জন মজে ॥
রস তত্ত্বখানি　　তত্ত্বের লাগিয়া
ভজিতে রাধার লেহা।
গোকুলে জনম　　তথির কারণ
ধরিয়া কালিয়া দেহা ॥
চণ্ডীদাস কহে　　এ রস মাধুরি
ছানিলে রসের সিন্ধু।
শুনি দেব যত　　দাণ্ডাইয়া শত
মোরা না পাইয়ে বিন্দু ॥ ২২॥

বন্ধু কাহে না পায়ল বিন্দু।
রসের সমুদ্র কাছে　　মো সভার বসতি আছে
তুমি তাহে অনাথের বন্ধু ॥
তুমি কৃপালু হয়া　　দীনেহ না দিলে দয়া
কি আর কহিব রাঙ্গাপায়।
এমন পীরিতি রস　　মো সভা করিতে বশ
কবে হেন রসেতে না হয় ॥
পীরিতি সায়রে খুঁজি　　পাইলুঁ সেহেন নিধি
তাহা প্রভু নিজে কর পান।
সেই রসতত্ত্ব লাগি　　ভাবে ভক্তগণ যোগী
কারে হেন প্রীত কর দান ॥
তুমি প্রভু দয়াময়　　কহিতে লাগয়ে ভয়
যদি পাই আজ্ঞা এক বাণী।
যবে প্রভু জন্ম নিবে　　গোকুলে নন্দের ঘরে
গুল্ম লতা হইব সে আমি ॥
ব্রজে যাব গোচারণে　　লয়া বংশী শিশুগণে
নয়ন ভরিয়া যেন দেখি।
আর এক শুন প্রভু　　দয়া না ছাড়িহ কভু
মরমে মরমে যেন রাখি ॥
সে নব কিশোরী সনে　　রাস-রস জাগরণে
শুনি যেন নপুরের তালি।
যবে ফিরি বনে বনে　　চাহিব চরণ পানে
লাগে যেন চরণের ধূলি ॥
তথির কারণে দেবা　　পাইব চরণ সেবা
তেই মোরা লতা হৈতে আশে।
আমার বাসনা এই　　নিশ্চয় কহিয় সেই
চরণে কহিছে চণ্ডীদাসে ॥ ২৩ ॥

কহে নর্ম্মসখি　　শুন চন্দ্রমুখি
পুরূব বৃত্তান্ত কথা।
হেনক পীরিতি　　তাহা পাবে কতি
পীরিতি থাকয়ে তথা ॥
এই রূপে ভেল　　পিরিতি জনম
আখর উঠল তিন।

তোহে তাহে আছে পীরিতি ধরম
ইথে নাহি কিছু ভিন ॥
ঐছন পীরিতি তাহার ঘোষণা
রোষ না করহ রাধে।
অনেক যতনে পীরিতি রতন
পায়াছ অনেক সাধে ॥
এত দুঃখে দেবে মথন করিয়া
পায়ল পীরিতি লেহা।
হেনক পীরিতি বিহনে যে জন
কি ছার তাহার দেহা ॥
পীরিতি কি রীতি রসের আরতি
না জানে দোসর জনে।
তোহে তাহে আধ আধ প্রীত ছিল
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২৪ ॥

রাই কহে শুন মরম সজনি
পীরিতে যাহার চিত।
তবে এত দুঃখ নহে কোন সুখ
কেমন ধরল রীত ॥
পীরিতি কে জানে এমন ধরণ
প্রথমে আছিল ভাল।
শেষে হেন করে নাহিক সংসারে
ভাবিতে পরাণ গেল ॥
কি দোষ দেখিয়া সেই হেন প্রিয়া
মধুপুর দূর দেশ।
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয় না গণল
হইল পরাণ শেষ ॥
আর কি এমন হইব মিলন
সে হেন পিয়ার সনে।
তাহার কারণ পীরিতি আক্ষেপ
করিল আপন মনে ॥

তারে মিছা রোষ কারু নহে দোষ
আপন করমহীন
যবে শুভ দশা মিলয়ে সভার
পাইবে তাহার চিহ্ন ॥
দেবে কহে হে দে দেয়াসী কহল
গণিল অনেক সাধে।
তুরিতে আয়ব সে নব নাগর
শুনহ সুন্দরী রাধে ॥
এ কথা শুনিয়া হরষ হইয়া
কহেন একটী বাণী।
কবে গিয়াছিলে দেয়াসীর ঘর
আমিত নাহিক জানি ॥
নন্দ রাজপুরে আছেন দেয়াসী
জানহ তাহার নাম।
বুঝহ কি রীতি ইহার যুগতি
তুরিতে আয়ব ঠাম ॥
রাধার বচনে এক নব রামা
তুরিতে চলিয়া গেল।
সব বিবরণ কানুর কারণ
কহিতে মোহিত ভেল ॥
শুনগো দেয়াসী কানুর প্রেয়সী
আয়লুঁ তোমার কাছে।
বুঝহ কারণ কেমন ধরণ
যেবা তোর মনে আছে ॥
দেবী আরাধিয়া হেদে দেয়াসিনি
শিরেতে চড়াহ ফুল
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
বিহি হব অনুকূল ॥ ২৫ ॥

সুহই

দেবী আরাধন　　করল যতন
　　চড়ায়ে মাথায়ে ফুল।
কহ কহ দেবি　　নিশ্চয় বচন
　　যদি হবে অনুকূল॥
মথুরা নগরী　　দূর পরবাস
　　গেছেন নাগর হরি।
যদি বা তুরিত　　গমন করব
　　সে নব চতুর ধারী॥
সমুখ সমহ　　যদি ফুল দেহ
　　তবে সে জানব ভালি।
তবে সে জানব　　গোকুল নগরে
　　আয়ব সে বনমালী॥
এ সব রচন　　করত যতন
　　চড়ায়ে মাথায়ে ফুল।
তুরিত করিয়া　　হরি গৃহে আন
　　তুমি হও অনুকূল॥
দাণ্ডায়ে সমুখে　　সেই সে দেয়াসী
　　কর যোড়ে আছে কাছে।
তুমি দিলে বর　　বালিকা উপর
　　স্বস্বামী নিয়া কাছে॥
কোন অপরাধে　　সে হেন নাগর
　　তেজল রাধার সঙ্গ।
সুখের ঘরেতে　　দুঃখ অতি ভেল
　　তিলেকে হইল ভঙ্গ॥
যদি বা যায়ব　　গোকুল নগর
　　দেহ না মাথার ফুলে।
তবে সে জানব　　তোমার মহিমা
　　পূজন করিব ভালে॥
চণ্ডীদাস বলে　　শুন গো সজনি
　　দেবীর নাহিক দয়া।
ফুল নাহি নড়ে　　ভূমে নাহি পড়ে
　　বুঝিয়া বুঝল ইহা॥ ২৬॥

বল দেয়াসিনী　　শুনহ ভবানি
　　পড়ুক মাথার ফুল।
এই নিবেদন　　তোমার চরণে
　　রাইয়ে হয় অনুকূল॥
তুমি সে জানহ　　তোমার গোচর
　　তুমি যদি কর দয়া।
তুরিত করিয়া　　দেহ এক ফুল
　　না কর তিলেক মায়া॥
যদি বা কানাই　　তুরিতে আয়ব
　　তেজিয়া মথুরাপুর।
এ চূড়া ভাঙ্গিয়া　　পড়ুক আসিয়া
　　দেহ না মাথার ফুল॥
এ বোল বলিতে　　দিয়াসী দাণ্ডায়ে
　　যুড়িয়া এ দুই কর।
যদি বা তুরিতে　　মথুরা তেজিয়া
　　কানাই আসিব ঘর॥
এ বোল বলিতে　　গৌরী দিল ফুল
　　ভাঙ্গিয়া মাথার চূড়া।
সেই নব রামা　　চলিলা তুরিতে
　　অতি সে হইয়া চেরা॥ ২৭॥

সেই নব রামা　　তুরিত গমন
　　চলিলা রাধার পাশে।
কহিতে লাগল　　সব বিবরণ
　　রায়ের ও মন তুষে॥
দেবি দিল ফুল　　ভেল অনুকূল
　　পিয়া সে আয়ব ঘর।

এ কথা অন্যথা নহিব কখন
পাইল মনের সর ॥
পুন এক বলি শুন গো সুন্দরি
গণক ডাকিয়া আনি।
তাহারে গণাব আপনার নামে
কি হেতু ইহার শুনি ॥
আনহ যতনে গণক ডাকিয়া
গণুক ভালই মতে।
কোন্ দোষ আছে তার মোর রাশ্যে
বুঝিব আপন চিতে ॥
ডাকিয়া আনিল গণক আইল
সুধাই রাধার রাশি।
পাঁজি পুথি লয়া সুযগ গণক
হরিষে গণিতে বসি ॥
রাধা নামে রাশি তোলাইয়ে আসি
কোন কোন দোষ আছে।
এবার রাশ্যেতে গণিতে গণিতে
চণ্ডীদাস আছে কাছে ॥ ২৮ ॥

ধানসি

একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছে
তৃতীয়ায়ে আছে শনি।
বুধ বলবান দশায়ে আছয়ে
বৎসর ভালই গণি ॥
কেতু রাহু আছে অতি শুভ গ্রহ
মঙ্গল গোচর জানি।
শুনিয়া আনন্দ ঘুচে মন ধন্দ
ভালে সে ভাবিয়া গণি ॥
এ সব গণন গণিয়া গণক
পাইল সুফল দশা।
এ সব বচন শুনিতে রাধার
হইল আনন্দ আশা ॥
গণক তুষিয়া হরষ হইয়া
বৈঠল কিশোরী গোরী।
করের রতন অঙ্গুরি গণকে
তুরিতে দিলেন পেলি ॥
চলিলা গণক আপন মন্দিরে
হরষ বদন হয়া।
দেয়াসীর বোলে গণকের বাণী
এ দুই সমান পায়া ॥
পুনরপি ধনী কহে এক বাণী
শুনহ সজনি সই।
আর এক আছে আগ উঠাইতে
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥ ২৯ ॥

কহিয়ে সজনি শুন এক বাণী
আনহ ধবল ধান।
আগ উঠাইব বিচার করিব
ইহাতে নাহিক আন ॥
শুক্ল ধান আনি ভূমেতে থুয়ল
সে নব কিশোরী রাই।
যদি গৃহে মোর কানাই আসিব
তুরিতে কহিবি তাই ॥
এ বোল বলিয়া আগ উঠায়ল
বিজোড় নাহিক হয়।
জোড়ে জোড়ে ধান উঠল সমান
বুঝিল মঙ্গল হয় ॥
চণ্ডীদাস বলে তুরিতে মিলব
কিশোর নাগর কান।

শুতলি মন্দিরে সখিগণ রঙ্গে
সরল হইল মান ॥ ৩০ ॥

চণ্ডীদাস বলে ধৈরজ ধরহ
ক্ষেণে চিত কর থির ॥ ৩১ ॥

রাগশ্রী

সেই যে মন্দিরে শুতলি কিশোরী
কিছু হয়ে একমনে।
পুরব পীরিতি যখন করিল
কালিয়া কানুর সনে ॥
বন্ধুর চূড়ার মাণিক পুতলি
পুরুবে পড়িয়াছিল।
সেই সে পুতলি যতন করিয়া
সমুখে রাখিয়া নিল ॥
সেই সে মাণিক পুতলি দেখিয়া
সে নব সুন্দরী রাই।
নিজ কোরে করি মান উপজল
কুরঙ্গ নয়নে চাই ॥
আপন নীলের বসন দেখিয়া
কানু পড়ি গেল মনে।
বিষম বিরহ উপজল অতি
কিছুই নাহিক মনে ॥
ধরণী উপরে পড়ল সুন্দরী
চিত্রের পুতলি হেন।
ধুলায়ে ধুসরি নবীন কিশোরী
সোনার প্রতিমা যেন ॥
লোরে ঢল ঢল বহিয়া চলিল
সঙরি পিয়ার গুণে।
পুরুব পীরিতি সুখের আরতি
সে সব পড়িল মনে ॥
নয়নের জল বহে অনিবার
তিঁতল অঙ্গের চীর।

বরাড়ি

ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণেকে বেদন
ক্ষেণেক নিশ্বাস নাসা।
ক্ষেণেকে চেতন ক্ষেণেকে অস্থির
ক্ষেণেকে কহেন ভাষা ॥
মনের হুতাশে নিশ্বাস সহিতে
নাসার বেসর খসে।
চান্দ মুখখানি মলিন হইছে
যেনক নাহিক রসে ॥
কোটি চান্দ নিছি কি তার গণনা
যাহার বদন শোভা।
চান্দের ভরমে চকোর লালসে
পাইতে সুধার লোভা ॥
সো বর বিধুর এমতি দেখিয়ে
যেমন আন্ধার লাগে।
উঠ উঠ বলি বলে কোন নারী
দেখিতে ভয় সে লাগে ॥
নিকট ভেঠব সো বর নাগর
ধৈরজ ধরহ রাধা।
সো বর কিশোরী খিন তনু ভেল
সকল করল বাধা ॥
চণ্ডীদাস বলে নিকটে মিলব
সে বর রসিক কান।
হের কমলিনী যে শুভ দেখিল
মনে না ভাবিহ আন ॥ ৩২ ॥

কেদার

রাধা তুমি জানহ কি রীতি।
বিরহ বেদনা মনে · জানিবা তেজহ প্রাণে
বুঝিলাঙ হেন তার গতি ॥
অনেক তপের ফলে বিধি দিয়াছিল ভালে
পুন তাহা করিল নৈরাশ।
করম লিখন যে খণ্ডাইতে পারে কে
ঘুচিল সকল সুখ আশ ॥
স্ত্রী-বধ-পাতক-ভয়ে তার কিছু মনে নয়ে
পাসরিল এ সকল লেহা।
অবলা বধিতে হেন না দেখিয়ে কোন জন
জনম দুখিতে গেল দেহা ॥
পরিণামে এই ভৈল পরাণ সংশয় ভেল
কুলশীল গেল এত দূর।
হরি হরি করি প্রাণ বারে করে আনচান
তারে কহে দয়ার ঠাকুর ॥
বাঢ়াইয়া অতি প্রীতি এবে করে অনুচিতি
পরিণামে পরাভব সারা।
সেখানে পরের বশে কুবুজায়ে রতি রসে
ঐছন তাহার ভেল ধারা ॥
মরম সখীর বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণি
কহে পুন তাহার উত্তর।
সে যদি নিঠুর ভেল তাহার উত্তর বল
ইহার ঘুচাব আর ঘর ॥
যাহার লাগিয়া সুখ সেই ভেল বিমুখ
ঐ তনু তেজিব গিয়া জলে।
চণ্ডীদাস কহে সারা বুঝিল তাহার ধারা
পরতিত কর মোর বোলে ॥ ৩৩ ॥

কানড়া

সো বর নাগর কান।
নিশির শয়নে দেখিল স্বপনে
সুবল আয়ল ঠাম ॥
শুনহ সুবল কি আজু দেখল
সো বর রঙ্গিণী রাই।
গোকু[ল] হইতে আইলা তুরিতে
স্বপনে দেখিল যেই ॥
পুরুব পীরিতি সুখের আরতি
অতি সে কৌতুক-রসে।
রাই করে ধরি বসাই সে বেরি
করই অনেক বেশে ॥
রাইয়ের কুন্তল বনাই সুন্দর
মাথাই কুঙ্কুম গন্ধে।
নানা ফুলদাম অতি অনুপাম
দুসারি বকুল ছান্দে ॥
মুকুতা গাঁথিয়া দুপাশে খেচনি
দিয়া মাণিকের চুনি।
কুন্তল বেনান অতি সুশোভন
যেমন দেখল ফণী ॥
শিথায়ে সিন্দুর অতি বিলক্ষণ
চৌদিগে চন্দনবিন্দু।
তা দেখিয়া ব্যাসে লজ্জিত হইলা
লাখে শশধর বিন্দু ॥
গলে গজমতি কিবা সে সুভাঁতি
কাঁচলি উপরে পড়ে।
সোনার কাঁচলি দুধারে মুকুতা
গাঁথি পরায়ল তারে ॥
দেখ অদভুত যেমন দামিনী
চটকে অগোরের ঘটা।

নিতম্বে সোনার ঘুঘুর দিয়াছে
কি কহিব তার ছটা ॥
নীল বাস অতি উঢ়নি সুন্দর
ধরিয়া আপন করে।
রতন নূপুর দেয়লি সুন্দর
চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥ ৩৪ ॥

হেন বেলা নিদ ভাঙ্গিল তুরিত
শুনহ সুবল সখা।
নিশির স্বপন না হয়ে কখন
পুন সে নাহিক দেখা ॥
দেখিতে দেখিতে কতি গেল দুখ
ভৈগেল প্রেমের লেঠা।
এই সে দেখল নিশি অবশেষে
পশিল দারুণ জাঠা ॥
কে বলে পীরিতি অতি সুখময়
তিলেক নাহিক সুখ।
ভাবিতে গুণিতে পীরিতি মুরুতি
পরিণামে এত দুখ ॥
এ বোল বলিতে সুবল সঙ্গেতে
কহিতে কাহিনী যত।
সুবল না দেখি নিশির স্বপন
সেই ভেল অনুচিত ॥
ঐছন স্বপন দেখল ভৈগেল
ভাঙ্গল দারুণ ঘুমে।
উড়িয়া বৈঠল সকল নৈরাশ
কিবা সে দেখিয়ে ভ্রমে ॥
কোথা না দেখল সোনার নাগরী
কোথাহ সুবল মোর।
নিশির স্বপন মিছাই মগন
চণ্ডীদাস শুনি ভোর ॥ ৩৫ ॥

ভৈরবী

নিশির স্বপন দেখল সঘন
বিস্মিত হইল বড়ি।
দিয়া দরশন পুন সে গমন
এ কথা বিষম বড়ি ॥
রাধার দরশ করল পরশ
অতি মগন চিত।
যেমত জলের বিম্বুক মিলায়ে
তাহার তৈছন রীত ॥
উঠি সুনাগর গুণের সাগর
চিন্তিত হইয়া রয়।
কিবা দেখি আজি নিশির স্বপন
কহিলে কি জানি হয় ॥
স্বপন গমন সত্য নহে কভু
ইহাই দেখল মনে।
নিশি অবশেষে কথার আলাপ
সুবল সাঙ্গাত সনে ॥
ঐছন কিশোরী দেখল তখন
পুন দরশন নাই।
বিস্মিত হইলা শ্যাম নটরাজ
কহব কাহার ঠাই ॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর
বেদের বিহিত কয়।
নিশ্চয় স্বপন রাই ভাগ্য কভু
শয়ে এক সাঁচা হয় ॥ ৩৬ ॥

তথা

স্বপন দেখিয়া রাধার বরণ
ভাবয়ে রসিক রায়।
অতি সন্থথিত হইলা বেকত
কিছুই নাহিক ভায় ॥
সে বর নাগর গুণের সাগর
ভাবিতে রাধার রূপ।
বিরহ উঠল তৈখন হইল
বিষম লেঠার কূপ ॥
পুরূব পীরিতি মনে পড়ি গেল
সম্বিত না লয় চিতে।
মধুর মুরুলি বদনে লইয়া
আকুল করল গীতে ॥
রাধা রাধা রাধা তুমি অনুরাধা
দিয়া সে দরশ আশা।
পুন গেলা কতি রাই রসবতি
পাইলা এ ফল ভাসা ॥
খেনে খেনে খেনে মুরুলির গানে
সঙ্কেত বলিয়া বাজে।
মথুরা নাগরী শুনিয়া মুরুলি
তাহারা দেখিতে সাজে ॥
তা দেখি অধিক মনে পড়ি গেল
পুরূব রসের কেলি।
অধিক বিরহ তাহে উপজল
হৃদয় ভিতরে জারি ॥
তাথে এক নব রামার সুঠান
তার নাম কহে রাধা।
সে কথা যখন শুনল শ্রবণে
তাথে ভেল অনুরাধা ॥
বৃষভানুসুতা সে বা রহে কোথা
ঐছন উঠল চিতে।
তার না[ম] রাধা গোকুল নগরে
সে মোর পরাণ রিতে ॥
সেই সে বিরহ উঠয়ে দ্বিগুণ
চিত স্থির নাহি মানে।
মুদিয়া নয়ন কাঁপয়ে বয়ান
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৩৭ ॥

কর্ণাট

শুন শুন প্রাণের উদ্ধব।
হেন চিত আছে মোরা বুঝিয়ে এমতি ধারা
গোকুলেতে করহ উদ্ভব ॥
লইয়া সন্দেশ হার ঝট কর আগুসার
তবে চিত স্থির করি মানে।
কহিব যতন করি তুরিতে আওঅব হরি
পাছে ধনী তেজয়ে পরাণে ॥
সে নব কিশোরী গোরী চিতে পাসরিতে নারি
গোপতে গুমরি এই চিতে।
অবলম্ব করি তাই বাঁশীতে সুচারু গাই
রাধা নাম বলিএ বেকতে ॥
সে মোর তনুর সম তা বিনু দেখয়ে ভ্রম
সে মোর ভজন তনুধারী।
বিষম কংসের মতি রাখিতে জগতে খ্যাতি
তারে বধিবারে মধুপুরী ॥
ভাবিতে রাধার গুণ পাঁজরে বিন্ধিল ঘুণ
হিয়া বিন্ধে সোহেন নাগরী।
আমার বিরহ পায়া না জানে কি আছে জিয়া
সেই মোর নবীন নাগরী ॥
লইয়া সন্দেশ মালা দেহ লয়া শুভ বেলা
কহিবে বচন দুই চারি।
তুরিতে যাইয়া দেখ কি কাজ বিলম্বে থাক
যাহ ঝট গোকুল নগরী ॥

শ্যামের বচন শুনি উদ্ধব মনেতে গণি
শুন প্রভু মোরে কর দয়া।
দেহত সন্দেশ মাল লইয়া উদ্ধব ভাল
চলি পথে গোবিন্দ ধেয়াইয়া॥
চণ্ডীদাস অতি সুখী মনেতে আনন্দ দেখি
রাধার করিতে উদ্দেশ।
ধাইয়া চলল পথে রাধারে বারতা দিতে
গাইতে রাধার গুণ যশ॥৩৮॥

হেনই সময়ে কাক কহিতে লাগল ডাক
বসিয়া মন্দিরশির রহে।
হেন বোল আর কাক কাহে কহে লাক ডাক
আহার বাটিয়া খায় দুহে॥
কহে কত নানা বোল করে বহু উত্তরোল
বদনে বদনে করে ডাক।
দেখিয়া কিশোরী গোরী সখীরে পুছয়ে বেরি
শুভাশুভ দেখি এই বেলা॥
আচম্বিতে আসি কাক কহয়ে বহুত ডাক
কি হেতু ইহার দেখি জান।
বুঝিহ ইহার গতি শুনহ যুবতী সতী
কি শবদ দেখি ইহা শুন॥
তাহা দেখি এক সখী হেদে কাক কহ দেখি
যদি গৃহে আয়ব কানাই।
উড়িয়া বৈঠহ ঠায় আসিব গতিক প্রায়
উড় দেখি বৈস এক ঠাই॥
উড়িয়া বৈঠল কাক করয়ে বদন ডাক
যার গৃহে বসিলা তুরিতে।
চণ্ডীদাস কহে রাই নিশ্চয় কহিয়ে এই
বুঝিপাও শুভাশুভ চিত্তে॥ ৩৯॥

ধানশ্রী

শুনি কাকবাণী কহে বিনোদিনী
হরি কি আয়ব ঘরে।
এ ঘর হইতে ও ঘর বৈঠল
বুঝিনু কাজের ছলে॥
মাথুর তেজিয়া সেই বিনোদিয়া
আসিব বলিতে উড়ে।
কাক কলরব আহার বাটিল
ওষ্ঠে হৈতে খসি পড়ে॥
শুভাশুভ দেখি শুনহ যুবতী
মাধব আয়ব গেহা।
পুন শুভদিন দেখি তার চিন
আজু সে বুঝল লেহা॥
দেখিয়া আনন্দ হইল রাধার
কানাঞি আসিব ঘর।
তুরিতে আ[য়]ব রসিক নাগর
মনেতে জানিল রস॥
এ সব বচন করিল রচন
দুই চারি সখী মেলি।
চণ্ডীদাস বলে নিকটে মিলব
মনেতে জানিল ভালি॥ ৪০॥

নটনারায়ণ

শুন গো মরমসখি তোরা।
নিশি অবশেষ কালে ঘুমে অচেতন ভালে
স্বপনে দেখিল চিতচোরা॥
একে নবঘনশ্যাম পীত বাস অনুপাম
বান্ধে চূড়া নানা ফুল দিয়া।
হাসিয়া নাগর রায় আসিয়া বৈঠল ঠায়
দুটি করে কর আরোপিয়া॥

একে নাম বিরহিণী কহিল কঠিন বাণী
কেঁপে ছিল কর ছাড়াইয়া।
পুনরপি করে ধরি সেই না রসিক হরি
বসাইলা যতন করিয়া॥
শুতল চতুর হরি মোহে নিজ কোরে করি
আলিঙ্গন বেরি আচম্বিতে।
দারুণ কোকিল নাদ মনে না পুরল সাধ
বুঝিলাঙ হইল প্রভাতে॥
যেমন সতিনী প্রায় সঘনে ডাকয়ে রায়
মনে না পুরল কোন আশা।
ননদিনী পাপমতি জানয়ে দেখিয়ে কতি
হেন বুঝি নিশি ভেল উষা॥
তুরিতে রসিকরাজ রাখিয়া নপুর সাজ
বড় দুখ রহল মরমে।
এহেন সময় কালে ভাঙ্গি সুখ অবহেলে
মিলি আখি দূর গেল ঘুমে॥
নিশির স্বপন এই দেখিল মরম সই
পিয়া সনে না পারি বঞ্চিতে।
চণ্ডীদাস বলে বাণী মিলিব নাগরমণি
হেন বুঝি আসিব তুরিতে॥ ৪১॥

আজু বড় মোর শুভদিন ভেল
কানুরে দেখিয়াছি।
মথুরা হইতে আইল গৃহেতে
পিয়ারে দেখিয়াছি॥
আজু নিজদেহ দেহ করি মানি
আজু গেহা ভেল গেহা।
নিশি ভোল অতি নিশি করি মানি
লেহা করি মানি লেহা॥
আজু মলয়গিরি- মন্দ পবন বহু
আকাশে উদিত হউ চন্দা।
অবহু মউরগণ নাচু সাধে করু
কোকিল কুহুহু ধন্ধা॥
চামরু চামর ধরিয়া সুন্দর
বাধুলি হউ রূপবান।
চণ্ডীদাস বলে ঐছন জানত
তুরিতে ভেঠব তোহে কান॥ ৪২॥

যথারাগ

সখি হে, আজু রজনি শুভ ভেলা।
কানু আয়ব ঘর হেন মনে লাগল
পায়ব ফল অতি ভেলা॥
গণি গণি বচ্ছর আয়ব রে হরি
কবহু না শুভদশা ভেলি।
ঘাটত বর কান আনন্দ সানন্দ
মোহে দরশায়লি ভালি॥
অমঙ্গল বিঘিনি ঘাটত পড়ু বাধক
সৌরভ তেজত গন্ধ।
শুষ্কহি কাষ্ঠ তরুবর বৈঠত
কাক গিধির বন্ধ॥
দিনহুঁ পড়ত কত কতহুঁ বরজপতি
দেখল দিন মাহ।
অব নিশি রজনি ফুয়ল করি মানল
হেরলুঁ তাকর দেহ॥
চন্দন গন্ধ গন্ধ ভেল মোহিত
কোকিল সুমধুর জান।
বাম নয়ন ঘন করতহি স্পন্দন
হেরলুঁ তছু অবিধান॥
বিপিন গহন যত আছিলহি মুদিত
সবহুঁ খিন তনু মেলি।

খঞ্জন পাখী কমল পর দেখলি
অতি তনু আনন্দ ভেলি ॥
কদম্ব তরুয়া ছিল বিরহ মদন হেন
সো ভেল সরস মান।
চণ্ডীদাস কহে শুন ধনি সুন্দরি
তুরিতে মিলায়ব কান ॥ ৪৩ ॥

এ সখি শুন মোর বোল।
হরি আজু মীললি কোল ॥
দেখহুঁ রজনিক শেষ।
আজু সভে পূজহ মহেশ ॥
পূজহ যত দেবী দেবা।
তাকর সভে কর সেবা ॥
মঙ্গল গায়ত মেলি।
সভে মেলি দেয়ত তালি ॥
গায়ত বায়ত ঘনঘোর।
ধূপ দীপ লেহ গোচর ॥
চিনি নারিকেল দুগ্ধ লেই।
খণ্ড আতর কর তাই ॥
পূজহ পশুপতি দেবা।
তব ধনি করতহি সেবা ॥
মঙ্গল ঘট পরিপূর।
রাম কদলি রুপ দূর ॥
নগরে বাজাহ ভেরু জোড়।
দগড় ডিণ্ডিম ঘন ঘোর ॥
গাঁথই বনমালা জোর।
চণ্ডীদাস ভেল ভোর ॥ ৪৪ ॥

কানড়া

সখী কহে শুন ধনি রমনী[র] শিরোমনি
শুভদশা জানল এখন।
নিশির স্বপনে যদি দেখিয়াছ গুণনিধি
তব হরি আয়ব ভবন ॥
হরষ বদন ধনি কহএ কিছুই বাণী
কোকিল সতিন সম ভেল।
করিতে রসের সুখ হেন বেলে দিলে দুখ
ং াচম্বিতে ডাকিয়া উঠল ॥
ভালই তাহার কাজ সে রসে পড়িল বাজ
হইব অক্ষটির বিনাশি।
হেনক ভাবিল মনে তবে রাখে কোন জনে
গলাএ ধরিয়া দিব ফাঁসি ॥
জতেক কোকিল আছে গিয়া সে তাহার কাছে
ধরিব জতেক পিকগণে।
সভারে করিয়া জড় মারিতে কর্য্যাছি দড়
যমুনাতে ডুবাব যতনে ॥
বিনাশ করিব তারে এ দুখ কহিব কারে
সেই ভেল রিপুর সমান।
সুখেতে করিল দুখ না হল্য মনের সুখ
শুনি রব উঠে গেল কান॥
মনেতে হইল ভয় ননদিনী পাপাশয়
দুর্ম্মতি বিঘিনী কুলকাটা।
ভাঙ্গিল নয়ন নিন্দ গেলা তেজি গোবিন্দ
চণ্ডীদাস ভালে লেঠা ॥৪৫॥

রাগ তথা

পুন কি এমন দশা মোর।
পিয়া কি করব নিজ কোর ॥
আর কি ডাকব বনমালি।
পুন হব রস রাস কেলি ॥
দেবে কহে গণক গণিয়া।
স্বপনে দেখিনু আজু পিয়া ॥

তবে সে করমফল মানি।
এ কথা অন্যথা না হয় জানি॥
দেখি চণ্ডীদাস কয়।
নিকটে মিলব রসময়॥ ৪৬॥

নিকট দুয়ারে রথ আরোহণে
আয়ল রসিক কান।
পুলকে বদনে চাহি পথি পানে
চণ্ডীদাস গুণ গান॥ ৪৭॥

কর্ণাট

হেনক সমএ রথ আরোহণে
আইল উদ্ধব মতি।
উদ্ধব আনন্দ মনে রসানন্দ
তাহা না কহিব কতি॥
গোকুল নগরি প্রবেশিলা আসি
গোধূলি সময় কালে।
প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ
কাতর হইয়া বলে॥
এক সহচরি বাহির দুয়ারে
দেখিয়া সুচারু রথ।
ধাইয়া সে সখি তুরিতে চলয়ে
নাহি দেখি যেন পথ॥
আপনার অঙ্গ আপনি না চিনে
তুরিতে যাইয়া কয়।
এত দিন দুখ সুখ করি মানি
ঘরে আল্য রসময়॥
কিশোরী বিসোরি কানুর বিরহে
ভাবনা করিতেছিল।
হেন বেলে সখি মুখেতে শুনিয়া
তুরিতে বাহির হল॥
রাই কহে শুন কেমন ধরন
কি হেতু ইহার শুনি।
সখি সব কথা কহিতে লাগল
সব বিবরণ বাণী॥

রাগশ্রী

ধনি কহে দেখ বাহির দুয়ারে
কানু কি [আ]য়ল গেহা।
আজু সে রজনি সফল মানিয়ে
তবে সে সফল দেহা॥
গিয়া এক সখি দেখল তুরিতে
নিশিতে লখিতে নারে।
তুমি কোন জন বলহ বচন
কে বট রথের পরে॥
বিনতি আরতি অনেক প্রকারে
কাতর বচনে বলে।

* * *

কোথা না আছয়ে শ্যামের প্রেয়সি
রাধা বলি তার নাম।
তাহারে দেখিতে মোরে পাঠায়ল
সো বর নাগর শ্যাম॥
শ্যাম পরসঙ্গ শুনিতে সে ধনি
অঙ্গ পুলকিত ভেল।
মৃত তরু জেন বারি ঢাড়ি পাল্যে
সে তরু মুঞ্জরি গেল॥
পুলকে পুরল শ্যাম নাম শুনি
কহ কহ পুন বোল।
বহু দিন পর কানু নাম শুনি
তনু মুগধল মোর॥
শুনহ সুন্দরি নবীন কিশোরী
শ্রবণ পরশি পুন।

মোরে পাঠায়ল　　তোমারে দেখিতে
কি রীতি দেখিয়ে হেন ॥
কানুর আদর　　দেখিয়ে যেমন
কহিতে কহিব কতি।
অনেক প্রকারে　　প্রবন্ধ বুঝাতে
আমি সে আইলুঁ ইথি ॥
সো নব নাগর　　গুণের সাগর
তোমার বিরহে আধা।
শুইতে বসিতে　　দিগ নেহারিতে
সদাই দেখয়ে রাধা ॥
তোমার বিরহ　　কাতর দেখিয়া
তেঞি পাঠায়ল মোরে।
দশমি দশার　　অবশেষ শুনি
কানু সে কাতর ভালে ॥
চণ্ডীদাস বলে　　ঐছন দেখল
সে হরি কাতর বড়।
দোহে এক তনু　　ভিনু সে ভৈগেল
বুঝিতে বিষম বড় ॥৪৮॥

কামোদ

কি নাম তোমার　　বলহ বচন
শুনিয়ে শ্রবণ ভরি।
পুন সে সরল　　হইল গরল
সো নব কিশোরি গোরি ॥
এই সে আছিল　　অঙ্গের পুলক
শুনিয়া শ্যামের নাম।
ক্ষেণেকে ভৈগেল　　আর দশা ভেল
কি রস ইহার নাম ॥
রসের আরতি　　কি জানি পীরিতি
রসের উপরে রস।
প্রধান বসতি　　আট রস তথি
যাহাতে করিল বশ ॥
তার তর তম　　ছপ্পন্ন রসের
তিন সে আছয়ে রীত।
বিপ্রলম্ভ সনে　　এ সব আখ্যান
প্রধান করিয়া মান ॥
তবে সে বলিবে　　কলহান্তরিত
এখানে কিরূপ হয়।
গোচর নহিলে　　কিরূপে হইল
রসাভাস মাত্র হয় ॥
ব্যাসের রচন　　বেদের বচন
তাহাতে রাখহ মতি।
বৃন্দাবন তেজি　　পদ নাহি চলে
নাগর আছয়ে ইথি ॥
নেতের গোচর　　না হয়ে গোচর
গোচর দেখল যবে।
হরষ হইয়া　　বিরস বদন
বিরহ হইল তবে ॥
এ রস বুঝিতে　　আন সে নারয়ে
ব্যাসের বচন ভাষে।
বিচার করিতে　　অনেক শকতি
কোন জন বুঝে শেষে ॥ ৪৯ ॥

তুড়ি

কেবা আইসে　　দুর পর হই
না দেখি আছিনু ভাল।
তোমারে দেখিতে　　হৃদয়ে আনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল ॥
কাননে আনল　　জ্বলিলে নিভায়ে
যদি বা মেঘের লেহা।
বারি পরশনে　　দারুণ কাননে
নিভায়ে তিলেক দেহা ॥
এমতি আনল　　হিয়ায়ে পশিল
কিসেতে নিভায়ে বল।

ভস্ম আৎসাদনে তাহে ঘৃত দিয়া
অধিক করিয়া জ্বাল ॥
ধিকি ধিকি সদা অন্তর আনল
জ্বলিছে এ রাতি দিনে।
তাহে তুমি আসি ঘৃতের আহুতি
আসিয়া দিলে বা কেনে ॥
একে বিরহিণী তাপেতে তাপিনি
ছিলাঙ তাপিত হয়া।
শ্যাম পরসঙ্গ কহিলে শ্রবণে
নিভাইব কিবা দিয়া ॥
এই তনু দেখ তাহার বিরহে
প্রতিমা আছয়ে সারা।
হৃদয় বিদারি যদি বা দেখাই
তবে হবে পাতিআরা ॥
নয়নের নীর নিশি দিশি ঝরে
সাঙন মাসের ধারা।
চণ্ডীদাস কহে নিরবধি লেহে
পরাণ তেজিবে পারা ॥ ৫০॥

কে বলে কালিয়া ভাল।
সে গুণ মহিমা ভাবিতে গুণিতে
রাধার পরাণ গেল ॥
শুন হে উদ্ধব সে সব বৈভব
তাহা না কহিব কত।
বড় নিদারুণ হৃদয় কঠিন
পরাণে সহয়ে কত ॥
আমরা সে পদে এ তনু নিছিয়া
শরণ লইয়াছিলুঁ।
তাহে নিদারুণ কেবা জানে হেন
মাথায়ে কলঙ্ক নিলুঁ ॥
সেই সে কলঙ্ক বাদ পরিবাদ
ভূষণ করিয়া নিল।
গুরু দুরুজনে দিয়া তিয়াগনে
তভু তারে নাহি পাল্য ॥
গুরুর গঞ্জনা পাড়ার তুলনা
সে নিল চন্দন চুয়া।
কি করিতে পারে ও সব বচন
কানুরে সপ্যাছি দেহা ॥
অমিয়া বলিয়া সে হরি সেবিনু
গরল হইয়া গেল।
গরল তরসি তাহার পরশি
এই গতি মতি ভেল ॥
কে জানে এমন দশার মরম
কহিতে কি জানি হয়।
চণ্ডীদাস বলে এত দুখে শুনি
জেবা করে রসময় ॥৫১॥

ভাবিতে গণিতে তাহার পীরিতি
পাজর হইল শেষ।
মরণ শরণ এই সে নিদান
প্রেমের নহিল লেশ ॥
কালার পীরিতি যে করে আরতি
সে জন মরুক জলে।
রসায়া রসায়া প্রেমসিন্ধু দিয়া
নিদান করিল লেহে ॥
কে জানে এমন না শুনি কথন
পরের পীরিতি সুখে।
ঘরতে আনিয়া ধরম খাইয়া
পরিণামে হল্য দুখে ॥
যখন করিল বহুত পীরিতি
তখনি জানিল মনে।
বহুত লেঠার বহুত আদর
সে নব কানুর সনে ॥

তখনি জানিল মনের সহিত
যে জন নিদান হবে।
সেই সত্য ভেল বুঝিতে কারণ
চণ্ডিদাস কহে ইবে॥ ৫২॥

চণ্ডিদাস কহে শুন সুধামুখী
দূতমুখে শুনি বাণী।
বিষম বিরহ দূরে তেয়াগিয়া
শুনহ রমণি ধনি॥ ৫৩॥

তুড়ি।

এক ভাব দেখ উদ্ধব হইল
তিন ভাব তাহা নয়।
ভাবের শকতি দরশাএ কতি
অনুভাব দেখ হয়॥
আগেতে কহিল প্রেমে সে বৈচিত্র্য
ভাবনা দরশ রসে।
ক্ষেণেক দরশে ক্ষেণেক পরশে
ক্ষেণেক বিরহ ঝরে॥
সেই সে বৈচিত্র্য রস কহিয়াছি
এবে সে ভাবিব রস।
মাথুর কারণ রস পুষ্ট লাগি
ইহাতে জগত বশ॥
রস পরিমল রসে ঢল ঢল
যার দশা আসি ভেল।
ভাবি রস কহি অনুভাবে এই
ভাবে ভাবে যতি দেল॥
এখন বিরহ অগোচর অতি
গোচর নাহিক দেখি।
অতএব হয় বিরহ দশার
সেই সে কমলমুখি॥
রসের সমুদ্র ভাবিতে ভাবিতে
অগাধ সায়র মানি।
রাঙ্গা টুনি যেন খাইবারে চাহে
মহাসমুদ্রের পানি॥

করুণাশ্রী

কাহে আয়ল ওহে বিরহ দশাপর
কাহে পুছ ইহ বাণি।
উহা পরবাসি সাচি করি মানল
কুবুজা সে তাহি মন মানি॥
যো রূপি অঙ্কুরি আপনি পরশি কর
যবে ভেল অঙ্কুর শাখা।
বিরহকি তাপে জারল সো তরুবর
কি তাহে দেয়ত দেখা॥
কো জানে এ রস পরিণাম বৈভব
তব তাহা করত বেভার।
প্রেম পরশ প্রতি কর তথি দুর্গতি
কাহে পিরিতি রস হার॥
অব হাম জানল তার চিত বেবহার
তাহাকে পরিহার মান।
বিষম হুতাশ ভাষ তহুঁ দেখনি
চণ্ডিদাস গুণ গান॥ ৫৪॥

রাগশ্রী

এ সব বচন শুনিয়া উদ্ধব
চিন্তিত হইলা মনে।
রাধার আরতি শুনিতে পিরিতি
কেহো না জানয়ে প্রেমে॥
কাষ্ঠের পুতলি যেমন থাকয়ে
না স্ফুরে বচন শ্বাস।

ভকতি কি রীতি দেখিয়া উদ্ধব
কহেন একটী ভাষ ॥
শুন সুধামুখি শুনি ভেল দুখি
নহেত এমনি কাজ।
এহেন পিরিতি এড়িয়া যুবতি
গেছেন রসিকরাজ ॥
চিত কর স্থির শুনহ সুন্দরি
তেজহ দারুণ মতি।
হেন দেখি মনে তেজহ পরাণে
বুঝিয়ে হেনক গতি ॥
তেজিয়াছ সুখ শ্রীমুখমণ্ডল
দেখিয়ে আন্ধার সম।
বচন কহিতে নাহিক শকতি
ক্ষণেকে হইছ ভ্রম ॥
কোটি চান্দ জিনি যাউক নিছনি
ও মুখমণ্ডল আভা।
সো বিধুমণ্ডল মলিন হয়াছে
চকোর করিতে লোভা ॥
চণ্ডিদাস কহে বিরহের মোহে
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ।
অলপ বয়সে এহেন বিরহে
ততক্ষণে রহে রঙ্গ ॥ ৫৫ ॥

সুই সিন্ধুড়া

তেজিয়া এমন নাগরির কোর
মথুরা রহল গিয়া।
* * *
কালিয়া বরণ যিসের কারণ
তাহাত ভালই জানি।
তেকারণে তিহো কালিয়া হইল
শুনহ পুরুব বাণী ॥
যে কালে সমুদ্র মথন করিল
অমৃত পাবার তরে।
দেবগণ যত হই এক যূথ
সমুদ্র মথন করে ॥
মথিতে মথিতে প্রথমে উঠল
কমলা নামেতে রামা।
তাহা নিল হরি অতি স্নেহ করি
অতি সে রূপের ধামা ॥
তবে সে মথনে উঠল যতনে
কালকূট বিষরাশি।
* * *
তাহাই ভক্ষয়ে নীলকণ্ঠ নাম
মহাদেব হল সুখী।
রাখিল দেবের প্রতিজ্ঞা কারণ
অসুর নাশিল ভুখি ॥
চণ্ডিদাস কহে অদ্ভুত কথা
শুনিতে শুনিবে কত।
ব্যাসের রচন পুরাণ বচন
কহিল তাহার মত ॥ ৫৬ ॥

ধানশ্রী

যেখানে আছিল কালকূট বিষ
সেওহ মাঝার কাছে।
সেই সিন্ধুসুতা বিষের সমূহে
করিয়া আছিল বাসে ॥
ব্যাসের কায়াতে বিষ উপজিল
তাহার কায়ার কা।
সেই সিন্ধুসুতা তাহারে পরশি
তাহার অক্ষর কা ॥
লাবণ্য সায়রে নাহিল যখন
তখন রঞ্জিত গা।

কালের কাটিল লাবণ্যের বল
তাহাতে অঙ্গের প্রভা ॥
এ দুই আখর শুন।
ইহাতে কালিমা বরণ হইল
ইহাতে দুরিত হেন ॥
এখন কখন লাবণ্য লহরি
তখনি অমিয়া কহে।
কালকূট সবে তাহার আকৃতে
কুটিল হইয়া রহে ॥
কাল নাম দুটি আখর বলিয়া
কখন ভালই নহে।
কখন সরল কখন গরল
চণ্ডিদাস ইহা কহে ॥ ৫৭ ॥

মানব

কি আর বলহ শ্যামের বচন
তাহারি পিরিতি জানি।
বসায়া বসায়া পিরিতি করিয়া
পরাণে লইল টানি ॥
বিরহ সায়রে এড়িয়া নাগরে
বরাত মদন বাতি।
কানু মধুপুর সদা মন ঝুরে
নাহি জানি দিবারাতি ॥
সে জন সঙরি নিশি দিশি বারি
নয়ন পুড়িয়া বহে।
আন কিবা জানে আনের সে বেথা
কহিলে কি জানি হয়ে ॥
যে জানে যাহার মরম সরম
তাহারে এ সব দিল।
সরম ঢাকিতে আর কে আছয়ে
তারে সে দিলাঙ কুল ॥
সে হেন সরল দেশে না রাখিলা
নিদানে এমতি ধারা।
চণ্ডিদাস বলে শুন রসময়ি
পরাণ হারাবে পারা ॥ ৫৮ ॥

বেহাগড়া।

এ ঘর দুয়ার যেন লাগে বিষ
তাহার লাগিয়া কই।
রাতি দিন লোরে আখি না চলয়ে
হরি হরি করি রোই ॥
শয়নে স্বপনে আন নাহি মনে
সদাই সে গুণ গাই।
আহার ভোজন কিছু না রুচয়ে
তোমারে কহিল এই ॥
যদি বা কখন সাধু প্রয়োজন
ঘুমেতে নয়ন টল।
স্বপনে সদাই বরণে লেখিয়ে
নিরবধি দেখি কাল ॥
বড় নিদারুণ অতি নিকরুণ
তিলেক নাহিক দয়া।
অবলা বধিতে আক্ষের পলকে
পরাণে কটাক্ষ দিয়া ॥
অলপ ইঙ্গিতে সভারে তেজন
তিলেক নহিল দয়া।
সকল ছাড়িয়া ও রাঙ্গা চরণে
লয়াছিনু পদছায়া ॥
চণ্ডিদাস মনে শুনিয়া বেথিত
পুলক মানল তনু।
মথুরা তেজিল সভারে কহিল
তুরিতে আয়ব কানু ॥ ৫৯ ॥

যথারাগ।

আগে কহিয়াছি পুরাণ কথন
যেমত হইল কালা।
আর কহি শুন পুরাণ কথন
ঐছন ব্যাসের ধারা॥
আন অবতারে চারি বর্ণরূপ
হইল গোলোকপতি।
রক্ত বর্ণ হুহুঁ লইয়া আকার
রাখল জগত খ্যাতি॥
তথা তার পর হইলা সুন্দর
এ পীত বরণ কায়া।
সৃষ্টির পালন আন আন বহে
করল অনেক মায়া॥
তার পর পহুঁ গোলোক ঈশ্বর
শুকল রূপ ধরি।
সৃষ্টির পালক করল দমন
অসুর দাহিল হরি॥
এবে কৃষ্ণরূপ হয়া বাঁশী ধর
করল অনেক খেলা।
গোপ গোপী যত করিল অনাথ
তেজিয়া মাথুর গেলা॥
যবে নন্দঘরে জনম লভিল
রাখল যখন * * *।
শুন্যাছি আমরা জ্ঞানীর মুখে
গর্গ মুনি অবিধান॥
চণ্ডিদাস অতি বেথিত দেখিয়া
কহেন একটি বাণী।
হেন মনে বাসি মাথুর তেজিয়া
ঘরে আল্য গুণমণি॥ ৬০॥

জয়শ্রী।

অতি সে পিরিতি যে করে যুবতি
পরের পিরিতে চিত।
জনম তাহার ভাবিতে গণিতে
পরিণামে এই রিত॥
শুনহ উদ্ধব আমার এ দশা
তাহারে কহিব কি।
কি বলিব কারে আপন বেদন
হইয়া কুলের ঝি॥
দিয়া প্রেমরাশি কত মধু ঢারি
সিঞ্চিয়া করল শাখা।
ডালে মূলে কাটি পেলাএল দূরে
পুনই সে না পাইল দেখা॥
কেমন ধরল কোন বেবহার
এহেন সুজন কাজ।
পরিণামে এই পথেরে ডারল
কুলে শীলে দিলে বাজ॥
পরের পিরিতি স্বপন সমান
জলের বিম্বুক ছায়া।
ক্ষেণেক যখন নাহি দরশন
কতি গেলা দেখা দিয়া॥
ঐছন কালার প্রেম সে পিরিতি
নাহি পরতিত তায়।
ঐছন কানুর পিরিতের লেহা
দীন চণ্ডিদাস কয়॥ ৬১॥

করুণাশ্রী

তাহার বরণ কালিয়া দেখিয়া
ভুলল বরজ ধনি।
কেবা কোথা দেখ ভাল আছে কেবা
পরাণে লইল টানি॥

সভে বলে তারে　　　রসিক নাগর
বাখানে সকল জনে।
উপরে কালিয়া　　　বরণ দেখহ
হৃদয়ে কুটিল হানে॥
পর নহে কভু　　　আপন বলিতে
আপনা না হয়ে পর।
বুঝহ কারণ　　　জানল অন্তরে
কেবল বিষের ঘর॥
আন বিষ যদি　　　করয়ে ভোজন
তখনি মরিয়া যায়।
এ বিষ এড়িয়া　　　হৃদয় মাঝারে
জ্বালিল মুরতি কায়॥
কাল সম ফণী　　　দংশল মরমে
আর কি জীবন রয়।
না শুনে মন্তর　　　অন্ত করি জানে
চণ্ডিদাস ইহা কয়॥ ৬২ ॥

কহ কহ দেখি　　　কেমন মথুরা
কেমন নগর দেশ।
কহ দেখি শুনি　　　কহেন সে ধনি
হইয়া কাতর শেষ॥
নগরের যত　　　রমণী সকলি
কেমন রূপের ছটা।
কোন রসবতি　　　করিয়া পিরীতি
ভুলায়ে করিয়া লেঠা॥
কানু কি ভুলল　　　কুব্জা সহিতে
এই সে তাহার রীত।
তেজিয়া চন্দন　　　ভূষণ কেসাই
এই সে তাহার চিত॥
তেজিয়া কাঞ্চন　　　গুঞ্জা ফল সম
এ দুই একই মূল।
কোথা গজমতি　　　কোথা সে সমান
ভেলি সে মুকতা তুল॥
কাহা মুনি সুত　　　কাহা সে খোজল
কাচক রতনকু মান।
কাঁহা মরকত　　　কোথা সে ফাটক
চণ্ডিদাস পরমাণ॥ ৬৩ ॥

বরাড়ি।

কতি সে কোকিল　　　বায়স ভাখত
মউর কপোত মেলি।
কাহা সে কুরঙ্গ　　　খর সম ভেল
এ অতি লাগয়ে গালি॥
কোথা হংসরাজ　　　কোথা সে মণ্ডুক
এ দুই সমান নয়।
তেজি গন্ধ অতি　　　কুড়চিয়া অতি
কেবল সে রসময়॥
রসের সমূহ　　　তেজিয়া চন্দন
কুবুজা মনেতে ভায়।
সে অতি রসিক　　　জানল হৃদয়
চণ্ডিদাস গুণ গায়॥ ৬৪ ॥

এক করে ধরি　　　রোপল অঙ্কুর
না পাই মেঘের বারি।
তাহে রবি তাপ　　　তাপিত হইয়া
সে তনু করল জারি॥
কেমনে বাঁচব　　　বারি না পাইয়া
তরু ভেল খিন দেহা।
তেন মত ভেল　　　কানুর পিরীতি
আদর পিরীতি লেহা॥
কে বলে সরল　　　তাহার হৃদয়
কুটিল বিষের রাশি।

এ দেহ তেজিব তাহার লাগিয়া
হেনক আমরা বাসি ॥
যাহার কারণে এত পরমাদ
সে ভেল নিঠুরপনা।
এমন না জানি কখন না শুনি
এত দিনে গেল জানা ॥
একে সে যুবতি সে নব ভকতি
দেখিতে না পায়ল তায়।
পিরীতি তেজিয়া গেলা কোন দেশে
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥ ৬৫ ॥

কানু সে নিদান করল যখন
তখনি জানল মনে।
আর কি রমণী কুলের কামিনী
তার কি থাকয়ে প্রাণে ॥
এক তিল যদি বিচ্ছেদ যা সনে
তিলে কত বার মরি।
দেখিলে জুড়াই শ্রীমুখমণ্ডল
তবে সে চেতন ধরি ॥
এক শত কোটি কোটির নিমিখে
তার শত শত গুণে।
তার লাথ গুণ কণা অংশ হয়
ঐছন বেদন মনে ॥
তবে ধরি জিউ না থাকে কায়েতে
ঐছন বিচ্ছেদ ভয়।
হেন জন তেজি চলে মধুপুরি
কেমতে পরাণ রয় ॥
তবে বল যদি এমন যা সনে
তিলে না দেখিলে মর।
সে জন আঁখের আড় হই গেল
কেমতে পরাণ ধর ॥
তা ছাড়ি পরাণে কেন আছ ধরি
তার তর তম বলি।
এ কথা কহিতে অনেক যতন
চণ্ডিদাস ভালে জানি ॥ ৬৬ ॥

আগে আছে আর আর কহি শুন
তিনের কাছেতে তিন।
তিন তিন ভরি তিন তিন ভাবি
তিন তিন ভেল জিন ॥
তিন গুণ করে তিনের সমূহ
তিন তিন করি আছি।
তিন তিন তিন আনিয়া যতন
সেই সে ভাবিয়াছি ॥
তিন তিন ভয় তিন তিন লয়
তিন তিন যবে ভেলি।
তিন তিন তিন তিন সে আখর
তিন ভেল পর মেলি ॥
তিন তিন আনি হয় পরকাশি
এ তিন তিনহি নয়।
তিন গুণ যার হৃদয় উপর
তার গুণ আতিশয় ॥
কালার এ গুণ গুণের সাইতে
তার সেজে রহে সারা।
কালার কোটেক তাহার পুটেক
ঐছন তাহার ধারা ॥
আট নয় ছয় রাম রাম করি
এ কুল আখর সাধে।
তাহে গুণাগুণ তিন রসপরি
তাহে গুণ করি বাধে ॥
সে গুণে বা কুল তিন তিন করি
তিন করি ছোড়ল পাশ।

তিন তিন তিন তাহে ভেল চিত এই সে আশের আশ।
তাহাতে আছয়ে আশ ॥ চরণে পড়িয়া * * *
তেঞি সে এ জিউ আছিএ ধরিয়া * * *

[১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২৩ ও ২২৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ পাঠ সন্নিবিষ্ট হইবে]

২২৩	পৃষ্ঠার	১ম পঙ্‌ক্তি—	"শুনিল শ্রবণে"
"	"	৭ম "—	ব্যাস মুনিবর তায়
"	"	৮ম "—	পুরাণ বর্ণিল
"	"	১৩শ "—	সেই কল্পতরু রচিলা পুরাণ
২২৪	"	২০শ "—	দেবের গোচরে তথি
"	"	২৪শ "—	মুখে করি ল'য়া
"	"	২৮শ "—	ফলের লাগিয়া
"	"	২য় "—	(২য় কলম)—পেলিলে কতি
"	"	৩য় "—	অনেক রতন
"	"	৬ষ্ঠ "—	উড়িয়া যাইতে তেজে
"	"	১০ম "—	ফলের কারণে ঝুরে
"	"	১৪শ "—	হ'য়া এক ভিত

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

জৈন-দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম

(১)

ধর্ম্ম

সাধারণতঃ ধর্ম্মশব্দে পুণ্যকর্ম্ম অথবা পুণ্যকর্ম্মসমষ্টি বুঝায়। ভারতীয় বেদমার্গানুযায়ী দর্শনসমূহের কোথাও কোথাও ধর্ম্মশব্দে নৈতিক-অতিরিক্ত অর্থের আরোপ দেখা যায়। এই সমস্ত স্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ বস্তুর "প্রকৃতি", "স্বভাব" বা "গুণ"। বৌদ্ধ দর্শনেও ধর্ম্মশব্দের নৈতিক অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু অনেক স্থলে "কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা", "অনিত্যতা" প্রভৃতি কোন জাগতিক নিয়ম অথবা বস্তু-ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জৈনদর্শন ব্যতীত অন্য কোনও দর্শনে, ধর্ম্ম একটী অজীব পদার্থরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

নৈতিক অর্থ ব্যতীত একটী অপরূপ অর্থে ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ, একমাত্র জৈনদর্শনেই দেখা যায়। জৈনদর্শনে ধর্ম্ম একটী "অজীব" পদার্থ। কাল, অধর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় ধর্ম্ম "অমূর্ত্ত" দ্রব্য। ইহা লোকাকাশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং ইহার "প্রদেশ"সমূহ অসংখ্যেয়। পঞ্চ "অস্তি-কায়ে"র মধ্যে ধর্ম্ম অন্যতম। ইহা "অপৌদ্গলিক" (immaterial) এবং "নিত্য"; ধর্ম্ম-পদার্থ সম্পূর্ণরূপে "নিষ্ক্রিয়" এবং "অলোকে" ইহার অস্তিত্ব নাই।

জৈন-দর্শনে ধর্ম্ম "গতি-কারণ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, ধর্ম্ম বস্তু-সমূহকে চালাইয়া থাকে। ধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় পদার্থ। তাহা হইলে ইহা কিরূপে গতি কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? ধর্ম্ম কোনও পদার্থের গতিবিষয়ে "বহিরঙ্গ-হেতু" বা "উদাসীন-হেতু"; ইহা পদার্থের গতির সহায়তা করে মাত্র। জীব অথবা কোনও অনাত্ম-দ্রব্য আপনা হইতেই গতিমান্ হইয়া থাকে; ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে অথবা প্রকৃষ্ট উপায়ে ইহাদিগকে চালিত করে না; তবে ধর্ম্ম গতির সহায়ক এবং ধর্ম্মের জন্য পদার্থের গতি এক হিসাবে সম্ভবপর হইয়া থাকে। দ্রব্য-সংগ্রহকার বলেন,—"জল যেরূপ গতিমান্ মৎস্যের গতিবিষয়ে সহায়ক, সেইরূপ ধর্ম্ম গতিমান্ জীব অথবা অনাত্মদ্রব্যের গতিবিষয়ে সহায়ক; ইহা গতিহীন পদার্থকে চালিত করে না।" কুন্দকুন্দাচার্য্য ও অন্যান্য জৈন দার্শনিকগণও এ বিষয়ে জল ও গতিশীল মৎস্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। "জল যেরূপ গতিশীল মৎস্যের গমনবিষয়ে সহায়তা করে, ধর্ম্মও সেইরূপ জীব ও পুদ্গলের গতির সহায়তা করে (৯২, পঞ্চাস্তিকায়সময়সারঃ)।" তত্ত্বার্থসারেরও গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"যে সমস্ত পদার্থ আপনা হইতে গতিমান্ হয়, ধর্ম্ম তাহাদের গতিবিষয়ে সহায়তা করে; গমনকালে মৎস্য যেমন জলের সাহায্য গ্রহণ করে, জীব ও অনাত্মদ্রব্যসমূহও সেইরূপ গতিবিষয়ে ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে।" বস্তুসমূহের গতিবিধানে ধর্ম্মের অমুখ্যহেতুত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব ব্রহ্মদেব নিম্নোক্ত প্রকারে দৃষ্টান্ত সহকারে

সমর্থন করেন। সিদ্ধ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত জীব; তাঁহার সহিত সংসারের কোনও সম্বন্ধ নাই। তিনি পৃথিবীর কোনও জীবের উপকারক নহেন, পৃথিবীর কোন জীবের দ্বারাও তিনি উপকৃত হন না। তিনি কোনও জীবকে মুক্তিপথে লইয়া যান না। তথাপি যদি কোনও জীব ভক্তিসহকারে সিদ্ধপুরুষবিষয়ে ভাবনা করে,—চিন্তা করিয়া দেখে যে, অনন্ত দর্শন-জ্ঞানাদি বিষয়ে স্বভাবতঃ সেও সিদ্ধের অনুরূপ,—তাহা হইলে ঐ জীব ধীরে ধীরে সিদ্ধত্বলাভের পথে অগ্রসর হয়। এ স্থলে দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে জীব স্বয়ংই মোক্ষপথের পথিক হইয়াছে; তথাপি সিদ্ধ পুরুষও যে তাহার মুক্তির কারণ, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ও প্রকৃষ্ট উপায়ে বস্তুসকলকে চালিত না করিলেও, ধর্ম্মও ঠিক এইরূপে তাহাদের গতিবিষয়ে কারণ বা হেতু।

লোকাকাশের বাহিরে ধর্ম্মতত্ত্বের অস্তিত্ব নাই। স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধগতি হইলেও মুক্ত জীব এই জন্য বিশ্বশিখরস্থ সিদ্ধশিলায় অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তদূর্দ্ধে অলোকাখ্য অনন্ত মহাশূন্যাকাশে বিচরণ করিতে পারেন না। যে সমস্ত কারণে লোকাকাশ অলোকাকাশ হইতে বিভিন্ন, লোকমধ্যে ধর্ম্মের অবস্থান তাহাদের অন্যতম। বিশ্বে বস্তুসমূহের অবস্থান এবং বিশ্ববস্তুসকলের নিয়মাধীনতা গতি-সাপেক্ষ। এই জন্য ধর্ম্মের জন্যই লোকাকাশ বা নিয়মসংবদ্ধ বিশ্ব সম্ভবপর হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। অথচ ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, গতিবিষয়ে ধর্ম্ম সহায়ক কারণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। পদার্থসমূহ আপনা হইতেই গতিমান্ বা স্থিতিশীল হয় এবং স্থিতিশীল কোনও পদার্থকে ধর্ম্ম চালিত করিতে পারে না,—এই জন্যই বিশ্ববস্তুসমূহকে অনবরত আকাশে ছুটাছুটি করিতে দেখা যায় না। বিশ্বে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ধর্ম্ম তাহার অন্যতম কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক শীলের মতে, ধর্ম্ম গতির সহায়ক কারণ তো বটেই, ইহা "তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু।" তিনি বলেন,—"ইহা তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু,—ইহা নিয়ম-নিবদ্ধ গতি-পরম্পরার (system of movements) কারক বা কারণ,—জীব ও পুদ্গলের গতি-সমূহের মধ্যে যে শৃঙ্খলা (order) রহিয়াছে, ধর্ম্মই তাহার কারণ।" তাঁহার মতে ধর্ম্ম কতকটা লাইব্‌নিট্‌সের "পূর্ব্বনিরূপিত শৃঙ্খলার (pre-established harmony)" অনুরূপ। প্রভাচন্দ্রের "সকৃদ্‌গতি যুগপদ্‌ভাবি গতি"—এই উক্তির উপর তিনি তাঁহার মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুসমূহের গতিসকলের মধ্যে যে শৃঙ্খলা বা নিয়ম দেখা যায়, ধর্ম্মই তাহার কারণ,—প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রভাচন্দ্রের অভিপ্রায় কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। উক্ত শৃঙ্খলার কারণসমূহের মধ্যে ধর্ম্ম অন্যতম, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু বস্তু-সকলের শৃঙ্খলাবদ্ধ গতিবিষয়ে ধর্ম্মাতিরিক্ত অন্যান্য কারণেরও প্রয়োজন হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সরোমধ্যে মৎস্যপঙ্‌ক্তি যে শৃঙ্খলা সহকারে গতাগতি করে, সেই শৃঙ্খলাবিষয়ে সরোবরস্থ জলই যে একমাত্র কারণ, তাহা বলা যায় না। মীনপঙ্‌ক্তির উক্ত সুসম্বদ্ধ গতিবিষয়ে পুষ্করিণীস্থ জলের যেরূপ

কারণত্ব, মৎস্যসমূহের প্রকৃতিরও সেইরূপ কারণত্ব আছে। প্রমেয়-কমল-মার্ত্তণ্ডে প্রভাচন্দ্র বলিতেছেন,—

"বিবাদাপপন্নসকলজীবপুদ্‌গলাশ্রয়াঃ সকৃদ্‌গতয়ঃ সাধারণবাহ্যনিমিত্তাপেক্ষাঃ যুগপদ্‌ভাবিগতিত্বাদেকসরঃসলিলাশ্রয়ানেকমৎস্যগতিবৎ। তথা সকলজীব-পুদ্‌গলস্থিতয়ঃ সাধারণবাহ্যনিমিত্তাপেক্ষা যুগপদ্‌ভাবিস্থিতিত্বাদেককুণ্ডাশ্রয়ানেকবদরাদিস্থিতিবৎ। যত্তু সাধারণং নিমিত্তং স ধর্ম্মোঽধর্ম্মশ্চ তাভ্যাং বিনা তদ্‌গতিস্থিতিকার্য্যস্যাসম্ভবাৎ।"

উদ্ধৃত অংশের ভাবার্থ এইরূপ,—"সমস্ত জীব ও পৌদ্‌গলিক পদার্থসকলের গতিসমূহ একটী সাধারণ বাহ্য নিমিত্তের অপেক্ষা করে; কারণ, এই সমস্ত জীব ও পৌদ্‌গলিক পদার্থসমূহ যুগপৎ অর্থাৎ এককালেই গতিমান্ দেখা যায়। সরোবরে বহু মৎস্যের যুগপদ্‌গতি দেখিয়া যেরূপ উক্ত গতির সাধারণ নিমিত্তরূপে একটী সরোবরস্থ সলিলের অনুমান হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবপুদ্‌গলের গতি হইতে একটি সাধারণ নিমিত্তের অনুমান করিতে হইবে। সমস্ত জীব ও পৌদ্‌গলিক পদার্থসমূহের স্থিতিসমূহও একটী সাধারণ বাহ্য নিমিত্তের অপেক্ষা করে; কারণ, এই সমস্ত জীব ও পৌদ্‌গলিক পদার্থসকল যুগপৎ স্থিতিশীল দেখা যায়। একটী কুণ্ডে অনেক বদরের যুগপৎ স্থিতি দেখিয়া যেরূপ উক্ত স্থিতির সাধারণ নিমিত্তরূপে একটী কুণ্ডের অনুমান হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবপুদ্‌গলের স্থিতি হইতে একটী সাধারণ নিমিত্তের অনুমান করিতে হইবে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যথাক্রমে এই সাধারণ নিমিত্ত; কারণ, এই দুইটী ব্যতিরেকে উপরোক্ত গতি-স্থিতিরূপ কার্য্য অসম্ভব।"

প্রভাচন্দ্রের উপরোদ্ধৃত বচন হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, একাধিক পদার্থের যুগপদ্‌গতি হইতে ধর্ম্মতত্ত্বের অস্তিত্ব অনুমেয়। কিন্তু যেরূপ একটী পদার্থ আর একটী পদার্থের পরে গেলেই যে তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, এরূপ বলা চলে না, সেইরূপ দুইটী বা ততোধিক পদার্থের যুগপদ্‌গতি হইতেই যে তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, এরূপ অনুমান করা যায় না। গতিসমূহ যুগপৎ হইলেই যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে, এমন কোনও কথা নাই। মনে কর, কোনও পুষ্করিণীতে একটী মৎস্য উত্তরদিকে ছুটিতেছে; একটী মনুষ্য পূর্ব্বদিকে সন্তরণ দিতেছে; বৃক্ষচ্যুত একটী পত্র পশ্চিমদিকে ভাসিয়া যাইতেছে এবং একটী উপলখণ্ড সরোবরের তলদেশের দিকে নামিয়া যাইতেছে। এই সমস্ত গতিই যুগপৎ এবং এই যুগপৎগতিসমূহ গতি-কারণ জলের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এই সকল গতির মধ্যে যৌগপদ্য থাকিলেও, কেহই কোন শৃঙ্খলা দেখিতে পায় না। সেইরূপ ধর্ম্ম যুগপৎ গতিসমূহের কারণ হইলেও, ইহাকে তদন্তর্গত শৃঙ্খলার কারণ বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম জৈনদর্শনে নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। গতিপরম্পরার শৃঙ্খলায় ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে,—ধর্ম্ম ক্রিয়াশীল বস্তু নহে এবং সেই জন্য বিশ্বের গতিসমূহের মধ্যে যে শৃঙ্খলা আছে, ধর্ম্মকে তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

সেই কারণে আমাদের মনে হয়, অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিতবর শীলের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদের

যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু গতিসমূহের শৃঙ্খলার কারণ আবিষ্কার করিতে যাইয়া অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী অধর্ম্মতত্ত্বকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। স্থিতিকারণ অধর্ম্ম "যুক্তিতঃ" ধর্ম্মের "পূর্ব্বগামী" (logically prior) এবং অধর্ম্মের ফল বা কার্য্য নিরাস অথবা কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত করিবার জন্য ধর্ম্মের প্রচেষ্টায় শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইয়াছে;—বোধ হয়, ইহাই তাঁহার অভিমত। সুবিজ্ঞ অধ্যাপকের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে অক্ষম। বিস্মৃত হইলে চলিবে না,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, দুইটীই নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব। তাহাদের অস্তিত্বের ফলে গতি-শৃঙ্খলার আবির্ভাব সহায়তা লাভ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু গতি-শৃঙ্খলার উৎপাদন-ব্যাপারে তাহাদের ক্রিয়াকারিত্ব একেবারেই নাই।

প্রকৃত কথা এই যে—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ অথবা কাল, মিলিতভাবে অথবা পৃথক্‌ভাবে বস্তুসকলের গতিপরম্পরার মধ্যে শৃঙ্খলাবিধান করিতে সমর্থ নহে। উহাদের অস্তিত্ব ঐ শৃঙ্খলাবিষয়ে সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হইলেও, উহারা সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয় দ্রব্য। বিশ্বনিয়মের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া অদ্বৈতবাদ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সৎপদার্থের অবতারণা করিয়া থাকে এবং ঈশ্বর-বাদ এক মহীয়ান্ স্রষ্টা নির্দ্দেশ করে। জৈনদর্শন অদ্বৈতবাদ ও স্রষ্টৃবাদ, উভয়েরই বিরোধী। কাজে কাজেই শৃঙ্খলাবদ্ধ গতিসমূহের এবং সেই সঙ্গে বিশ্বান্তর্গত নিয়মের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে জৈনগণ স্বতঃ গতিশীল জীব ও পুদ্‌গলের স্বাভাবিক প্রকৃতির উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য। সমস্ত জীবের মধ্যেই একই জীবগুণসমূহ বিদ্যমান; তজ্জন্য সকল জীবের কর্ম্মসমূহ ও ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকটা একপ্রকারেরই হইয়া থাকে। আবার একই কাল, আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও পুদ্‌গলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া সকল জীবকেই কর্ম্ম করিতে হয়; এ নিমিত্তও জীবগণের মধ্যে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়া থাকে। জড় জগতের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, জৈন-দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত মত গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। বর্ত্তমান যুগের জড়বিজ্ঞানাচার্য্যগণের মত জৈনগণও বলিতে পারেন যে, জড়জগতের যে শৃঙ্খলা, তাহা জড় পদার্থের স্বাভাবিক গুণ হইতে প্রসূত। জড়ের সংস্থান (mass) এবং গতি (motion), কেন্দ্র-স্থিতি-নিয়ম (law of gravity) এবং জড়নিহিত আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তি (principles of attraction and repulsion) হইতেই জড় জগতের শৃঙ্খলার উদ্ভব। জড় ব্যাপারসমূহের (purely material phenomena) মধ্যে যে নিয়ম দেখা যায়, তাহার প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও কালের অস্তিত্ব একান্ত সহায়ক, ইহাও এ স্থলে স্বীকার্য্য। জগন্মধ্যে জীবসমূহের অস্তিত্বও জড়জগতের শৃঙ্খলার পোষক; কারণ অনাদিকাল হইতে যে সমস্ত বদ্ধজীব সংসারমধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে, পুদ্‌গল বা জড়দ্রব্য তাহাদেরই প্রয়োজন ও অভীপ্সা অনুসারে ক্রমাগতঃ অবস্থান্তরিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে দেখা যায় যে বস্তু সমূহের গতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা, তাহা মূলতঃ বস্তুরই ক্রিয়াশীল প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত এবং ধর্ম্মতত্ত্বের অস্তিত্বই যে কেবল এই শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার সহায়ক তাহা নহে, অধর্ম্ম আকাশ প্রভৃতি তত্ত্বও উহার পরিপোষক। গতি-স্থিতি-বিষয়ে পদার্থের স্বভাবই

কর্ত্তৃত্বাধিকারী, ইহা তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিককার বিশেষভাবে বলিয়াছেন এবং তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে “উপগ্রাহক” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, অন্ধ ব্যক্তি ভ্রমণকালে যষ্টির সাহায্য গ্রহণ করে; যষ্টি তাহাকে ভ্রমণ করায় না, তাহার ভ্রমণ-ব্যাপারে সহায়তা করে মাত্র। যদি যষ্টি ক্রিয়াশীল কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে ইহা অচেতন ও নিদ্রিত ব্যক্তিকেও ভ্রমণ করাইত। এই জন্ম অন্ধের গতিবিষয়ে যষ্টি উপগ্রাহক। দৃষ্টি-ব্যাপারে আবার আলোক সাহায্যকারী। চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি আছে,—আলোক দৃষ্টিশক্তির জনয়িতা নহে। আলোক যদি ক্রিয়াশীল কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে ইহা অচেতন ও নিদ্রিত ব্যক্তিকেও দর্শন করাইত। এই জন্য দৃষ্টিব্যাপারে আলোক উপগ্রাহক। তিনি বলেন,—“ঠিক সেই প্রকারেই জীবসমূহ ও জড় পদার্থসকল আপনা হইতে গতিমান্ অথবা স্থিতিশীল হয়। তাহাদের সেই গতি ও স্থিতি-ব্যাপারে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উপগ্রাহক অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হেতু। তাহারা ঐ গতি ও স্থিতির ‘কর্ত্তা’ বা জনয়িতা নহে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যদি গতি ও স্থিতির কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে গতি ও স্থিতি অসম্ভব হইত।” ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সক্রিয় দ্রব্যরূপে কল্পিত হইলে জগতে গতি ও স্থিতি কি জন্য অসম্ভব হইত, তাহাও তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপক, লোকাকাশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। অতএব যখনই ধর্ম্ম কোন বস্তুকে পরিচালিত করিবে, তখনই অধর্ম্ম তাহাকে থামাইয়া দিবে; এইরূপে জগতে গতি একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিবে। আবার অধর্ম্ম যখনই কোনও বস্তুকে স্থিতিশীল করিবে, তখনই ধর্ম্ম তাহাকে সঞ্চালিত করিবে; এইরূপে জগতে স্থিতি একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত অকলঙ্কদেব বলেন যে, যদি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় দ্রব্যের অতিরিক্ত আর কিছু হইত, তাহা হইলে জগতে গতি ও স্থিতি অসম্ভব হইত। গতি ও স্থিতি জীবসমূহ ও জড়পদার্থ-সকলের ক্রিয়া-সাপেক্ষ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম গতি ও স্থিতির সহায়ক এবং এক হিসাবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জন্যই গতি ও স্থিতি সম্ভবপর হইয়া থাকে। এই স্থলে আমরা আর একটু অগ্রসর হইয়া কি এ কথা বলিতে পারি না যে,—শৃঙ্খলাবদ্ধ গতি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থিতিও জীব ও জড় পদার্থসমূহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং উহাদের সহায়ক ও অপরিহার্য্য হেতু হইলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মিলিতভাবে অথবা পৃথগ্‌ভাবে গতি-স্থিতি-শৃঙ্খলার জনয়িতা (cause) নহে?

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রত্যক্ষের বিষয় নহে এবং তন্নিমিত্ত উহারা সৎপদার্থ নহে,—জৈনগণ এরূপ বিচারকে নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত অনেক পদার্থকেই আমরা সত্য বলিয়া মানিতে বাধ্য এবং মানিয়া থাকি। পদার্থসমূহ যখন গতিশীল বা স্থিতিমান্ দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই এমন দ্রব্য আছে, যাহা তাহাদের গতি ও স্থিতি-ব্যাপারে সাহায্য করে—ইত্যাকার যুক্তিতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সত্তা ও দ্রব্যত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, আকাশই গতিকারণ এবং আকাশাতিরিক্ত-ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জৈনদার্শনিকগণ এই মতবাদের অসারতা প্রতিপাদন-কল্পে নির্দ্দেশ করেন যে, অবকাশ-প্রদানই আকাশের গুণ; এই অবকাশ-প্রদান গতিশীল পদার্থের গতি-

ব্যাপারে সাহায্যদান হইতে বিভিন্ন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। গুণদ্বয়ের এই মৌলিক বিভিন্নতা মূলতঃ বিভিন্ন দুইটী দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে এবং এই নিমিত্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আকাশ হইতে পৃথক্ দ্রব্য। আরও দেখা যায় যে, যদি আকাশ গতি-কারণ হইত, তাহা হইলে বস্তুসমূহ অলোকে প্রবেশ করিয়া লোকাকাশের ন্যায় তথায়ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে পারিত। অলোক আকাশের অংশ হইয়াও যে একেবারে শূন্য ও পদার্থপরিবর্জ্জিত (এমন কি, সিদ্ধগণও তথায় প্রবেশ করিতে পারেন না),—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ধর্ম্ম একটী সৎ-দ্রব্য, অলোকে ইহার অস্তিত্ব নাই, এবং ইহা লোকমধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া লোকাকাশ ও অলোকাকাশের মধ্যে একটা বিশাল বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছে। অদৃষ্টই গতি-কারণ,—ধর্ম্মের সত্তা নাই,—ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, চেতন জীব যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে, অদৃষ্ট তাহারই ফলরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। চেতন জীবের গতাগতিবিধানে অদৃষ্ট সমর্থ, ইহা তর্কস্থলে মানিয়া লইলেও,—পাপপুণ্যকর্ম্মের অকর্ত্তৃ এবং তজ্জন্য অদৃষ্টের সহিত সর্ব্বথা অসংশ্লিষ্ট যে জড় পদার্থসমূহ, তাহাদের গতির কারণ কি হইবে ? এ স্থলে ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, জৈনমতে ধর্ম্ম, পদার্থের চালনকারী কোনও দ্রব্য নহে, ইহা বস্তুর গতি-ব্যাপারে সাহায্যদান করে মাত্র। গতিবিষয়ে ধর্ম্মের ন্যায় একটী নিষ্ক্রিয় কারণ অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। অদৃষ্টের সত্তা স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা ধর্ম্ম একটী সৎ-অজীব দ্রব্য এই মতবাদের কোনওরূপ বাধ হয় না।

(২)

অধর্ম্ম

জগদ্ব্যাপারের ভিত্তি অন্বেষণ করিতে যাইয়া অনেক দর্শনই,—বিশেষতঃ প্রাচীন দর্শনসমূহ —দুইটী বিরোধী তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া থাকে। জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে আমরা "অহুরো মজ্দ" ও "আহরিমান্" নামে দুইটী পরস্পর-বিবদমান হিতকারী ও অহিতকারী দেবতার পরিচয় পাই। প্রাচীন য়িহুদী-ধর্ম্মে ও খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের চিরশত্রু শয়তান বর্ত্তমান! দেব ও অসুর লইয়া ভারতের পুরাতন ধর্ম্মকথা। ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা দার্শনিক তত্ত্ববিচারের আলোচনা করি, তাহা হইলে সেখানেও দ্বৈতবাদের একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে আত্মা ও অনাত্মার বিভেদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই বিভেদ-কল্পনা প্রায় প্রত্যেক দর্শনেই কোনও না কোনও প্রকারে নিহিত। সাংখ্যে এই দ্বৈত পুরুষ-প্রকৃতি-ভেদ-রূপে বর্ণিত ; আবার বেদান্তে ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধের বিচারের মধ্যে উহারই কতকটা আভাস পাওয়া যায়। কার্টিসীয় দার্শনিকগণ আত্মা ও জড়ের বিভিন্নতা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহাদের সমন্বয়-সাধনে বৃথা প্রয়াস করিয়াছিলেন। জৈন-দর্শনে

জীব ও অজীব পরস্পর-বিভিন্ন মূল-তত্ত্ব। এই সমস্ত দ্বৈতবাদ ব্যতীত দার্শনিকগণ আরও অনেক দ্বৈত স্বীকার করিয়া থাকেন, যথা—সৎ-ও-অসৎ (Being and Non-Being), তত্ত্ব-ও-পর্য্যায় (Noumenon and Phenomenon) প্রভৃতি।

প্রাচীন গ্রীকগণ আর একটী সুপ্রসিদ্ধ বিভেদ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন,—তাহা গতি ও স্থিতির মধ্যে। হেরাক্লিটাসের শিষ্যগণের মতে স্থিতি একটা প্রকৃত তাত্ত্বিক ব্যাপার নহে, প্রতি পদার্থ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং এইরূপে প্রতি পদার্থ প্রতি মুহূর্ত্তেই গতিশীল, ইহা বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে আবার পার্ম্মেনিডিসের শিষ্যগণ বলিতেন,—গতি অসম্ভব, অপরিবর্ত্তনীয় স্থিতিই প্রকৃত তত্ত্ব। এই দুই পক্ষের বাদানুবাদ হইতে গতি ও স্থিতি, উভয়েরই সত্যতা ও তাত্ত্বিকতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা কেবলমাত্র তত্ত্ববিচারের পক্ষপাতী না হইয়া লোক-ব্যবহারের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা গতি ও স্থিতির মধ্যে কোনও একটীর সত্যতা একেবারে উড়াইয়া দিয়া, অপরটীর তাত্ত্বিকতা ঘোষণা করিতে পারেন না। জৈনগণ অনেকান্তবাদী; অতএব তাঁহারা যে গতি-কারণ ধর্ম্ম ও স্থিতি-কারণ অধর্ম্ম, উভয়েরই তাত্ত্বিকতা স্বীকার করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই।

ধর্ম্মের জন্য গতি ও অধর্ম্মের জন্য স্থিতি—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুইটীই সৎ-দ্রব্য, অজীবাখ্য অনাত্ম-তত্ত্বের অন্তর্গত। দুইটীই লোকাকাশ-ব্যাপী সর্ব্বগত ব্যাপক পদার্থ। মহাশূন্য অলোকে দুইটীরই অস্তিত্ব নাই। "ধর্ম্ম তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু,—ইহা নিয়ম-নিবদ্ধ গতি-পরম্পরার কারক বা কারণ,—জীব ও পুদ্গলের গতিসমূহের মধ্যে যে শৃঙ্খলা রহিয়াছে, ধর্ম্মই তাহার কারণ।"—এরূপ মনে করা বোধ হয়, যুক্তিসঙ্গত নহে। জৈন দর্শনের মতে জীব ও পুদ্গল, উভয়েই আপনা হইতে গতিশীল এবং ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় দ্রব্য; অতএব ধর্ম্ম বিশ্বের অন্তর্গত শৃঙ্খলার বিধায়ক, এরূপ বলা চলে না। অধর্ম্মও নিষ্ক্রিয় দ্রব্য। জীব ও পুদ্গল আপনা হইতেই স্থিতিশীল হয়। জগতে যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থিতি থাকে, তাহা হইলে অধর্ম্মকে তাহার কারণ বলিলে চলিবে না,—জীব ও পুদ্গলের স্বভাবই তাহার কারণ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে কোনটীই জগদনুপ্রবিষ্ট নিয়মের কর্ত্তা নহে। আবার উহাদের মধ্যে কোনটীকে অপরটীর "যুক্তিতঃ পূর্ব্বগামী (logically prior)" বলাও চলে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে একটী অপরটীর ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া করিতেছে এবং এই চির-বিরোধ বা অনন্ত-সংগ্রামের উপর বিশ্ব-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত, এরূপ মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে। গ্রীক দার্শনিকের উদ্ভাবিত "রাগ" (principle of love) ও "দ্বেষ" (principle of hate) এই দুইটীর সহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তুলনা করা চলে না। ধর্ম্মকে "বহির্মুখী-গতি-কারণ (principle "guaranteeing motion within limits") এবং অধর্ম্মকে "অন্তর্মুখী-গতি-কারণ" বা "মাধ্যাকর্ষণ-কারণ (principle of gravitation) বলিলেও, আমাদের মনে হয়—ভুল হইবে। পরমাণুকায়-সংরক্ষণে যে দুইটী পরস্পর-বিরোধী (positive and negative) তাড়িৎ-শক্তির ব্যাপার (electro-magnetic influences) পরিলক্ষিত

হয়, তাদৃশ পরস্পর-বিরোধী কোন তত্ত্বদ্বয়ের সহিতও ধর্ম্মাধর্ম্মের তুলনা করা চলে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় দ্রব্য ; যেমন "কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবহির্গামী গতি"র) centripetal and centrifugal forces) সহিত তাহাদের সাদৃশ্য নাই,—সেইরূপ তাহাদের উপর কোনও প্রকার ক্রিয়াকারিত্বের (dynamic energising) আরোপ করা চলে না।

জৈন-দর্শনে অধর্ম্মের অর্থ পাপ বা নীতিবিরুদ্ধ অপকর্ম্ম নহে। ইহা একটী সৎ অজীব তত্ত্ব ; বস্তুসকলের স্থিতিশীলতার ইহা অন্যতম কারণ। জীবসমূহ ও জড় বস্তুসকলের "স্থিতি-কারণ" বলিয়া ইহা বর্ণিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা অধর্ম্ম গতিশীল পদার্থকে থামাইয়া দেয়, এরূপ অর্থ সূচিত হয় না। অধর্ম্ম স্থিতির কারক-সহভাবী কারণ। দ্রব্যসংগ্রহকার ইহাকে "ঠাণজুদাণ ঠাণসহয়ারী" (স্থানযুতানাং স্থানসহকারী) অর্থাৎ স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি-সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতিবিষয়ে যাহা সাহায্য করে, বিশুদ্ধ-দর্শন জিনগণ তাহাকেই অধর্ম্ম বলিয়াছেন ; গো-গণের স্থিতিবিষয়ে পৃথিবী যেমন সাধারণ আশ্রয়, সেইরূপ জীব ও পুদ্গলসমূহের স্থিতি-ব্যাপারে অধর্ম্ম সাধারণ আশ্রয় (তত্ত্বার্থসার, তৃতীয় অধ্যায়, ৩৫।৩৬)।" গমন-শীল গো-সমূহকে পৃথিবী থামাইয়া দেয় না ; অথচ পৃথিবী না থাকিলে তাহাদের স্থিতিও অসম্ভব ; সেইরূপ অধর্ম্ম গতিশীল কোনও বস্তুকে থামাইয়া দেয় না ; অথচ অধর্ম্ম ব্যতীত গতিশীল পদার্থের স্থিতিও অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে, জৈন লেখকগণ অধর্ম্মের সহিত ছায়ারও তুলনা করেন। "ছায়া যেরূপ তাপদগ্ধ প্রাণিগণের এবং পৃথিবী যেরূপ অশ্বগণের,— অধর্ম্মও সেইরূপ পুদ্গলাদি দ্রব্যের স্থিতিকারণ।"

অধর্ম্ম "অকর্ত্তা" অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব। ইহা বস্তুসকলের স্থিতির হেতু বা কারণ হইলেও কদাপি ক্রিয়াকারী (dynamic or productive) কারণ নহে। এই জন্য অধর্ম্ম স্থিতির "বহিরঙ্গ হেতু" বা "উদাসীন হেতু" বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা "নিত্য" ও "অমূর্ত্ত" ; স্পর্শ, রস, গন্ধাদি গুণ ইহাতে নাই। এই সমস্ত বিষয়ে ধর্ম্ম, কাল ও আকাশের সহিত অধর্ম্মের সাদৃশ্য আছে। ইহার বিশিষ্ট গুণ আছে এবং ইহা বস্তু-স্থিতি-পর্য্যায়সমূহের আধার বলিয়া অধর্ম্ম একটী সৎ দ্রব্য। দ্রব্যত্ব-হিসাবে অবশ্য অধর্ম্ম জীব-সদৃশ। জীবের ন্যায় ইহাও অনাদ্যনন্ত ও অপৌদ্গলিক (immaterial)। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অধর্ম্ম অজীব অর্থাৎ অনাত্ম-দ্রব্য।

ধর্ম্ম, কাল, পুদ্গল ও জীবের ন্যায় অধর্ম্ম লোকাকাশের মধ্যেই অবস্থিত। অনন্তাকাশে ইহার অস্তিত্ব নাই। অধর্ম্ম বর্ত্তমান (অস্তি) ও প্রদেশবিশিষ্ট (কায়) বলিয়া পঞ্চ অস্তিকায়ের মধ্যে ইহা অন্যতম। একটী অবিভাজ্য পুদ্গল-পরমাণুদ্বারা যতটুকু স্থান অবরুদ্ধ হইয়া থাকে তাহার নাম 'প্রদেশ'। অধর্ম্ম লোকাকাশের সীমার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার প্রদেশসমূহ অনন্ত নহে ; এগুলি নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত বলিয়া ইহাদের শেষ আছে। জৈনগণ অধর্ম্ম, ধর্ম্ম ও জীবের প্রদেশসমূহকে "অসংখ্যা" অর্থাৎ সংখ্যাকরণের অযোগ্য বলিয়া থাকেন।

অধর্ম্ম উক্তরূপে "অসংখ্যেয়প্রদেশ" হইলেও ইহা এক—একটীমাত্র ব্যাপক পদার্থ। ইহা বিশ্বব্যাপী ("লোকাবগাঢ়") এবং বিস্তৃত ("পৃথুল")। ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মেরও প্রদেশ-সমূহ পরস্পরসংশ্লিষ্ট, সেই জন্য অধর্ম্ম একটী ব্যাপক সম্পূর্ণ ("স্পৃষ্ট") পদার্থ বলিয়া কথিত হয়। এই বিষয়ে কাল-তত্ত্বের সহিত অধর্ম্মের পার্থক্য আছে, কালাণুসমূহ পরস্পর-বিভিন্ন।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে কি মূলতঃ একই দ্রব্য বলা যাইতে পারে? উভয়েই লোকাকাশব্যাপী, অতএব উভয়েরই "দেশ" এক। উভয়েরই "সংস্থান" অর্থাৎ পরিমাণ এক। উভয়েই এক "কালে" স্থায়ী। দার্শনিক একই "দর্শন" অর্থাৎ প্রমাণের সাহায্যে উভয়েরই অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম "অবগাহন"তঃ এক অর্থাৎ উভয়ে পরস্পর গাঢ়-সংশ্লিষ্ট। উভয়েই তত্ত্ব-"দ্রব্য", অমূর্ত্ত ও জ্ঞেয়। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে দুইটী বিভিন্ন দ্রব্য গণনা না করিয়া, দুইটীকে একই দ্রব্য বলিলে দোষ কি? ইহার উত্তরে তত্ত্বার্থরাজ-বার্ত্তিককার বলেন,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কার্য্য বিভিন্ন; এই জন্য ইহারা বিভিন্ন দ্রব্য। একই পদার্থে, একই সময়ে রূপ, রস ও অন্যান্য ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তজ্জন্য রূপ-রসাদি ব্যাপারসমূহকে একই ব্যাপার বলিতে হইবে কি?

আকাশ-তত্ত্বকে গতি বা স্থিতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সত্তা অস্বীকার করা যায় না। অবকাশ অর্থাৎ স্থানদানই আকাশের লক্ষণ; নগরে যেরূপ গৃহাদি অবস্থিত, সেইরূপ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহ আকাশে অবস্থিত। যদি স্থাপনা ও চালনা আকাশের গুণ হইত, তাহা হইলে অনন্ত, মহাশূন্য, অলোকেও ঐ সকল গুণের অসদ্ভাব হইত না। অলোকাকাশে গতিস্থিতি সম্ভবপর হইলে লোকাকাশ এবং অনন্তাকাশে কোনও প্রভেদ থাকিত না। শৃঙ্খলাবদ্ধ লোক ও অনন্ত অলোকের পার্থক্য হইতেই বুঝা যায় যে, আকাশে গতি-স্থিতি-কারণত্বের আরোপ করা চলে না এবং গতিস্থিতির কারণ বা আধাররূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অবকাশ-দায়ক আকাশ ব্যতিরেকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কোন কার্য্য হইতে পারে না, ইহা সত্য; কিন্তু তজ্জন্য আকাশের সহিত যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কোনও প্রভেদ থাকিবে না, এমন কথা নাই বৈশেষিক দর্শনে দিক্, কাল ও আত্মা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আকাশ ব্যতিরেকে ইহাদের মধ্যে কাহারও কোন কার্য্য হইতে পারে না; অথচ ইহাদের সকলের হইতে আকাশের পৃথক্ সত্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি একই দ্রব্যে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যের আরোপ করা চলিত, তাহা হইলে ন্যায়দর্শন-সম্মত আত্মার নানাত্ব-বাদের যৌক্তিকতা কোথায়? এবং সাংখ্যদর্শন যে সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ নামে তিনটী বিভিন্ন গুণ প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া থাকেন, তাহাই বা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? উক্ত গুণত্রয়ের একটী, তিনটী বিভিন্ন প্রকারে কার্য্যকর হয়, ইহা বলিলেই তো চলিত। মূলতঃ বিভিন্ন কার্য্যসমূহের কারণ এক হইলে, সাংখ্যের পুরুষনানাত্ববাদও অপ্রতিপন্ন হয়। বৌদ্ধদর্শন রূপস্কন্ধ,

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ নামে পাঁচটী বিভিন্ন স্কন্ধের উল্লেখ করিয়া থাকেন; শেষোক্ত স্কন্ধ ব্যতিরেকে অন্যান্য স্কন্ধ অসম্ভব হইলেও বৌদ্ধগণ পাঁচটী স্কন্ধই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং একটী পদার্থ আর একটি পদার্থের উপর নির্ভর করিলেও যদি উভয়ের কার্য্যের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ থাকে, তাহা হইলে দুইটী পদার্থেরই পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিতে হয়।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অমূর্ত্ত দ্রব্য; অতএব তাহারা কিরূপে অন্য পদার্থের গতিস্থিতি-বিষয়ে সহায়ক হইবে?—এরূপ সংশয় করিবার কারণ নাই। দ্রব্য অমূর্ত্ত হইলেও কার্য্যকারী হইতে পারে। আকাশ অমূর্ত্ত হইয়াও অন্যান্য পদার্থকে অবকাশ প্রদান করে। সাংখ্যদর্শন-সম্মত প্রধানও অমূর্ত্ত; অথচ পুরুষের জন্য ইহার জগৎ-প্রসবিতৃত্ব স্বীকৃত হয়। বৌদ্ধদর্শনের বিজ্ঞান অমূর্ত্ত হইয়াও নাম-রূপাদি উৎপাদনের কারণ। বৈশেষিক-সম্মত অপূর্ব্বই বা কি? ইহাও অমূর্ত্ত; অথচ ইহা জীবের সুখদুঃখাদির নিয়ামক। সুতরাং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অমূর্ত্ত হইলেও কার্য্যকর, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সাধারণতঃ নৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; জৈন-দর্শনে উহারা দ্রব্য, দুইটী অজীব তত্ত্ব। কেহ কেহ ধর্ম্মাধর্ম্মের এই দুইটী অর্থের মধ্যে একটী সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পান,—উপসংহারে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। ধর্ম্ম গতি-কারণ ও অধর্ম্ম স্থিতি-কারণ। নৈতিক অর্থে ধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম ও অধর্ম্ম পাপকর্ম্ম। কাহারও কাহারও মতে, ধর্ম্মের 'গতি-কারণ' এই তাত্ত্বিক অর্থই আদিম ও সুপ্রাচীন; উত্তরকালে ইহা হইতেই ধর্ম্মের নৈতিক অর্থের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, জীবদ্রব্য স্বভাবতঃ "উড্ঢগঈ" (ঊর্দ্ধগতি)। অর্থাৎ বিশুদ্ধ-স্বভাবে ইহা যতই অবস্থিত হইবে, ততই ইহা ঊর্দ্ধগতি হইয়া লোকাকাশ-শিখরের দিকে অগ্রসর হইবে। ধর্ম্ম গতিকারণ; অতএব সুখময় ঊর্দ্ধলোকে গমনবিষয়ে যাহা জীবের সহায়ক, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। এ দিকে আবার পাপস্পর্শশূন্য পুণ্য কর্ম্ম করিয়াই জীব ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। এই কারণে যে ধর্ম্মশব্দ পূর্ব্বে জীবের ঊর্দ্ধগতিবিষয়ে যাহা সহায়ক, এই অর্থ প্রকাশ করিত, কালে তাহাই পুণ্যকর্ম্ম-বাচকরূপে পরিগণিত হইল। সেইরূপ, অধর্ম্ম জীবের স্থিতি-বিষয়ে সহায়ক, মূলতঃ এই অর্থের বাচক হইয়া, উত্তরকালে যদ্দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ থাকে, সেই পাপকর্ম্মের বাচক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই মতবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম শব্দের তাত্ত্বিক ও নৈতিক অর্থদ্বয়ের মধ্যে উপরে যে সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা যুক্তিগতও (logical) নহে, কালগতও (chronological) নহে। জীবের যে স্বাভাবিক ঊর্দ্ধগতি, শুধু সেই ঊর্দ্ধগতিবিষয়েই ধর্ম্ম সহায়ক, এরূপ মনে করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? জৈনদর্শনে ধর্ম্ম সর্ব্ববিধ গতিরই কারণ, ইহা বলা হইয়াছে। জীবের গতিবিষয়ে ইহা যেরূপ সাহায্যদান করে, পুদ্গলের গতিবিষয়েও ইহা সেইরূপ সহায়তা করে। সর্ব্ববিধ গতির কারণ ধর্ম্ম, জীবকে

শুধু ঊর্দ্ধগতিবিষয়েই সাহায্য করে, ইহাই বা কিরূপে মনে করা যাইতে পারে? যখন জীব জৈনসম্মত সপ্তসংখ্যক নরকসমূহের অন্যতমে গমন করে,—আমরা মনে করি,—জীবের সেই অধোগতি-ব্যাপারেও ধর্ম্ম সহায়ক। ধর্ম্মতত্ত্ব ঊর্দ্ধগতির যেরূপ সহায়ক, অধোগতির ঠিক সেইরূপই সহায়ক। সেই জন্য ধর্ম্মশব্দের 'গতি-কারণ' এই তাত্ত্বিক অর্থের সহিত উহার 'পুণ্যকর্ম্ম' এই নৈতিক অর্থের কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অধর্ম্ম সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, এই তত্ত্ব দুঃখময় সংসার অথবা যন্ত্রণাসঙ্কুল নরকসমূহে জীবের স্থিতি যেমন সম্ভবপর করে, তেমনই আবার আনন্দধাম ঊর্দ্ধলোকে জীবের স্থিতি-বিষয়ে সহায়তা করে। অতএব স্থিতিকারণ অধর্ম্মের সহিত পাপকর্ম্ম অধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার এ কথাও বলা যায় না যে, পুণ্যকর্ম্মসাধনে একটা প্রযত্নশীলতা থাকে এবং পাপকর্ম্মে একটা জড়তা বিদ্যমান, তজ্জন্য গতি-কারণ-বাচক ধর্ম্ম-শব্দের সহিত পুণ্যকর্ম্ম-বাচক ধর্ম্ম-শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে এবং স্থিতিকারণ-বাচক অধর্ম্ম-শব্দের সহিত পাপকর্ম্ম-বাচক অধর্ম্ম-শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে। জৈন-ধর্ম্ম-নীতিতে কেন, ভারতীয় প্রায় সমস্ত ধর্ম্মনীতিতেই ইহা একরূপ স্বীকৃত যে, পুণ্যবান্, সুকর্ম্মী বা ধর্ম্মসাধক ক্রিয়াবান্ না হইতেও পারেন। অচঞ্চল স্থিতি বা চির-গম্ভীর ধৈর্য্য ভারতীয় ধর্ম্মনীতির অনেক স্থলেই প্রশংসিত—এবং ইহাই সাধনার মূল ও লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ দিক্ দিয়া দেখিলে, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মই সমধিক পরিমাণে ধর্ম্মপোষক, ইহা বলা যাইতে পারে।

প্রকৃত কথা এই যে, গতি-স্থিতি-কারণরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের তাত্ত্বিকতা-স্বীকার জৈনদর্শনের একটী বিশিষ্টত্ব। উহাদের নৈতিক ও তাত্ত্বিক অর্থদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের প্রয়াস সর্ব্বথা বিফল বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য

"অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"-সম্পাদকের নিবেদন*

পদাবলী-সাহিত্যে অভিজ্ঞ, সুলেখক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় আমার সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত কতকগুলি প্রাচীন পদাবলী এবং ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় চণ্ডীদাস প্রভৃতি কয়েকজন প্রাচীন পদকর্ত্তার সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, উহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও গবেষণাপূর্ণ একটী প্রবন্ধ লিখিয়া, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ জন্য আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুকে এবং তাঁহার উক্ত প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে আমার কি বক্তব্য আছে, জানার জন্য উহা আমার নিকট প্রেরণ করায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য-শাখার সুযোগ্য সদস্য মহাশয়দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধের দফা অনুসারেই আমার বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

১। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকার ৵০—১৷০ পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালী পদকর্ত্তা কবিশেখর, বল্লভ, চম্পতি ও ভূপতিনাথের ভণিতাযুক্ত শতাধিক পদ বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐতিহাসিক ও ভাবগত প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল ভাষাগত সাদৃশ্য দর্শনেই বিদ্যাপতির পদ বলিয়া স্বীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার এই প্রবন্ধে আমাদিগের ঐ উক্তির সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রথম দফার সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বক্তব্য নাই। তিনি প্রথম দফার শেষভাগে রাধাবল্লভের ভণিতাযুক্ত যে একটা নূতন ধরণের খণ্ডিত পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে "আদ্যা", "যোগাদ্যা" ও "উলুকবাহন" কৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়; সুতরাং পদটীতে ধর্ম্মপুরাণের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীন কোনও বৈষ্ণব-পদেই কিন্তু আমরা এরূপ উল্লেখ পাই নাই; এ জন্য এই পদের রচয়িতা রাধাবল্লভ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা রাধাবল্লভ কি না, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছে। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা রাধাবল্লভের ১৭টী পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধাবল্লভের ঐ পদগুলির অধিকাংশই "ব্রজবুলী"র পদ; তিনি "ব্রজবুলী" পদরচনায় বেশ নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক পুথিখানি আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হওয়ার পরে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, এক আধটি প্রবন্ধে উহার উপযুক্ত বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব। লিপি-তত্ত্ব

---

* ১৩৩২।১৭ই জ্যৈষ্ঠ, প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ও ভাষা-তত্ত্বের বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথিখানির অসাধারণ প্রাচীনত্তা উত্তমরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। এ দিকে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত বহু পদাবলীও 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদ-কল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন পদ-সংগ্রহে দেখা যায় ; সুতরাং সেগুলিকেও অন্ততঃ দুই শত বৎসরের কম প্রাচীন বলা যাইতে পারে না। এখন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রধান বিচার্য্য বিষয় তিনটী ;—

(১) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রচয়িতা চণ্ডীদাসই প্রচলিত ও স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর আবিষ্কৃত নূতন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস কি না ?

(২) একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় কি না ?

(৩) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রচয়িতা চণ্ডীদাস ও প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাস বিভিন্ন ব্যক্তি হইলে, ঐ বিভিন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রসিদ্ধ পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া কাহাকে স্বীকার করিতে হইবে ?

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিংবা ১৩২৯ সনের পৌষ ও ১৩৩০ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় এই আলোচ্য বিষয়গুলির সম্বন্ধে যথারীতি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করেন নাই। পরমত খণ্ডন ও স্বমত-সংস্থাপন—তর্কের এই দুইটী প্রধান ও প্রসিদ্ধ অঙ্গ বটে ; তত্ত্বনির্দ্ধারণের জন্য এই দুইটীই একান্ত আবশ্যক। তার্কিকগণকে প্রায়শঃ প্রথমে পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক পরে স্বমত সংস্থাপনে যত্নবান্ হইতে দেখা যায়। আমরা ১৩২৯ সালের চৈত্রসংখ্যার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় হরেকৃষ্ণ বাবুর উত্থাপিত আপত্তিগুলির যথাসাধ্য সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিয়া, যে জন্য প্রচলিত চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলী আদি বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, আমাদের সেই আপত্তিগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ এবং হরেকৃষ্ণ বাবুকে উহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁহার পুনরালোচনায় আমাদিগের প্রদর্শিত আপত্তিগুলির রীতিমত আলোচনা না করিয়া, তাঁহার অনুকূল যুক্তিগুলিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। এ ভাবে তর্ক চালাইয়া কোনও লাভ নাই মনে করিয়াই আমরা তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধের পুনরালোচনা করি নাই। অতঃপর তিনি ১৩৩১ সালের ভাদ্র সংখ্যার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের উল্লিখিত "হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে" ইত্যাদি চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদটি প্রকাশিত করিয়া, ঐ পদের দ্বারাই তাঁহার সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সমর্থন হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এ যাবৎ যতগুলি আলোচনা হইয়াছে, উহার সকলগুলির একত্র আলোচনা করিয়া আমরা পরিষৎ-পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত এই চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রমাণ সম্বন্ধেও আলোচনা করিব, মনে করিয়াই আমরা তৎসম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করি নাই ; কিন্তু এখন হরেকৃষ্ণ বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত পদটী পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া, "চণ্ডীদাসের শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদিত গানই পরবর্ত্তী সংগ্রহগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে"—এইরূপ সিদ্ধান্ত করায়, আমাদিগকে সে সম্বন্ধেও দুই চারিটী কথা বলিতে হইবে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের আলোচনার সুবিধার জন্য এ স্থলেই আমরা অতিসংক্ষেপে চণ্ডীদাস-সংক্রান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাগুলির সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, মূল বিচার্য্য তিনটী বিষয়েরই মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু দামোদরস্বরূপ ও রায় রামানন্দের সহিত দিবারাত্র গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের নাটক ("জগন্নাথ-বল্লভ") ও পদাবলী এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত (বিল্বমঙ্গল-কৃত) গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতেন।* মহাপ্রভুর জন্মাবধি এ যাবৎ ৪৪০ বৎসর গত হইয়াছে; চণ্ডীদাস মহাপ্রভুরও আন্দাজ এক শতক পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন; সুতরাং মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিশেষ বিকৃতি ঘটে নাই এবং মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের যে পদগুলি আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলে, সেগুলিকে বাঙ্গালার আদি বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, এ কথা সমীচীন বটে। সুতরাং মহাপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের কোন্ পদগুলি কি ভাবে প্রচলিত ছিল, চণ্ডীদাস-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ বিষয়ে উহাও বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য।

প্রথমে হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত পদই ধরা যাউক। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলার ৩য় পরিচ্ছেদে আছে যে, সন্ন্যাসী অবস্থায় যখন শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেন, তখন আচার্য্য প্রভু বিদ্যাপতির—"কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটী গান করাইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করেন। অতঃপর—

"প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুরে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ॥
অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্‌গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥

তথাহি পদম্

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বহু প্রসিদ্ধ পদ সে সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে গীত হইত; সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত অবস্থায়, আচার্য্য প্রভু ও শ্রীমহাপ্রভু যে তাঁহাদিগের তৎকালীন

* চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥—চৈ-চ (মধ্য—২য় পরিচ্ছেদ)।

মনোভাবের ব্যঞ্জক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ গাহিয়া নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করিবেন, ইহা নিতান্ত সম্ভবপর বটে; কিন্তু অদ্বৈত প্রভু আর শ্রীমহাপ্রভু যে ঠিক ঐ দুইটী পদই গান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, যথাসময়ে রোজ-নাম্‌চা লিখিয়া না রাখিলে আমরা আজ যে গানটি শুনিলাম, কয়েক বৎসর পরে শুধু স্মরণ করিয়া উহা বলা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। অদ্বৈত প্রভু কিংবা শ্রীমহাপ্রভু তৎসময়ে শান্তিপুরে ভাবাবেশে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের যে পদটী গান করিয়াছিলেন, তাহা কোনও সাক্ষাৎ-শ্রোতা রোজনাম্‌চা করিয়া না রাখিলে, ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পরেই, ঐ গানের বিষয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্মৃতি ব্যতীত গানের ঠিক কথাগুলি সাক্ষাৎ-শ্রোতাদিগেরও স্মরণ থাকা সম্ভব বোধ হয় না। মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; এখানেই চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণিত আদি-লীলার শেষ। তার পরে মধ্যলীলা,—

"তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥
তাহাঁ যেই লীলা তার মধ্য-লীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান ॥"—(চৈ-চ; মধ্য, ১ম পরিচ্ছেদ)

এই মধ্যলীলার শেষ সময়ে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনের পথ ভুলিয়া রাঢ়দেশে উপনীত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমপূর্ণ কৌশলে তিনি শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর গৃহে সমানীত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার আন্দাজ ত্রিশ বৎসর বয়সের কালে অর্থাৎ ১৪৩৭ শকে এই শান্তিপুর-মিলন সঙ্ঘটিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের উপসংহার-শ্লোক ("শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥") হইতে জানা যায় যে, ১৫৩৭ শকে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। অতএব বর্ণিত ঘটনার ঠিক একশত বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামী এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে উক্ত ঘটনার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিবরণের রোজনাম্‌চা-লেখক কোনও বিশ্বস্ত সাক্ষাৎ-দ্রষ্টার নিকট হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে উল্লিখিত পদদ্বয়ের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই; সুতরাং তিনি যে কেবল তাঁহার সময়ের বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত শ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থূল ঘটনাবলীর মধ্যেও ঐতিহাসিক সমালোচক-দিগের অনুসন্ধানের ফলে আজকাল এত অসঙ্গতি ধরা পড়িয়াছে যে, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ-খানাকে শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের ও তাঁহার প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের একটী উৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ব্যতীত উহাকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রামাণিক জীবন-বৃত্তান্ত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। অতএব হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত পদটীর দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুকর্ত্তৃক উহা নিশ্চিতই আস্বাদিত হইয়াছিল, সুতরাং উহা চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না;

ইহা দ্বারা বড় জোর এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের উক্ত ঘটনার প্রায় একশত বৎসর পরে, কবিরাজ গোস্বামীর বৃদ্ধাবস্থার সময়ে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ঐ পদটী বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত ছিল। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত পদটী পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদরসসার, পদরত্নাবলী, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি কোনও প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহে কিংবা স্বর্গীয় রমণীবাবু বা নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে নাই। শ্রীমহাপ্রভুর দ্বারা সমাদৃত ও তৎকর্ত্তৃক গীত হওয়ার অসামান্য সৌভাগ্য লাভ করা সত্ত্বেও উক্ত পদটী যে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পদসংগ্রহ পুথিগুলিতে স্থান পায় নাই, ইহা হইতেও যদি কেহ অন্ততঃ ঐ পদের নবাবিষ্কৃত কলি তিনটীর প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাহা হইলে, এমন কি, কবিরাজ গোস্বামীর সময়েও সম্পূর্ণ পদটী এ ভাবে বর্ত্তমান ছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়ে। আমাদের বিবেচনায় ১৫৩৭ শকে এই পদটী যথাযথ ভাবে বর্ত্তমান ছিল, ইহা তর্ক-স্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও উহা দ্বারা বেশী কিছু আসে যায় না; বাশুলীভক্ত আদি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস প্রচলিত চণ্ডীদাস-ভণিতার পদাবলীর রচয়িতা নহেন, যদি ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট পদগুলির রচয়িতারা রামু শামুর মত নগণ্য লোক ছিলেন না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ঐরূপ ভাবপূর্ণ পদ-রচনা কেবল গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বংশীবদন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগের পক্ষেই সম্ভব বটে। ইহাঁরা প্রায় সকলেই শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী শতকের লোক এবং কবিরাজ গোস্বামীর প্রায় সমসাময়িক; সুতরাং আদিকবি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদাবলী শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ও পবিত্র বৈষ্ণব-মতাবলম্বী বঙ্গসমাজে ভাষা ও ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হেতু শ্রোতৃবর্গের দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রীতিকর হইয়া পড়িলে যখন কীর্ত্তন-গায়কগণ শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য নিরুপায় হইয়াই তৎকালীন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলী আত্মসাৎ করিয়া, চণ্ডীদাসের নাম দিয়া চালাইতে আরম্ভ করেন, তখন হইতেই চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলীর উদ্ভব হইতে থাকে। গোবিন্দদাস পরবর্ত্তী সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা হইলেও, তাঁহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদ ব্রজবুলীর রচনা বলিয়া, তাঁহার উপর কীর্ত্তন-গায়কদিগের বেশী দৌরাত্ম্য খাটে নাই। জ্ঞানদাস, রায়শেখর ও বংশীবদনের বাঙ্গালা পদগুলি ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের গভীরতার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া, তাঁহাদিগের উপরই অধিক অত্যাচার হইয়াছে। সে সময়ে সংবাদপত্রের প্রচার ছিল না; সুতরাং কখন কোন্ কীর্ত্তনিয়া তাঁহাদিগের কোন্ পদটীতে চণ্ডীদাসের ভণিতা যোগ করিয়া কোথায় গান করিল, যথাসময়ে জানিবার বা জানিয়া উহার প্রতিবাদ করার কোনও সুবিধা ছিল না; সুতরাং উক্ত পদকর্ত্তারা কিংবা তাঁহাদিগের শিষ্যগণ যে এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণবোচিত উদারতাবশতঃ ঔদাসীন্যই প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কারণ নাই। এরূপ স্থলে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াদিগের ব্যবহার ও অনুকরণ-মূলে জ্ঞানদাস প্রভৃতির কতকগুলি পদ সকলের নিকট নির্ব্বিবাদে চণ্ডীদাসের বলিয়া প্রচলিত হইলেও, প্রাচীন

পদ-সংগ্রহের সঙ্কলয়িতা ও লিপিকারদিগের সত্যপ্রিয়তার জন্ম কতকগুলি পদের ভণিতায় প্রকৃত পদকর্ত্তার নামই রহিয়া গিয়াছে, এবং উহার দ্বারাই এখন এই পরস্বাপহরণ-রহস্যের একটু ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ ভাগবত-টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে পদকর্ত্তা হরিবল্লভ ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন লোক; তাঁহার সঙ্কলিত "ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি" গ্রন্থে চণ্ডীদাস-ভণিতার একটী পদও নাই। পদকর্ত্তা দীনবন্ধু দাসও অন্যূন দুই শত বৎসরের প্রাচীন লোক; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক দীনবন্ধু দাসের সঙ্কলিত "সংকীর্ত্তনামৃত" নামক যে বৃহৎ পদ-সংগ্রহগ্রন্থ সম্পাদিত হইতেছে, উহাতেও চণ্ডীদাসের কোন পদ নাই; অথচ কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসরের প্রাচীন "পদামৃতসমুদ্র" ও "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রায় সকল উৎকৃষ্ট পদগুলিই পাওয়া যায়; ইহা দ্বারাও কি ইহাই অনুমিত হয় না যে, চণ্ডীদাসের 'পূর্ব্বরাগ' 'অনুরাগ' প্রভৃতি বিষয়ের অধিকাংশ প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলী ২০০ কি ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে কীর্ত্তন-গায়ক-সমাজে অজ্ঞাত ছিল?

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের পদাবলী কি ভাবে প্রচলিত ছিল, আমরা মহাপ্রভুর সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর প্রসিদ্ধ "বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী" টীকা হইতে উহার একটা সুন্দর আভাস পাইয়াছি। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা" ইত্যাদি ২৬ সংখ্যক শ্লোকের "কাব্যকথা-শ্রয়ঃ" বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন,—"কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীত-গোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।" ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, আদি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের কাব্যে "দান-খণ্ড" ও "নৌকাখণ্ড"ই প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল। "পদামৃতসমুদ্র" ও "পদকল্পতরু"তে নানা পদকর্ত্তার দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটী পদও নাই;—ইহা দ্বারা কি নীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের ভাব-বৈচিত্র্যহীন পদাবলী আধুনিক ও অপর কোনও অপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া অনুমিত হয় না? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদাবলী পদ-কল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধৃত না হওয়ার কারণ কিন্তু বুঝা কঠিন নহে। ভাষা ও ভাবের বৈষম্য হেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের খাঁটি পদাবলী বাঙ্গালার শ্রোতৃসমাজের অনুপযোগী এবং তজ্জন্য ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানির প্রচার বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায়ই যে, উহার পদগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহে স্থান পায় নাই, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

এখন মূল আলোচ্য বিষয় তিনটী ধরা যাউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া লইয়া, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরচয়িতা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় কি না, ইহাই প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বটে। দুঃখের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সুবিজ্ঞ সম্পাদক বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যে এ

বিষয়ের রীতিমত আলোচনা করেন নাই। তথাপি তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যের নিম্নলিখিত অংশগুলি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য,—"চণ্ডীদাস যে একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন, পদাবলীর পাঠকমাত্রেই সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'তোর রতি আশোআসে,' 'যদি কিছু বোল বোলসি,' 'তনের উপর হারে,' 'নিন্দয়ে চান্দ চন্দন' প্রভৃতি পদ জয়দেবের অনুকরণ; অনুকরণ হইলেও কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য সূচিত করে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিঞ্চিদধিক ১২৫টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া যায়। ওগুলি চণ্ডীদাসের স্বরচিত, গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত নহে। 'চতুরে চতুরো মাসান্‌' কবিতাটিতে উত্তরমেঘের "মাসানেতান্‌ গময় চতুরঃ" শ্লোকের সুর কানে বাজে। যাঁহারা পদাবলীতে উপমার অল্পতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনে উহার প্রয়োগবাহুল্য ও বিবিধ ছন্দের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।" (সম্পাদকীয় বক্তব্য, ২৫-২৬ পৃষ্ঠা)।

"চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 'রাধার কলঙ্কভঞ্জন' ও 'কৃষ্ণের জন্মলীলা' নামক পুথির কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ দুইটিতে প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাসের কবিতার কোন লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই নাই।"—(ঐ ২৬ পৃষ্ঠা)। "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও বিদ্যাপতি, মাধব কন্দলি, শঙ্করদেব, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক কবিগণের ভাষাতে সাদৃশ্য আছে। গুণরাজ খান, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাসের ভাষাতেও কিছু কিছু আছে। প্রমাণ হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথিতে প্রাপ্তব্য। 'বঁধু কি আর বলিব আমি' পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক—একেবারে হালী। উহা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। সুতরাং কোন ক্রমেই চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"—(ঐ, ৩৫ পৃষ্ঠা)।

"পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম প্রহর নিশি' পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে।"—(ঐ, ৩৫।৩৬ পৃষ্ঠা)।

বসন্তবাবুর প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অভিজ্ঞতা ও তাঁহার ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের উপর আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও আমরা বিনীতভাবে বলিতে বাধ্য যে, 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থখানি কবি চণ্ডীদাসের প্রথম বয়সের রচনা আর পদাবলী তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা, বসন্তবাবুর এই উক্তির কোন মতেই সমর্থন করিতে পারি না। কালিদাস, সেক্ষপীয়র প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকবিদিগেরও প্রথম বয়স ও পরিণত বয়সের রচনায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়; কিন্তু তাহা সত্বেও "ঋতুসংহার" কাব্য কিংবা "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটক যে রঘুবংশ শকুন্তলাকার কালিদাসের ব্যতীত অন্য কোন সংস্কৃত কবির রচনা নহে—তাহা বুঝিতে বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে কোনও বাধা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তন ও চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর সম্বন্ধে কি সে কথা বলা যাইতে পারে? কৃষ্ণকীর্ত্তনের "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" ইত্যাদি শুধু একটীমাত্র পদ নীলরতন বাবুর সংস্করণের "প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদে যেরূপ

রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বহুগুণে অধিক রূপান্তরিত-ভাবেও আর কোনও পদ পাওয়া গিয়াছে কি ? ভাষা বিচারের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বন বসন্তবাবুর অনুসৃত পারিপার্শ্বিক প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির ভাষার সাহায্যে আলোচনা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সহিত পদাবলীর "সই কেবা শুনাইলে শ্যামনাম", "বঁধু কি আর বলিব আমি," "আজি কে গো মুরলী বাজায়" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীর ভাষার ব্যবধান অন্ততঃ তিন শতাব্দীর কম বলিয়া মনে করা যায় না। উভয়ের মধ্যে ভাবগত ও রস-গত পার্থক্য যে আরও কত বেশী, তাহা বলা আরও কঠিন। কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, উহার কবি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, অসাধারণ রসজ্ঞ এবং বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ গীতি-নাট্যের রচয়িতা হইলেও প্রেমাবতার শ্রীমহাপ্রভুর অনর্পিতচর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার সজ্ঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পক্ষে তাঁহার নামে প্রচারিত অনন্যসাধারণ ভাব ও প্রেমের পরাকাষ্ঠাপূর্ণ পদাবলী রচনা করা কখনও সম্ভবপর হইত না।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে আমরা পূর্ব্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসারানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি যে রসের ধারা দেখিতে পাই, উহা "উজ্জ্বল-নীলমণি" প্রভৃতি শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী রস-শাস্ত্রেরই নিজস্ব। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী "গীতগোবিন্দ", "কৃষ্ণকীর্ত্তন" বা বিদ্যাপতির পদাবলীতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না; পাওয়ারও কথা নহে। আমরা প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে যে অনন্যসাধারণ ভাব ও প্রেমের উৎকর্ষ দেখিতে পাই, শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় অলৌকিক চরিত্র দ্বারা উহার স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত না করিলে অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈষ্ণব কবিগণের পক্ষেও তাহা এরূপ সহজ ও সুন্দররূপে চিত্রিত করা সম্ভব হইত না। হরেকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় পদাবলীভক্ত সুধী ব্যক্তিও কেন যে, শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমময় জীবন ও তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের এই অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্যটা লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার জন্মের অন্যূন একশতাব্দী পূর্ব্বের অনুর্ব্বর কণ্টকাকীর্ণ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে 'বসোরা' গোলাপের তুল্য অতুলনীয় বৈষ্ণবপদাবলীর উৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা যে কবির অপরিণত বয়সের রচনা নহে এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণিত কথাবস্তু ও রসের ধারার সহিত পদাবলীর বর্ণিত লীলা ও রস-পর্য্যায়ের কিরূপ মৌলিক পার্থক্য, আমরা ১৩২৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে উহা সবিস্তারে প্রদর্শিত করিয়াছি। আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে ঐ প্রবন্ধ ও তৎসঙ্গে আমাদের "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"র ভূমিকার ১৷৵০—১৸৵০ পৃষ্ঠা ও ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় "চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উত্তর" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা এখানে ঐ আলোচিত বিষয়ের অনাবশ্যক পুনরালোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য কি না, এই দ্বিতীয় বিচার্য্য সম্বন্ধে আমাদের

বক্তব্য এই যে, চণ্ডীদাস-রচিত "কলঙ্কভঞ্জন" ও "শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা" প্রবন্ধ দুইখানা পাঠ করিলে, উহাদের রচয়িতা চণ্ডীদাস যে পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস নহেন, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা চণ্ডীদাস, পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা) প্রবন্ধেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার ঐ মতের সমর্থন করি। চণ্ডীদাসের একটী রাগাত্মিক পদে ভণিতা আছে,—"আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়।"—(রমণীবাবুর ৩য় সংস্করণ, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)। ইহা দ্বারাও একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। অনেক সুধী ব্যক্তি "চণ্ডীদাস" নামটী "জগৎশেঠ" বা "জগৎগুরু—শঙ্করাচার্য্য" নামের মত কৌলিক উপাধির সূচক বলিয়া মনে করেন; বস্তুতঃ অতদূর না যাইতে পারিলেও অনেক নগণ্য ও নিকৃষ্ট পদে ও পয়ারে আমরা সুপ্রসিদ্ধ "বড়ু চণ্ডীদাস" নামের পরিবর্ত্তে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ও "দীন চণ্ডীদাস" ভণিতা পাইয়া—এই দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস যিনি বা যাঁহারাই হউন না কেন, তিনি বা তাঁহারা মহাকবি বড়ু চণ্ডীদাস হইতে স্বতন্ত্র, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এরূপ একাধিক চণ্ডীদাস স্বীকার করিলেই মূল বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা হয় না। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা, সুপণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ গীতিনাট্য-রচয়িতা চণ্ডীদাস ও অতুলনীয় গীতি-কাব্য বৈষ্ণব-পদাবলীর রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস যদি বিভিন্ন ব্যক্তিই হইবেন, তবে শেষোক্ত চণ্ডীদাস কখন, কোন্ দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ের সাহিত্য ও সমাজের বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ অপ্রাপ্য নহে। তৎসময় এরূপ অদ্বিতীয় বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা কোনও চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হইয়া থাকিলে—বৈষ্ণব-সাহিত্যে ঘুণাক্ষরেও তাঁহার উল্লেখ নাই কেন? এই সঙ্গত ও অখণ্ডনীয় আপত্তির মীমাংসার জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস শ্রীমহাপ্রভুর কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ও পদাবলীর চণ্ডীদাস তাঁহার আন্দাজ এক শতাব্দী পরে জন্মিয়াছেন—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার একটী প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৯ সালের চতুর্থ সংখ্যা) কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরচয়িতা আদি চণ্ডীদাসকে ১২শ শতকের "গীতগোবিন্দ"রচয়িতা জয়দেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। পদাবলীর চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা বলেন নাই। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি শ্রীমহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতাব্দী পূর্ব্বের চণ্ডীদাস কি না? যদি হরেকৃষ্ণবাবুর মত তাহাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে আমরা ভাষাগত ও ভাবগত যে সকল অনৈক্য ও অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিয়াছি, উহার কোনই মীমাংসা হয় না। চণ্ডীদাসকে মহাপ্রভুর এক আধ শতাব্দী পরবর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইলে ঐ ভাষাগত ও ভাবগত আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্পষ্টতঃ ঐতিহাসিক প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং একাধিক অপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসেরঅস্তিত্ব স্বীকার করিলেও মহাকবি চণ্ডীদাস যে একজন ব্যতীত দুইজন নহেন, ইহা অস্বীকার করার

উপায় নাই। এ অবস্থায় উপযুক্ত প্রমাণাভাবে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণ করিতে না পারিয়া, আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনরচয়িতা চণ্ডীদাসকেই শ্রীমহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতাব্দী পূর্ব্বের লোক এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীই তাঁহার খাঁটি রচনা, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেই বাধ্য হইয়াছি। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমরাই এই অভিনব মতের প্রথম প্রচারক নহি। আমরা পরিষৎ-পত্রিকায় "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত করার আন্দাজ দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগত মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ মুখবন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; আমরা তাহার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"একই চণ্ডীদাস কখনও এই দুই রকমের ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? দুইজন বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল? কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই।"

হরেকৃষ্ণবাবু দেখাইয়াছেন যে, আমরা চণ্ডীদাসের অনেক গানে অন্য কবির ভণিতা দেখিয়া, উহা প্রকৃতপক্ষে কাহার পদ, সে সম্বন্ধে কোন বিচার-বিতর্ক না করিয়াই সেগুলি অন্যান্য কবির নামে পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত করিয়াছি। বস্তুতই "পদরসসার," "পদ-রত্নাকর" প্রভৃতি পুঁথিতে কতকগুলি পদে এরূপ ভণিতার বিপর্য্যয় দেখা যায়। ঠিক্ ঐ পদগুলিই রমণীবাবু কিংবা নীলরতন বাবুর সংস্করণে অবিকল ভাবে চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে কি না, তৎসময় আমরা উহা লক্ষ্য করি নাই। আমাদের নীলরতন বাবুর সংস্করণটী অপহৃত হওয়ায় এবং উহা এখন অপ্রাপ্য হওয়ায় সময়াভাবে আমরা এখন ঐ সংস্করণটী সংগ্রহ করিয়া মিলাইয়া দেখিতে পাইলাম না। ঐ পদগুলি অবিকলভাবে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে নিশ্চিতই আমরা উহা অপ্রকাশিত পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিতাম না; কিন্তু এইরূপ ভণিতার বিপর্য্যয় হইতেই পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবিদিগের কতকগুলি প্রসিদ্ধ পদ যে, কীর্ত্তনিয়াগণকর্ত্তৃক কিরূপে চণ্ডীদাসের নামে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় বলিয়া, আমরা উহা আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের পোষক প্রমাণস্বরূপ ভূমিকায় অবশ্যই উল্লেখ করিতাম। যাহা হউক, হরেকৃষ্ণবাবু এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। অন্য কোন্ কোন্ পদকর্ত্তার কোন্ কোন্ এবং কতগুলি পদে এভাবে চণ্ডীদাসের ভণিতা-সংযোগ ঘটিয়াছে—চণ্ডীদাস-সমস্যার সুমীমাংসার জন্য উহা বিশেষভাবে আলোচ্য বটে। আমরা ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র একটা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ইচ্ছুক রহিলাম। ভরসা করি, হরেকৃষ্ণ

বাবুও তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন পুথিগুলির সাহায্যে এই কৌতূহলজনক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টীর উপরে আরও নূতন আলোক বিকীর্ণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলী আসল নহে, উহা নকল—ইহা বলা যত সহজ,—কিরূপে, কখন ও কাহার দ্বারা ঐ নকল পদাবলী রচিত ও প্রচারিত হইল, তাহা বলা সেরূপ সহজ নহে। যদি পদকর্ত্তারা সকলেই স্বরচিত পদাবলীর স্বহস্ত-লিখিত সন-তারিখযুক্ত লিপি রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এখন সেই লিপিগুলির তুলনা করিয়া পদাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য ও কৃতিত্ব অনেকটা নিরূপিত হইতে পারিত। পদকর্ত্তারা সেরূপ করেন নাই; কাজেই এখন এই বিষয়টা ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সমসাময়িক একদেশীয় একই সম্প্রদায়ভুক্ত পদকর্ত্তাদিগের পদাবলীর ভাষা কিংবা ভাব দর্শনে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা একরূপ অসম্ভব। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষা ও ভাবের মধ্যেও অনেক স্থলেই এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায় যে, অনেক সময়ে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে কোন্‌টী কাহার রচনা, চিনিয়া লওয়া বিশেষজ্ঞদিগের পক্ষেও অসম্ভব বোধ হয়। অভিজ্ঞ পদাবলীপাঠক মাত্রেই জানেন যে, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, লোচনদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের প্রত্যেকেরই দশ পাঁচটী করিয়া এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ আছে—যাহা ভাষা কিম্বা ভাবে চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাবলীর সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত উত্তম, মধ্যম ও অধম—তিন রকমের আট নয় শত পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট পদাবলীর সংখ্যা চল্লিশ পঞ্চাশটীর বেশী হইবে না; সুতরাং চণ্ডীদাসের নামে নকল, কিন্তু উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রচারিত হওয়া বিষয়টা আপাততঃ যেরূপ অসম্ভব বা দুর্ব্বোধ্য মনে হয়, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে সেরূপ মনে হইবে না।

৩। হরেকৃষ্ণ বাবুর ৩ দফার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের কয়েকটা বিচিত্র পদ পূর্ব্ব-প্রকাশিত হইলেও পাঠ-বিভ্রাট ও ছন্দের বিপর্য্যয় হেতু সেগুলির সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ায়, আমরা জানিয়া শুনিয়াই পদরত্নাবলীতে সেগুলির যথাসম্ভব শুদ্ধ পাঠান্তর, ছন্দের মাত্রা-বিশ্লেষণ সহ প্রকাশিত করিয়াছি এবং ভূমিকায়ও তাহার উল্লেখ করিয়াছি। হরেকৃষ্ণ বাবু "রাধে জয় রাজপুত্রি" ইত্যাদি পদ যে বদনের নহে, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার সম্পূর্ণ আনুমানিক মন্তব্যের প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক।

৪। হরেকৃষ্ণ বাবু আমাদিগের অপ্রাপ্ত যদুনাথ দাসের "সুবল-মিলন" লীলার পদগুলি পাইয়াছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। তিনি উহার একটা পদ দিয়াছেন। আশা করি, বাকি পদগুলিও প্রকাশ করিয়া যদুনাথের অসম্পূর্ণ পালাটী পূর্ণ করিবেন।

৫। দফার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, "জলে" শব্দের সহিত "তলে" শব্দেরই ভাল মিল হয়। সুতরাং প্রথম চরণের "সই কেন গেলাম যমুনার জলে" পাঠই ছন্দের হিসাবে নির্দ্দোষ বটে। আমরা এই নির্দ্দোষ পাঠান্তরটা না পাওয়ায়ই যথাপ্রাপ্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। তথাপি এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রাপ্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের—

"নন্দের নন্দন চাঁদ　　পাতিয়া মোহন ফাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে ॥"

পাঠ অপেক্ষা আমাদের প্রাপ্ত—

"নন্দের দুলাল চাঁদ　　পাতিয়া মোহন ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে ॥"

পাঠই সমীচীন মনে হয়। "ব্যাধ ছলে" পাঠ স্বীকার করিলে, উক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে রূপকের পরিবর্ত্তে অপহ্নুতি অলঙ্কার ঘটিয়া থাকে। অপহ্নুতি অলঙ্কারের স্থলে সর্ব্বত্রই উপমেয় বা প্রকৃত বস্তুটীর পরে উহার 'অপহ্নব' অর্থাৎ সঙ্গোপনসূচক "ছলে" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উপমেয়ের সঙ্গোপনপূর্ব্বক উপমান বা অপ্রকৃত বস্তুটীরই সত্তা প্রখ্যাপিত করা হইয়া থাকে। এখানে নন্দের দুলাল বা নন্দনই উপমেয় বা প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়,—ব্যাধ উপমান বা অপ্রকৃত বিষয়। কবি এখানে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লাস্য-লীলারূপ প্রকৃত বিষয়টী সঙ্গোপিত রাখিয়া উহাকে অপ্রকৃত ব্যাধের মৃগ-পক্ষী ধরার মোহন-ফাঁদরূপে প্রখ্যাপিত করিয়াছেন; সুতরাং "ব্যাধের ছলে নন্দ-নন্দন ফাঁদ পাতিয়া ছিল" এইরূপ অসঙ্গত কথা না বলিয়া, "নন্দনন্দনের ছলে ব্যাধ ফাঁদ পাতিয়া ছিল"—ইহা বলাই একান্ত আবশ্যক ছিল; সেরূপ না বলায়, উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে রূপক অলঙ্কারই কবির অভিপ্রেত; সুতরাং 'ছিল' ছাড়া 'ছলে' পাঠ হইতে পারে না, ইহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে।

হরেকৃষ্ণ বাবু দানলীলার "এই মনে বনে দানী হইয়াছ" ইত্যাদি গোবিন্দদাসের যে পদটী (পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার ২৫শ পল্লবের ৩০ সংখ্যক পদ) উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই পদের সহিত পদরত্নাবলীর ৩৬৯ সংখ্যক বংশীবদনের পদের কেবল একটী কলি (ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ইত্যাদি,) অভিন্ন,—তা ছাড়া বাকী কলিগুলির মধ্যে কিছুমাত্র ঐক্য নাই। এই পদকর্ত্তা বংশীবদন গোবিন্দ কবিরাজেরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত "গৌরপদতরঙ্গিণী" গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। গোবিন্দদাসের "এই মনে বনে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পদের ও বংশীবদনের "ছুইয় না ছুইয় না" ইত্যাদি পদের মধ্যে যে কলিটা অভিন্ন, তাহা বংশীবদন গোবিন্দদাসের পদ হইতে লইয়াছেন, এরূপ অনুমান অসম্ভব। গোবিন্দদাসের মত বিখ্যাত কবিই বা অন্যের পদের একটা কলি আত্মসাৎ করিতে যাইবেন কেন? কীর্ত্তনগায়ক বা পদের লিপিকারদিগের ভ্রম-প্রমাদ হেতুই একটা কলি এ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে—ইহাই একমাত্র সমীচীন অনুমান বটে। হরেকৃষ্ণ বাবুর উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের "তোঁহারি হৃদয় বেণি বদরিকাশ্রম" ইত্যাদি প্রত্যুত্তরের পদটীও পদকল্পতরুতে "এই মনে বনে" ইত্যাদি পদের অব্যবহিত পরেই সন্নিবেশিত দেখা যায়। গোবিন্দদাসের এই দুইটী পদের প্রামাণিকতা আমরা অস্বীকার করি না। হরেকৃষ্ণ বাবু বংশীবদনের পূর্ব্বোক্ত ত্রিপদীর পদটীতে একটীমাত্র কলির ঐক্য দেখিয়া, ঐ সম্পূর্ণ পদটী কেন অগ্রাহ্য করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

হরেকৃষ্ণবাবু বংশীবদনের পদে যে লঘুত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের গোলযোগের কথা

লিখিয়াছেন, প্রাচীন অনেক পদকর্ত্তার একাধিক পদে আমরা এরূপ ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাইয়াছি ; ইহা দ্বারা ঐ সকল পদের কৃত্রিমতা ও আধুনিকতা প্রমাণিত না হইয়া বরং সেগুলির অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতাই প্রমাণিত হয়।

৬। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক উৎকলবাসী ভক্ত কানাই খুঁটিয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে ; কিন্তু তিনিই পদরত্নাবলীর ৪৩৪ সংখ্যক "মনচোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে" ইত্যাদি বাঙ্গালা পদের রচয়িতা কানাই খুঁটিয়া কি না, সে সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এ জন্যই আমরা পদরত্নাবলীর ভূমিকায় কানাই খুঁটিয়ার সম্বন্ধে বৈষ্ণবসাহিত্যানুরাগীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কেবল নাম-সাদৃশ্য দর্শনে উৎকলবাসী কানাইকে বাঙ্গালা-পদকর্ত্তা বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। আশা করি, ওড়িয়া সাহিত্যে সুপণ্ডিত কোনও বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া, পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসের একটা সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিবেন। উৎকল-সাহিত্যে কানাই খুঁটিয়ার অনুসন্ধান করিবার সময়ে রাধামোহন ঠাকুরের কৃত "পদামৃতসমুদ্রে"র সংস্কৃত টীকায় উল্লিখিত রাজা প্রতাপরুদ্রের ভূতপূর্ব্ব মহাপাত্র "রায় চম্পতি" নামক প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তার সম্বন্ধেও বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। চম্পতির রচিত ব্রজবুলী ও বাঙ্গালা—উভয়বিধ পদই পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। এ দিকে আবার তাঁহার ব্রজবুলীর পদগুলি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "চম্পতি" বিদ্যাপতিরই একটা উপাধি মনে করিয়া, তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চম্পতির "অখিল-লোচন-তম-তাপ-বিমোচন" (প-ক-ত,৪৮০ সং), "সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা (প-ক-ত, ৪৮১ সং) ইত্যাদি ব্রজবুলীর পদগুলি অতি প্রসিদ্ধ।

হরেকৃষ্ণবাবু মাধব ও দ্বিজ পরশুরামের রচিত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল", "মাধবী" ভণিতাযুক্ত "রস-পুষ্টি-মনোশিক্ষা" ও নটবরের কৃত পাণ্ডবগীতার অনুবাদ পুথিগুলির সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ভরসা করি, তিনি সময়ান্তরে পরিষৎ-পত্রিকায় ঐ পুথিগুলির একটু বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়া আমাদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবেন।

৭। হরেকৃষ্ণবাবুর ৭ দফা সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।

৮। হরেকৃষ্ণবাবু পদরত্নাবলীর উল্লিখিত ও প্রকাশিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব ২৮ জন পদকর্ত্তার মধ্যে "কাশীদাস", "বীরবাহু", "রাজচন্দ্র" ও "ভাগবতানন্দের" পদগুলি "পদকল্পলতিকা" গ্রন্থে অবিকল উদ্ধৃত দেখিতে পাইয়াছেন। পদরত্নাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরে আমরাও উহা লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদিগের অপ্রণিধানবশতঃই ঐ পদগুলি পদরত্নাবলীতে পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। তবে পদরত্নাবলীর ও পদকল্পলতিকার ঐ পদগুলির মধ্যে দুই একটা কলির কম-বেশও দেখিতে পাওয়া যায়। পদগুলি পদরত্নাবলীতে দেওয়ায় বোধ হয়, পাঠ-বৈষম্যের বিচারের পক্ষে সুবিধাই হইবে।

৯-১০। হরেকৃষ্ণবাবুর ৯ ও ১০ দফার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

১১। হরেকৃষ্ণবাবুর ১১ দফার সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 'তুক' বা 'তুক্কো' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? হরেকৃষ্ণবাবু পদাবলীর আদি জন্মভূমি বীরভূমের অধিবাসী। বীরভূম অঞ্চলে যত প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয়, আর কোথায়ও নহে। "তুক্কো" গানগুলি রীতিমত পদ না হইলেও প্রায়ই খুব প্রাচীন এবং ভাষা, ভাব ও রসের হিসাবে অতি উপাদেয়। সেগুলি সযত্নে সংগৃহীত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। ভরসা করি, হরেকৃষ্ণবাবু রাঢ় দেশের প্রচলিত "তুক্কো"গানগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের একটা চিরস্মরণীয় উপকার করিবেন।

১২। হরেকৃষ্ণ বাবু ১২ দফায় অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার একটা তালিকা দিয়া এ সম্বন্ধে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিকট পদকল্পতরুর পদসূচী ও পদকর্ত্তৃগণের সূচী প্রস্তুত না থাকাতেই বোধ হয়, তাঁহার তালিকায় কয়েকজন পূর্ব্ব-পরিচিত পদকর্ত্তার নামও লিখিত হইয়াছে। তালিকায় জগদানন্দ ঠাকুর ও নয়নানন্দ ঠাকুরের নাম কেন দেওয়া হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না; ইহাঁরা সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা এবং ইহাঁদের বহু উৎকৃষ্ট পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে অবশ্যই একাধিক জগদানন্দ ও নয়নানন্দ থাকা অসম্ভব নহে। হরেকৃষ্ণ বাবুর এই জগদানন্দ ও নয়নানন্দ যে নূতন পদকর্ত্তা, তাহার কোনও প্রমাণ আছে কি? তালিকার গোকুলানন্দ নাম নূতন নহে। গোকুলানন্দের একটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। (প-ক-ত, ২৩৫১ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। পদকল্পতরুতে "কৃষ্ণকান্ত", "গোপীকান্ত" ও "রামকান্ত"—তিনজন কান্তেরই পদ আছে। সম্পূর্ণ নামের পরিবর্ত্তে সুবিধার জন্য নামের একাংশ গ্রহণের রীতি এ দেশে পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। পদকল্পতরুতে এরূপ নাম-সংক্ষেপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষ প্রমাণের অভাবে এরূপ স্থলে শুধু 'কান্ত' 'দাস' ভণিতা দেখিয়াই নূতন পদকর্ত্তার অস্তিত্ব স্থির করা সঙ্গত হইবে না।

হরেকৃষ্ণবাবুর "যাদবেন্দ" পদকল্পতরুর পরিচিত পদকর্ত্তা "যাদবেন্দ্র" বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে। পদকল্পতরুতে "হরিদাস" (২৩৪২।৩০১৪ পদের রচয়িতা) ও "দ্বিজ হরিদাস" (১২৯।২৯৮।১৪৬৮।১৪৬৯ পদের রচয়িতা) ভণিতার পদ আছে। হরেকৃষ্ণ বাবুর "হরিদাস" যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহার কি প্রমাণ আছে? অবশিষ্ট নামগুলির মধ্যেও 'ভবানীদাস' বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন; তবে সেই ভবানীদাস ও এই ভবানীদাস এক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। যাহা হউক, এইরূপ কয়েকটী নামের সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে তাঁহার প্রদর্শিত তালিকার বত্রিশ জন পদকর্ত্তার মধ্যে অন্ততঃ ছাব্বিশ জন অজ্ঞাত পদকর্ত্তার ভণিতাযুক্ত পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। আশা করি, হরেকৃষ্ণবাবু ইহাঁদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত করিয়া পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসের পুষ্টি-সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী'র উপর মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য

শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রবন্ধটি পড়িয়া এবং তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু এই মন্তব্যে তিনি এত পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন যে, তাহার উত্তর দিতে হইলে, আমাকে আবার সেই "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বাদপ্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে; সুতরাং সংক্ষেপে তাঁহার মন্তব্যের দুই একটি কথার উত্তর প্রদান করিতেছি।

"চণ্ডীদাস" সম্বন্ধে বক্তব্য যে, যদিও অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে মুকুন্দ যে পদ গান করিয়াছিলেন, তাহার "রোজনাম্‌চা" কেহ রাখে নাই এবং কবিরাজ গোস্বামী তাহার একশত বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ঠিক সেই গানই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, তথাপি ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, যে মুকুন্দ এই গান গাহিয়াছিলেন, তিনি পুরীধামে বহুবার উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ গায়ক শ্রীপাদ স্বরূপের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, মুকুন্দের মুখে শুনিয়া শ্রীপাদ তাহা নিজ অন্তরঙ্গ ভক্ত দাস গোস্বামীর নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়নকালে দাস গোস্বামী ঐ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং বিষয়টি যে, 'রোজনামচা'র ব্যঙ্গোক্তিতে উড়াইয়া দিবার নহে, ইহা বলা বোধ হয় আবশ্যক।

"শ্রীগৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত পবিত্র প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে কীর্ত্তনীয়াগণ বাধ্য হইয়া চণ্ডীদাসের নামে কতকগুলি জাল পদ প্রচলন করিয়াছিলেন।"—ইহার মত হাস্যোদ্দীপক যুক্তি আর নাই।

"নয়নানন্দ", "জগদানন্দ", "গোকুলানন্দ", এই যে তিনজন পদাবলী-রচয়িতার উল্লেখ করিয়াছি, ইঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা না হইলেও নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন, ইঁহারা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহার "প্রমাণ" আছে। ইঁহাদের বিষয় বহুপূর্ব্বে আমরা বীরভূম হইতে প্রকাশিত "বীরভূমি" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইঁহাদের নিবাস বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামে, ইঁহাদের বংশধরগণ আজিও বর্ত্তমান আছেন এবং ইঁহাদের মধ্যে ঠাকুর নয়নানন্দের স্বহস্তলিখিত "শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব" নামক একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমরা ইঁহাদের পরিচয় ও পদাবলী প্রকাশ করিব।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব*

যে প্রসঙ্গ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে যাইতেছি, সেটি যে একটি গুরুতর বিষয়, তাহা আপনারা ইহার নামকরণ হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহার প্রথমাংশ লইয়া সর্ব্ববিধ সংবাদপত্রে—মায় দৈনিক পত্র হইতে মাসিক পত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আলোচনা হইয়াছে এবং আজও চলিতেছে। এমন কি, মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত এ বিষয়ে নীরব নহেন। আর পাশ্চাত্য দেশে এবং আমেরিকায় ইহার আলোচনা এমন হইতেছে যে, ঐ সকল দেশে স্থায়ী সভা হইয়াছে এবং বহু কৃতবিদ্য চিকিৎসক তাহাতে লিপ্ত আছেন। তাঁহারা এ বিষয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্দোলন যাহাতে পৃথিবীব্যাপী হয়, তাহাতে উদ্যোক্তা হইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে ইউরোপ ও আমেরিকা কি স্বাধীনতায়, কি অর্থে, কি বীর্য্যে, কি বিদ্যায়, কি আত্মমর্য্যাদায়, ভারতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করিয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং ঐ সকল দেশে যদি কোন ধুয়া ওঠে, তাহার ঢেউ যে ইংরাজ-শাসিত ভারতভূমে লাগিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তাই আমাদের দেশে এ বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। এ প্রবন্ধের অবতারণাও সেই কারণে।

এখন একটা বিষয় দেখিতে হইবে, নবসভ্যতাদীপ্ত ইউরোপ আমেরিকার ভাবধারা ও প্রাচীনতম ভারতের ভাবধারায় তফাৎ কি। প্রবন্ধের বিষয় উহারাই বা কি ভাবে ভাবিতেছে এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি ভাবে ভাবিয়াছেন, ইহা একটু দেখা আবশ্যক। ইহা হইতেই নবীন ও প্রাচীনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ যেমন প্রকাশ পাইবে, তেমনি ধৈর্য্য ও সংযমশক্তিও ধরা পড়িবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিবাহ যে একটা উচ্চ ধর্ম্মাঙ্গ, তাহা স্বীকৃত হয় নাই; পুত্রজন্মও যে একান্ত আবশ্যক এবং তাহা ধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গ, তাহাও ঐ সভ্যতা স্বীকার করে না। ওখান হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য কামেন্দ্রিয়ের উপভোগ; এই জন্য সেখানে স্ত্রী সঙ্গিনী, মুগ্ধকারিণী, সৌন্দর্য্যময়ী, ভালবাসার পাত্রী, বিলাসের ভূমি, ভোগের সহায় এবং গৃহের অবলম্বন। আর সন্তান সন্ততির উৎপত্তি আকস্মিক ব্যাপার (Pure accident) এবং ভোগের নিদর্শন মাত্র। সন্তানাদির জন্মজন্য আগ্রহ নাই; তবে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মায়। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে আপনা আপনি মায়ার বন্ধন পড়ে; সুতরাং কর্ত্তব্য দেখা দেয়। তদনুসারে তাহার লালন পালন। এইরূপই এখনকার সভ্য জগতের আদর্শ।

হিন্দুর সভ্যতা, ইহা হইতে একেবারে বিভিন্ন। সেখানে বিবাহ ধর্ম্ম; স্ত্রী ধর্ম্মসঙ্গিনী;

---

* ১৩৩৩।৫ই চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

পুত্র পিণ্ডদাতা, বংশরক্ষাকর্ত্তা, পিতৃপুরুষের স্বর্গের খুঁটী। কন্যা, সৃষ্টিরক্ষার উপায় এবং তাহার পুত্র পিণ্ডদাতা। হিন্দুর দ্বিতীয়া স্ত্রী কামপত্নী ; তাহাকে লইয়া ধর্ম্ম হয় না, সে কেবল বিলাসের জন্য। হিন্দুর সন্তান সন্ততি ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন। সন্তান না হইলে তাহার নরক লাভ ঘটে, সন্তান হইলে নরক হইতে উদ্ধার হয়। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—হিন্দু জন্মমাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণে আবদ্ধ হয়। নিজের ক্রিয়াকর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত দুইটী ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং সন্তান হইলেই তবে পিতৃঋণ হইতে মুক্তি। বিবাহ ব্যতীত বৈধ সন্তান জন্মে না, সন্তান না জন্মিলে পিতৃঋণ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় নাই ; সুতরাং হিন্দুর বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহা ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ। ইহাই হিন্দুর সভ্যতা ও আদর্শ। তবে কি হিন্দুর মধ্যে কামোপভোগ বলিয়া কিছু নাই, স্ত্রী কি উহার অঙ্গ নহে ? পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্ত্রীর যে মাপকাঠী ধরিয়াছে, উহা হিন্দুদের পরোক্ষ ভাব, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাব ধর্ম্মাঙ্গ। হিন্দু যেখানে কেবল কামভোগের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, সে স্ত্রীকে কামপত্নী বলে, ধর্ম্মকর্ম্মে সে বর্জ্জিতা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীর সতীত্বই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মে ইহা লক্ষ্যের বহির্ভূত। অন্ততঃ তাহারা সতীত্ব (chastity) যে ভাবে বুঝে, হিন্দু তাহা বুঝে না ; সতীত্ব সম্বন্ধে হিন্দুর মাপ (standard) হইতে অপরের মাপ বেশ বিভিন্ন, অনেক নীচে। হিন্দুর ধারণা ও বিশ্বাস, স্ত্রীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ না থাকিলে সুপ্রজা অর্থাৎ সুসন্তান জন্মে না। আবার বৈধ সন্তান ব্যতীত সুপ্রজা হয় না। অন্য জাতির এ ধারণা আছে বলিয়া জানি না।

হিন্দুর মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল ; তাহার এক কারণ, পুরুষের পুত্রোৎপাদিকা শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার অর্থাৎ বহু সন্তান উৎপাদন। হিন্দুশাস্ত্রে বহু সন্তানের আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ আছে। পাছে পিণ্ড লোপ পায়, এই এক ভয় এক কারণ, আর এক কারণ যে, বহু সন্তান থাকিলে কেহ না কেহ গয়াদি তীর্থক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিতে সক্ষম হইবে। এ সবই ধর্ম্মঘটিত আবশ্যকতা।

অন্য জাতির মধ্যে যে বহু বিবাহ দেখা যায়, তাহা লোভ, মোহ, কাম ঘটিত। হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে যে বিধবাবিবাহের বা পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা প্রচলন, তাহারও কারণ হইতেছে—স্ত্রীলোকের যতটা সন্তান ধারণের ক্ষমতা আছে, তাহার সম্যক্ ব্যবহার করা। এমন কি, কোন জাতির ধারণা যে, স্ত্রীলোকের যতক্ষণ সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে, ততক্ষণ তাহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ; কেন না, কে বলিতে পারে, কোন্ গর্ভে কোন্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবে ? হিন্দুর মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই। তবে কখন কখন পুনর্ভূ বা পরপূর্ব্বা নামক বিধবাবিবাহ বা পত্যন্তর গ্রহণের কথা দেখা যায়, তাহা কামজ। আর সন্তান আবশ্যক হওয়ায় বিধবা বিবাহ হয় নাই, নিয়োগ হইয়াছে। হিন্দুর ধারণা, বিধবাবিবাহে সুপ্রজা উৎপন্ন হওয়া সুকঠিন। এই জন্য হিন্দুরা বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী নহে। মনু নিয়োগ সম্বন্ধেও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে নিতান্ত আবশ্যক স্থলে নিয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মোটের উপর হিন্দুর এ সমস্তই ধর্ম্মঘটিত।

হিন্দু ও হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতির পুত্রবিষয়ক ভাবধারা বুঝিবার জন্য মোটামুটি দুই চারিটি কথা বলা হইল।

বর্ত্তমানে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রজা নিয়মন (birth control) করিবার ভীষণ চেষ্টা চলিতেছে, তাহার তিনটী প্রধান কারণ দেখা যাইতেছে। একটি হইতেছে অর্থ-সমস্যা। এক ব্যক্তির বহু সন্তানসন্ততি জন্মিলে সে তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে লালন পালন করিতে পারে না; ফলে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়; তৎসঙ্গে কষ্ট দুঃখ চিন্তা দেখা দেয়; ইহাতে জাতি দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং অকালমৃত্যু বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে যে, প্রসূতি বহু প্রসব করিলে অর্থাৎ এক নারী যদি ৪, ১০, ১২, ১৫, ২০টী সন্তানের জননী হয়, তাহা হইলে সেই দেহ সতেজ থাকে না, স্ত্রীসৌন্দর্য্যের হানি হয়, অকালবার্দ্ধক্য দেখা দেয়, অনেক স্থলে যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি হয়, ফলে জীবনী শক্তি নষ্ট হয় এবং অনেক স্থলে এরূপ স্ত্রীলোক অকালে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে। তৃতীয় কারণ হইতেছে যে, স্ত্রীলোক বর্ষে বর্ষে প্রসব করিলে যে সন্তান সন্ততি জন্মায়, উহারা রুগ্ন হয়, দীর্ঘজীবী হয় না। এরূপ সন্তান কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেই জন্মায়, পৃথিবীর কোন কাজে আসে না।

এই সকল কারণেই বর্ত্তমান সভ্যতাবাদীরা গর্ভসংরোধের পক্ষপাতী। তাহাদের ধারণা, স্ত্রীপুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করা সম্ভব নয়। অতএব এমন উপায় নির্দ্ধারণ করা দরকার, যাহাতে যৌন সম্বন্ধ ঘটিলেও গর্ভ নিবারিত থাকে। তাহার ফলে নানা ঔষধ ও নানা বাহ্য ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাঁতির উদ্ভব হইয়াছে। আর এই সকল পুস্তক লিখিয়া ও লোক দ্বারা জনসাধারণে প্রচার করা হইতেছে। উদ্দেশ্য, দরিদ্র লোকের সন্তানাদি-জনিত অর্থসমস্যার সমাধান, নারীর শরীর রক্ষা এবং শিশুমৃত্যু নিবারণ।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঠিক এ জাতীয় চিন্তা বোধ হয় করেন নাই। আমাদের গ্রন্থাদি হইতে যাহা পাই, তাহাতে দেখিতে পাই, তাঁহারা দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ সন্তান সন্ততি কামনা করিতেন, নরনারীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও দীর্ঘজীবন কিরূপে সম্ভব, তাহারও চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অর্থাভাবে সন্তান পালন হইবে না, এ চিন্তা করেন নাই। অর্থের অভাব ঘটিতে পারে, তাঁহারা কখন এ কথা ভাবিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাই এই সকল বিষয়ের সমাধানের পথ, ইহাই মহাত্মা গান্ধীর মত। আমাদের গ্রন্থাদি হইতে যাহা পাই, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের কথা আছে; কিন্তু ইহাই একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সংযমই ব্রহ্মচর্য্যের নামান্তর; কিন্তু সংযম যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা যাহা বলিয়াছে যে, নরনারীকে শুধু সংযমের পথে তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে রোধ করিলে চলিবে না, উহা বালির বাঁধের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। নরনারীর আকাঙ্ক্ষাকে ঐরূপে বাধা দিয়া রাখা যাইবে না। তাহার অবাধ গতি রাখিয়া ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। এ মতবাদকে ফেলিয়া দেওয়া

চলিবে না। ইউরোপ আমেরিকা কোন উপায় না পাইয়া, নানাবিধ দ্রব্যাদির ও ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করিতেছে।

আমরা আমাদের শাস্ত্রে ইহার সুন্দর সমাধান পাইতেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ত্তমান ভাবের পথিক ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ভাবেই ভাবুন না কেন, আমাদের জন্য এমন অক্ষয় ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে আমরা সকলের উপযোগী যাহা দরকার, তাহাও পাইতেছি।

হিন্দুরা সন্তানজন্ম ধর্ম্মাঙ্গ মনে করে। এই জন্য আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে—স্ত্রী পুষ্পবতী হইলে, ঐ কালমধ্যে গর্ভাধান না করিলে স্বামীর পাপ হয়। যথা পরাশর,—

ঋতুস্নাতাং তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং পততে নাত্র সংশয়ঃ॥

এই যাহাদের শাস্ত্রনির্দ্দেশ, তাহারা কখনও সন্তান সংরোধ চিন্তা (birth control) করিতে পারে না। তবে কামশাস্ত্রাদি গ্রন্থে গর্ভনিরোধের উপায়স্বরূপ ঔষধ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহা হীনচরিত্র নরনারীর মধ্যে অথবা বেশ্যাদিগের মধ্যে কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিয়া থাকিবে। সভ্যসমাজে উহার বিশেষ আদর ছিল না। কেন না, ইহার বিস্তৃত আলোচনা ঐ সকল পুস্তকে নাই। আর বৈদ্যশাস্ত্রেও ইহার সাধারণ উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে গর্ভরোধের মাত্র দুইটী ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহাও সেবন করিতে হয়। সুতরাং ইহা লইয়া বিশেষ গবেষণা দেখা যায় না। মোট কথা, আমাদের শাস্ত্র এই সকল কৃত্রিমতার প্রশ্রয়প্রদাতা নয়। ধর্ম্ম মানিয়া যাহা সম্ভব, তাহাই হিন্দুর ভাল লাগে, তাহাই করিতে চায়। আমাদের ধর্ম্মে এমন বিধি নিষেধ আছে, যাহা পালন করিলে লোক সংযমী হয়, কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে গর্ভরোধ করিবার আবশ্যক হয় না, নরনারীর দেহ সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ থাকে, দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, ইচ্ছামত সন্তান সন্ততি লাভ করা যায়। এ বিষয়ে হিন্দুরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন। জ্যোতিষে কি করিয়া ইহা সম্ভব, তাহাই এখন বলিব।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। হিন্দু ধর্ম্ম এমনভাবে গঠিত যে, তাহার এক শাস্ত্র লইয়া এক কার্য্যের মীমাংসা হওয়া অনেক সময় সুকঠিন। ইহার শাস্ত্ররাজি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটি ধরিয়া টান দিলে অন্যটি আপনি আসিয়া পড়ে। এইজন্য এক জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইলে ইহার সহিত স্মৃতি, তন্ত্র, যোগশাস্ত্র, মন্ত্রশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ কিছু জানা আবশ্যক। এইরূপ সর্ব্বত্র। ইহার কারণ এই যে, এই শাস্ত্রগুলি এক বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা, তাই এক ডাল ধরিয়া টান দিলে অন্য ডালগুলিও নড়িয়া উঠে।

হিন্দুর প্রধান লক্ষ্য সন্তান। সেই সন্তান যাহাতে সুসন্তান হয়, তাহাই তাহার প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেই পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান ভাবধারা পড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুরা

সন্তান-রোধের কথা ভাবেন নাই সত্য ; কিন্তু সুসন্তান লাভের যে প্রণালী স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত সন্তান সম্ভাবনা নিরোধ হইয়া গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, রজঃ ও বীর্য্য সন্তান সন্ততির কারণ। ইহাদের মিশ্রণেই ভ্রূণের জন্ম হয়। যথা,—"সৌম্যং শুক্রং আর্ত্তবং আগ্নেয়ম্ ॥ তত্র স্ত্রীপুংসয়োঃ সংযোগে তেজঃ শরীরাদ্বায়ুরুদীরয়তি। ততস্তেজঃ অনিলসন্নিপাতাৎ শুক্রচ্যুতং যোনিমভি প্রতিপদ্যতে, সংসৃজ্যতে চার্ত্তবেন। ততোঽগ্নিসোমসংযোগাৎ সংসৃজ্যমানো গর্ভো গর্ভাশয়মনুপ্রতিপদ্যতে।" (সুশ্রুতসংহিতায় শারীরস্থান, ৩য় অধ্যায়)।

"অতুল্যগোত্রস্য রজঃ ক্ষয়ান্তে
রহো বিসৃষ্টং মিথুনীকৃতস্য।
কিং স্যাচ্চতুষ্পাৎ প্রভবঞ্চ ষড়্ভ্যো
যৎ স্ত্রীষু গর্ভত্বমুপৈতি পুংসঃ ॥ ২ ॥
শুক্রং তদস্য প্রবদন্তি ধীরা
যদ্ধীয়তে গর্ভসমুদ্ভবায় ॥ ৩ ॥" (চরকসংহিতায় শারীরস্থান, ২য় অধ্যায়)।

তথা ভাবপ্রকাশে পূর্ব্বখণ্ডে প্রথম ভাগে গর্ভপ্রকরণে,—

"কামান্মিথুনসংযোগে শুদ্ধশোণিতশুক্রজঃ।
গর্ভঃ সংজায়তে নার্য্যাঃ স জাতো বাল উচ্যতে ॥
ঋতৌ স্ত্রীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ।
মেঢ্রযোন্যভিসংঘর্ষাৎ শরীরোষ্মানিলাহতঃ ॥
পুংসঃ সর্ব্বশরীরস্থং রেতো দ্রাবয়তেঽথ তৎ।
বায়ুর্মেহনমার্গেণ পাতয়ত্যঙ্গনাভগে ॥
তৎ সংশ্রুত্য ব্যাত্তমুখং যাতি গর্ভাশয়ং প্রতি।
তত্র শুক্রবদায়াতেনার্ত্তবেন যুতং ভবেৎ ॥"

জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও ইহাই মত। যথা,—"গর্ভাবাসে নিপততি সংযোগঃ শুক্রশোণিতয়োঃ।" (সারাবলী)। অতএব পুরুষের শুক্র ধাতু ও স্ত্রীর আর্ত্তবই গর্ভের কারণ। ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত।

জ্যোতিষের মতে, শুক্র গ্রহই শুক্রধাতুর কারক। চন্দ্রগ্রহ শোণিতের কারক। এবং মঙ্গলগ্রহ মজ্জা ও রক্তবাহিকা নাড়ীর কারক। শুক্রে জলতত্ত্ব, চন্দ্রেও জলতত্ত্ব এবং মঙ্গলে অগ্নিতত্ত্ব চিন্তনীয়। আর শুক্র ও চন্দ্র উভয়েই জলগ্রহ এবং মঙ্গল শুষ্কগ্রহ ও শুষ্কতা উৎপাদক। সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"আর্ত্তবং আগ্নেয়ং"। জ্যোতিষেও চন্দ্রকে আর্ত্তব ও মঙ্গলকে আর্ত্তববাহিনী নাড়ী বলিতেছে। এই জন্যই জ্যোতিষমতে স্ত্রীরজের কারক চন্দ্র ও মঙ্গল ; যথা বৃহজ্জাতকে,—"কুজেন্দুহেতুঃ প্রতিমাসমার্ত্তবং"। তথা ভট্টোৎপলধৃত সারাবলী—"ইন্দুর্জলং কুজোঽগ্নিঃ জলমিশ্রত্বগ্নিরেব পিত্তং স্যাৎ এবং রক্তে ক্ষুভিতে পিত্তেন রজঃ প্রবর্ত্ততে স্ত্রীষু" অর্থাৎ চন্দ্র জল, মঙ্গল

অগ্নি; এই জল ও অগ্নি মিশ্রিত হইলে পিত্তের উৎপত্তি হয় এবং ঐ পিত্ত রক্তকে সঞ্চালিত করিয়া নিঃসারিত করে, তাহাই ঋতু নামে কথিত।

নারীর মাসিক ঋতুই তাহার গর্ভধারণক্ষম-কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই ঋতুর কাল সাধারণতঃ মোটামুটি স্থির থাকে। চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টিই আর্ত্তব নিঃসরণের কারণ ধরা যায়। মাসিক আর্ত্তবই গর্ভের কারণ পাওয়া যাইতেছে। এখন জ্যোতিষ সাহায্যে গর্ভধারণ-ক্ষম আর্ত্তব কোন্‌টি এবং কোন্ আর্ত্তব গর্ভধারণক্ষম নহে, তাহা স্থির করিতে পারিলেই জ্যোতিষ দ্বারা কিরূপে প্রজানিয়মন (birth control) সম্ভব, তাহা জানা যাইবে। আমরা পাইতেছি,—"তৎ উপচয়সংস্থে বিফলং প্রতিমাসং দর্শনং তস্যাঃ"—(ভট্টোৎপল) এবং "স্যাৎ অন্যথা নিষ্ফলম্"—(জাতকপারিজাতে ৩য় অধ্যায়ে ১৬ শোক)—উপচয়গত অর্থাৎ স্ত্রীকোষ্ঠীতে জন্মলগ্ন হইতে ৩য়, ষষ্ঠ, ১০ম, ১১শ গত চন্দ্রে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টিতে যে মাসিক আর্ত্তব দেখা যায়, ঐ আর্ত্তব নিষ্ফল অর্থাৎ উহা গর্ভধারণক্ষম নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতিষ জাতচক্রে গ্রহাদি সংস্থান দ্বারা এবং গোচরগত গ্রহাদির অবস্থান হইতে নির্দ্দেশ করিতে পারে, কোন্ আর্ত্তব বিফল হইবে আর কোন্ আর্ত্তব সফল হইবে, অর্থাৎ কোন্ আর্ত্তব গর্ভধারণক্ষম, তাহা জানিবার উপায় আছে। এক্ষণে উহা আরও স্পষ্ট করা হইতেছে, যথা—

"গতে তু পীড়র্ক্ষমনুষ্ণদীধিতৌ।"—(বৃহজ্জাতক) "অনুষ্ণদীধিতৌ শীতময়ূখে চন্দ্রে পীড়র্ক্ষং গতে প্রকৃতত্বাৎ। স্ত্রীণামনুপচয়গৃহাশ্রিতে আর্ত্তবকারণং ভবতি। অর্থাদেব যদি চন্দ্রঃ কুজসন্দৃষ্টো ভবতি। এতদুক্তং ভবতি। স্ত্রিয়ো জন্মর্ক্ষাদনুপচয়সংস্থশ্চন্দ্রমাঃ তত্র যত্নঙ্গারকেণ দৃশ্যতে তদা গর্ভগ্রহণক্ষমমার্ত্তবমতীব হেতুর্ভবতি।"—(ভট্টোৎপল)।

তথা চ সারাবল্যাং,—"অনুপচয়রাশিসংস্থে কুমুদাকরবান্ধবে।

রুধিরদৃষ্টে প্রতিমাসং যুবতীনাং ভবতীহ রজো ব্রুবন্ত্যেকে॥"

তথা চ ১৬ শ্লোকে, তৃতীয়াধ্যায়ে, জাতকপারিজাতে,—

"শীতজ্যোতিষি যোষিতোঽনুপচয়স্থানে কুজেনেক্ষিতে জাতং গর্ভফলপ্রদং খলু রজঃ"

অর্থাৎ নারীর জন্মলগ্ন হইতে কোন অনুপচয়রাশিতে (অর্থাৎ লগ্ন, দ্বিতীয়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১২শ রাশিতে) চন্দ্র থাকিলে এবং ঐ চন্দ্রের উপর মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি পড়িলে যে আর্ত্তব দেখা যায়, ঐ আর্ত্তবই গর্ভধারণক্ষম হইয়া থাকে।

আবার বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

স্ত্রীণাং গতোঽনুপচয়র্ক্ষমনুষ্ণরশ্মিঃ
সংদৃশ্যতে যদি ধরাতনয়েন তাসাম্।
গর্ভগ্রহার্ত্তবমুশন্তি তদা ন বন্ধ্যা-
বৃদ্ধাতুরাল্পবয়সামপি চৈতদিষ্টম্॥

এই শ্লোকে বন্ধ্যা স্ত্রী, বৃদ্ধা, আতুর ও বালিকা বর্জ্জিত হইল অর্থাৎ ইহারা গর্ভগ্রহণক্ষম নহে জানিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে গর্ভপ্রকরণমধ্যে ভাবপ্রকাশধৃত "তন্ত্রান্তরে" বলিয়া উল্লিখিত অংশমধ্যে পাইতেছি,—

মনোভবাগারমুখেঽবলানাং তিস্রো ভবন্তি প্রমদাজনানাম্।
সমীরণা চান্দ্রমসী চ গৌরী বিশেষমাসামুপবর্ণয়ামি॥
প্রধানভূতা মদনাতপত্রে সমীরণা নাম বিশেষনাড়ী।
তস্যা মুখে যৎ পতিতং তু বীর্য্যং তন্নিষ্ফলং স্যাদিতি চন্দ্রমৌলিঃ॥
যা চাপরা চান্দ্রমসী চ নাড়ী কন্দর্পগেহে ভবতি প্রধানা।
সা সুন্দরী যোষিতমেব সূতে সাধ্যা ভবেদল্পরতোৎসবেষু॥
গৌরীতি নাড়ী যদুপস্থগর্ভে প্রধানভূতা ভবতি স্বভাবাৎ।
পুত্রং প্রসূতে বহুধাঙ্গনা সা কষ্টোপভোগ্যাসুরতোপবিষ্টা॥

ইহা হইতে পাওয়া গেল যে, গর্ভধারণ বিষয়ে সমীরণা, চান্দ্রমসী ও গৌরী, এই তিনটি নাড়ীই প্রধান। নাড়ী অর্থে বায়ু। এই বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যতীত কিছুই নহে। যখন স্ত্রীদেহে সমীরণা নাড়ী বহিতে থাকে, তখন নিষেকে গর্ভ সঞ্চার হয় না। চান্দ্রমসী নাড়ীর প্রবাহকালে নিষেক হইলে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহাতে কন্যার উৎপত্তি হয়। এবং যখন গৌরী নাড়ী প্রবাহিত থাকে. তখন আধান হইলে গর্ভসঞ্চার হয়, তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীদেহে এই নাড়ীর যেরূপ প্রভাব আছে, পুরুষের দেহেও নাড়ীর এইরূপই প্রভাব জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে প্রাণতোষিণী।—

"যা বামমুষ্কসম্বন্ধা সংশ্লিষ্যন্তী সুষুম্নয়া।
দক্ষিণাঞ্চ ক্রমাশ্রিত্য ধনুর্ব্বক্রা হৃদি স্থিতা॥
বামাংশযন্ত্রান্তরগা দক্ষিণাং নাসিকামিয়াৎ।
তথা দক্ষিণমুষ্কস্থা নাসায়া বামরন্ধ্রগা॥
তন্ত্রান্তরে,—সুষুম্নাকলিতা যাতা মুষ্কং দক্ষিণমাশ্রিতা।
সঙ্গতা বামভাগস্য যন্ত্রমধ্যং সমাশ্রিতা॥
দক্ষিণং নাসিকাদ্বারং প্রাপ্নোতি গিরিজাত্মজে।
বামমণ্ডমনুস্যূতা মনস্যাসব্যনাসিকাম্॥

অত্রেড়া বামমুষ্কাধঃস্থা ধনুর্ব্বক্রা বামনাসাপর্য্যন্তং গতা। এবং পিঙ্গলা দক্ষিণাণ্ডাধঃস্থা ধনুর্ব্বক্রা দক্ষিণনাসান্তং গতা। পৃষ্ঠবংশান্তর্গতা সুষুম্না ইতি" (প্রাণতোষিণী, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)। ইড়ানাড়ী, পিঙ্গলানাড়ী ও সুষুম্নানাড়ী, এই তিন নাড়ীর মধ্যে সাধারণতঃ ইড়াকে চন্দ্র ও পিঙ্গলাকে সূর্য্যনাড়ী কহে। বামনাসাতে যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম ইড়া বা চান্দ্রমসী। দক্ষিণনাসাস্থ বায়ুকে পিঙ্গলা বা গৌরী কহে। এবং উভয় নাসাপুটস্থিত বায়ুকে সুষুম্না বা সমীরণা বলে। এই নাড়ী বিচার করিয়া চলিতে পারিলে কিংবা কোষ্ঠীনির্দ্দিষ্ট আর্ত্তব বিচার করিয়া স্থির করিয়া লইতে পারিলে গর্ভনিয়মন নিজের হাতে আসিয়া পড়ে।

গর্ভ নিরোধের কথা বলা হইল। এক্ষণে সুসন্তান কিরূপে স্বেচ্ছাধীন সম্ভব, তাহাই বলিব। ইতিপূর্ব্বে গর্ভসংরোধ বলিতে যাইয়া দেখাইয়াছি যে, চান্দ্রমসী নাড়ীতে গর্ভাধান হইলে কন্যার জন্ম হয় এবং গৌরী নাড়ীতে গর্ভাধান হইলে পুত্র জন্মায়। আর কোন্ আর্ত্তবে গর্ভধারণ হয়, তাহাও,—

শীতজ্যোতিষি যোষিতোঽনুপচয়স্থানে কুজেনেক্ষিতে

জাতং গর্ভফলপ্রদং খলু রজঃ স্যাদন্যথা নিষ্ফলম্ ॥—(জাতকপারিজাত, ৩।১৬)।

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ অনুপচয়রাশিগত চন্দ্রে মঙ্গলের দৃষ্টি পড়িলে যে ঋতু হয়, তাহা গর্ভ গ্রহণের উপযোগী হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে হয় না। সুপুত্র লাভ করিতে হইলে আরও একটু বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। শাস্ত্র বলিতেছে,—

বিভাবরী-ষোড়শ ভামিনীনাং ঋতুদ্‌গমাদ্যা ঋতুকালমাহুঃ।

নাদ্যাশ্চতস্রোঽত্র নিষেকযোগ্যাঃ পরাশ্চ যুগ্মাঃ সুতদাঃ প্রশস্তাঃ ॥

—(জাঃ পাঃ ৩।১৭)।

ষোড়শ দিন নারীদিগের আর্ত্তব কাল। তাহার প্রথম চারি দিন নিষেকের অযোগ্য দিন এবং অবশিষ্ট দিনগুলির মধ্যে যুগ্ম দিন পুত্রপ্রদ বলিয়া নিষেকে প্রশস্ত।

"ভাবপ্রকাশ" এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু" অর্থাৎ ঋতুর যুগ্ম দিনে গর্ভাধানে পুত্র এবং অযুগ্ম দিনে (অর্থাৎ ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫) গর্ভাধানে কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

শাস্ত্রে কতকগুলি দিনে আধান করিতে নিষেধ করিয়াছে, যথা—

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।

ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ ॥—মনু, ৩।৪৭।

পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং ॥—মনু, ৩।৪৫।

প্রথম চারিটা দিন, একাদশ দিন ও ত্রয়োদশ দিন, এই ছয় দিন নিন্দিত এবং অবশিষ্ট দশ দিন প্রশস্ত। এই দশ দিনের মধ্যে পর্ব্বদিন বর্জ্জন করিতে হইবে। পর্ব্বদিন বলিতে—

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা।

পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥—(বিষ্ণুপুরাণ)।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিগুলি এবং সংক্রান্তি, এগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত শ্রাদ্ধদিন, গ্রহণদিন, দিব্য-আন্তরীক্ষ-ভৌম্য উৎপাতদিন, দিবাভাগ, ব্যতীপাতযোগ, বৈধৃতিযোগ, সন্ধ্যাকাল, পরিঘযোগের পূর্ব্বার্দ্ধকাল, নিধনতারা, জন্মনক্ষত্র, জন্মলগ্নের বা জন্মরাশির অষ্টম লগ্ন, জন্মলগ্নে বা জন্মনক্ষত্রে পাপগ্রহযুক্ত কাল, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রগুলি বর্জ্জন করিবার বিধি জ্যোতিষে ও স্মৃতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকায় গর্ভাধানের দিন ও কাল নির্দ্দেশ

থাকে। ঐ দিনে, ঐ সময়ে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের শুক্লপক্ষে চন্দ্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে তারা-শুদ্ধি দেখিয়া গর্ভাধান করিলে যে পুত্র বা কন্যা জন্মিবে, সেই অপত্য যে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এগুলি যাহা বলা হইল, তাহা কেবল উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্য। সাধারণ সন্তানের জন্য এত বিধিনিষেধ মানিবার আবশ্যক নাই। কেবল নাড়ী বুঝিয়া বা গর্ভধারণক্ষম আর্ত্তব বুঝিয়া চলিলেই যথেষ্ট।

কিরূপ অবস্থায় স্ত্রী পুরুষে সংযোগ হয়, তৎসম্বন্ধে মণিত্থ বলিতেছেন,—

ঋতুবিরামে স্নাতায়াং যদ্যুপচয়স্থঃ শশী ভবতি।
বলিনা গুরুণা দৃষ্টো ভর্ত্রা সহ সঙ্গমশ্চ তদা॥

অর্থাৎ আর্ত্তবের নিবৃত্তি হইলে পর যখন স্ত্রীকোষ্ঠীতে গোচরে চন্দ্র উপচয়গৃহগত হইবে, তাহাতে বলবান্ বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়িলে স্ত্রী পুরুষের মিলন হয়। "সারাবলী"র মতে,—

উপচয়ভবনে শশভৃদ্দৃষ্টো গুরুণা সুহৃদ্ভিরথবাসৌ।
পুংসা করোতি যোগং বিশেষতঃ শুক্রসংদৃষ্টঃ॥

অর্থাৎ উপচয়গৃহগত চন্দ্রকে বৃহস্পতি বা বন্ধুগ্রহ দেখিলে পুরুষের সহিত যুবতী সংযুক্ত হয়, যদি শুক্রকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংযুক্ত হইবে। কিন্তু "বাদরায়ণ" বলিতেছেন,—

পুরুষোপচয়গৃহস্থো গুরুণা যদি দৃশ্যতে হিমময়ূখঃ।
স্ত্রীপুরুষসম্প্রয়োগং তদা বদেৎ অন্যথা নৈবমিতি॥

অর্থাৎ পুরুষের কোষ্ঠীতে গুরুদৃষ্ট চন্দ্র উপচয়গৃহে থাকিলে স্ত্রী পুরুষের মিলন হয়।

কোন্ সময় গর্ভধারণ হইবে, তৎসম্বন্ধে বর্ণিত হইতেছে,—

পীড়ারাশৌ ভৌমদৃষ্টে শশাঙ্কে মাসং মাসং যোষিতামার্ত্তবং যৎ।
ত্র্যংশে শান্তং যচ্চ রক্তং জবাভং তদ্গর্ভার্থং বেদনাগন্ধহীনম্॥—শুদ্ধিদীপিকা।

অর্থাৎ স্ত্রীকোষ্ঠীতে গোচরে অনুপচয়রাশিতে চন্দ্র উপস্থিত হইলে, ঐ চন্দ্রে মঙ্গল অবলোকন করিলে প্রতিমাসে স্ত্রীগণের রজঃ উৎপন্ন হয়। যে আর্ত্তব তিন দিনেই প্রশমিত হইয়া যায়, যাহার বর্ণ জবাপুষ্পের সদৃশ হয় এবং যাহাতে বেদনা বা গন্ধ থাকে না, সেই ঋতু গর্ভগ্রহণক্ষম বুঝিতে হইবে।

গর্ভগ্রহণক্ষম ঋতু পরিজ্ঞাত হইয়া কোন্ সময় আধান করিলে গর্ভসম্ভব হইবে, তাহার নির্দেশ জ্যোতিষশাস্ত্র এইরূপ করিয়াছেন,—

রবীন্দুশুক্রাবনিজৈঃ স্বভাগগৈঃ
গুরৌ ত্রিকোণোদয়সংস্থিতেঽপি বা।
ভবত্যপত্যং হি বিবীজিনামিমে
করা হিমাংশোর্বিদৃশামিবাফলা॥—বৃঃ জাঃ, ৪।১।

অর্থাৎ [ক] নিষেককালে রবি, চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল, ইহারা যে কোনও রাশিগত হইয়া

স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিলে গর্ভ হইবে। এখানে টীকাকার ভট্টোৎপল বলিতেছেন,—(১) যদি ঐ সকল গ্রহ স্বীয় স্বীয় নবাংশে না থাকে, তাহা হইলে পুরুষের কোষ্ঠীতে উহাদের মধ্যে দুইটী গ্রহ উপচয়গৃহগত হইয়া স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিলে গর্ভ সম্ভব। (২) কিংবা স্ত্রীকোষ্ঠীতে চন্দ্র ও মঙ্গল উপচয়গৃহগত হইয়া স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিলেও গর্ভ হইবে। এই প্রসঙ্গে "স্বল্পজাতকে"র বচন তুলিয়া বলিতেছেন,—(৩) রবি ও শুক্র উভয়েই বলবান্ হইয়া স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিয়া পুরুষের কোষ্ঠীতে উপচয়গৃহে থাকিলে গর্ভ হইবে। (৪) অথবা চন্দ্র ও মঙ্গল উভয়েই বলবান্ হইয়া স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিয়া স্ত্রীকোষ্ঠীর উপচয়রাশিতে থাকিবে, তাহা হইলে গর্ভ হইবে। [খ] নিষেককালে বৃহস্পতি যদি লগ্নে বা নবমে বা পঞ্চমে থাকে, তাহা হইলে গর্ভ হইবে। কিন্তু উক্ত যোগ বীর্য্যহীনের পক্ষে নিষ্ফল, যেরূপ অন্ধের চক্ষে চন্দ্রের কিরণ।

কিরূপ অবস্থায় গর্ভ সম্ভব হয়, তাহা বলা হইল। এখন কোন্ গর্ভে পুত্র হইবে বা কোন্ গর্ভে কন্যা হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার বিধি কথিত হইতেছে। "চরকসংহিতা"য় লিখিত আছে,—"রক্তেন কন্যামধিকেন পুত্রং শুক্রেণেত্যাদি"। স্ত্রীর রক্তের আতিশয্য হইলে কন্যা জন্মে এবং পুরুষের বীর্য্যের আধিক্য ঘটিলে পুত্র জন্মে। ইহা হইতে বিশেষ কিছু নির্ণয় করা যায় না। কোথায় রক্তাধিক্য হইল, কোথায় বীর্য্যাধিক্য হইল, ইহা কিরূপে অনুভব করা যাইবে? যুগ্ম দিন ও অযুগ্ম দিন বলিয়া যে নির্দ্দেশ আছে, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণে অসিদ্ধ বলিলে বিশেষ দোষের নাও হইতে পারে। ইহার হিসাবে শতকরা ৫টি মিলিলেও মিলিতে পারে। তবে স্বরোদয় শাস্ত্রে যে ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীর কথা আছে, তাহার সহিত ইহার যোগ করিলে ইহার অর্থনির্ণয় সম্ভব। পিঙ্গলা বহমান কালে রেতাধিক্য থাকে এবং ইড়া প্রবাহকালে রেতাল্পতা পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষও করা গিয়াছে যে, পিঙ্গলা বাহিনী থাকা কালে নিষেকে পুত্রই জন্মায়। এবং ইড়ায় নিষেক হইলে কন্যাই জন্ম গ্রহণ করে। এই নাড়ী লইয়া আরও অনেক সূক্ষ্ম বিচার আছে, তাহা এ প্রবন্ধে অবতারণার আবশ্যক নাই।

জ্যোতিষে দেখিতে পাই যে,—

জীবাষ্টবর্গাধিকবিন্দুরাশৌ লগ্নে নিষেকঃ কুরুতে সুতার্থম্॥—জাঃ পাঃ, ১০।২৩।

বৃহস্পতির অষ্টবর্গে যে রাশিতে রেখাধিক্য থাকে, সেই লগ্নে নিষেক করিলে পুত্র জন্মে।

অষ্টমাষ্টমগে সূর্য্যে নিষেকর্ক্ষাৎ সুতোদ্ভবঃ।
অথবাহধানলগ্নাত্তু ত্রিকোণস্থে দিনেশ্বরে॥—জাঃ পাঃ, ৩।১৯।

নিষেকলগ্নের তৃতীয়ে, নবমে বা পঞ্চমে রবি থাকিলে পুত্র জন্মে।

অস্মিন্নাধানলগ্নে তু শুভদৃষ্টে যুতেহথবা।
দীর্ঘায়ুর্ভাগ্যবান্ জাতঃ সর্ব্ববিদ্যাস্তমেষ্যতি॥—জাঃ পাঃ ৩।২০।

ঐ নিষেকলগ্নে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে বা শুভগ্রহযুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ু, ভাগ্যবান্, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়।

ওজর্ক্ষে পুরুষাংশকেষু বলিভির্লগ্নার্কগুর্বিন্দুভিঃ
পুংজন্ম প্রবদেৎ সমাংশকগতৈর্যুগ্মেষু তৈর্যোষিতঃ।
গুর্বর্কৌ বিষমে নরং শশিসিতৌ বক্রশ্চ যুগ্মে স্ত্রিয়ম্॥—বৃঃ জাঃ ৪।১১।

(১) নিষেককালে লগ্ন, রবি, বৃহস্পতি ও চন্দ্র, ইহারা বলবান্ হইয়া পুরুষরাশিতে ও পুরুষ-নবাংশে থাকিলে পুত্র জন্মিবে। (২) আর ঐ লগ্ন ও ঐ গ্রহগণ বলবান্ হইয়া স্ত্রীরাশি ও স্ত্রীনবাংশগত হইলে কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। (৩) বৃহস্পতি ও রবি পুরুষরাশিতে থাকিলে পুত্র এবং (৪) চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল স্ত্রীরাশিতে থাকিলে কন্যা জন্মিবে।

বিহায় লগ্নং বিষমর্ক্ষসংস্থঃ সৌরোঽপি পুংজন্মকরো বিলগ্নাৎ।—বৃঃ জাঃ, ৪।১২।

নিষেককালে লগ্ন ব্যতীত অন্য বিষম রাশিতে শনি থাকিলে পুত্র জন্মায়।

[টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, এই যোগ উপরিউক্ত যোগের অভাবে গ্রহণ করিতে হইবে]

এখন নিষেকলগ্ন বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পঞ্জিকাতে গর্ভাধানের সময় লিখিত থাকে। ঐ সময়মধ্যে নিষেক করিলে সাধারণতঃ আয়ুষ্মান্ সুসন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা। আর যদি ঐ সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের চন্দ্রতারা শুদ্ধ দেখিয়া আধান হয়, তাহা হইলে সে সন্তান যে দীর্ঘজীবী ও সৎসন্তান হইবে, এইরূপ আশা করা অন্যায় নহে। আধানলগ্ন নির্ণয় করিবার নিয়ম হইতেছে,—

কেন্দ্রত্রিকোণেষু শুভৈশ্চ পাপৈস্ত্র্যায়ারিগৈঃ পুংগ্রহদৃষ্টলগ্নে।
ওজাংশগেঽজ্জেঽপি চ যুগ্মরাত্রৌ চিত্রাদিতীজ্যাশ্বিষু মধ্যমং স্যাৎ॥

—(মুহূর্ত্তচিন্তামণি)।

অর্থাৎ আধানলগ্নের কেন্দ্র ও ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকিবে, তৃতীয়, ষষ্ঠ, একাদশে পাপ থাকিবে, লগ্নে পুংগ্রহের (রবি, মঙ্গল বা বৃহস্পতির) দৃষ্টি থাকিবে, বিষম রাশির নবাংশে চন্দ্র থাকিবে। গর্ভাধানের প্রশস্ত নক্ষত্র না পাইলে, চিত্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্বিনী নক্ষত্রেও গর্ভাধান চলিতে পারে, ইহা মধ্যম পর্য্যায়। যুগ্ম দিনই আধানে প্রশস্ত। "শুদ্ধিদীপিকা"-মতে,—

পাপাসংযুতমধ্যগেষু দিনকৃল্লগ্নক্ষপানাথিষু
তদ্দ্যূনেষশুভোজ্ঝিতেষু বিকুজে ছিদ্রে বিপাপে সুখে।
সদ্যুক্তেষু ত্রিকোণকণ্টকবিধুষ্বায়ত্রিষষ্ঠান্বিতে
পাপে যুগ্মনিশাস্বগণ্ডসময়ে পুংশুদ্ধিতঃ সঙ্গমঃ॥

অর্থাৎ রবি, চন্দ্র ও লগ্ন পাপগ্রহযুক্ত বা পাপমধ্যগত হইবে না, উহাদের সপ্তমে পাপ থাকিবে না, অষ্টমে মঙ্গল বা চতুর্থে পাপযুক্ত হইবে না, কেন্দ্র ত্রিকোণ ও চন্দ্রে শুভযুক্ত হইবে, তৃতীয় ষষ্ঠ ও একাদশে পাপগ্রহ থাকিবে। এইরূপ লগ্নে যুগ্মরাত্রে গণ্ড নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া পুরুষের চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি থাকিলে গর্ভাধান প্রশস্ত।

জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়তায় পুত্র বা কন্যা কি হইবে, তাহা জানিবার উপায় বলা হইল।

অবশ্য আধানকাল যদি কেহ লক্ষ্য না রাখেন, তাহা হইলে কিছুই নির্ণয় করা চলে না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে অনেকে নিষেককাল লিখিয়া রাখিয়া, তাহা লইয়া ইহার গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ আমার আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে যে প্রবন্ধ এখানে পাঠ করেন, তাহাতে আপনারা জ্ঞাত আছেন। আমাদের দেশবাসিগণ যদি জড়বাদীদের "Birth by accident—জন্মটা হঠাৎ হইয়া গিয়াছে" এই মত ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রাচীনতম "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই মত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হইতে পারে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সন্তান কামনা করিতেন, সন্তান প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিতেন, তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের কামজ সন্তান চাহিতেন না। তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণের উপর বর্ত্তমানের জড়বাদীদের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে ও হইতেছে। তবে আমরা যে আজও সময় সময় অন্তর্মুখী হইবার চেষ্টা করি, ইহার কারণ আর কিছু নয়, উহা সেই অতিপুরাতন পূর্ব্বপুরুষগণের যে ভাবধারা বংশপরম্পরায় কিছু না কিছু রহিয়া গিয়াছে, তাহারই সাময়িক বিকাশ মাত্র। এখনও যদি আমরা পুনর্ব্বার আমাদের পূর্ব্বভাবধারা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জাতির ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্ত্তমানে আমরা কামজ সন্তান উৎপাদন করিতেছি। বস্তুতঃই "আমার সুসন্তান হউক" এই কামনা লইয়া সন্তান উৎপাদন করি না, পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারই ফলে দেশের এই উচ্ছৃঙ্খলতা। তবে অজ্ঞাতসারে শুভ লগ্নে দুই একটী লোক জন্মায়—তাহারাই বিখ্যাত, ভাগ্যবান্, গুণবান্ বলিয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করে। কেহ বলিতে পারেন, পাশ্চাত্য জাতিগণও তো জড়বাদী, তাহারাও তো বিলাসে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তাহারাই বা তবে বড় কেন? ইহার উত্তর বড় সোজা। তাহারা নবদীপ্ত জাতি। তাহাদের কাম্য—ঐশ্বর্য্য, বিলাস, প্রভুত্ব। তাহারা তাহারই সাধনায় নিমগ্ন। ইহার জন্য তাহারা উৎসাহশক্তি-সম্পন্ন, তাহারা অলস নয়। তারপর নবীন জাতির শক্তি উৎসাহ প্রখর, তাই তাহারা এখনও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। কোথায় কিছুর অভাব ঘটিলে তাহাদের উৎসাহশক্তির গুণে সে অভাব দূর হইয়া যাইতেছে। আজ তাহারা সৎসন্তানাদির জন্মের জন্য লালায়িত না থাকিলেও তাহাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে। তাহার কারণ এই যে, যেমন মানবের ভাগ্যচক্রে এক একবার শুভ সময় দেখা দেয়, সেইরূপ ঐ নবীন অভ্যুদয়সম্পন্ন জাতির ভাগ্যচক্রে এখন সুসময়; তাহারই ফলে উহাদের অধিক পরিমাণে সন্তান সন্ততি আমাদের সন্তানাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া উৎকর্ষ লাভ করিতেছে।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে সেই সাধনা, যাহার সাহায্যে আমাদের ভাগ্যগগনে শুভগ্রহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। এই সাধনার একমাত্র পথ, সৎপ্রজার উৎপাদন। প্রাচীন কালের যে সকল উপাখ্যান আমরা পুরাণাদি শাস্ত্রে পড়ি, আমরা তাহা ঠিক উপলব্ধি

করিতে পারি না। আমাদের দুরবস্থা মোচন করিতে চেষ্টা পাই না। আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, একজন তাপস তপস্যা করিলেন, তাহার ফলে তিনি অসাধ্য সাধন করিলেন। অর্থাৎ তিনি গভীর তপস্যায় এমন এক সত্যের আবিষ্কার করিলেন, সেই সত্য তাঁহার সমাজে প্রচার করিলেন, সেই সত্য তাঁহার সমাজে গ্রহণ করিল, তাহার ফলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইল, আর প্রচার হইল—অমুক তপস্যার দ্বারা অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যিনি কোন এক ছোট বা বড় মত বা সত্য আবিষ্কার করেন এবং তাহার প্রভাব তাঁহার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত ফলবান্ থাকে, তিনিই অবতার বা অংশাবতার হইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ আমরা বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী হইতেই পাইতেছি। তিনি একটি মত এমন ভাবে প্রচার করিলেন, যাহার প্রভাব সারা মানবমধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহারই ফলে আজ তাঁহাকে মহাত্মা মহামানব আখ্যা দিয়াছে। তিনি তাঁহার মতবাদ যদি সমান বেগে চালাইতে পারিতেন, তিনি অবতার আখ্যায় ভূষিত হইয়া থাকিতেন। তবে যেটুকু করিয়াছেন, তাহাতে হয় তো পরশু-রামের মত অংশাবতার-বাদ তাঁহার থাকিয়া যাইবে। সে কালে এক ঋষি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধন দ্বারা এমন সন্তান উৎপাদন করিতেন, এবং তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়া সুসন্তান উৎপাদন করিতেন, যাহার প্রভাবে দেশের দুর্দ্দশা দূরীভূত হইত। তাই বলিতেছিলাম, এখন আমাদের দেশে সৎপ্রজার আবশ্যক—যাহাদের পদার্পণে দেশে স্বর্গীয় সুরভি আপনি প্রবাহিত হইবে। ঐ সৎপ্রজার উৎপাদনের মালমসলা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করা। আমাদের জাতি এখন দুর্ব্বল, উৎসাহহীন। তাহাকে সজীব করিতে হইলে যদি এক হাজার লোক সৎপ্রজালাভের সাধনা করেন, তাহা হইলে হয় তো একশত সৎপ্রজা জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এই এক শত অকামজ সৎপ্রজা যদি একবার জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে হাজার হাজার সুসন্তানে দেশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, দেশের দৈন্য দুর্দ্দশা চলিয়া যাইবে।

আমরা সকলে দুর্ব্বল, কামনায় জর্জ্জরীভূত; তাই আমরা আমাদের শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করি না বলিয়াই আমরা দুঃখে কষ্টে ত্রাহি ত্রাহি রবে কোনও রূপে দেহভার বহন করিতেছি। আমরা যদি একটু সংযমী হইবার চেষ্টা করি, একটু সাধনা করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের জাতির, আমাদের দেশের কিছু না কিছু উপকার করিয়াই যাইতে পারি।

এখন উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিবেন, তাঁহারা চলিবেনই। তাঁহারা তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় যে জীবজগতে কতদূর বিশৃঙ্খলা আনিতেছেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে বা ভাবিতে রাজী নন! তাঁহাদের উৎপাতে যে জীব সংসারে আসিয়া পড়ে, তাহার প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কতখানি, তাহাও তাঁহারা ফিরিয়া দেখেন না। এই জাতীয় জীবগণকে কিছু বলিবার নাই। আমাদের শাস্ত্রে অবাধে বিচরণ করিতে একেবারে নিষেধ করিতেছে না, ঋতুকাল বাদ দিয়া এবং গর্ভধারণক্ষম ঋতু ব্যতীত ঋতুতে অবাধ উপভোগ

বাধা দেয় না। তবে গর্ভধারণক্ষম ঋতুতে অবাধগতি সর্ব্বদা উপভোগের উপযুক্ত নয় বলিয়াছে। যদি কেহ ঐ সময়ে সমীরণা নাড়ী বুঝিয়া চলিতে পারেন, তাহার পক্ষে বাধা নাই, কেবল গৌরী ও চান্দ্রমসী নাড়ীতে যথেচ্ছ উপগত হইলে গর্ভধারণ হয়; সুতরাং সন্তান প্রার্থনা-বিহীন নরনারীকে ঐ সময়ের জন্য সংযম রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে। এইটুকু বাধা শাস্ত্র দিতেছে, গর্ভরোধ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের হাত এই পর্য্যন্ত। সন্তানজনন বিষয়ে গর্ভধারণক্ষম ঋতুতে গর্ভাধানবিহিত কালে ঋতুরক্ষা করিলে সুসন্তান সুসন্ততি পিতামাতার ইচ্ছাধীন। বিশেষ গৌরী ও চান্দ্রমসী নাড়ী বুঝিয়া চলিতে পারিলে উহা আরও সহজ হইয়া যায়। তারপর বিশেষ সৎসন্তানসন্ততি কামনা করিলে তাহাদের জন্য বিশেষ সংযম সহকারে জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করিয়া উপযুক্ত গর্ভাধান লগ্নে নিষেক আবশ্যক। ইহা সহজসাধ্য নহে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত গর্ভনিরোধ ও স্বেচ্ছাধীন সন্তান সন্ততির উৎপাদন কষ্টসাধ্য নয়। এক্ষণে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে কিরূপ ও কতদূর মানবের সহায়তা করিতে পারে, তাহার মোটামুটি হিসাব দেখান হইল। ইহা প্রত্যক্ষ বিদ্যা, সুতরাং ব্যবহার দ্বারা ইহার দোষগুণ নিরূপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগণপতি সরকার

বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ

গৃহস্থালী

আখা—উনন, চুল্লী।

উঁপুল—ঘুঁটে।

ওড়োং—নারিকেলের মালা-নির্ম্মিত হাতা, গরম দুধ নাড়িবার জন্য ব্যবহৃত।

ওঁতা'ল্—আবর্জ্জনা, Sweepings.

কানি—নেকৃড়া, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

কাঁথ্‌রা—ভগ্ন গৃহ।

গোঁজা—জঞ্জাল, আবর্জ্জনা।

ঘসি—ঘুঁটে।

ছামু—সম্মুখভাগ।

জোলুই—পেরেক।

ঠেঙা—লাঠি।

ডামাল, দামাল—সুপুষ্ট শিশু।

নেতা'ড়্—নানা দ্রব্যে পরস্পর সংলগ্ন থাকা, জোড়াজুড়ি।

পাউঠি—সিঁড়ি, পাদপীঠিকা।

পাঁদা'ড়্—গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ।

বেনা—হাতপাখা, ব্যজন।

নাছ, নাচ দুঅর, পাচ দুঅর,—বহির্দ্বার, বহির্দ্বারের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র অঙ্গন। পৌষ মাসে এই অঙ্গন মার্জ্জিত হয় এবং ধানের গাড়ী এই স্থানে রাখিয়া তাহা হইতে ধান নামাইয়া লওয়া হয়।

গুদুড়ি—ছিন্ন কন্থা।

ডাবোর্—বড় বাটি।

ডাবুরি—বড় বাটি।

তিউরী—উনন।

ধানকাঠ—চৌকাঠের নিম্নস্থিত ভূ-সংলগ্ন কাষ্ঠ-খণ্ড।

দিব্‌গাছা—দীপবৃক্ষ, দের্‌খো; 'পিলশুজ' শব্দও ব্যবহৃত হয়।

নুতো—তামাক খাইবার জন্য খড়ের গুটি (ball) প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এই খড়ের গুটিকে 'নুতো' বলে।

দোনা—মৃত্তিকানির্ম্মিত সুবৃহৎ প্রশস্তমুখ পাত্র; এই পাত্রে গরুকে জাব খাইতে দেওয়া হয়। ['দ্রোণ' শব্দজ ?]

পাৎনা—অতি বৃহৎ প্রশস্তমুখ মৃন্ময় পাত্র। ইহাতে ধান ভিজাইয়া রাখা হয়।

গোরা—জালা, সঙ্কীর্ণমুখ বৃহৎ পাত্র। গৃহাভ্যন্তরে এই পাত্র তণ্ডুলাদি রাখিবার জন্য রক্ষিত হয়।

থেলানি—হাঁড়ি, সঙ্কীর্ণমুখ মৃন্ময় রন্ধনপাত্র।

তোলো—অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মৃন্ময় রন্ধনপাত্র।

মালসা—প্রশস্তমুখ মৃন্ময় রন্ধনপাত্র।

ফাওড়া—দণ্ডায়মান অবস্থায় মাটি কাটিবার জন্য দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডসম্বলিত কুদ্দাল-বিশেষ।

কুটুরি—প্রশস্তমুখ প্রস্তরপাত্র।

খোরা—প্রশস্তমুখ কাংস্যপাত্র।

চুমকি—কাংস্যনির্ম্মিত জলপানপাত্র ['চুম্বন' শব্দের সগোত্র শব্দ ?]

পাথ্‌রা—প্রস্তরের থালা।

পাথুরি—প্রস্তরের বাটি।

মাঙ্গলি—গোবোর জল দিয়া নিকানো মণ্ডলাকার স্থান। প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রত্যেক দ্বারে ও তুলসীতলায় 'মাঙ্গলি' দেওয়া গৃহস্থবধূর দৈনন্দিন কার্য্য। [মণ্ডলী-শব্দজ]

কৃষি

আঁকুশী—আকর্ষী, বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িবার জন্য দীর্ঘ বংশদণ্ড।

আবোর গরু—হল চালনা বা শকট চালনায় অশিক্ষিত অল্পবয়স্ক গরু।

ইলেম্—নির্দ্দিষ্ট দৈনিক মজুরীর উপরে যাহা মজুর বা কৃষাণকে প্রদত্ত হয়, পুরস্কার।

কয়া চা'ল—লোহিতাভ চাউল।

কেদে—কাস্তে।

কোঁএলা বাছুর—ছোট বকনা বাছুর।

খাবুটে গরু—যে গরু খুব খায়, বাছাবাছি করে না।

গুশিএ্রুএ্রে—গো-মহিষাদির স্বামী বা মালিককে 'গুশিএ্রুএ্রে' বলা হয়। 'গুরু' শব্দ সাধারণতঃ এই শব্দের সহিত যোজিত হয়। 'এটোর কি গুরু গুশিএ্রুএ্রে কেউ নাই ?'

জোল—জলাভূমি, নিম্নভূমি, যেখানে ধান্যক্ষেত্রে ধান পাকিয়া গেলেও জল মরে না। জোলের মাঠ, জোল জমি প্রভৃতি শব্দও প্রচলিত। বীরভূমের বেদেরা যে শিবের গান গাহিয়া বেড়ায়, তাহাতে আছে—"মাঠ জোল ভাসিঁএ্রে এল, নদী পদ্মাবতী।"

ডাংরানো—গরু বা মহিষকে অতিরিক্ত প্রহার করা।

ঢেলা—হলকর্ষণের পর মই দিয়া জমির 'ঢেলা' ভাঙ্গিতে হয়।

থানা—শসা, কুমড়া প্রভৃতি বীজ পুঁতিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট গোলাকৃতি স্থান। অঙ্কুরোদ্‌গমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'থানা' সরস রাখিতে হয়।

দরজা গরু—রুগ্ন বা বৃদ্ধ এবং অপটু গরু।

পলানো—উঠান কাটিয়া কাদা করিয়া তাহা শুকাইলে পিটাইয়া শক্ত করা হয়। ধান্য কাটিবার পূর্ব্বে উঠানের এই সংস্কারকার্য্য আবশ্যক, নতুবা ধান্যের অপচয় হইবে। এইরূপ সংস্কারকার্য্যকে 'আগ্‌নে (অঙ্গন) পলানো' বলে।

বীচন, বেচন—বীজ, ধান্যের চারাগাছ।

মিরিকচিরিক—যে গরু বাছিয়া বাছিয়া অত্যল্প খায়। বিপরীত শব্দ 'খাবুটে'।

শোঁপ্‌রে—লঙ্কা।

শোঁদা—কাটারী।

আগোল বাঁধ—শস্যক্ষেত্রে পশুপ্রবেশ নিবারণের ব্যবস্থা, প্রহরী নিয়োগ ও বেড়াবাঁধা, তত্ত্বাবধান।

আছাল—পশলা, 'এক আছাল বৃষ্টি।'

আদাড়—ঝোঁপ, ছায়াযুক্ত দুর্গম ঝোঁপ, যেমন 'বাঁশ আদাড়'।

খুঁচি—মাপবিশেষ, এক সেরের অষ্টমাংস, অর্দ্ধ পোআ

খোঁটোর, খোঁদোর—কোটর, গহ্বর, বৃক্ষকোটর, শৃগালাদির বাসস্থান।

ঘোশুরে ঘোশুরে—ঘর্ষণ করিয়া।

ঘষ্টানি—ঘর্ষণ, মৃদু ঘর্ষণ।

চরাট—চরিয়া ঘাস খাওয়া, গোচর স্থান।

চোটাল মুনিষ—কর্ম্মঠ ও সুপটু মজুর।

চ'ড়্—নীচ জাতি, ঘৃণিত জাতি, চোয়াড়।

ছয়লাপ—অপচয়, অত্যধিক অপচয়।

ঘুণানো—ঘুণবৎ বৃষ্টিপাত, 'দেবতা ঘুণোইছে', ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু পড়িতেছে।

ঝিমেনি—মৃদু বৃষ্টিপাত, 'দেবতা ঝিমেইছে'—মৃদু বারিপাত হইতেছে।

কাড়ান্—অধিক বৃষ্টিপাত, কৃষির জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত। 'কাড়ান্' হইলে শস্যক্ষেত্রের উপর জলপ্রবাহ হয়।

উঠোনি—কাড়ানের সময় পুকুর হইতে কই, মাগুর প্রভৃতি মাছ উঠিয়া আইসে। এইরূপ মাছ উঠাকে 'উঠোনি' বলে।

গোঙাল—ক্ষেত্রের জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য গুপ্ত সুড়ঙ্গ।

গো-ভাগাড়—মৃত পশু নিক্ষেপের স্থান।

টেকোর্—জমির উচ্চ স্থান, 'টেকোরে জল ছাড়্লে সব জমিতে ছিঁচ পায়'।

তেউরি—কলাগাছের চারা, উদ্গত অঙ্কুর।

নামাল্—নিম্নভূমি।

লিটুপিটে—দীর্ঘসূত্রী।

দুনী—জলসেচন-পাত্র।

পয়মাল—শস্যক্ষেত্র পদদলিত করা, 'গরু ছেড়ে দিএে আমার তিন বিঘে জমির ধান পয়মাল করেছে'।

প'ল্—পোআল্, বিকীর্ণ খড়, 'পলাল' শব্দজ।

পৌঠি—ধানের মাপবিশেষ। পাঁচ মণে এক বিশ, ষোল বিশে এক পৌঠি।

বোরুই—পানের বাড়ী।

বা'গ্রো, বাগুরো—তাল বা কলাগাছের পত্রের দণ্ড। [বল্কল — বকল — বাকল — *বাগরঅ — বাগ্রো বা বাগুরো]

লীগ—গাড়ীর লীগ, মাঠে গাড়ী চলিয়া গেলে মাটি কাটিয়া যে চাকার দাগ পড়ে, তাহাকে 'লীগ' বলে। 'গাড়ীর লীগ ধোরে ধোরে চোলে যাবি'।

শরান্—প্রশস্ত রাজপথ।

শামাল—উধঃ, পালান, আপীন। 'গাইটোর শামাল্ নামে না।'

মানুষ

অপয়া—অলক্ষণযুক্ত, অলক্ষণা।

আপ্তসারা, আপ্তসুখী—আত্মসুখমাত্রে তৃপ্ত, অপরের সুখ দুঃখে উদাসীন।

আ-বাগা মানুষ—যে লোক কাহারও কথা শুনে না, নিজের মতানুযায়ী কার্য্য করে।

উদো মাদা লোক—সাদা সিধা লোক।

কাঠ খোট্টা—বিজাতীয় ও অদমনীয়।

চেরোলদাঁতী—গালিবিশেষ, ব্যাঘ্রদন্তী।

ছেব্লা—নির্ব্বোধ [কিন্তু প্রা°-ছবিল্ল = পণ্ডিত]

ইলছে—ধৃষ্ট।

উদম্—অনাবৃত [উদ্দাম]।

উব্বান—বমন।

গাহাক—গ্রাহক, খরিদদার

গোশা—দাম্পত্য অভিমান ['গুস্সা']।

জেঠুই—জ্যেষ্ঠতাতপত্নী।

মাউই—ভ্রাতা বা ভগিনীর শাশুড়ী।

কয়েশ্—চোয়াল, 'কয়েশের দাঁত'।

খিট্কেলো—অপবাদ, নিন্দা।

ডাঁফালো—বর্দ্ধনশীল, "ডাঁফালো বিটি ছেলে"।

ডোবো গাল—মাংসল গণ্ডস্থল।

ডোমো ডোমা—ফুলা ফুলা।

ঞিট্‌পিটে—দীর্ঘসূত্রী।

চুথিয়ে—নীচ, হীন।

ধাষ্ট্যামি—ধৃষ্টতা, বৃথা কথা কাটাকাটি।

তকোল্লোবি—সত্য গোপনপূর্ব্বক প্রতারণা [পারসী]।

তাক্ তুক্—কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান।

তুতিঞে বাতিঞে—মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া। 'বিটিকে তুতিঞে বাতিঞে পাঠিঞে দেগা; জামাইকে চটাস্ নে।'

নাকানি চুবোনি—অপ্রতিভত্ব। 'তাকে নাকানি-চুবোনি খাঁঞে ছেড়ে দিঁঞেছে।' অর্থাৎ অত্যন্ত অপ্রতিভ করিয়াছে।

লট্‌ঘটি—কেলেঙ্কারী, কলঙ্ক। [নটঘটি]

তেরিমেরি করা—ক্রোধব্যঞ্জক ভাষা। 'আমি যেতেই তেরি-মেরি কোরে এ'ল।' [হিন্দী]।

ধাঁতাইল্—বহুবিধ কার্য্যের ভিড়।

ধাউৎথরা—রুক্ষতাজন্য রোগবিশেষ, মেহ-রোগ। [ধাতু+থরা]।

ধাদোশ্—অসমর্থ ব্যক্তির যন্ত্রচালিতবৎ কর্ম্ম-শীলতা, "ধাদোশে ঘুর্‌ছি ফির্‌ছি, আমার শরীরে কিছু আছে ?"

খুঁট্-আঁকুরে—ছিদ্রান্বেষী।

গিদের—বালকসুলভ অহঙ্কার প্রকাশ।

গেঁড়া—খর্ব্বকায়।

গোঁএ—নারাজ।

গোঁতা—লজ্জাশীল।

ঘরামি—গৃহছাদনকারী মজুর।

ঘস্‌সোর, ঘেস্‌সোর্—অপরিষ্কৃত, নোংরা। [ঘস্মর]।

নুড়্‌কো—বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার সাহায্যকারী বালক।

পেকাম্বর—বৃথা অহঙ্কারী। [পয়গম্বর]।

বাল্খুরে—খর্ব্ব, বামনাকার।

বড়াং—বড়াই, গর্ব্ব।

বব্‌বোলে—যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। 'গঙ্গা জলে, বব্‌বোলে'।

ফোকোশ্—ডাইনী।

মোনোক্তোর—পছন্দ।

শাউকর—বিদ্রূপাত্মক শব্দ, আক্ষরিক অর্থ 'দানশীল'। ব্যঞ্জনালব্ধ অর্থ 'কৃপণ'। [সাধুকার]।

হুপর্—ভীতিজনক দেশব্যাপী গুজব।

হেদিঁঞে য—প্রিয় ব্যক্তির অদর্শনজন্য শিশুর মানসিক পীড়া হওয়া।

লেওটো—"ছেলেটো আমার বড্ড লেওটো" = ছেলেটা আমার কাছ ছাড়া থাকিতে পারে না।

চ্যাঁদোর—প্রবঞ্চনাবুদ্ধিপ্রবণ।

চোকোল্‌খোর—নিমক্‌হারাম, অকৃতজ্ঞ।

ছ্যাব্‌লা—নির্ব্বোধ।

মুরদ—পুরুষত্ব, বীরত্ব। "ঝাঁক পাঁচ ছয় জল ছিঁচে কোমরে দিলে হাত। এই মুরদে খাবা তুমি বা'গ্‌তেনীর ভাত॥" —শিবের গান।

ছেঁচোর—নীচাশয়, হীন-প্রকৃতি।

ছোঁচা—লোভী।

ঝুঁটি—খোঁপা, কবরী।

হাতের চোটো—করতল।

চাড়্—চেষ্টা।

চেঠা—চেষ্টা, উদ্যম।

চিকি—কৃপণ।

ঠেঁটা—ধৃষ্ট।

ডোঙো—অবিবাহিত চঞ্চল-স্বভাব যুবক

ডোখ্‌লা—লোভী।

ভঞ্চোক্—প্রবঞ্চনা।

তায়েন্—খেয়াল।

থুবড়ো—বিবাহযোগ্য বয়সে অবিবাহিতা কন্যা।

পেকাম—বৃথাভিমানী। [পয়গম্বর]।

ফিচ্‌কেল—জটিল-চরিত্র।

ব্যাত—মুখগহ্বর। 'হাতে-ব্যাতে ঠিক থাকলে আঁধারে ভাত খায়।'

ব্যাদোর—অপরিষ্কৃত।

ভাইজ্—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী।

ভাউই—কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী।

ভোঁশা——বিশাল বপুবিশিষ্ট বুদ্ধিহীন ব্যক্তি।

মোড়ে—খর্ব্বকায় দুর্ব্বল ব্যক্তি।

শঁক-শঁকানি—কৃতিত্বাভিমান।

শাঁন—ঘোমটা।

হাবুচাবু—থতোমতো।

লেরোল্—ললাট।

পীলুই—প্লীহা, প্লীহারোগ।

জাং—জঙ্ঘা।

হোঁটো—হাঁটু।

গুঁড়ুলি—গোড়ালি।

পাইট-করাণী—দাসী, ঝি।

ধেঙোর্—পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

লেট্—নিম্নজাতীয় হিন্দু। ইহারা সাধারণতঃ কৃষাণের কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে।

কির্‌শেন্—কৃষাণ।

মাইন্‌দের—মাহিয়ানাদার, ভৃত্য। ইহারা বৎসর-চুক্তিতে বেতন পায়।

মোছল্—মৎস্য শিকারে পটু ব্যক্তি।

গোছল্—বৃক্ষারোহণে পটু ব্যক্তি।

আঁটকুরো—নির্ব্বংশ।

ছিতুশ্, ছেতোশ্—অনুভবের আধিক্য, স্নায়বিকতা, অসহনীয়তা।

ছিতুশে লোক—সামান্য অসুখে স্নায়বিক উত্তেজনাবশতঃ যে ব্যক্তি অধিক কাল রোগ ভোগ করে। যাহার ক্ষতাদি সহজে আরোগ্য হয় না। 'এমন ছিতুশে' লোক যে একটো কাঁটা ভুঁকলে ছ মাস পড়ে' থাকে।"

কাল

আমুতী—অম্বুবাচী।

ওশুজ্—অশৌচ।

আকাবাকি—তাড়াতাড়ি।

আফ্‌সার্—সচরাচর। [আকসর্]।

জাড়ের দিন—শীতকাল।

খরা—গ্রীষ্মকাল।

বাইর্‌শে—বর্ষাকাল।

ডাওর্—বাদলা।

চট্ কোরে, চপ্ কোরে, ঝপ কোরে—সত্বরতার সহিত।

উঠনি—বৃষ্টির সময় মাছ-উঠা।

বন্দেজ্—সময়ানুযায়ী দ্রব্য সরবরাহের বন্দোবস্ত।

বাওর্—বাতাস।

ঝোড়্—ঝড়।

বিয়েন্ বেলা—প্রাতঃকাল।

সঞ্জা বেলা—সন্ধ্যাকাল।

সঞ্জা বাঁউরে এল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল।

জল খাবার বেলা—আন্দাজ ১০টার সময়।

পরোব্ পাইল্—পূজা পার্ব্বণ, উৎসবাদি।

লবান্—নবান্ন উৎসব।

সোমোত্তো বয়েস—যৌবনকাল। [সমর্থ বয়স]।

লেওর—শিশির।

ভাতবেলা—আহারের সময়।

শিঁয়েন্ বেলা—স্নানের কাল।

ঘুর্‌ঘুট্টি আঁধার—সূচিভেদ্য অন্ধকার।

আমাবোশে—অমাবস্যা।

কাত্তি—কার্ত্তিক মাস।

জোনাক রা'ত্—জ্যোৎস্না রাত্রি।

জোনাকে ফিং ফুট্‌ছে—জ্যোৎস্নালোকের প্রাচুর্য্য।

বেশভূষা

আঙ্‌টি—অঙ্গুরীয়।

কাঁক্‌নী—রৌপ্য-গ্রথিত কঙ্কন।

উদম্—অনাবৃত, নগ্ন।

গিলিপ—ওয়াড়। [পারসী 'গিলাফ']।

গুদুড়ি—ছিন্ন কন্থা, ছিন্ন ও জীর্ণ বস্ত্র। [পোর্ত্তুগীজ—গোদ্রিম্]

ঝুঁটি—কবরী।

কানি—বস্ত্রের খণ্ডিতাংশ, নেকড়া।

চহোট্—চাক্‌চিক্য, আভিজাত্যাভিমান।

চাবুকী—ঘুন্‌সি।

ভ্যাক্, ভেক—ভৈক্ষ্য, ভিখারীর বেশ।

শাঁন—ঘোমটা, মুখাবরণ।

মালা তিলক—বৈষ্ণবের বেশ।

মালা চন্দন—বৈষ্ণবের সংস্কার।

খাড়ু—রৌপ্যবলয়বিশেষ।

হাঁসুলি—রৌপ্যহার।

পাউরো—মল, রৌপ্যনির্ম্মিত পাদাভরণ।

ফেরানি—বালিকার পরিধেয় ক্ষুদ্র সমচতুষ্কোণ বস্ত্র।

বাজু—রৌপ্য-গ্রথিত বাহুবলয়।

দোলাই—বালক বালিকার শীতবস্ত্রবিশেষ।

বিন্দেবুনী—বৃন্দাবন হইতে আগত ছাপান পা'ড়বিশিষ্ট বস্ত্র বা শাড়ী।

নীলাম্বরী, লীলাম্বরী—নীল সাড়ী।

ডোর—ঘুনসী।

ডোর কোপিন্—বৈষ্ণবের বেশ।

জ্যাব—পকেট। [পারসী 'জেব']।

ফল ও উদ্ভিদ

আম শোঁপ্‌রে—পেয়ারা। [সফরী আম]।

আঁকোড়—অঙ্কোল্ল, কণ্টকবৃক্ষবিশেষ।

কুঁড়চি—কুটজ পুষ্প বা বৃক্ষ। ইহার ফলকে 'বাঁদোর লাঠি' বলে।

গর্‌গো'রে—শরজাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদবিশেষ। 'কুসুমবীজ'সদৃশ ফল।

কাঁইবীচ—তেঁতুলবীজ।

তেউর, তেউরি—কদলীবৃক্ষের চারা।

লাটা, নাটা—বিষাক্ত কণ্টকলতাবিশেষ।

নামাড়্—বটবৃক্ষের শূন্যবিলম্বিত শিকড়।

থকা, থোপা—স্তবক, কাঁদি।

ধ'—বৃক্ষবিশেষ। ইহার আঁঠা দিয়া ব্রাহ্মণেরা পৈতা পরিষ্কার করেন।

ডুঁকলি—জলে ভাসমান উদ্ভিদবিশেষ, পানা।

বেচোন—ধান্যের চারা, যাহা এক জমি হইতে তুলিয়া লইয়া অন্য জমিতে পুতিতে হয়।

শিয়েল কুল—অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ কুল, শেয়াকুল। কণ্টকবৃক্ষবিশেষ।

চোঁকা—খোসা, ফলের গাত্রত্বক্।

কোষো—কাঁচা, কষায়াস্বাদবিশিষ্ট ফল।

ডিংলে—কুমড়া।

থানা—শসা প্রভৃতির বীজ বপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলাকার সরস স্থান।

শোঁপরে—লঙ্কা।

বাঙী—ফুটিবিশেষ।

কেঁদ্—আবলুস গাছের ফল।

মাঁর্‌বা—শসাবিশেষ।

রাখাল কেঁদুরী—আরণ্য লতাজাত ফলবিশেষ। স্থানান্তরে ইহাকে 'রাখালশসা' বলে।

ঘি কল্লা—মিষ্ট করলা, কাঁক্‌রোল।

বড়াল—ডেয়াফল।

মাঁদার—　ঐ　।

লেওর্ জালি—নীহার বা শিশিরপাতে শসা প্রভৃতির যে ফলোদ্‌গম হয়, তাহাকে 'লেওর্-জালি' বলে।

খাদ্য-দ্রব্য

আ'র্‌শে—অপূপবিশেষ।

আমোট—হিন্দী 'অমাবট' শব্দজাত। আমসত্ত্ব।

আমানি (কাঁজি) সাঁতোলা—গ্রীষ্মকালে ডা'লের পরিবর্ত্তে 'আমানি সাঁতোলা' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৈল, লবণ, হরিদ্রা, পানিফলপত্র ও সরিষা ইহার উপকরণ।

খোয়েনো—খই বাছিয়া লইবার পর তুষাবরণ-মধ্যস্থ যে শক্ত খইগুলি পড়িয়া থাকে, তাহা ঢেঁকিতে কুটিয়া ছাতু প্রস্তুত হয়। ঐ শক্ত তুষমধ্যস্থ খইকে 'খোয়েনো' বলে। প্রস্তুত ছাতুকেও 'খোয়েনো' বা 'খোয়েনোর ছাতু' বলে।

উখ্‌রো—মুড়কী।

খাজারি—মুড়ি। [সাঁওতালী 'খেজেরি']।

পেটেলি—গুড়ের চাক্‌তি, পাটালি।

ভাজা-তোলা—নানাবিধ ভৃষ্ট তরকারি।

সিঝে পোড়া—সিদ্ধ ও দগ্ধ, যেমন আলুভাতে ও বেগুনপোড়া। সংক্ষিপ্ত রন্ধন।

চেকা—অম্লাস্বাদ।

পুঅ—অপূপ।

লবান্—নবান্ন।

মলান—মৃণাল। পদ্মডাঁটার ভূগভস্থ শুভ্র অংশ। নিম্নজাতীয় বালক বালিকাগণ পুষ্করিণীর পাঁক হইতে 'মলান' তুলিয়া খায়

ভেঁইট্—পাকা শালুক ফল। ইহার মধ্যস্থ সর্ষপবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলিকে ভাজিলে লঘুপাক খই প্রস্তুত হয়। পশ্চিমে এইরূপ খইএর মোআ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

ক্রিয়াপদ

আকাচাকা ভালা—মুগ্ধভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ।

আকাবাকি করা—সত্বরতা অবলম্বন করা।

আথালা—প্রক্ষালন করা।

আমুলে য' }
আম্‌লিয়ে য' } টকিয়া যাওয়া।

আবুরে রাখা—যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেওয়া।

কারে পড়া—বিপাকে পড়া।

উকুট'—অন্বেষণ করা।

উশ্‌কিএে দে—উত্তেজিত করা। [উৎ+শিখা]

ওলিয়ে য',—পড়া,—ক্লান্ত হওয়া। পচিয়া যাওয়া।

ছাঁটা—পদদলিত করা।

ঝিমে—মৃদু বৃষ্টিপাত। 'দেবতা ঝিমেইছে'।

কাজিয়ে করা—ঝগড়া করা।

কিরে করা—দিব্য করা, শপথ করা।

খচলান্ত করা—বিরক্ত করা।

খপ্ করা—সত্বরতা অবলম্বন করা।

খপ্ খপ্ করা—অনুশোচনা করা।

খপ্খপানি—পশ্চাত্তাপ।

খিট্‌কেল করা—কুৎসিৎ নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া।

তেরিমেরি করা—ক্রোধ প্রকাশ করা।

তাঙ্‌রে রাখা—সঞ্চয় করা।

দাঁহুড়ে খ'—রুচিপূর্ব্বক আহার করা, খাইবার সময় বাছ-বিচার না করা।

ধাঁতাল করা—নানাবিধ কার্য্যের জটিলতায় বিরক্তিকর কার্য্য করা।

ওঁতাল করা—আবর্জ্জনাপূর্ণ করা। অপরিষ্কার করা।

ঠুল'—লাফান,—"কি আনন্দ হ'ল রে ভাই, কি আনন্দ হ'ল। সুচির ওপর তালবড়া ঠুলইতে লাগিল॥"

তকোল্লবি করা—বিশ্বাসঘাতকতা করা।

তাকৃতুক করা—ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রাদি দ্বারা বশীভূত করা। বাহ্য ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা বশীভূত করাকে 'ওষুদ করা' বলে।

তুতিঞে বাতিঞে কাজ করান—মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া মজুর খাটান।

খেহুড়ে দে—তাড়াইয়া দেওয়া।

(পোখুর) গাবান—মাছ ধরিবার জন্য সমগ্র পুকুরের জল অপরিষ্কার করা।

গিদের করা—ছেলেকে আদর করা, অহঙ্কার করা।

ছেলে কা'না—ছড়া বলিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ান।

ঘাটকে য'—স্ত্রীলোকের ভাষা। মলত্যাগার্থ গৃহ হইতে নির্গমন।

বিগুরে য'—বিকৃত হওয়া। 'এমন বউ আন্‌লে যি আমর সোনার ছেলে বিগুরে দিলে।'

ফোকোশে খ'—ডাইনীর প্রভাবাধীন করা। 'ছেলের জ্বালা ছাড়ে না, ফোকোশে খেঁঞেছে।'

কাঁটা ভোঁকা—কাঁটা ফোটা। 'পায়ে একটো কাঁটা ভুঁকেছে। আজ তিন দিন খচ্-খচ্ ক'রছে।'

ফরে আনা—কার্য্যোপযোগী করা। কার্য্যানু-কূল করা। 'এত ক'রেও তাকে ফরে আ'ন্‌তে পা'রলাম না।'

পয়মাল করা—পদদলিত করা।

চকাস করা / ধরণ করা } ফরসা করা, মেঘ বা বাদলা কাটিয়া যাওয়া।

ঝ্যাঁজকান—ঝ্যাঁক্ ঝ্যাঁক্ করা।

ফুঁকুলে য'—ফস্‌কে যাওয়া।

হুলন—উচ্চস্বরে চীৎকার করা।

শাউকরি করা—উদারতার ভাণ করা।

হালা—কাঁপা। 'গরুটো জাড়ে হা'ল্‌ছে।'

হেঁচোলা—অকস্মাৎ টান দেওয়া। 'দোয়ে বলদটো হিঁচুলে হিঁচুলে দড়ি ছিঁড়্‌ছে।' 'হেঁচোল মারা'—সহসা আকর্ষণ।

হেদিঞে য'—অদর্শনে কাতর হওয়া। 'তিন দিন বাবাকে না দেখে ছেলেটো হেদিঞে গেল।'

মোনোক্কর করা—পছন্দ করা।

মাকুলি দে'—প্রাতঃকালে গোবর-জল দিয়া মণ্ডলাকার স্থান লেপন করা। প্রতি দ্বারে ও তুলসীতলায় মাকুলি দিতে হয়।

ডাংড়ান—নৃশংসভাবে প্রহার করা।

ঢেরীকরা—স্তূপীকৃত করা।

তকরার করা—বাজী রাখা।

তিরিশ বিরিশ করা—বিরক্ত হওয়া।

দিক্ করা—বিরক্ত করা। [হিন্দী]।

দিশালাগা—দিগ্‌ভ্রম হওয়া।

নেতাড় লাগা—নানা দ্রব্যের পরস্পর সংলগ্ন হওয়া।

আগুনে পলান—জলকাদা করিয়া অঙ্গন সংস্কার।

পাশুরে য'—ভুলিয়া যাওয়া।

ফাবড়া—যষ্টি প্রভৃতি দীর্ঘ বস্তু নিক্ষেপ করা।

বাসা—দুর্গন্ধ উৎপন্ন হওয়া। 'একটো এঁদুর মোল্‌ছে, ভারি বাসাইছে।'

মালুক মারা—ডিগ্‌বাজী মারা।

জীবজন্তু

চাঁদকুয়ো—ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

কোউঅ—কাক।

ডালকোউঅ—দাঁড়কাক।

চ্যাং—ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

গুচি—সর্পাকৃতি সূক্ষ্মমুখ মৎস্যবিশেষ

গো-বাগা—নেকড়ে বাঘ।

খরিশ্—গোখ্‌রো সাপ।

আলান—কৃষ্ণসর্প।

রুই—উইপোকা।

মিরিক—মৃগেল মৎস্য।

আঁধি—ফসলের অনিষ্টকর কীটবিশেষ।

পোলু—রেসম-কীট।

কাঁখুরী—কাঁকড়া।

কানকোটারি—কেন্নূ।

সোনা গোদা—গোসাপ, স্বর্ণগোধিকা।

হনু—বানর।

শোঁশা—খরগোশ।

কুকিল—কোকিল।

গুঁঠলী—এঁটুলি।

বিজি—নকুল, বেজি।

ক্রিয়াবিশেষণ

কোতি—কোথায়।

আকাবাকি—তাড়াতাড়ি।

আকাচাকা—বিস্মিতভাবে।

আফছার—সচরাচর, প্রায়ই। [পারসী 'অকসর্']।

আনাই ধানাই } বৃথা কথা কাটাকাটি,
ধানাই পানাই } অনর্থক সময়ক্ষেপণ।

ওমুনি—বিনা মূল্যে।

আদা-খেঁচরা—অর্দ্ধসম্পূর্ণ।

ধানোকা—অনর্থক, অকারণ।

কুনঠিঞে—কোথায়।

ফারাক্—দূরবর্ত্তী, দূরে।

হাবুচাবু—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

শোঁজাশুজি—সোজাসুজি।

নাফানাফি—লাফালাফি।

শ্রীগৌরীহর মিত্র

চতুস্ত্রিংশ ভাগ]   [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

গিজো (GUIZOT) লিখিত

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ অনূদিত

মূল্য—সদস্য-পক্ষে—১৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৷০, সাধারণ-পক্ষে—১৷৹

ন্যায়দর্শন

বাৎস্যায়ন ভাষ্য—চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

এই খণ্ডে নানা প্রসঙ্গে নানা দার্শনিক তত্ত্বের এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল গ্রন্থাবলম্বনে বিচারপূর্ব্বক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশদ ভাষায় আলোচনা করা হইয়াছে। নানাদর্শনপরমাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—"বঙ্গভাষায় এইরূপ পণ্ডিত্য ও বিচারপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ আর হয় নাই, সংস্কৃতেও অধুনা হয় নাই।" পঞ্চম অর্থাৎ শেষ খণ্ড যন্ত্রস্থ।

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৷৹, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৸৹, সাধারণের পক্ষে ২৲টাকা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

৬৲ টাকায় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্য-পক্ষে ১৫৷০ ও সাধারণ পক্ষে ২২৷৵০, কিন্তু পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্য পক্ষে ৬৲ ও সাধারণ-পক্ষে ৭৲ মূল্যে দেওয়া হইতেছে। —১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সারদা-মঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুব্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। ন্যায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

মাথুর কথা

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-প্রণীত

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা সমেত

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মথুরার ধারাবাহিক সচিত্র ইতিহাস। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে ২৷০।

"অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী" ও "রস-মঞ্জরী"

যাঁহারা বৈষ্ণব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের "গীতগোবিন্দ," "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদাবলী-পূর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিকা, পদ-সূচী, রস-সূচী ও শব্দ-কোষ-সম্বলিত "অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী" ও রস-শাস্ত্রে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভানুদত্তের রস-মঞ্জরীর বিস্তৃত ভূমিকা, সূচী ও রস-বিশ্লেষণ-সম্বলিত সুমধুর পদ্যানুবাদ পাঠ না করিলে চলিবে না। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'বাঙ্গালা ও সংস্কৃত' শাখার বি, এ পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রসংশা-সূচক অভিমত হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে; এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"—রবীন্দ্রনাথ

"এই সকল অপরিচিত পদ-কর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্ব-রস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"—প্রবাসী

"রস-মঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে। সেই বিবরণী অপূর্ব্ব কবিত্ব-রসে মণ্ডিত। * * * রস-শাস্ত্রবিষয়ক এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।"—ভারতী

"অনুবাদে সতীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বর্দ্ধিতই হইয়াছে। এই রস-মঞ্জরীতে কেবল আদিরসেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়া রুচি-সংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ করি।"—হিতবাদী

মূল্য যথাক্রমে ২৲ টাকা ও ৸৹ আনা।

গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত প্রেসে ও ঢাকেশ্বরী মিল পোঃ, ঢাকা, শ্রীযুক্ত যতীনচন্দ্র রায় এম এ ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

জ্ঞান উৎপাদ[১]—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

জ্ঞান কি, বস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ, জ্ঞানের প্রকারভেদ আছে কি না, সত্য বা প্রমা-জ্ঞান কি করিয়া হয়, প্রমিতিস্থলে প্রমাতা কাহাকে ধরা যায়, ভ্রমের স্থান কোথায়, এই সকল প্রশ্নের সমাধান মনস্তত্ত্ব অথবা তর্কশাস্ত্র দ্বারা হয় না। সেই জন্য জ্ঞান উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্বের আবশ্যকতা হইয়াছে এবং ইংরাজীতে উহাকে "এপিস্‌টেমোলজি" বলে। তবে মনস্তত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র জ্ঞান উৎপত্তি বিচারে সাহচর্য্য করে, তাহা বলা আবশ্যক।

জ্ঞান প্রকৃতপ্রস্তাবে একাকী উৎপন্ন হয় না, ইহা জ্ঞেয়ের অর্থাৎ বস্তু বা বিষয়ের অপেক্ষা করে। যদি জগৎটা না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, মানবজ্ঞান, নাগার্জ্জুনের শূন্যে পরিণত হইত এবং সংস্কার না থাকায় সকলেই বিনা সাধনায় নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিত। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি, তাহা বহু প্রাচীন কাল হইতে মানুষ জানিয়াছে। মনোবিজ্ঞানে এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্থলে আরও কএকটি সংযুক্ত হইয়াছে—তাহারা সাধারণতঃ দৈহিক বা শারীর ক্রিয়ার অনুভূতি[২]। প্রাকৃতিক পদার্থের দ্বারা কোনও অজ্ঞাত নিয়মে এই ইন্দ্রিয়গুলি অভিহত হয় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন সংবেদন হয়। সংবেদনসমূহ জাতি গুণ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপার লইয়া বস্তুগ্রহ বা উপলব্ধিতে (পারসেপ্‌শন্) পরিণত হয়। এখানেও কোন অপরিচিত নিয়মে উহা মানসিক আকার (আইডিয়া) প্রাপ্ত হয় ও উহা অবধৃত হইয়া সংস্কার (কন্‌সেপ্ট) আকারে মনোমধ্যে নিহিত থাকে এবং তাহাকে আমরা স্মৃতি বলি। আধুনিক মনস্তত্ত্বের যেরূপ রীতি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে চৈতন্যের স্থান নাই। সুতরাং "কনসস্‌নেস্" বা চৈতন্যের কথা না বলাই ভাল। পূর্ব্বোক্ত সংস্কারগুলির আমরা পশু, উদ্ভিদ, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি এক একটা নাম দিয়া থাকি। তাহার পর সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য বোধ-কার্য্যটাও অনেকের মতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু সেটা ঠিক নহে। কারণ, গ্রহণ-কার্য্যটাই ইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তুলনা কার্য্য কি করিয়া হইবে?

এই স্মৃতি জীব-জীবনে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সংস্কারসমূহ অলক্ষিতভাবে কোথায় ও কি প্রকারে থাকে, তাহা বলা যায় না। বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, এই স্মৃতি না হইলে জীবের, বিশেষতঃ মানুষের এক দণ্ড চলে না। চলে না বলিয়া যে একটা শক্তি বা বৃত্তি আপনি আসিয়া পড়ে, তাহার কোনও কারণ নাই। ইহার মূলে উদ্দেশ্য আছে বলিলেও একশ্রেণীর তার্কিক উদ্দেশ্যের[৩] কথা শুনিলে কুসংস্কার বলিবে। যাহা হউক, স্মৃতি আছে বলিয়াই

১। "ধর্ম্মসংগনি" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে "চিত্তুপ্পাদকণ্ডম্" শব্দ প্রথম অধ্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃতে উহা "চিত্ত-উৎপাদ" এবং ঐ পুস্তকে চিত্ত বা জ্ঞানের উৎপত্তি কি ভাবে হয়, তাহাই দেখান উদ্দেশ্য। উহারই অনুকরণে উৎপাদ শব্দ ব্যবহৃত হইল।

২। Organic sensation. ৩ Teleology.

মানুষ ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে বা চিন্তা করিতে পারে বলিয়া জীব-জগতে মানুষই উন্নত। কোন বিষয় ভাবিতে হইলে আমাদের একটা লক্ষ্য থাকে এবং উহার অনুকূল বিষয়গুলি আমরা স্মরণ করি ও উহার মধ্যে যেগুলি আবশ্যক, তাহারই প্রতি মনঃসংযোগ করি এবং অপরাপর বিষয়গুলি আপনা আপনি মানস কেন্দ্র হইতে তিরোহিত হয়। তাহার পর বিতর্ক ও বিচার করি অর্থাৎ দ্রব্য সম্বন্ধে যে গুণ ও ক্রিয়া জানা আছে, উদ্দেশ্য সাধনে তাহার উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করি। এ স্থলে যদি দুইটি লক্ষ্যের বিষয় থাকে, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য লইয়া তুলনা করি এবং অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত করি অথবা করিতে পারি না।

পূর্ব্বকথিত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিই আভ্যন্তরীণ। বস্তুসমূহের ইন্দ্রিয়গৃহীত গুণ ও ক্রিয়া-সকল মানসপটে যে ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহা লইয়াই তোলাপাড়া। তবে সংবেদন প্রকৃতপ্রস্তাবে দৈহিক ক্রিয়া; তাহার পর যে সকল স্তর দিয়া ইন্দ্রিয়গৃহীত উত্তেজনা সংস্কারে পরিণত হয়, তাহা মানসিক। এখন দেখিতে হইবে, এই মানসক্রিয়া বিশেষভাবে মানুষেরই হইয়া থাকে এবং উহা যে আধারে বা যাহা অবলম্বনে হয়, তাহাই অহংব্যাপার। যাহা মানস ব্যাপার, তাহা তাহার নিজের এবং আভ্যন্তরীণ এবং যাহা মনকে সজাগ করিতেছে, তাহা তাহার নিজস্ব নহে—বাহিরের বস্তু। তবে কতকগুলি বিষয় যদিও শুদ্ধ আধ্যাত্মিক, কিন্তু তাহাদের অনুভূতি বাহ্য পদার্থের ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন সুখ ও দুঃখ, ভাব ও রস (ইমোশন্)। মানস আকৃতি[১] সংস্কার, বিচার প্রভৃতি সমস্তই মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং নামযোজিত সংস্কার ও সিদ্ধান্ত তর্কশাস্ত্রের বিষয়। এই উভয় অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র মিলিয়া জ্ঞানের ও সত্যের পরিচয় আমাদিগকে দিয়া থাকে।

মনের প্রক্রিয়া লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে কোনও গোল নাই। তবে মনের প্রকৃত অবস্থা বা উহার নিজের রূপ লইয়া মতদ্বৈধ আছে এবং তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ স্থলে দিতে চেষ্টা করিব। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মনটা শাদা কাগজের মত। শিশু এই শাদা কাগজ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে এবং এক একটি প্রাকৃতিক উত্তেজনার সহিত তাহার ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হইয়া নূতন নূতন জ্ঞান উৎপন্ন করে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানসমূহ অনুবন্ধ নিয়মে (এসোসিয়েশন্) সজ্জিত হইয়া চিন্তাধারা উৎপন্ন করে। যখন যেটুকু আবশ্যক, তাহা এই নিয়মবশেই জ্ঞানকেন্দ্রে উপস্থিত হয়। বাহ্যিক জগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ, অন্তর্জগতে সেইরূপ অনুবন্ধ নিয়ম। এই জন্য তাঁহাদের মতকে মানসরসায়ন মত বলে অর্থাৎ বাহ্য জগতে যেমন পরমাণুপুঞ্জ দ্ব্যণুক আকার ও পরে দ্রব্যে পরিণত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়জনিত খণ্ড জ্ঞান, রূপ, গন্ধ, জাতি প্রভৃতি লইয়া সংস্কার ও পরে চিন্তা কালে যথাযথভাবে স্বস্থানে উপস্থিত হয়। এ মতের আজকাল বড় আদর

১। Images.

নাই এবং ইহা লক্, হার্‌টলী, মিলদ্বয় ও বেনকর্ত্তৃক পোষিত হইয়াছে। তবে মিল ও বেন উহার নূতন আকার দিয়াছেন। ইহাঁদের অপর নাম "এমপিরিসিস্‌ট।"

পূর্ব্বোক্ত মতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতপ্রধান ক্যাণ্ট। অনুবন্ধবাদীরা দ্রব্যকেই বড় করিয়াছেন এবং মন তাঁহাদের চক্ষে একটি যন্ত্রমাত্র। এই বস্তুসমূহ মননামক যন্ত্রে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া পতিত হইয়া নিজে নিজে আপন আপন স্থান খুজিয়া লয় এবং মনটা একটা নিষ্ক্রিয় আধারমাত্র। ক্যাণ্ট মনকে প্রাধান্য দিয়া, উহাতেই কতকগুলি জ্ঞানের ব্যাপার আরোপিত করিয়াছেন। গুণ, সংখ্যা, সম্বন্ধ এবং সম্ভাবনা প্রভৃতি বোধ ও কাল এবং কতকপরিমাণে দেশেরও বোধ মন বা বুদ্ধির স্বকীয় সম্পৎ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-সমূহ মনের ঐ শক্তি দ্বারা সুরঞ্জিত হইয়া মানবজ্ঞানে পরিণত হয়। অনুবন্ধমতে দ্রব্যই সর্ব্বস্ব, ক্যাণ্টের মতে দ্রব্যগুলি সামগ্রীমাত্র, জ্ঞানাকারে পরিণত হইতে হইলে মনের সাহায্য ভিন্ন হয় না। যেমন গৃহনির্ম্মাণে ইষ্টক, কাষ্ঠ, লৌহ প্রভৃতি উপকরণমাত্র, সেইরূপ বাহ্য জগৎ উপকরণমাত্র, উহাদের সংস্থান ও সন্নিবেশ মনের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। মন যতক্ষণ সংখ্যা, পরিমাণ, সম্বন্ধ প্রভৃতি তাহার স্বকীয় বৃত্তিগুলি বস্তুর উপর আরোপিত না করে, ততক্ষণ উহাকে জ্ঞান বলা যায় না, উহা নির্ব্বিকল্পক একটা কিছু প্রতীতিমাত্র। তবে মনঃসৃষ্ট জ্ঞানও ব্যবহারিক জ্ঞানমাত্র, স্বরূপজ্ঞান[১] ইহার পশ্চাতে আছে, তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে বলিয়া আমাদের বোধগম্যও নহে। প্রজ্ঞা (রিসন্) মনের সর্ব্বপ্রধান শক্তি এবং উহার সাহায্যে আমাদের ধর্ম্ম ও নীতি-বোধ হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারাই আমরা স্বরূপ-লোকের বা পরমার্থতত্ত্বের আভাস পাইয়া থাকি।

স্পেন্‌সারও ক্যাণ্টের মতই দর্শনতত্ত্বে অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নব্য বিজ্ঞানের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিজ্ঞান সামগ্রী হইতে পারে, তবে উহা জ্ঞান নহে। জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে বস্তুসৃষ্ট নহে, উহার মূল আকার মনঃসৃষ্ট এবং ক্যাণ্টও তাহাই দেখাইয়াছেন। এই মূল আকার বংশপরম্পরালব্ধ শক্তিবিশেষ। সাদৃশ্যবুদ্ধি বা সমতাবুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের একটি মূল আকার। বস্তুদ্বয়ের সমানতাবুদ্ধি মনোনিহিত নৈপুণ্যবিশেষ, তাহারই ফলে আমরা সমান অসমান বুঝি। জ্যামিতির প্রথম স্বতঃসিদ্ধও জ্ঞানমুখী, উহা বস্তুমুখী নহে। এইরূপ ভাবের জ্ঞানকে স্বতোবুদ্ধি বলা যায়।

আজকাল আরও কএকটা মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক। যাঁহাদের জড়ত্বে ও জড়বাদে অধিক অনুরাগ, তাঁহারা সকল বিষয়েই জড়কে প্রবল করিতে চাহেন। সেই সম্প্রদায় সাইকোলজিকে আর প্রাচীন আকারে দেখিতে চাহেন না। সম্বিৎ, সংবেদন, উপলব্ধি প্রভৃতি তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা অসার কল্পনামাত্র। আমরা কেবল জানি, উত্তেজনাও

১। **Noumenon.**

তাহার ক্রিয়া[১]। অর্থাৎ জড়ের উত্তেজনা ও তাহার ফল যাহা কিছু। প্রকৃতির আলোক প্রভৃতি সামগ্রী স্নায়ুপ্রান্তে ইন্দ্রিয়সমূহকে অভিহত করে ও তাহার ফলে যে একটা ক্রিয়া হয়, সেইটিই আমাদের বোধগম্য। কাজেই জীবশরীর, অতএব মানুষের শরীরও এক একটি যন্ত্রস্বরূপ ও উহা বাহ্য প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া যখন যেরূপভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাহাই করে। তাহার সম্বিৎ, তাহার চিন্তা, তাহার ইচ্ছা, তাহার সুখ, তাহার ক্রোধ, তাহার রস (ইমোশন্), এ সকলই প্রকৃতির ক্রিয়া এবং প্রকৃতির যাদৃচ্ছিক ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের ক্রিয়া ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রত্যাবৃত্তক্রিয়াবাদ[২]। এই মত অনুসারে সম্বিৎ, অহং প্রভৃতি কিছুই নাই। এমন কি, জীবের স্বতোবুদ্ধি বলিয়া কোনও শক্তি নাই। দ্বিখণ্ডিত ব্যাংএর পায়ে সূচি বিদ্ধ করিলে সে মস্তক না থাকাতেও তাহার পা টানিয়া লয় অথবা ছিন্নমুণ্ড কুকুরের পায়েও ঐরূপভাবের উত্তেজনা দিলে সে তাহার পাদ চালনা করে। ইহাদের মুণ্ডহীন অবস্থাতে এরূপ ভাব কি করিয়া হয়? প্রথমতঃ ইহাদের স্পর্শস্নায়ু-প্রান্ত উত্তেজনার সংবাদ স্নায়ুকেন্দ্রে লইয়া যায় এবং তথা হইতে স্নায়ু-শক্তি-স্রোত প্রবাহিত হইয়া, পায়ের পেশীদেশ-সংলগ্ন চালক স্নায়ুতে (মোটর নার্ভ) পৌছায় ও সেই ইঙ্গিত অনুসারে পায়ের পেশী চালিত হয়। বলা বাহুল্য, আমরা কেবল দুইটা ক্রিয়া মাত্র দেখি। প্রথমতঃ পায়ের নীচে উত্তেজনা ও পাদসঙ্কোচ। উহার পর পর কি ক্রিয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে আনুমানিক। তাহা ছাড়া মনের একটা স্বতন্ত্র অধিকার আছে, যেহেতু উহার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও অঙ্গ চালনা করিতে পারে। কাজেই যন্ত্র-বাদটা সকল মানসিক তত্ত্বের ও অবস্থার তৃপ্তিজনক ও রুচিকর ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

আরও একটা নূতন যন্ত্রবাদ হইয়াছে, তাহাকে ট্রোপিজম্[৩] বলে। এই বাদটির বয়স অধিক নহে এবং লোএব্ প্রমুখ শারীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার উপর খুব ঝোঁক দিয়াছেন। উদ্ভিদ-সমূহ সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে রশ্মির দিকে অগ্রসর হয় এবং শিকড়সমস্ত রস ও পুষ্টিলাভের জন্য নিম্নে গমন করে, ইহা অনেক দিন হইতে জানা আছে। কিন্তু ইহা কেন হয়, সে বিষয়ে লোকের ততটা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ইহাদের এই দুইটি গতি লইয়া ট্রোপি নামটির সৃষ্টি; কারণ, উহার মৌলিক অর্থ "ফেরা"[৪]। টর্ণ অর্থাৎ কোনও কারণে ইহারা সাধারণ দিক্ ছাড়িয়া অন্য দিকে ফিরে। সম্প্রতি এই সম্বন্ধে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। পক্ষবিশিষ্ট কীটকে কাচের বাক্সের মধ্যস্থ জলে ছাড়িয়া দিয়া, যদি একটা আলোকরশ্মি তাহাদের মুখের উপর বা একটি চোখের উপর পাতিত করা হয়, তাহা হইলে সেই আলোকরশ্মির প্রভাবে

১। Stimulus and Response.

২। Reflex action.

৩। Tropism from Gr. Trepein to turn.

৪। Behaviourism.

তাহাদের চোখের দিকের স্নায়ু উত্তেজিত হয় এবং সেই জন্য তাহাদের সেই দিকের পাখাও সঙ্গে সঙ্গে নড়িতে থাকে এবং যতক্ষণ রশ্মি ক্রিয়াশীল থাকে, ততক্ষণ তাহাদের এক পাখা নড়ার জন্য ঘুরপাক খাইতে হইবে। পতঙ্গসমূহ যে আলোকরশ্মির কাছে ঘুরিতে থাকে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কারণেই হয়, যদিও সাধারণ বিশ্বাস যে, আলোকে প্রফুল্ল হইয়া কীটসমূহ আলোকের সহিত খেলা করে। এই জন্য লোএব্ সাহেব বলেন যে, তাবৎ জীবের ব্যবহার ও আচরণ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সম্বিৎ, ইচ্ছা, প্রণয়, ভালবাসা, ও সকল কিছুই নয়—উলঙ্গ প্রকৃতির তাড়না মাত্র। যাহা হউক, এই মত অল্পে অল্পে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্র আক্রমণ করিতেছে।

আরও একটা নূতন মার্কিন মত প্রচলিত হইয়াছে এবং এই অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত মতে সম্প্রদায়বিরোধও উপস্থিত হইয়াছে। এই মতটার নাম আচরণবাদ বলা যাইতে পারে। উক্ত মতাবলম্বী পণ্ডিতেরাও একপ্রকার যন্ত্রবাদী বটেন। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে তাঁহাদেরও শ্রদ্ধা নাই, আবার তাঁহারা একবারে স্নায়ুসর্ব্বস্ববাদীও নহেন। তাঁহারা মনোবস্তু, সম্বিৎবস্তু প্রভৃতি অসার কল্পনা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন অথচ স্নায়ুই যে জ্ঞানের মূল অথবা মস্তিষ্ক, স্মৃতি ও জ্ঞানকে একই বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মানব আচরণ মানবের বাহ্যিক ও মানসিক কর্ম্ম। ম্যাকডুগাল মানবের জ্ঞান[১]সমষ্টি আছে, তাহা অস্বীকার করেন না এবং তিনি পূরাভাবে যন্ত্রবাদীও নহেন। তিনি বলেন যে, জীবের আচরণে বা কর্ম্মে লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে; জীব, বাত্যাতাড়িত কাগজের গোলকের মত নহে। ওয়াট্‌সন্ সাহেবও এই মতের একজন অধিনায়ক। জ্ঞানসমষ্টি আছে, কি নাই, তাহা বিচার করিবার তাঁহার মতে আবশ্যক নাই। আচরণই আমাদের বোধগম্য এবং আচরণই মনস্তত্ত্বের আলোচনার বিষয়। ম্যাকডুগাল বলেন, কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ড ও স্তন্যপায়ী জীব অবধি প্রত্যেকেরই স্বতোবুদ্ধি আছে। কাজেই মানুষেরও স্বতোবুদ্ধি ও স্বতঃপ্রবৃত্তি আছে। জীবমাত্রেই এক মহাপ্রাণের[২] বশে কোনও অলক্ষিত অজ্ঞাত পথে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। ওয়াট্‌সন্ ও হোল্ট, ইহাঁরা উভয়েই মানুষের ক্রিয়া বা আচরণ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করেন। পণ্ডিত ম্যাকডুগাল বলেন, ইতর জীবের ন্যায় মানুষেরও কতকগুলি স্বতোবুদ্ধি বা মূল সংস্কার আছে—সন্তানরক্ষা-বুদ্ধি, সংগ্রামবুদ্ধি, কৌতূহলবুদ্ধি, খাদ্যসংগ্রহবুদ্ধি, যৌথবুদ্ধি ইত্যাদি। এই সকল বুদ্ধির বা সংস্কারের প্রেরণায় মানুষের ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। একদিকে স্বতোবুদ্ধি ও অপর দিকে ভালবাসা, দ্বেষ, স্বদেশপ্রেমিকতা ইত্যাদি। এইগুলিও মানুষের মনে সতত স্বতঃ বর্ত্তমান। তাহাদিগকে ভাব (সেন্টিমেন্ট) বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া রসও আছে অর্থাৎ ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আছে। এই রসগুলি স্বতোবুদ্ধির সহিত জড়িত এবং উহারই সঙ্গে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা মানবজ্ঞানের একটা

১। Experience.

২। Libido (Jung), Elan vital (Bergson).

দিক্ পাইতেছি অর্থাৎ বুদ্ধির দিক্‌টা। কিন্তু কতকগুলি বিশ্বাসও মানুষের আছে, অতএব মনঃ-প্রকোষ্ঠ দুইটি স্তম্ভের উপর খাড়া হইয়া আছে—একটি বুদ্ধিমুখী ও অপরটি বিশ্বাসমুখী। বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের দ্বারা ধর্ম্ম, নীতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতির মূল তথ্য বা বাদ।

ইহাকে মনস্তত্ত্বের নবতন্ত্র বলিতে পারা যায়। প্রাচীন আত্মাবাদ, অনুবন্ধবাদ, স্বতো-গ্রহণবাদের সহিত এই মতের বিরোধ। আবার শুদ্ধ স্নায়ু বা মস্তিষ্কজন্য জ্ঞানবাদও এই নব্যতন্ত্রের প্রীতিকর নহে, কাজেই এই নূতনতর তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এখন জ্ঞান সম্বন্ধে অপরাপর সমস্যাও আছে, সেই বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক।

জ্ঞান উভয়বাহিনী অর্থাৎ একদিকে ইন্দ্রিয়গৃহীত প্রাকৃতিক পদার্থ ও তাহার পর উহার একটা সংস্কার এবং এই দুইয়ের সমন্বয় জ্ঞানে। এই সংস্কার ও প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য বা কোন্‌টি প্রামাণিক? এইখানে একটা সমস্যা। বার্কলী বলেন, পদার্থ বা দ্রব্যের বার্ত্তা আমরা জানি না; তবে আমরা জানি, আমাদের উপলব্ধি বা সংস্কার, ইহা এক প্রকার বিজ্ঞানবাদ। স্বরূপতঃ বস্তুর রূপ বা কোমলতা কঠিনতা আছে কি না, তাহা আমাদের জানার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবে আমরা উহার সংস্কার মাত্র জানি[১]। বস্তু আমরা যথার্থ ভাবে জানি, ইহা লোকায়ত মত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে মনোগৃহীত সমাচার ভিন্ন বস্তুর আর কোনও নিদর্শন নাই। ষ্টুয়ার্ট মিল এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তিনি ইহা স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়াছেন।

মন ও বস্তু দুইটি বিভিন্ন সামগ্রী অথচ ইহাদের সম্মিলন ও সামঞ্জস্য কি করিয়া হয়, এই প্রশ্ন সকল পণ্ডিতকেই কোন না কোন ভাবে প্রক্ষুব্ধ করিয়াছে। ডেকার্টের মতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সময়ে সময়ে এই ঐক্য[২] সম্পন্ন হইয়া থাকে। লাইবনীট্‌জ বলেন, এই ঐক্য[৩] পূর্ব্বব্যবস্থিত। স্পেন্সার্ বলেন, বস্তুর যথাযথ জ্ঞান আমাদের হয় না। তবে উহার যে ভাণ হয়, তাহা রূপান্তরিত সত্তা[৪]। আমাদের দেশে যোগাচার ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় বাহ্যার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান এবং যোগাচারীরা বাহ্যার্থের অস্তিত্ব অস্বীকারই করেন। তবে সৌত্রান্তিকেরা বাহ্যার্থ অনুমানের বিষয় বলিয়া থাকেন।

ষড়্‌দর্শনের সূত্রকারেরা জ্ঞানমূলে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা সকলেই "এম্‌পিরিসিষ্ট"। তবে ঐ সঙ্গে মীমাংসক ভিন্ন সকলেই যোগজ জ্ঞান বা প্রাতিভ জ্ঞান মানিয়া লইয়াছেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের প্রথম অবস্থা নির্বিকল্পক অর্থাৎ তাহাতে জাতি, দেশ, কাল প্রভৃতি কোন উপাধি বা বিশেষণ থাকে না, উহা কেবল জ্ঞানমাত্র। পরে

১। Esse is percipi.
২। Occasionalism.
৩। Pre-established harmony.
৪। Transfigured realism.

জাতি প্রভৃতির সহিত উহা সবিকল্পক জ্ঞানে পরিণত হয় এবং তৎপরে "আমি ইহা জানিতেছি" এইরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের নাম অনুব্যবসায়।

বাহ্যার্থ বিষয়ে যেমন এক সম্প্রদায় অনিশ্চয়তা স্থির করিয়াছেন, তেমনি ইহার বিরোধী সম্প্রদায় বস্তুর সত্তাব[১] জোরের সহিত ধরিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাঁদের সংখ্যাই অধিক। আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই বাহ্যসত্তাবাদী, কেবল বৈদান্তিকেরা বাহ্য পদার্থ ব্যবহারিক ভাবে সৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত, তাঁহারা জ্ঞানমাত্রেই আপেক্ষিক[২] বা পরিচ্ছিন্ন, এইরূপ মনে করেন। তাঁহাদের মতে বস্তুর স্বরূপ আমাদের পক্ষে অজ্ঞেয়। বস্তুর চিহ্নমাত্র আমরা জানি, তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি আমাদের জানিবার উপায় নাই। জগতের পশ্চাতে নিরুপাধিক, পূর্ণ পদার্থ আছেন আর তাহা ছাড়া যাহা কিছু, তাহা সোপাধিক, পরিচ্ছিন্ন বা আপেক্ষিক। ইহার মধ্যে হেগেল, ব্রাডলী ও রয়স্ এই পূর্ণ পদার্থকে একভাবে দেখিয়াছেন, আবার হ্যামিল্টন্ ও স্পেন্সার ইহা অন্যভাবে দেখিয়াছেন। বৈদান্তিক মতও ইহার সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এ স্থলে আর একটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। আমাদের জাতি বা ব্যক্তিজ্ঞান কি ভাবে হইয়া থাকে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে এক দল[৩] আছেন, তাঁহারা জাতি-জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করেন এবং তাঁহারা বলেন যে, আমাদের গরু বা কুকুর প্রভৃতি এক একটা জাতিবাচক জীব বা উদ্ভিদের জ্ঞান আছে। অপর দল[৪] বলেন যে, নাম বা শব্দই জাতি বুঝাইয়া থাকে, উহার প্রকৃত সত্তা নাই।

যাহা হউক, অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞান সম্বন্ধে মত এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। মন এবং বস্তু, এই উভয়ই সমস্যাপূর্ণ। জড়বাদ, যন্ত্রবাদ, ইন্দ্রিয়বাদ, চিদ্‌বাদ প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া জ্ঞানবাদ তত্তৎক্ষেত্র অনুসারে স্ফুরিত হইয়াছে। হয় ত প্রত্যেকেই আপন আপন স্কন্ধে কিছু সত্য বহন করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব গুহাতেই নিহিত আছে। যাঁহারা চিত্তকে একবারে জড়ধর্ম্মী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কি করিয়া জড় বস্তু, চিত্তরূপ জড়ের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহার কোনও কারণ দেখাইতে পারেন না। গতিশীল গোলক স্থির গোলককে অভিঘাত করিলে শেষোক্ত গোলকও গতিশীল হইয়া থাকে, ইহা সত্য; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেহই জানে না, তাহারা কি করিতেছে; ইহাও বুঝিবার বিষয়। জীবচিত্ত সম্বন্ধে জড়বাদ ঠিক খাটে না, যেহেতু উহার অভি-ঘাতের পর আর একটা পরিণাম হয়, তাহাই জ্ঞান। এই স্থলে একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য বলিয়া

১। Realist.
২। Relativity.
৩। ইহাদের নামও Realist.
৪। Nominalist.

তাহা তুলিয়া দিতেছি। কোন একজন খ্যাতনামা কেম্‌ব্রিজ জ্যোতিষাচার্য্য "নব রিলেটিভিটি" সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"এই নূতন নিয়ম পদার্থতত্ত্বের নিয়মসমূহকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে ও সূক্ষ্ম গণনার পক্ষে সুবিধা করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বস্তুর গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে এই জ্ঞান শাঁস ও শামুকের খোলার ন্যায় অসার। যে অজ্ঞাত সামগ্রী ভৌতিক জগতের অন্তরে অন্তরে রহিয়াছে, তাহাই আমাদের জ্ঞানবস্তু এবং উহা পদার্থতত্ত্বের প্রণালীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেখানে বিজ্ঞান খুব অগ্রসর হইয়াছে, সেখানে মন প্রকৃতিকে যৎটুকু আত্মদান করিয়াছে, ততটুকুই সে প্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়াছে। অজ্ঞাত সলিল-তীরে পদচিহ্ন দেখিয়া তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বাদের পর বাদ রচনা করিয়াছি এবং পরে পদাঙ্ক হইতে জীবের আকৃতিও পুনর্গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু হায়! সে আকৃতি আমাদেরই।"[১] বাস্তবিকই মানুষের বাদ অনুবাদের সংখ্যা নাই। কিন্তু জড়ই বল, আর মনই বল, তাহাদের স্বরূপ বা তাহাদের মূল আকার সম্বন্ধে আমরা কি জানিয়াছি? বুদ্ধি ও উদ্যমপ্রাপ্ত মানুষ নিজের যতটুকু অধিকার, নিজের যেরূপ প্রবৃত্তি ও মানসিক ভাব, তাহাই তিনি মনুষ্যসমাজকে দিয়াছেন।

এই অবকাশে জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্ঞান শব্দটি আমাদের অতি সঙ্কীর্ণভাবে ব্যবহার করিতে হয়। ইংরাজী "কগ্‌নিশন্", "এক্সপিরিয়েন্স", "কন্‌সেপ্‌শন্", "নলেজ্", "সেন্‌সেশন্", "কনশস্‌নেস" প্রভৃতি বোধের বিভিন্ন সংস্থানের বিভিন্ন নাম না থাকায় আমাদের জ্ঞান শব্দই ব্যবহার করিতে হয়। যাহা হউক, যত দিন বাঙ্গালা সাহিত্যে দর্শনের দেহ পরিপুষ্ট না হয়, তত দিন আমাদের এক অঙ্গ দিয়া অপর অঙ্গের অভাব পূরণ করিতে হইবে। পণ্ডিতেরা জ্ঞানের অনেক প্রকার ভাগ করিয়াছেন। (১) (ক) সাক্ষাৎজ্ঞান, (খ)অসাক্ষাৎজ্ঞান। সাক্ষাৎজ্ঞান—যাহা ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং অসাক্ষাৎ জ্ঞান, যাহা তাহা হয় না। (২) একবিষয় জ্ঞান, যেমন গো, বৃক্ষ ইত্যাদি এবং অনেকবিষয়াশ্রিত জ্ঞান, যেমন বৃক্ষ প্রভৃতির উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আকৃতি প্রকৃতির জ্ঞান। এই জ্ঞানদ্বয়কে এক হিসাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জ্ঞানও বলা যায়। (৩) পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান (মিডিয়েট্ ও ইমিডিয়েট্ নলেজ্)। যাহা নিজের ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, তাহা পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে যোগজ জ্ঞানও ধরা যাইতে পারে। কেহ কেহ (আরিস্ততল ও ক্যাণ্ট) জ্ঞানকে (ফরম্যাল ও মেটিরিয়াল) তাত্ত্বিক ও বাস্তব, এই দুই ভাগ করিয়াছেন। জ্ঞান একদিকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি (এপ্রিহেন্‌শন্) এবং আর এক দিকে অববোধ বা বুঝা (কম্‌প্রিহেন্‌শন্)। অন্ধের আলোকজ্ঞান অববোধ মাত্র।

(১) A. S. Eddington—Space, Time and Gravitation.
(ক) Knowledge by acquaintance.
(খ) Knowledge about.

যাহা হউক, একৈক জ্ঞানে বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে বিশেষ কোন গোল নাই। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যে সংস্কার হয় এবং স্মৃতি সাহায্যে যাহার পুনরুদ্বোধ হয়, সেই সকল সংস্কারের আমরা এক একটা নাম দিয়া থাকি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সকল নাম আমরা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি এবং এই স্থলেই তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি। চিন্তা দ্বারা অনুমান সাহায্যে (গ) আমরা এক একটা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি এবং এই সিদ্ধান্ত এক একটি উক্তি। ক্যান্টের মতে আন্বীক্ষিকী জ্ঞান দুই প্রকার—বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য[১] জ্ঞান ও সংশ্লেষক[২] জ্ঞান। "বস্তুমাত্রেরই বিস্তৃতি আছে," ইহা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য অথবা বিশেষণজ্ঞান, যেহেতু বিস্তৃতি বস্তুর একটি সাধারণ গুণ। আবার "পৃথিবী একটি গ্রহ," এই উক্তিটি সংশ্লেষক জ্ঞানের পরিচয় এবং ইহাই তাঁহার মতে প্রকৃত জ্ঞান, যেহেতু ইহাতে একটা নূতন বিষয়ের প্রতীতি হইল।

তর্কশাস্ত্রের অবয়বে আজকাল পণ্ডিতদের ততটা শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা বলেন, উহাতে জ্ঞানের কোনও প্রসারতা দেখা যায় না। সকল মানুষই মরণশীল, অতএব হরিও মরিবে, এ ত জানা কথা। যাহা হউক, এই প্রাচীন "অবয়ব" একেবারে প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্যক্ বা অবিসম্বাদী জ্ঞানপ্রাপ্তি। ঐ জ্ঞান ভ্রমশূন্য হওয়া আবশ্যক এবং যাহা ভ্রমশূন্য, তাহাই প্রমাজ্ঞান ও তর্ক-শাস্ত্র ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করার উপায় দেখাইয়া দেয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংস্কার অবধি মানসিক ক্রিয়া, কিন্তু সংস্কার ছাড়াও জ্ঞান বিষয়ে অপরাপর আবশ্যকীয় সামগ্রী আছে এবং তাহাও মানসিক। তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। হিন্দু এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা সংশয়মূলে জ্ঞান উৎপত্তি দেখিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যদের ইহা "ফিলসফিক ডাউট"। ইহাকে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছাও বলিতে পারা যায়। সংশয় হইলেই যে জানিতে পারা যায়, তাহা বলিতে পারা যায় না। কতক বিষয়ের জ্ঞান চিরকালই হয় ত সংশয় থাকিয়া যায়। মঙ্গল গ্রহে জীব আছে কি না, তাহা এখনও প্রমাণিত হইবার কোনও উপায় নাই। অথবা দেশ ও কাল সান্ত, কি অনন্ত, তাহাও জানিবার কোনও পন্থা নাই। উহা আমাদের পক্ষে এখনও অবিদ্যা বা অজ্ঞান।

অতএব জানিবার চেষ্টা থাকিলেই যে জানা যায়, তাহা ঠিক নহে। কাজেই জ্ঞানের ক্রম-(ডিগ্রী) বিভাগও হইতে পারে। কতক বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারা যায়, কতক বা সম্ভাবনা আকারে, আবার কতক পরের মুখে শুনিয়া বা গ্রন্থাদি পড়িয়া (শব্দজ্ঞান ইংরাজী অথরিটি) এবং অপর যাহা কিছু জানি, তাহা কেবলমাত্র বিশ্বাস আকারেই আছে। এই বিশ্বাসলব্ধ জ্ঞানই মানুষের অন্তঃকরণে অধিকতর স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে, যেটুকু আমাদের নিজস্ব, যাহা সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া জানি, তাহার মধ্যেও আবার দুই প্রকার ভাগ হইতে পারে—কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী[৩] বা নিত্য বা অব্যভিচারী, আবার কতক কাদাচিৎক[৪]

গ। অনুমান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধবিবৃত হইয়া পড়িবে।

১। Analytical.   ২। Synthetical.

৩। Necessary.

৪। Contingent.

অর্থাৎ কখনও কখনও হইয়া থাকে। যখন সংশয় একবারে চলিয়া যায়, তখনই সত্যের বা প্রজ্ঞা-জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সংশয় হয় ভ্রমের জন্য। কারণ, কোন মানুষই আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারে না। অতএব প্রমাত্ববাধক জ্ঞান হয় কি করিয়া ? আবার কি করিয়া সত্যকে সত্য বলিয়া আলিঙ্গন করি ? ইহার কি কোনও পরিমাপক আছে, কোনও জ্ঞাপক আছে ? যদি থাকে, তাহা হইলে উহা মনেরই একটা বৃত্তি অথবা মনের অতীত অপর কোনও ব্যবস্থাপক শক্তি। ভ্রম সমস্ত দূরীভূত হইল কি না, তাহা ত জানিবার কোনও উপায় নাই। প্রাচীনেরা হয় ত পৃথিবীকে ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ অথবা বিস্তৃত বলিয়া মনে করিতেন। এখন আমরা ইহা ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া বিবেচনা করি। ইহা একটা তাঁহাদের বিশ্বাস মাত্র ছিল, ইহাতে সংসারযাত্রায় কোনও ইষ্টানিষ্ট বা বিঘ্ন ছিল না। অতএব সত্যের অনুভূতি আধ্যাত্মিক। যিনি সত্যের আবিষ্কর্ত্তা, তিনি ঋষি বা বুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষও স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে সেই সত্যের আস্বাদন করিতে পারে।

মানুষের সংশয় ভ্রমের জন্য। যদি সর্ব্বজ্ঞতা মানুষের থাকিত, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। এই ভ্রমের প্রধান কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয় ও স্মৃতি। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকেরা ইহা জানিতেন। ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা জ্ঞানের প্রধান অন্তরায়, তাহা আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক স্থলেই উপলব্ধি করিয়া থাকি। আর অনুস্মৃত বিষয়ও সকল সময়ে ঠিক সংবাদ দেয় না। এক মাস আগে অথবা ২৫ দিন আগে কোনও ঘটনা ঘটিয়াছে কি না, অথবা কোনও ব্যক্তিকে কলিকাতায় অথবা অপর কোনও স্থানে দেখিয়াছি, কিংবা তাহার সহিত কি বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা অনেক সময়ে স্মরণ করা যায় না। কাজেই মানুষের ইন্দ্রিয় ও স্মৃতি, উভয়ের উপরেই অবিশ্বাস। ভ্রমের কারণ সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদি বাহির হইয়াছে, আমাদের দেশের পণ্ডিতদের মধ্যেও অসৎখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি প্রভৃতি কএকটি ভ্রমের আকার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ভ্রম ঐ দুই কারণেই হইয়া থাকে অর্থাৎ উহা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অপটুতার জন্য উৎপন্ন হয়।

কিন্তু ভ্রম অন্য স্থলেও হইতে পারে। চিন্তাকালে বা তর্কস্থলে, সম্বন্ধের ব্যভিচারজন্য ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি কেহ বলে, পশু এবং মানুষ, উভয়ই প্রাণবিশিষ্ট, অতএব পশু চতুষ্পদ বলিয়া মানুষও চতুষ্পদ। এইরূপ সিদ্ধান্তে অনৈকান্তিক ভ্রম আছে এবং ইহা হেত্বাভাস। তর্কশাস্ত্রে জাতি বা ধর্ম্মী বিভাগের দোষে যে ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাহা হেত্বাভাস। এই ভ্রম লইয়া মীমাংসকের সহিত নৈয়ায়িকের অনেক বাদবিতণ্ডা আছে, তাহা এ স্থলে দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

মন অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আমাদের বার আনা রকম জ্ঞান শব্দজ প্রমাণ বা পরের মুখে শুনিয়া ও কতক অপ্রমাণিত বিশ্বাস, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শব্দজ প্রমাণগুলি সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকের কথা বলিয়া উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লই। বিশ্বাসসমূহ অধিকাংশ স্থলেই ধর্ম্ম, নীতি ও আচার অনুষ্ঠান-বিষয়ক। যখন বিজ্ঞান খুব প্রতাপ-

শালী ছিল, তখন বিশ্বাসসমূহ অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বিজ্ঞানেরও অনেক বাদ আছে;—যেমন স্নায়ুবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, ঈশ্বরবাদ; সেগুলিও অপ্রমাণিত বিশ্বাসমাত্র। হিন্দু দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই যোগ দ্বারা অনিন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হয়, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই মূল তত্ত্ব-জ্ঞানের নাম বোধি।[১] কাজেই জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দার্শনিকেরা সকলেই একবাক্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন। জৈন, বৌদ্ধ (মাধ্যমিক) ও বৈদান্তিকেরা জ্ঞানের দুই প্রকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। একটা লৌকিক ও অপরটি অলৌকিক। আজকাল পাশ্চাত্যদের মধ্যেও ইন্‌টুইসন্‌বাদের অল্পে অল্পে আবার আদর হইতেছে। লীবনিজ ও ক্যান্‌টের স্বতঃপ্রণোদিত জ্ঞানবাদ উড়াইয়া দিলে জ্ঞানের কোনও অর্থই থাকে না।

সত্যের পরীক্ষা কি করিয়া হয়? কি ভাবে সত্যের সত্যতা আমরা জানিতে পারি? হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে সত্যের প্রমাতা বা প্রমাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রায় সকল দেশেই পণ্ডিতেরা বস্তুর বা অস্তিত্বের সহিত মনের ঐক্যকে (ক) সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমরা কি বস্তুর সব গুণগুলি জানিতে পারি? হয় ত কতক জানি, কতক জানি না। সেই জন্য সত্যের এই ঐক্যবাদপ্রবচনে অনেকে সন্দিহান হইতেছেন। যেহেতু কবি ও বৈজ্ঞানিক বস্তুতে যাহা দেখে, তুমি আমি তাহা ত দেখিতে পাই না? সুতরাং ঐক্য হইল কই? কেহ বলেন, যাহার বিপরীত কল্পনা করা যায় না, তাহাই সত্য[২]; কিন্তু ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ আসিয়া পড়ে। ইহা ছাড়া আরও বাদ আছে। ন্যায়মতে যাহা প্রবৃত্তি-জনন-সমর্থ, তাহাই সত্য। ঝিনুকের খোলা দেখিয়া যে রূপা মনে করে এবং তজ্জন্য লাভের বস্তু বোধ করিয়া উহা কুড়াইবার প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে উহা সত্যই রজত মনে করিয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্যের পরীক্ষা। ইহাতে ও প্রবৃত্তিজননসমর্থবাদে বিশেষ প্রভেদ নাই।

আজকাল কোন কোন পণ্ডিত একটা নূতন মত তুলিয়াছেন—উহার নাম প্র্যাগম্যাটিসম্। উহা প্রোতাগোরাসের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলিয়াছেন,—"মানুষই সকল জিনিসের পরিমাণকর্ত্তা।" সত্যের জ্ঞান হইতে পারে না। কেহ কেহ অর্থক্রিয়াকারিত্ব ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু উহা কতটা সমীচীন, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে বিশ্বাসরূপ জ্ঞানের কথা বলিয়াছি। তাঁহারা বলেন, সত্য জ্ঞানটা লোকের মনের গঠন অনুসারে হইয়া থাকে। মানুষের বিশ্বাস, তাহার মত ও ভাব[৩] অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। মনে

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-ব্যবহৃত।

ক। Correspondence, নব্য ন্যায়মতে তদ্বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানম্।

২। Hamilton ও Herbert Spencer.

৩। Temperament.

করুন, যাঁহারা জড়বাদী, তাঁহাদের জীবের চেতনা একটা রাসায়নিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়; আবার যাঁহারা প্রাণ একটা স্বতন্ত্র শক্তিবিশেষ বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রাণকে অতি-রসায়ন ব্যাপার বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। বিশ্বাসসমূহ কার্য্যকরী[১] হইলে অথবা উহাদ্বারা মানুষের বা সমাজের কোনরূপ অকল্যাণ না হইলে সে বিশ্বাসে কিছুই দোষের নাই। কতকগুলি বিশ্বাস লইয়া যদি সুবিধা হয়, উহাতে কোনও ক্ষতি নাই। বিজ্ঞানেও যে থিওরি আছে, তাহাও এই শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। যখন লোকে বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীর চারি দিকে সূর্য্য ঘুরিতেছে, তখন তাহারা ঐ বিশ্বাস লইয়া চলায় কোনও ক্ষতি হয় নাই। প্র্যাগ্‌ম্যাটিস্‌মবাদ মনস্তত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের দিক্ হইতে গ্রন্থকারেরা বিচার করিয়াছেন। ইহাতে এইটুকু বুঝা যায় যে, সত্য লক্ষ্মীর ন্যায় চঞ্চলা। এক যুগে যাহা সত্য, পরের যুগে তাহা অসত্যে পরিণত হইলেও কোনও ক্ষতি নাই। তবে মানুষ বিশ্বাস করিতে ছাড়িবে না।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়মূলে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন অর্থাৎ "এম্‌পিরিসিষ্ট" বা "একস্‌-পিরিয়ন্‌ ষ্যালিস্‌ট," তাঁহাদের মত অসম্পূর্ণ ও যুক্তিশূন্য। যুগে যুগে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম্ম ও নীতিতে মানবসমাজে নূতন নূতন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞান একমুখী হইলে নূতনের অবকাশ থাকিত না। আদিম মনুষ্যসমাজ হইতে জ্ঞানের বহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অতএব জ্ঞানের একটা আত্মনির্ব্বাচন ও স্বতঃপ্রকাশ আছে। যখন যাহা আবশ্যক, তখন তাহা আপনার ভাবে জ্ঞানরূপে আপনি প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তুর লিঙ্গমাত্র বুঝাইয়া দেয়। নূতন সংস্থান ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় না। কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় কি হইবে? জ্ঞান যতক্ষণ আত্মদান না করিবে, যতক্ষণ মানবমনে উহা স্ফুলিঙ্গ আকারে আত্মপ্রকাশ না করিবে, ততক্ষণ শত বৈজ্ঞানিক উপায়েও কিছু ফল হইবে না। পাশ্চাত্যেরা এখন জ্ঞানের সেই রহস্যপূর্ণ দিক্‌টা উপলব্ধি করিতেছেন, তাই আজকাল "ইনটুইসন্‌"এর এত আদর। প্রাচ্য পণ্ডিতেরা "এম্‌পিরিসিষ্ট" হইলেও জ্ঞানের সে রহস্যটা বহু পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা সেই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" আস্বাদের জন্য জ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন যে, উহা বাদমাত্র নহে, উহা ধ্যানগম্য এবং ধ্যানরূপ চিন্তাধারায় উহা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সকলই ধ্যানসিদ্ধ একাগ্র চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা করতলস্থ আমলকবৎ উহার আদান হইয়া থাকে।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

১। Workable.

শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীকর নন্দী (রায় বাহাদুর মহাশয়ের মতে শ্রীকরণ নন্দী) ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক দুইজন কবির মহাভারতের বিবরণ দিয়াছেন। * ১৩৩১ বঙ্গাব্দের প্রতিভা পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্ব বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখেন। বিগত ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী (Annual Report) নামক পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার বিবরণীতে প্রকাশ করেন যে, শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্বপ্রতিপাদক প্রমাণ তাঁহাদের সংগৃহীত পুথিগুলিতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া আমার ঐ সকল পুথি পড়িবার ইচ্ছা হয়। পুথি অনেকগুলি আছে। একখানি পরাগলী মহাভারতের পুথির লিপিকাল ১৬১০-১১শক (=১৬৮৮-৮৯ খ্রীঃ)। এই পুথিখানি সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ১৮টী পর্ব্বই ইহার মধ্যে আছে; তবে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি পাতার অভাবও আছে, এবং কয়েকখানি পাতা অপাঠ্যও হইয়া পড়িয়াছে। আমি এই পুথিখানিতে (ঢা, বি, ২০২৫ সংখ্যক পুথি) দেখিলাম যে, পরাগলী মহাভারতের সর্ব্বত্রই শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ভণিতা পাওয়া যায়। শহীদুল্লাহ্ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ পর্ব্বে কেবলমাত্র শ্রীকর নন্দীর এবং অন্যান্য পর্ব্বে কেবলমাত্র কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা কবীন্দ্রের ভণিতা পাওয়া যায়। পুথিগুলি পড়িয়া দেখা গেল, তাঁহার এ অনুমান অমূলক। সুতরাং শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর, দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন। পরাগলী মহাভারতের নানা পর্ব্বের পুষ্পিকা হইতে কয়েকটী ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি। দারিদ্রভঞ্জন বির অনাথের গতি॥
কুতুহলে পুছিলেন্ত ভারতকাহিনি। জেনমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥
বনবাসে আছিলেন্ত দ্বাদশ বৎসর। কোন কর্ম্ম করিলেক বনের ভিতর॥
বর্ষরেক কথা ছিল অজ্ঞাতবসতি। কেমত পৌরসকারে পাইল বসুমতি॥
এ যব রহস্যকথা সংখেপ করিয়া। পুরান ভারত কথা পাঞ্চালী রচিয়া॥
তাহান আদেশমাল্য মাথে আরোপীয়া। শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

—ঢা, বি, ২০২৫ সং পুথি, আদিপর্ব্ব, ২৩ পৃষ্ঠা।

* ব. ভা. ও সা, (৪র্থ সং) ১৪২—১৫২ পৃঃ।

(২) বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি। স্থনিলে অধর্ম্ম হরে:পরলোকে তরি ॥
ভারতের পুন্যকথা পুন্যবন্তে স্থনে পুত্রে পৌত্রে ধনে ধান্যে বাচএ কল্যানে ॥
লস্কর পরাগল মহিমা অপার। কবিন্দ্রে কহিল কথা রচিয়া পয়ার ॥
—ঐ, উদ্যোগপর্ব্ব, ৯৯ খ পৃষ্ঠা।

(৩) বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি। স্থনিলে অধর্ম্ম হরে পরলো[ে]ক তরি ॥
লস্কর পরাগল গুণের নিধান। অষ্টাদস ভারতেত জার অবধান ॥
—ঐ, ভীষ্মপর্ব্ব, ১১৯ খ পৃষ্ঠা।

(৪) ইহলোকে স্থখভোগ, পরকালে স্বর্গলোক, ভারতের পুন্যকথা স্থনি।
শ্রীযুত নায়কবর, লস্কর পরাগল, কবিন্দ্রেত পুছে পুনি পুনি ॥
বিজয় পাণ্ডব নাম, পুন্যকথা অনুপাম, অমৃত সিঞ্চিল কলেবর।
শ্রবন কলসে ভরি, মহাজনে পান করি, কভো না জাইব জমঘর ॥
—ঐ, কর্ণপর্ব্ব, ২০২ ক পৃষ্ঠা।

(৫) লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার। কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল। বিজয় পাণ্ডব স্থনি মনে কুতুহল ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি। স্থনিলে অধর্ম্ম হরে পরলো[ে]ক তরি ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে পরিক্ষিতজন্মঃ সমাপ্তঃ। শ্রীরস্তু সর্ব যগতাং
শ্রীরস্তু লেখকে ময়ি শ্রীরস্তু লিখিতং যস্য তস্য কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥ শুভমস্তু শকাব্দাঃ
১৬১০ প° সন ৪৮৬ তেরিখ ২৪ পৌষ মার্গসির্ষে। শ্রীকুমুদ পণ্ডিতস্য স্বাক্ষরমিদং ॥
—ঐ, অশ্বমেধ পর্ব্ব, ২৪০ পৃষ্ঠা।

(৬) অশ্বমেধ পুণ্যকথা, কল্পতরু ধর্ম্মলতা, পাতক তাপের নাই ভয়।
স্থনিতে অমৃত বড়, মক্তির আকার দঢ়, আর কোথ্ নাইক সংসয় ॥৬২॥
বন্ধুকুলপ্রকাশক, সক্রকুলবিনাসক, সমুদ্রেত জেন সসধর।
লস্কর ছুটিখান, কর্ন সম জার দান, মেদিনি মহিমা সমসর ॥
তাহান আদেস মাথে যুধিষ্ঠীর নরনাথে, কবিন্দ্রে জে রচিল পয়ার ॥৬৩॥
—ঐ, ২৫৫ খ পৃষ্ঠা।

(৭) শ্রীকর নন্দিএ কহে বুঝিয়া সংহিতা। যৌমিনী রচিল জেন ভারতের গাথা ॥
—ঐ, ২৫৩ ক পৃষ্ঠা।

(৮) অশ্বমেধ যজ্ঞকথা অমৃতের সার। কবিন্দ্র পরমেশ্ব[ে]র রচিল পয়ার ॥
—ঐ, ৩১৫ খ পৃষ্ঠা।

(৯) একলক্ষ নবতিন শ্লোক হৈল সার। কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥

লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার। জাহার আদেসে হৈল ভারত বিস্তার ॥

জে জন সম্ভ্রম বুদ্ধি না করে ভারতে। সবান্ধবে পচিব নরক রৌরবেতে ॥
ব্রাহ্মন বুদ্ধিএ জদি হাংসএ তাহাক। ধর্ম্মশাস্ত্রে কহিল নরক কুম্ভিপাক ॥
জোড় হস্তে সর্ব্বত মাগএ পরিহার। সুন সুন মহাজন বচন আহ্মার ॥
পুস্তক কারণে নাম হৈল ধরাতল। লস্কর পরাগল গুণের সাগর ॥
তাহান আদেসমাল্য মাথে আরোপীয়া। শ্রীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব্বঃ সমাপ্তঃ ॥ শ্রীরস্তু সর্ব যগতাং শ্রীরস্তু লেখকে ময়ী। শ্রীরস্তু লিখিতং যস্য তস্য কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥ হরএ নমঃ। * *।

শকাব্দাঃ ১৬১১ পরগনে ভুলুয়া সন ৪৮৭ তেরিখ ৭ বৈশাখ রোজ বৃহস্পতীবার দস দণ্ড গতে সমাপ্ত ॥ শ্রীকুমুদ পণ্ডীতস্য স্বকীয় পুস্তকমিদং স্বাক্ষরঞ্চ ॥

—ঐ, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ৩৪২ ক পৃষ্ঠা।

শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্রের ভণিতাযুক্ত পুষ্পিকা মহাভারতখানির সকল পর্ব্বেই পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ ভণিতা যে একখানিমাত্র পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। আর একখানি পুথি হইতেও কয়েকটী উদাহরণ দিলাম।

(১০)　সংগ্রামে রন করএ,　রনেতে পাইল ভএ,　সবে মিলি রহিতে না পারে।
বাঢ়ে আউ ধর্ম্ম জস　সর্ব্বলোক হএ বস,　প্রস্রএ করিতে কোনে পারে
বিজএ পাণ্ডব নাম,　সর্ব্বগুনে অনুপাম,　পুন্যবন্তে সুনে দুই কানে।
লস্কর জে পরাগল,　প্রনমিল বহুতর,　নামকির্ত্তি বাঢ়ে দিনে দিনে ॥
শ্রীকর যে নন্দি কবি,　তাহার বচন ধরি,　রচিলেক পাঞ্চালি প্রকার।
কুরু পাণ্ডু সংগ্রাম,　যুর্দ্ধ ছিল অনুপাম,　দ্রোন হইল জম অবতার ॥

—ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, দ্রোণপর্ব্ব, ২২৮ ক পৃষ্ঠা।

(১১)　ভাগে ভাগে লাগে জোধ, বাহিনির বিরোধ,　অস্ত্র সব এড় ঝাকে ঝাকে।
পদবন্দ বিস্তার,　কতেক লিখিব আর,　কুরু পাণ্ডু যুদ্ধ পরিপা[া]ক ॥
রুদ্রবংস জন্ম কর,　সম্পদ মনিসা চর,　লস্কর পরাগল খান।
পদবন্দ সোন্দর,　কবিন্দ্র পরমেশ্বর,　রচিলেক ভারথ বাখান ॥
উভয় লোকের সন্ধি,　পাত্রেত সুজুত বুদ্ধি,　পুন্যকথা অমৃতলহরি।
সুনি[লে] অধর্ম্ম ক্ষয়, সংগ্রামেত হএ জয়,　সবে পিয় কর্ন্নঘট ভরি ॥

—ঐ, দ্রোণপর্ব্ব, ৩১২ খ পৃষ্ঠা (লিপিকাল ১২০৭। ২৯ ফাল্গুন)।

(১২)　ভারথামৃতসির্দ্ধর্থং রসং বিজয়পাণ্ডবং।
পায়ং পায়মতো নিত্যং মহাকির্ত্তিপর[া]ম্বিতং ॥
শ্রীপরাগলখানস্য মহানুগ্রহগৌরবাৎ।
দেসভাসামের্ষ্যবাব্য [?] কৌতুকাদকরোৎ কবি [ঃ] ॥

—ঐ, ১২৫ ক পৃষ্ঠা।

এই সকল বিক্ষিপ্ত ভণিতা এবং পরাগল ও ছুটিখানের নামোল্লেখ দেখিলে শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে অভিন্ন ব্যক্তি, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও যোগ্য কারণ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' শ্রীকর নন্দীরই উপাধি। শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই অনুমানই করিয়াছিলেন। দুই জন লোকে সম্মিলিত চেষ্টায় গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। কারণ, 'ক্ষেমেন্দ্র' ও 'কেতকাদাসে'র মত যুগ্ম নাম গ্রন্থের কোনও স্থানে পাওয়া যায় নাই। যেখানে 'শ্রীকর নন্দী' আছে, সেখানে 'কবীন্দ্র' বা 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' নাই; আবার যেখানে 'কবীন্দ্র' আছে, সেখানে 'শ্রীকর' নাই। আরও একটী বিকল্পের অনুমান চলিতে পারে,—পরাগলের সভায় হয় ত 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' নামক (ইংরাজী Poet Laureate এর অনুরূপ) একটী সদস্যের পদ থাকিতে পারে। কিন্তু সেটাও অনুমান মাত্র। দীনেশ বাবু শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে বিভিন্ন কাব্যের লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া আর তাঁহার মত গ্রহণ করা যায় না। কারণ, মহাভারতখানি দুই জন লোকের সমবেত চেষ্টাতেই লিখিত হউক, আর একজনের দ্বারাই হউক, গ্রন্থখানি অভিন্ন; এবং যিনি (বা যাঁহারা) অশ্বমেধ পর্ব্ব লিখিয়াছিলেন, তিনিই (বা তাঁহারাই) অন্যান্য পর্ব্বগুলিও লিখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবসর নাই। কিন্তু এই মহাভারত-খানির প্রচারে কবি অপেক্ষা কবির উৎসাহদাতা পরাগল খানেরই গৌরব বেশী। সে কথা কবি স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই মহাভারতখানিকে 'পরাগলী মহাভারত' নাম দিয়া দীনেশ বাবু সুবিচারই করিয়াছেন। কিন্তু অশ্বমেধ পর্ব্বটী ছুটিখানের নামে সংজ্ঞিত হইলে অভিনব পাঠকের মনে একটা সংশয়ের উৎপত্তি হইতে পারে। অথচ তাঁহার পিতৃদেবের আরব্ধ কার্য্য তিনি সম্পূর্ণ করাতে সেই কার্য্যের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট না থাকিলে তাঁহার পক্ষে কোনও অবিচার হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। কারণ, গ্রন্থমধ্যে তাঁহার নাম আছে, এবং কবি তাঁহাকে পিতৃভক্ত পুত্র বলিয়াছেন।* সুতরাং সমগ্র মহাভারতখানিই পরাগলের নামে প্রসিদ্ধ করাই আমি সঙ্গত মনে করি। তাহাতে কবির অভিন্নত্ব বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না।

এই পরাগলী মহাভারতের কবি শ্রীকর নন্দীর কালনির্ণয় বিষয়ে বিশেষ কোনও গোলযোগ নাই। কারণ, কবি স্বয়ং সে বিষয় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥
প্রণমহো নারায়ণ পুরুষ প্রধান। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েত জার অবধান॥
সরস্বতী প্রণমহো বচনদেবতা। জাহার প্রসাদে হএ সরস কবিতা॥
সর্ব্ব দেব [ী ?] বন্দিয়া বন্দোম দেবগণ। জনক জননী আদি বন্দো গুরুজন॥
সভাসদ অগ্রতে জে করো[ম] প্রণতি। রচিয়া পয়ার কিছু কহিব ভারতি॥

* কপটের গন্ধ নাই প্রসন্ন হৃদয়। রামসম পিতৃভক্ত খান মহাশয়॥
—২০২৫ সং পুথি, ২৪১ পৃষ্ঠা।

পৃথিবির মধ্যেত প্রধান এক স্থান। উপদ্রব নাই কোথু অতি পুণ্যবান ॥
নসরত সাহা নাম অতি মহারাজা। পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা ॥[১]
নৃপতি হুসন-সাহা-তনয় সুমতী। সামদণ্ড ভেদে পালে সর্ব্ব বসুমতী ॥
তান এক সেনাপতি নামে ছুটিখান। ত্রিপুরা গড়েত গীয়া কৈল সন্নিধান ॥
চাটীগ্রাম নগরক উত্তর প্রধান। চন্দ্রসেখর নাম পর্ব্বতের স্থান ॥
চয়ো নাম নগর জে পৈতৃক বসতি। সে পুরির জত গুন কহিবম কতি ॥
আপনি মহেস তথা ক্রমতিস নাম। উনকোটী সিবলিঙ্গ বৈসে অবিরাম[২] ॥
চারি বর্ণ্ণে বৈসে প্রজা সেনাসন্নিপাত। নানা গুনবন্ত সব বৈসএ তথাত ॥
ফনি নাম নদিএ বেষ্টীত চারিধার। পূর্ব্বেত জে মহাগিরি অধিক বিস্তার ॥
দৈবের নির্ম্মাণ সে জে প্রলংহন পুরি। আছুউক সত্রুর ভয় নাই ডাকাচুরি ॥
লস্কর পরাগল খান মহাশয়[৩]। সমর বিজয়ী ছুটী খান মহাশয় ॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন। বিশাল হৃদয় মত্ত গজেন্দ্রগমন ॥
চতুঃষষ্টী কলার বসতি গুণনিধি। পৃথিবিত কল্পতরু সৃজিলেক বিধি ॥
দাতা বলী-কর্ণ-সম অপার মহিমা। শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভির্য্য বির্য্যের নাই সীমা ॥
কপটের গন্ধ নাই প্রসন্ন হৃদয়। রামসম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥
তাহান সহজ গুণ সুনি নরপতি। সম্বাদি বিসয় দিল হরষীত মতি ॥
ঘোটক পর্য্যন্ত (সহিতে ?) ক্ষিতি পাইল ছুটীখান। নৃপতি অগ্রেতে পাইল বহুল সম্মান ॥
লস্কর বিষয় পাই খান মহামতি। সামদণ্ডভেদে পালে সর্ব বসুমতী ॥
ত্রিপুরার নরপতি ভএ ছাড়ে দেস। পর্ব্বতকন্দরে গীয়া [২৪২ক] করিল প্রবেস ॥
গজ বাজী কর দিয়া করিল সন্ধান[৪]। মহাবনমধ্যে পুরি করিল নির্ম্মান[৫] ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিত সভা খান মহামতী। একদিন বসি আছে বান্ধব সংহতি ॥

১। মুদ্রিত পুথিতে পাঠান্তর,—
"নসরত সাহা তাত অতি মহারাজা। রাম বহুনিষ্ঠ পালে সব প্রজা ॥
নৃপতি হুসন সাহা যেত ক্ষিতিপতি। সাম দান দণ্ডভেদে পালএ বসুমতী।

২। অভিরাম।

৩। ৩১১ ক পৃষ্ঠার পাঠ :—
লস্কর পরাগল খানের তনয়। সমরে বিজয়ী ছুটী খান মহাশয়

৪। সন্ধি।

৫। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ,—
গজ বাজি বারি দিয়া করিল সম্মান। মহাবনমধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি। তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুরনৃপতি ॥
আপনি নৃপতি সম্বর্দ্ধিয়া বিশেষে। সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে ॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান। যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান ॥

সুনন্ত ভারত পোথা অতি পুন্যকথা। মহামুনি জৈমিনির রচিত সংহীতা ॥
অশ্বমেধ পুন্য সুনি প্রসন্ন হৃদয়। সভাখণ্ডে আদেসিল খান মহাশয় ॥
ব্যাসগীত ভারত সুনিল চারুতর। জার হেতু জৈমিনিএ রচিল সকল ॥
দেসি ভাষা কহি কথা রচিয়া পয়ার। সঞ্চরৌ[ক] কীর্ত্তি মোর যগত সংসার ॥
তাহান আদেশমাল্য মাথে আরোপীয়া। শ্রীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥

—ঢা. বি. ২০২৫ সং পুথি, ২৪১খ—২৪২ক পৃষ্ঠা।

এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গাধিপতি নসরৎ সাহার রাজত্বকালে ছুটীখান চট্টগ্রামের উত্তর অঞ্চলে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের নিকটে ফেণী নদীর তীরে লস্করী বিষয় পাইয়াছিলেন।[১] কিন্তু ছুটীখানের পিতা পরাগল খাঁ হুসেন সাহার নিকট লস্করী পাইয়াছিলেন।

"রাস্তিখানতনয় বহুল গুণনিধি। পৃথিবিতে কল্পতরু নিরমিল বিধি ॥
সুলতান হোসন পঞ্চম গৌড়নাথ। ত্রিপুরের ভার সমর্পিল জার হাথ ॥
সোনার পালঙ্গি দিল এক সত ঘোড়া। সঙ্গোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া ॥
তাহান আদেস তবে সিরেত ধরিয়া কবিন্দ্রে কহিল কথা পাচালি রচিয়া ॥
একমনে সুনে জেবা ভারথ কথন। তাহারে সুনিলে হএ স্বর্গেত গমন ॥"

—ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ১ পৃষ্ঠা।

হুসেন সাহার রাজত্বকাল ১৪৯৪—১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ, এবং নসরত সাহার রাজত্বকাল ১৫২০—২৫ খ্রীষ্টাব্দ। সমগ্র মহাভারতখানি লিখিতে যদি তিন বৎসর (অর্থাৎ প্রতি পর্ব্বে গড়ে দুই মাস) কাল সময় লাগিয়া থাকে, এবং তাহার শেষভাগ নসরত সাহার রাজ্যকালে পড়ে, তাহা হইলে মহাভারতখানির রচনাকাল ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী হয়। কিন্তু পরাগল খাঁর মৃত্যু কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না। কিন্তু সে ঘটনা যে নসরত সাহার রাজত্বকালেই সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ছুটীখানের লস্করী প্রাপ্তি বিষয়ে কবির উক্তি হইতেই জানা যায়। যদি এই ঘটনা নসরত সাহার রাজত্বকালের অবসানের (১৫২৫ খ্রীঃ) নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে গ্রন্থখানির রচনাকালও ঐ সময়ের নিকটবর্ত্তী হয়। যদিও পরাগল হুসেন সাহার নিকট হইতে লস্করী পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তথাপি গ্রন্থারম্ভ হুসেন সাহার রাজত্বকালে নাও হইয়া থাকিতে পারে। এমত অবস্থায় গ্রন্থরচনার কাল নসরত সাহার সময়ে বলিয়া ধরিলেই ভ্রমের সম্ভাবনা অল্প হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, গ্রন্থরচনাকালের সহিত নসরত সাহার রাজত্বকালই সুস্পষ্ট ভাবে বিজড়িত দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু হুসেন সাহার রাজত্বকালে গ্রন্থারম্ভ হইবার বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

১। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ অনুসারে এই ব্যাপারটা নসরত সাহার পিতা হুসেন সাহার সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, উহার পাঠ সম্ভবতঃ ভ্রমাত্মক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সংখ্যক পুথির পাঠ যেরূপ সরল, তাহাতে এই পাঠই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ কষ্টকল্পিত।

দীনেশ বাবু পরাগলী মহাভারতের রচনাকাল ১৪৯৫—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন[১]। কিন্তু উল্লিখিত প্রমাণসমূহ তাঁহার মতের অনুকূল নহে। মোট কথা, এই মহাভারতের রচনা ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের দুই তিন বৎসর পরে হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শহীদুল্লাহ সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, প্রথমে অশ্বমেধপর্ব্ব লিখিয়া শ্রীকর নন্দী 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে অন্যান্য পর্ব্বগুলি লিখিবার সময়ে তাঁহার এই উপাধি ভণিতাস্থলে ব্যবহার করিয়াছিলেন[২]। তাঁহার এই অনুমানের কারণস্বরূপে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "পরাগলী মহাভারতে 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' এই ভণিতা দেখিতে পাই। তাহাতে 'শ্রীকর নন্দী' এই নাম পাওয়া যায় না।" কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই যে সকল ভণিতা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, পরাগালী মহাভারতের সর্ব্বত্রই 'শ্রীকর নন্দী' নাম পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত ভণিতাগুলির মধ্যে (১), (৭), (৯) ও (১০) সংখ্যক ভণিতা দ্রষ্টব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিগুলি পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কবি সপ্তদশ পর্ব্ব মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়া সর্ব্বশেষে অশ্বমেধপর্ব্ব লিখিয়াছিলেন। অশ্বমেধপর্ব্ব আরম্ভ করিয়া কবি পরীক্ষিতের জন্ম উপাখ্যান শেষ করিবার পর বোধ হয়, পরাগল খাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। উদ্ধৃত (৫) সংখ্যক ভণিতা ও লিপিকরের পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য। অশ্বমেধপর্ব্বের অবশিষ্টাংশ পরাগলপুত্র ছুটীখানের সভায় পঠিত হইয়াছিল। অশ্বমেধ পর্ব্বের এই দ্বিতীয় অংশ পরিষৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কবি শ্রীকর নন্দী কেন অশ্বমেধপর্ব্ব সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন, তাহার একটা কারণ বা কৈফিয়ৎ অশ্বমেধপর্ব্বের শেষে কবির পুষ্পিকায় পাওয়া যায়। বোধ হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞের অবসানে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ব্যাসদেবকে প্রদত্ত দক্ষিণার অনুরূপ ভূরি দক্ষিণা আদায় করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল।

"অশ্বমেধ শেষ না আছিল যে কারণ। কবিন্দ্রে রচিল গাথা লিখিতে কারণ॥
হেন মতে অশ্বমেধে হইলেক প্রাপ্তি। জৈমিনীএ হেন মত রচিল ভারতী॥
যজ্ঞ অবশেষ ধর্ম্মরাজা করে দান। সুবর্ণ সহস্র কোটী দক্ষিণা প্রধান[৩]॥
চারি চারি ব্রাহ্মণেরে দিল চারি দান। ব্যাসের স্থানেত বসুমতী কৈল দান॥
লইল পৃথিবিদান পরাসরসুত। সবিস্ময়ে সর্ব্বলোক চাহে অদভুত॥
ধরা লই ব্যাস মুনি হরষীত মন। ধর্ম্মরাজা সম্বোধিয়া কহিলা বচন॥
মুনি কৈল পৃথিবি তোহ্মাক দিল পুনি। পৃথিবির মূল্য ধন দেয়[৪] মনে গুনি॥
যুধিষ্ঠীরে কহন্ত না হএ সমুচিত। পৃথিবি দক্ষিণা অশ্বমেধের উচিত[৫]॥"

—২০২৫ সং পুথি, ৩১৫ ক পৃষ্ঠা।

১। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, ৬১৭—১৯ পৃঃ। ২। প্রতিভা, ১৩৩১, ১৬০ পৃঃ। ৩। প্রদান। ৪। দাও।

৫। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ (১৩৯—৪০ পৃঃ):—

অশ্বমেধ শেষ আছিল যে কথন। কবীন্দ্ররচিত গাথা লিখিত কারণ॥
হেনমতে অশ্বমেধ হইল সমাপ্তি। জয়মুনি যেমন রচিল ভারথি॥
[অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃতলহরী। শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি।

পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা শ্রীকর নন্দীর বিষয়ে এই কয়টী কথা নির্দ্দিষ্টভাবে জানা যাইতেছে :—

(১) শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক দুই জন কবির সত্তা স্বীকার করিবার অনুকূল প্রমাণ নাই।

(২) শ্রীকর নন্দী সমগ্র মহাভারত লিখিয়াছিলেন ; এবং অশ্বমেধপর্ব্ব সর্ব্বশেষে লিখিয়াছিলেন।

(৩) চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটীখানের সভায় কবি তাঁহার মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন।

(৪) অশ্বমেধপর্ব্বের 'পরীক্ষিতের জন্ম' শেষ হইবার পর সম্ভবতঃ পরাগলের মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ পর্ব্বের অবশিষ্টাংশ ছুটীখানের সভায় পঠিত হইয়াছিল। মুদ্রিত অশ্বমেধ পর্ব্বে 'পরীক্ষিতের জন্ম' শীর্ষক আখ্যানটী নাই।

(৫) এই গ্রন্থের রচনা-কাল সম্ভবতঃ ১৫২২—২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

(৬) শ্রীকর নন্দীই সম্ভবতঃ বঙ্গীয় মহাভারতের আদিকবি[১]।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের যেমন একটী অতি-পরিচিত পুষ্পিকা-শ্লোক—"মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥" শ্রীকর নন্দীরও সেইরূপ একটী পুষ্পিকা-শ্লোক দেখা যায়,—

"বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি। শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥"

এই পুষ্পিকাটি পরাগলী মহাভারতে এত অধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে যে, কোনও একটী খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন মহাভারতের পত্রে এই পুষ্পিকা পাওয়া গেলে, সেই পত্রটীকে পরাগলী মহাভারতের একখানি ছিন্ন পত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থনামে যেমন 'বিজয়' শব্দের প্রতি একটা পক্ষপাত দেখা যায়, এ স্থলেও তাহাই দেখা যায়। শ্রীকর নন্দীর নিকট মহাভারতের নামান্তর 'পাণ্ডব-বিজয়' ; এই 'পাণ্ডববিজয়' শব্দ প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে গদ্য পুষ্পিকায় 'ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে কর্ণপর্ব্বনি দ্বিতীয়-দিবসীয়যুদ্ধে দুঃশাসনবধঃ' ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পুষ্পিকা ছাড়া পরাগলী

এহিরূপে অশ্বমেধ হইলেক শেষ।	অশেষ প্রকাশ করি করিল বিশেষ ॥]
যজ্ঞশেষে রাজা করয়ে দান।	সুবর্ণ সহস্র কোটি করিলেক দান ॥
চারি চারি বিপ্রেরে জে এহি দান দিল।	বসনেরে (?) দক্ষিণা তবে বসুমতী দিল ॥
না লইল পৃথিবী দান * * মোর সুত।	সবিস্ময় সর্ব্বলোক চাহএ অদভুত ॥
ধরা লইয়া ব্যাস মুনি আনন্দিত হইয়া মন।	ধর্ম্মরাজা সম্বোধিয়া বুলিল বচন ॥
অস্তি করি পৃথিবী তোম্মারে দিল পুনি।	পৃথিবীর সব ধন দেয় মনে গনি ॥
যুধিষ্ঠিএ বোলিল না হএ কদাচিত।	পৃথিবী দক্ষিণা অশ্বমেধ সমুদিত ॥

১। এই প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

মহাভারতে আরও কয়েকটী লাচাড়ীর পুষ্পিকা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল পুষ্পিকার ভাষায় কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 'শ্রবণ-কলস ভরিয়া' অথবা 'কর্ণঘট ভরিয়া' ভারতসুধা পান করিবার উপদেশ এই সকল পুষ্পিকায় পাওয়া যায়। (৪) ও (১১) সংখ্যক ভণিতা দ্রষ্টব্য। লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এই সকল পুষ্পিকা কোনও কোনও পুথিতে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত" নামক যে মহাভারতখানি পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ একটা ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থখানিতে মোট ষোল জায়গায় শ্রীকর নন্দীর 'বিজয়পাণ্ডব' পুষ্পিকা ভণিতার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে এগারোটী জায়গায় শ্রীকরের ভণিতি-পুষ্পিকা অবিকৃত অবস্থায় আছে, কেবল পাঁচ জায়গায় 'বিজয়পাণ্ডব' 'বিজয়পণ্ডিতে' রূপান্তরিত হইয়াছে। বিজয় পণ্ডিতের মুদ্রিত মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ডে ২৫৮—৫৯ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধের (৪) সংখ্যক ভণিতার 'শ্রবণ কলস' 'সুবর্ণ কলস' এবং 'মহাজন' 'মহাজল' হইয়াছে। এটা কি লিপিকরপ্রমাদ? না মুদ্রাকরপ্রমাদ?

"বিজয় পাণ্ডব নাম, পুণ্যকথা অনুপাম, অমৃতে বরিষে নিরন্তর।
সুবর্ণ কলস ভরি, মহাজল পান করি, কখন না যায় যমঘর॥"

পূর্ব্বোল্লিখিত (৪) সংখ্যক ভণিতাটীও যেমন কর্ণপর্ব্বের শেষে ব্যবহৃত হইয়াছে, বিজয় পণ্ডিতের এই 'সুবর্ণ কলস' ভণিতাটীও ঠিক সেই স্থলেই পাওয়া যাইতেছে। এই 'বিজয়পাণ্ডব নাম, পুণ্যকথা অনুপাম' ইত্যাদি পুষ্পিকাটী বিজয় পণ্ডিতের মুদ্রিত মহাভারতের প্রথম খণ্ডে ৫৬ পৃষ্ঠায় সভাপর্ব্বের শেষে বিকৃত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে :—

"বিজয় পাণ্ডব নাম, সভাপর্ব্ব অনুপাম, অমৃতলহরী বরিষণ (?)।
এহি পর্ব্ব ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ, বিজয় পণ্ডিতের সুবচন॥"

ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় বিরাট পর্ব্বের শেষে 'বিজয় পাণ্ডবকথা,' 'বিজয় পণ্ডিতকথা' হইয়া গিয়াছে :—

"শ্রবণে অধর্ম্ম হরে পরলোকে গতি।　　বিজয় পণ্ডিতকথা অমৃতভারতী॥"

শ্রীকর নন্দীর আর একটী পরিচিত পুষ্পিকা,—"ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের ধার। ইহ-লোক পরলোক উভয় উদ্ধার॥" মুদ্রিত বিরাট পর্ব্বের শেষে (প্রথম খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠায়) এই পুষ্পিকাটীও বিকৃত হইয়াছে :—

"বিজয় পণ্ডিত নাম (?) অমৃতের ধার।　　ইহলোক পরলোক করে উপকার॥"

এখানে কি ইষ্টনাম ত্যাগ করিয়া বিজয় পণ্ডিতের নাম গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে? আবার মুদ্রিত গ্রন্থের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠায়) এবং প্রথম খণ্ডের ১৬১ পৃষ্ঠায় বনপর্ব্বশেষে নিম্নলিখিত বিকৃত পুষ্পিকা দুইটী পাওয়া যাইতেছে :—

"বিজয় পণ্ডিতের কথা অমৃত সমান।　শুনিলে অধর্ম্ম হরে পায় পরিত্রাণ॥" (২।৩৬২ পৃঃ)
"শুন কথা ভারতের পণ্ডিত বিজয় (?)।　রচিল মহামুনি বনপর্ব্ব সায়॥ (১।১৬১ পৃঃ)

এই পাঁচটী বিকৃত ও অধিকাংশ স্থলে অর্থশূন্য পুষ্পিকা হইতেই বিজয় পণ্ডিত নামক একজন কবির উদয় হইয়াছে মনে হয় না কি ? ইহা ছাড়া বিজয় পণ্ডিতের আর ত কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একখানি খণ্ডিত পুঁথিতে দ্রোণপর্ব্বের শেষে 'মেলাধিপ শ্রীবিজয় পণ্ডিতবিরচিতে বিজয়-পাণ্ডবে দ্রোণপর্ব্ব' এইরূপ একটী লেখা পাইয়া, কুলগ্রন্থসমূহের সমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক এই 'বিজয়'-চন্দ্রের সপ্তদশ উর্দ্ধতন পুরুষের নামোদ্ধার সহ ইঁহাকে সাগরদীয়ার বন্দ্যবংশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইনি 'মসী'গোত্রে 'লেখনী'ক্ষেত্রে 'অনবধানতা'র গর্ভে উদ্ভূত কোনও 'অদ্ভূত', না প্রকৃত মনুষ্যজন্ম ইনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—সে বিষয়ের কোনও স্থির মীমাংসা না করিয়াই সম্পাদক মহাশয় ইঁহাকে ব্রাহ্মণ-জন্ম দান করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু কবীন্দ্র পরমেশ্বররচিত মহাভারত ও বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতকে 'প্রকৃত-পক্ষে এক পুস্তক বলিয়া' মনে করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ভণিতায় 'বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী' পদটি একটি মূর্খ লিপিকরের হস্তে 'বিজয়পণ্ডিতকথা অমৃতলহরী' হইয়া গিয়াছিল"[১]। শহীদুল্লাহ্ সাহেবও দীনেশ বাবুর সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন[২]। কিন্তু বিজয় পণ্ডিতের পুঁথি ত একখানিমাত্র পাওয়া যায় নাই,—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত তিনখানি পুঁথি (তন্মধ্যে একখানি মাত্র সম্পূর্ণ) পাইয়া মুদ্রিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরবঙ্গীয় খণ্ডিত পুথিখানির পাঠ অপর দুইখানি পুথির পাঠের সহিত অধিকাংশ স্থলেই মিলে নাই। এই তিনখানি পুঁথি ব্যতীত আরও দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে।[৩] সুতরাং মোট পাঁচখানি পুথির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র ভণিতা দিয়া বিচার করিলে এই পুথিগুলিকে পরাগলী মহাভারতের অসম্পূর্ণ পুঁথি বলিয়াই স্থির করা যায়। কিন্তু একমাত্র ভণিতাই কোনও গ্রন্থের সর্ব্বস্ব নহে। গ্রন্থের ভাষা বিচার এ ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। এই জন্য আমি মুদ্রিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের সহিত পরাগলী মহাভারতের পাঠ অনেক স্থলে মিলাইয়া দেখিয়াছি। বনপর্ব্বের প্রথম ২০০ পংক্তির পাঠ পরাগলী ভারত ও সঞ্জয়ী ভারতের পাঠের সহিত আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া গেল। স্থানে স্থানে অতি সামান্য পাঠান্তর দেখা গেল। এই জন্য সমস্ত গ্রন্থখানি মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হইল। মোটের উপর দেখা গেল, অধিকাংশ স্থলেই ছত্রে ছত্রে মিল আছে। কিন্তু অনেক স্থলেই পাঠ সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং পাঠ

১। ব ভা ও সা. (৪) ৪২৬-২৭ পৃঃ। ২। প্রতিভা, ১৩৩১, ১৬১ পৃঃ।

৩। এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর পুথি দুইখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ১১৭৬ সংখ্যক পুথিখানি ভীষ্মপর্ব্বের খণ্ডিত পুথি। ২০৩০ সংখ্যক পুথিখানি স্বর্গারোহণ পর্ব্বের সমগ্র পুথি। দুইখানিই বিজয়-পণ্ডিতের মহাভারতের ন্যায় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। দুইখানিতেই পর্ব্বশেষে ভণিতার পরিবর্ত্তে "বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী। শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি"। পুষ্পিকা আছে।

হিসাবে বিচার করিলে বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত পুথিগুলিকে পরাগলী মহাভারতেরই একখানি সংক্ষিপ্ত সংকলন বলা যায়। কিন্তু বিভিন্নতাও যে নাই, তাহা নহে। অনেক স্থলে উপাখ্যানভাগেই বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, (১) মহাভারতের উৎপত্তি বিষয়ে জন্মেজয়ের প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের অভিশাপবিষয়ক আখ্যায়িকাটী[১] বিজয়ের ভারতে নাই; (২) জাহ্নবীর বানর পতি বা শান্তনুর পূর্ব্বজন্মবিষয়ক আখ্যায়িকাটীও বিজয়ভারতে পরিত্যক্ত হইয়াছে; (৩) শকুন্তলার উপাখ্যানটী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে; (৪) লঙ্কাবিজয়প্রয়াসী অর্জ্জুন ও লঙ্কারক্ষক হনূমানের প্রসঙ্গটীও বাদ গিয়াছে, কিন্তু বনপর্ব্বে ভীম ও হনূমানের প্রসঙ্গে (১৪৭—১৫০ পৃঃ) অর্জ্জুনপ্রসঙ্গের ভাব ও ভাষার অনেকটা মিল দেখা যায়; (৫) খাণ্ডবদাহকালে নাগিনী ও তৎপুত্র সহ অর্জ্জুনের যুদ্ধপ্রসঙ্গ প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গই বিজয়ভারতে পরিত্যক্ত হইয়াছে দেখা যায়। এক কথায় বলিতে গেলে বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত মহাভারতখানিতে পরাগলী মহাভারতের অনেক প্রসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত প্রসঙ্গ প্রায়ই দেখা যায় না।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও পরাগলী ভারত ও সঞ্জয়ী ভারতের সহিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভাব ও ভাষার মিল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মিল দেখিয়া তাঁহার অনুমান হইয়াছিল যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিজয় পণ্ডিতের 'বিজয় পাণ্ডবকথা' অবলম্বন করিয়া অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ বিষয় সংযোজনা ও কাব্যরসের বিকাশ দ্বারা তাঁহার পরাগলী মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে সঞ্জয় ও শ্রীকর নন্দী চোর, এবং বিজয় মূল সম্পত্তির মালিক ও মহাজন। তিনি বলেন:—

"ভারতের প্রথমাংশ বাদ দিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের উৎপত্তি হইতে স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত সঞ্জয় যেরূপভাবে ও যেরূপ ভাষায় রচনা করিয়াছেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বিজয় পণ্ডিতের রচনা-মধ্যেও আমরা ঐরূপ ভাব ও ভাষার ঐক্য পদে পদে পাইয়াছি। এমন কি, অনেক স্থলে শ্লোকে শ্লোকে, কথায় কথায় মিল রহিয়াছে; এরূপ অপূর্ব্ব একতা বিরাট পর্ব্ব হইতেই সমধিক লক্ষিত হয়। দেখিলেই বোধ হইবে যেন, একই ব্যক্তির কর-কমল-বিনিঃসৃত। বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত বিজয় পণ্ডিতের পুথি এবং চটগ্রাম হইতে সংগৃহীত সঞ্জয়ের পুথি —উভয়ের স্থান কত দূরদেশ ও কত বর্ষ ব্যবধান, কিন্তু কি অপূর্ব্ব শ্লোকসাদৃশ্য! কেহ কি ভ্রমেও মনে করিতে পারেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন কবি, পশ্চিমবঙ্গে নামান্তর গ্রহণ করিয়া উদিত হইয়াছিলেন? অথবা একজন অপরের কীর্ত্তি নিজনামে ঘোষণা করিয়া থাকিবেন? এরূপ পর-কীর্ত্তি-বিলোপ-প্রকৃতি প্রাচীন সাহিত্যিক বঙ্গেও কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

"দীনেশবাবু দেখাইয়াছেন, সঞ্জয় কবীন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং চারি শত বর্ষেরও পূর্ব্বতন। এ দিকে যদি বিষ্ণুপুরের পুথিখানিতে কিছুমাত্র মৌলিকত্ব থাকে, তাহা হইলে গেলাধিপ

১। এই প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

বিজয় পণ্ডিতকেও আমরা চারি শত বর্ষেরও কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বতন বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং বিজয় ও সঞ্জয় উভয়েই চারি শত বর্ষের অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন। একজনের খ্যাতি রাঢ়দেশে ও অপরের খ্যাতি সুদূর চট্টগ্রামে। অথচ উভয়ের রচনায় ছত্রে ছত্রে পদে পদে এরূপ অপূর্ব্ব মিল হইবার কারণ কি? সুবিজ্ঞ সমালোচক উভয়েরই রচনা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্বীকার করিবেন, এক ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি তাহাই নকল করিয়াছেন।

* * * * *

"যাহাই হউক, সঞ্জয়ের গ্রন্থে খাঁটী সোণায় রাঙ্‌তা জড়ান থাকায় ইহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। বিজয় পণ্ডিতের সরল ও অতি সংক্ষিপ্ত আখ্যান এবং মূলের সহিত কোনও প্রকার বিরোধ না থাকায় বিজয়ের যত্নের ধন বঙ্গভাষার আদি ও অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি থাকিতেছে না।

* * * * *

"পরাগলী ভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। আর বিজয় পণ্ডিতের "বিজয় পাণ্ডবকথা" প্রায় ৮০০০ শ্লোকে সমাপ্ত। * * *। এত সংক্ষেপে মূল মহাভারতের বিষয় আর কেহ তৎপূর্ব্বে বর্ণনা করেন নাই। সম্ভবতঃ সেই সংক্ষিপ্ত ভারতকথাই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের লেখনীতে দ্বিগুণায়তন লাভ করিয়াছে।"—মুদ্রিত মহাভারতের মুখবন্ধ।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিজয় পণ্ডিতের সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা। সংক্ষিপ্ত হইলেই কাব্যখানিকে আদিকাব্য, এবং বিস্তারিত ও বৃহদায়তন হইলেই তাহাকে সেই আদিকাব্যের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? লঘুকৌমুদী ত সিদ্ধান্তকৌমুদীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থ নহে; 'লঘুভাগবত' গ্রন্থ ভাগবত গ্রন্থের মূল নহে; বাল্মীকীয় রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের, অথবা ব্যাস-মহাভারত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের বিকাশ নহে। বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত গ্রন্থে যাহা আছে, সঞ্জয় ও পরাগলীতে তাহা আছেই, এবং তদতিরিক্তও কিছু আছে। ইহা হইতে দুইটী অনুমান মনে আসে—(১) বড়টী ছোটটীর বিকাশ, অথবা (২) ছোটটী বড়টীর সংক্ষেপ। বড়টীকে ছোটটীর বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দুইটীকেই দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে এমনভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া জানা চাই, যাহাতে স্বাভাবিক কারণবশতঃ ছোটটীর বড়টীতে পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিজয় পণ্ডিতকে রাঢ়ে ও সঞ্জয় এবং কবীন্দ্রকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া বিজয়ের সহিত সঞ্জয় বা কবীন্দ্রের সম্পর্ক অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু বিজয় পণ্ডিতের যে পুথি তিনি তাঁহার পাত্রসায়েরনিবাসী পুথিসংগ্রাহক রামকুমার দত্তের নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে কোনও লিপিকর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল কি না, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কারণ, পুথিখানি খণ্ডিত বলিয়া তাহাতে লিপিকরপুষ্পিকা পাওয়া যায় নাই। বিজয় পণ্ডিতের আর কোনও পুথি পশ্চিমবঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজয় পণ্ডিতের নামে

প্রচলিত মহাভারতের পুথিখানির রাঢ়ে অবস্থান ব্যতীত বিজয় পণ্ডিতের আর কোনও বিবরণ আমরা পাই নাই। সুতরাং মাহেশের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা ও ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলীতে যে সাগরদীয়ার বন্দ্যবংশীয় বিজয় পণ্ডিতের উল্লেখ আছে, তাহার উপর এই পূর্ব্ববঙ্গীয় মহাভারতখানির গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব আরোপ করা চলে না। পূর্ব্ববঙ্গেই বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত মহাভারতের সব পুথিগুলিই পাওয়া গিয়াছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত পুথিখানি বাস্তবিক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত, না পশ্চিমবঙ্গ হইতে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে; কারণ, লিপিকরপুষ্পিকা পাওয়া যায় নাই। আরও দেখা গিয়াছে যে, পাঁচটী বিকৃত ভণিতা হইতে কষ্টকল্পনা দ্বারা বিজয় পণ্ডিতের উৎপত্তি হইয়াছে। অথচ এগারোটী ভণিতি-পুষ্পিকা ঐ গ্রন্থেই অবিকৃতভাবে স্থান পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উল্লিখিত পাঁচটী বিকৃত ভণিতার মধ্যে কেবলমাত্র একটীর (৫৬ পৃঃ) পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে,—"বিজয় পণ্ডিতের রচন"। "বিজয় পণ্ডিত নাম অমৃতের ধার। ইহলোক পরলোক করে উপকার॥"—এই পাঠটী যে ভ্রমাত্মক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আসিতেই পারে না। কারণ, বিজয় পণ্ডিত তাঁহার নিজের নামটীকে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায় না। "শুন কথা ভারতের পণ্ডিত বিজয়"—এইটীও ভ্রমাত্মক পাঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, পরবর্ত্তী পংক্তিতেই রচয়িতার নাম 'মহামুনি' (=ব্যাসদেব) আছে। এইরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত পাঠগুলির কোনটীকেই প্রকৃতিস্থ পাঠ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রথম খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "বিজয় পণ্ডিতের সুবচন" বা তাহার পাঠান্তর "বিজয় পণ্ডিতের রচন" যে লাচাড়ীর শেষভাগে স্থান পাইয়াছে, সেই লাচাড়ীর শেষে পরাগলী মহাভারতের পাঠ নিম্নরূপ :—

"সুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয়, সংগ্রামেত হএ জয়, আইউ জস বাঢ়এ বিসেষে।
বিজয় পাণ্ডব নাম, ধর্ম্মকথা অনুপাম, সর্ব্বকাল অমৃত বরিসে॥"

ইহারই স্থলে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ হইয়াছে :—

"বিজয় পাণ্ডব নাম, সভাপর্ব্ব অনুপাম, অমৃতলহরী বরিষণ।
এহি পর্ব্ব ইতিহাস, শুনিলে কলুষনাশ, বিজয় পণ্ডিতের সুবচন॥"

এবম্বিধ অবস্থায় বিজয় পণ্ডিতের বিষয়ে এই কথাগুলি জানা যাইতেছে :—

(১) কবি বিজয় পণ্ডিতের নাম ভ্রান্তিপ্রসূত। তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ নাই।

(২) বিজয় পণ্ডিতের নামযুক্ত পুথি পূর্ব্ববঙ্গেই পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যে একখানিমাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, লিপিকরপুষ্পিকার অভাবে তাহার প্রাপ্তিস্থান বিষয়ে সন্দেহ আছে।

(৩) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত কুলজীগ্রন্থদ্বয়ে উক্ত পশ্চিমবঙ্গীয় বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই পূর্ব্ববঙ্গীয় মহাভারতের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর নহে।

(৪) বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতের ভাষা পরাগলী মহাভারতের ভাষার সহিত ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়।

(৫) ভাষার মিল দেখিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় নিত্যানন্দ ঘোষ, নন্দরাম দাস, দ্বৈপায়নদাস প্রভৃতি যে সকল কবিকে বিজয় পণ্ডিতের অনুকরণকারী বলিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ পরাগলীর অনুকরণ করিয়াছেন।

(৬) বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারত পরাগলীরই সংক্ষিপ্তসার।

অতঃপর সঞ্জয়ের কথা। দীনেশবাবু সঞ্জয়ী মহাভারত ও পরাগলী মহাভারতের মধ্যে প্রভেদ রক্ষার জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, সে সকল চেষ্টার কোনটীতেই তিনি সফল হইতে পারেন নাই। যদিও তিনি সঞ্জয়কে আদিকবির বহুমান্য আসন ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে, সঞ্জয়ের কবিত্বের বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয়, তথাপি তিনি তাঁহার উক্তির পোষক প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সঞ্জয়ের ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয় বলিয়া তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের (৪র্থ সং) ১৩৬ পৃষ্ঠায় "এক দিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষ গুণি, শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া রাজ-সুতা" ইত্যাদি যে লাচাড়ীটী উদ্ধৃত করিয়া কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইয়াছেন, সেই লাচাড়ীটীই তাঁহার বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থের ৬৯১—৯৩ পৃষ্ঠায় গঙ্গাদাস সেনের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমিও পরাগলী মহাভারতের দুইখানি পুথিতেই গঙ্গাদাস সেনের ভণিতা সহ ঐ লাচাড়ীটীই দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং এ লাচাড়ীটী সঞ্জয়ী ভারত ও কবীন্দ্রের ভারতের প্রভেদ প্রমাণের পোষকতা করিতেছে না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৩৯ পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের কবিতার আদর্শস্বরূপ উদ্ধৃত "রাজার আদেশ পাই, দুঃশাসন গেল ধাই" ইত্যাদি লাচাড়িটী পরাগলী মহাভারতে (ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথির ১২৬—২৮ পত্রে), সঞ্জয়ী ভারতে (ঢা, বি, ১৫৫০ সং পুথির সভাপর্ব্ব, ১৩ খ পৃষ্ঠায়) এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে (মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠায়) পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এটীও সঞ্জয়ের নিজস্ব নহে। কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইবার সহজ স্থল বাছিয়া তিনি তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৪৫ পৃষ্ঠায় "তার পাছে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপ ধরি" ইত্যাদি যে পদ্যাংশটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেটী পরাগলীতে (ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ১৪২ খ পৃঃ), সঞ্জয়ে (ঢা, বি, ১৫৫০ সং পুথি, বিরাটপর্ব্ব, ৬ক পৃষ্ঠায়) এবং বিজয় পণ্ডিতের মুদ্রিত মহাভারতে (প্রথম খণ্ড, ১৬৯—৭০ পৃষ্ঠায়) পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই পদ্যাংশ দ্বারাও সঞ্জয় ও কবীন্দ্রভারতের প্রভেদ প্রমাণিত হইল না। উল্লিখিত গঙ্গাদাস সেনের ত্রিপদীটীর নীচে (ব. ভাঃ সা. ১৩৭ পৃঃ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—

"এইরূপ অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থলে স্ব-প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন,—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের একেবারে উদয় হয় নাই।"

ভীষ্মের প্রতি শ্রীহরির কোপবিষয়ক এই আখ্যানটীও সঞ্জয়ভারতে (ঢা. বি, ৮৫৬ সং পুথি, ভীষ্মপর্ব্ব, ২৯ পত্রে), পরাগলী ভারতে (ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ১৯৪—৯৫ পত্রে) এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে (মুদ্রিত পুস্তক, ২য় খণ্ড, ৩২—৩৩ পৃষ্ঠায়) পাওয়া গিয়াছে। দীনেশবাবু সঞ্জয়ের কবিত্বের আদর্শস্বরূপ কর্ণ ও শল্যের উপাখ্যান উদ্ধৃত (ব' ভা. সা: ১৪০—৪২ পৃঃ) করিয়াছেন। এ উপাখ্যানটীও পরাগলী ভারতে (ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ৩৩৭ পত্রে), সঞ্জয়ী ভারতে (ঢা, বি, ৮৬৫ সং পুথি, কর্ণপর্ব্ব, ৪৭—৪৮ পত্রে), এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে (মুদ্রিত ২য় খণ্ড, ২১৬—১৮ পৃঃ) পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং একে একে মিলাইয়া দেখা গেল যে, দীনেশবাবু যে সকল পদ্যাংশ সঞ্জয়ের নিজস্ব বলিয়াছেন, তাহা পরাগলীতে ও বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতে পাওয়া যায়; এবং যে সকল পদ্যাংশ তিনি কবীন্দ্রের নিজস্ব বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও[১] সঞ্জয়ী ভারত ও বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলির কোনওটার দ্বারাই সঞ্জয়ী ভারত ও কবীন্দ্রভারতের বিভিন্নত্ব প্রতিপাদন সম্ভবপর হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিজয়, সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের মহাভারতে ছত্রে ছত্রে পদে পদে মিল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমিও পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়ী মহাভারত ও বিজয় পণ্ডিতের নামে মুদ্রিত মহাভারত মিলাইয়া দেখিয়াছি। এত মিল দেখিয়াছি যে, এই তিনখানি গ্রন্থকে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ বলিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই মিল দেখাইবার জন্য আমি সঞ্জয়ী ভারতের পাঠ ও পরাগলীর পাঠ পাশাপাশি রাখিয়া কয়েকটী আখ্যান উদ্ধৃত করিলাম। এই আখ্যানগুলি মূল ব্যাস-মহাভারতের অন্তর্গত নহে। অথচ এইগুলির পাঠে উভয় গ্রন্থে কি সুন্দর মিল! প্রথম আখ্যানটী মহাভারতের উৎপত্তি বিষয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির অবমাননা করায় তাঁহার অভিশাপে পরিক্ষিৎপুত্র জন্মেজয়ের কুষ্ঠব্যাধি হয়। পরে ব্যাসশিষ্য জৈমিনির নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়া তিনি ব্যাধিমুক্ত হন। দ্বিতীয় আখ্যানটী শকুন্তলার অঙ্গুরীবিষয়ে। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা নর্ত্তকীর বেশে প্রচ্ছন্নভাবে রাজা দুষ্মন্তের নিকট গিয়া নৃত্যগীত দ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করে। রাজা তাহাদিগকে শকুন্তলার নিকট প্রাপ্ত রত্নহার উপহার দিলে তাহারা বলে যে, সে হার তাহাদেরই। তাহাদের নৃত্যগীতে সন্তুষ্ট হইয়া বরুণপত্নী তাহাদিগকে সেই হার দিয়াছিলেন। বরুণও তাহাদিগকে একটী অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের রাজধানীতে তাহাদের হার ও অঙ্গুরী অপহৃত হইয়াছিল। যখন হার পাওয়া গেল, তখন অঙ্গুরীও রাজাকে সন্ধান করিয়া দিতে হইবে। দুষ্মন্তকর্ত্তৃক নিযুক্ত চরগণ অঙ্গুরী সহ এক সুবর্ণবণিক্‌কে ধরিয়া আনিলে ছদ্মবেশিনী অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার অনুরোধে রাজা সেই অঙ্গুরী হস্তে ধারণ করিতেই তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হয়, এবং তিনি শকুন্তলার শোকে অভিভূত হন।

১। কেবল গঙ্গাদাস সেনের লাচাড়িটী ছাড়া।

তৃতীয় আখ্যানটী জাহ্নবীর বানর পতি বা শান্তনুর পূর্ব্বজন্ম বিষয়ে। অভিশাপবশতঃ বানরকুলে জাত এক স্বর্গবাসী শিবকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে গঙ্গাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়। গঙ্গা বানরের শরীরে লোম দেখিয়া লোম নাশের জন্য তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করাইয়া মারিয়া ফেলেন। বানরজন্মের পর এই স্বর্গবাসী মহাপুরুষের শান্তনুরূপে হস্তিনাপুরের রাজকুলে জন্ম হয়। তিনি দ্বাদশ বৎসর গঙ্গাকে পত্নীরূপে ভোগ করেন। চতুর্থ আখ্যানটী বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষয়ে। এই উপাখ্যানে সঞ্জয়ী ভারতে একটী নূতন কথার অবতারণা হইয়াছে। অন্য কোনও মহাভারতে এই আখ্যানটী পাওয়া যায় না। মৈথিলী ভারতে আবার চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষয়ে অন্যপ্রকার কথা লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম আখ্যানটী সভাপর্ব্বে অর্জ্জুন ও হনূমানের প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ যে ভক্তের অধীন, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমার উদ্ধৃত আখ্যানটীতে সঞ্জয়ী ভারতে অনেক বেশী কথা পাওয়া যাইতেছে। সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডের কথাটী সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোনও গায়ন গান জমাইবার জন্য এই প্রসঙ্গটী জুড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, সঞ্জয়ী ভারতের আর একখানি পুথিতে (ঢা, বি, ৯৬৭ সং পুথিতে) এই প্রসঙ্গটী পরাগলী ভারতের ন্যায়ই সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যাইতেছে। ষষ্ঠ আখ্যানটী ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ বিষয়ে। দীনেশবাবু এই প্রসঙ্গটী তাঁহার সঞ্জয়ী ভারতে পান নাই। সপ্তম আখ্যানটি কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের উক্তিপ্রত্যুক্তি। দীনেশবাবু এই আখ্যানটী পরাগলী ভারতে পান নাই। এইরূপ আরও অনেক আখ্যান উদ্ধৃত করা যাইতে পারিত। কিন্তু প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে বিরত হইলাম।

১। মহাভারতের উৎপত্তিকথা

জন্মেজয়সমীপে ব্যাসদেবের উক্তি

সঞ্জয়ী মহাভারত (১৫৫০ সংখ্যক পুথি)	পরাগলী মহাভারত (২০২৪ সংখ্যক পুথি)
কালি তোমার দ্বারেত আসিব এক রথ।	কালি তোর দ্বারেত আসিব এক রথ।
ভুবনবিজই রথ দেখিতে মহত্য ॥	অতি বিলৈক্ষান রথ নাহি ভুবনেত ॥
কদাচিত্য আরহন না করিয় তাত।	সেই রথ আরহন না করিবা তাত।
আপন কুসল জদি চাহ নরনাথ ॥	আপনা কুসল জদি চাহ নরনাথ ॥
রাজা বোলে সৈত্য তোমার বচন পালিব।	
আচোক আরহিব রথ পর্স না করিব ॥	
মুনি বোলে ই বাক্যে বিস্ময়ে লাগে মনে।	
তাকে পাইয়া উপেক্ষিব কাহার পরানে ॥	
নিশ্চয়ে চড়িবা রথে আমি জানি তত্যে।	জদি আরহন কর সুন মহাসয়ে।
তিন দিগে ভ্রমিয় রাজা না জাইয় দক্ষিনেতে ॥	মৃগয়ারে না জাইবা দক্ষিন দিগএ ॥

রাজা বোলে তোমা বাক্য ধরিবাম চিত্যে।
আচৌক মৃগয়া কার্জ্য না চড়িব রথে ॥
মুনি বোলে বের্থ কেনে আমা বাড় কেনে।
আমি জানি মৃগয়াতে জাইবা দক্ষিনে ॥
তথা গিয়া এক পুরি দেখিবা বিদিত।
তার মধ্যে প্রভেস না করিবা কদাচিত্য ॥
বচন লঙ্গিয়া জদি জাও সেই পুরি।
তার মধ্যে এক নারী দেখিবা সুন্দরি ॥
আপনার হিত জদি চাও মহাসএ।
সেই কর্ন্যা না আনিবা সুন জন্মজয় ॥
জদি বা আনহ কৈন্যা কামরসে ধরি।
জজ্ঞপত্নি না করিবা মুক্ষ পাটেস্বরি ॥
এত বোল অন্তধ্যান হৈল তপুধন।
সুনিয়া হইল রাজা চিন্তাকুল মন ॥
মুনিয়ে অসর্ক্ষ্য কথা কহিল আমাতে।
ই সকল কথা আমি বোঝিব কেমতে ॥

দির্ব্ব পুরি দেখিবা জে মনোহর ভেস।
মনিমএ দেখিবা জে পুরির উল্লাস ॥
কৈন্যা এক দেখিবা তাহাতে বিদ্ধমান।
সেই কৈন্যা না চাহিবা সুনহ রাজন ॥
সে কৈন্যা না নিবা ঘরে সুন জর্ম্মজএ।
পাটেশ্বরি না করিবা সুন মহাশএ ॥
এ বোলিয়া ব্যাস মুনি গেল তপোবনে।
বিস্ময়এ হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে ॥
মুনিবরে এহি কথা কহিল আম্মাত।
কেমতে বুঝিব আহ্মি এহার সম্মত ॥

হেন কালে এক রথ আসিলেক দ্বারে।
দ্বারি গিয়া জানাইল রাজার গোচরে।
মুনি মুক্তা লাগি আছে বিচিত্র নির্ম্মান।
ত্রিভুবনবিজই আসিছে রথখান ॥
কুড়ি সহস্র রথ আছে তোমার ভাণ্ডারে
হেন রথ নাই দেখি তার সমর্ম্বরে ॥
রাজা বোলে আন দেখি রথবর আগে।
কার রথ কে আনিছে সুনি ধন্দ লাগে ॥
দ্বারি গিয়া সেই রথ আনিল বিদিত।
দেখিয়া নৃপতি হৈল পরম বিস্মিত ॥
বোঝিয়া সকল কথা কহিয়াছে মুনি।
এমত অপূর্ব্ব রথ না দেখিছি আমি ॥
জর্ম্মান্তরের পুর্ন্ন ফলে বিধার্ত্তা নির্ব্বন্ধে।
রাজা বোলে রথখান রাখ পুরিমধ্যে ॥

হেন কালে রথখান মিলিল দ্বারেত।
দ্বারি গিয়া জানাইল রাজার অগ্রেত ॥
মনি মুক্তা লাগি আছে বহুল নির্ম্মান।
ত্রিভুবন বিদিতে আসিছে রথখান ॥
রাজাএ বোলে রথখান আনহ গোচরে
কাহার জে রথখান জানিবার তরে ॥
দ্বারি গিয়া রথখান আনিল ত্বরিত।
দেখিয়া নৃপতি মন হইল বিস্মিত ॥
বুঝিল স্বরূপ কথা কহিআছে মুনি।
এমত অপুর্ব্ব কথা কভো নাহি সুনি ॥
এমত অপুর্ব্ব কথা নাহি দেখি সুনি।
মির্থা না হইল তবে ব্যাসের জে বানি ॥

দিনান্তরে রথে চড়ি রাজা জন্মজয় ।
মৃগয়া করিতে গেল দক্ষিণ দিগএ ॥
ভ্রমিয়া সকল বন চাইল বিসেস ।
কুন্থখানে না পাইল মৃগের উদ্দেস ॥
পুনি বনান্তরে গেল নৃপতিসেখর ।
তথাতে দেখিল রাজা রর্ম্য সরোবর ॥
তাহার উদ্যানে পুরি দেখিল বিদিত ।
মনির বচন স্মরি বিস্ময়ে লাগে চিত্য ॥
মুনিয়ে নিসেদ আমা করিআছে পৃতে ।
দেখিলে অপুর্ব্ব পুরি তথা না জাইতে ॥
অতি বিলর্ক্ষন পুরি অপুর্ব্ব নির্ম্মান ।
কৈর্ন্না পাইলে উপেক্ষিমু দেখি পুরিখান ॥
ই বোলিয়া পুরিমধ্যে প্রভেসিল ঝাটে ।
দেখিল সুন্দর কৈর্ন্না সুভর্ন্নের খাটে ॥
পরিধান পট্টসারি গজমতি গলে ।
কুমারির রোপে গোনে পুরিখান জলে ॥
পাসে গিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপতিকুমারে ।
কার কৈন্যা কেবা তুমি কহিবা আমারে ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কৈন্যা দাণ্ডাইল আগে ।
আপনার জত কথা কহিবার লাগে ॥
বাপ মোর অংসুমান ক্ষেত্রিবংসে জাত ।
তাহান দুহিতা আমি কহিল তোমাত ॥
বিধার্ত্তা নির্ব্বন্ধে জান তার হৈল অন্ত ।
কহিতে আমার কথা বড়ই দুরন্ত ॥
একদিন মহামুনি বালিখিলা নাম ।
অতিথি হইয়া গেল রাম অনুঠাম ॥

প্রদিপের শির্ক্ষা জেন মহাতেজসালি ।
অতি সহস্র সসি সম হস্তের অঙ্গোলি ॥

কর্ম্মগতি ফলে কিবা বিধার্ত্তা নিবন্ধে ।
জত্ন করি তাহারে রাখিল পুরিমৈদ্ধে ॥
অপর দিবসে রাজা চড়িয়া রথএ ।
মৃগয়া করিতে গেল দক্ষিণ দিগএ ॥
ভ্রমিয়া সকল বন চাহিল বিসেস ।
কোনখানে না পাইল মৃগের উদ্ধেস ॥
আচম্বিতে পুরিখান দেখিল নৃপতি ।
মুনিবাক্য স্বরিয়া বির্স্বএ হৈল মতি ॥
মুনিএ নিসেদ পুনি করিয়াছে পুর্ব্বে ।
পুরিমধ্যে প্রবেস জে না করিব তবে ॥
অতি বিলৈক্ষন পুরি দেবের নির্ম্মান ।
কৈন্যা পাইলে না আনিব দেখি পুরিখান ॥
এ বলিয়া পুরি মৈদ্ধে প্রবেশিল ঝাটে ।
দেখিলেক কৈন্যারত্ন বসি আছে খাটে ॥
পরিধান পট্টবস্ত্র রত্নহার গলে ।
দেখিয়া কৈন্যার রূপ মুহিত সকলে ॥
জে হৌক সে হৌক কন্যা নিবাম ভুবন ।
দেখিয়া কৈন্যার রূপ মুহিলেক মন ॥
কাছে গিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপতিকুমার ।
আপনে কে তুহ্মি কৈন্যা কহ সমাচার ॥
কাহার দুহিতা তুহ্মি হও কার নারি ।
অঘোর কানন বনে আইলে একশ্বরি ॥
সম্বিত পাইয়া কৈন্যা দাড়াইল আগে ।
পরিচয় দিয়া কথা কহিবার লাগে ॥
পিতা মোর অংশুমান ক্ষেত্রিবংসে জাত ।
কান্তাবতি নাম মোর কহিলুম তোহ্মাত ॥
বিধার্ত্তা নিবন্ধ মোর পুরি হৈল অন্ত ।
কহিতে বিস্তর হএ সে সব বৃর্ত্তান্ত ॥
একদিন মহামুনি বালক্ষির্ল্য নামে ।
অতিথি হইয়া আইল বাপের আশ্রমে ॥
প্রদিপের শিক্ষা প্রায় তপে মহাবলি ।
অতি ক্ষুদ্র মুনি জেন বির্দ্ধ অঙ্গুলি ॥

অথিতি দেখিয়া বাপে না করিল পুজা।	ব্রহ্মার তনয় জানি না করিল সৈজ্জা।
অবজ্ঞা করিয়া বাপে না করিল পুজা।	অবজ্ঞাএ বাপে তারে না করিল পুজা ॥
ক্রোধ করি মুনিবরে দিল ব্রহ্মশ্যাপ।	ক্রোধ হৈয়া মহামুনি দিল ব্রহ্মশাপ।
পুরিসমে ভস্ম হইয়া মৈল মুর বাপ ॥	পুরিমৈর্দ্ধে ভর্স্ব হৈয়া মৈল মোর বাপ ॥
পুষ্প আনিতে আমি ছিল পুষ্পবনে।	পুর্স্প আনিবার আহ্মি গেলাম পুর্স্পবনে।
অভ্যাহতি পাইল আমি সেই সে কারণে ॥	অব্যাহত্তি পাই আহ্মি এহি সে কারণে ॥
একাকিনি নারি আমি বান্দববর্জ্জিত।	অকুমারি নারি আহ্মি বান্দববজ্জিত।
নাইক দুসর জন আমার পুরিত ॥	নাইক দ্বিতিয় জন আহ্মার সহিত ॥
রাজা বোলে কামবানে দহে মুর প্রান।	রাজায়ে বোলে কামবানে দহে মোর মন।
প্রান রাখ দিয়া মুরে আলিঙ্গন দান ॥	প্রান রাখ দিআ মোরে আলিঙ্গন দান ॥
পরিক্ষিতসুত আমি নাম জর্ম্মজয়।	পরিক্ষিতসুত আহ্মি নাম জর্ম্মজএ।
চন্দ্রবংসে জর্ম্ম মুর জগতে জানএ ॥	চন্দ্রবংসি রাজা আহ্মি কহিলুম নিশ্চ্যএ ॥
সর্ম্মতি জানিয়া জদি না দেও উর্ত্তর।	সম্ভ্রম করিয়া জদি না দেয় উর্ত্তর।
দিবাম পুরুসবধ তোমার উপর ॥	দিবম পুরুসবধ তোহ্মার উপর ॥
তবে সেই কৈন্যা বোলে বরিবারে পারি।	কৈন্যাএ বোলে তবে সে বরিতে আহ্মি পারি।
জজ্ঞপত্নি আমা জদি কর পাটেস্বর্রি ॥	সমাহিতে কর জদি মুক্ষ্য পাটের্শ্বরি ॥
তবে রাজাএ বোলে তোমার হৈল নিজদাস।	রাজাএ বোলে তোমার স্থানে কৈল প্রানপন।
জেই ইচ্ছা সেই তোমার পুরাইব আস ॥	না কর অন্যথা পুনি জে লএ তোহ্মার মন ॥
ই বোলিয়া কৈন্যা ধরি তুলিল রথএ।	তবে পুর্স্পমালা লইয়া কৈন্যাএ বরিল।
গন্ধর্ব্ব বিভাহ করি চলিল দেসএ ॥	হেনমতে অরণ্যেত বিবাহ নির্ব্বহিল ॥
কৈন্যা পাইয়া জায়ে রাজা পরম হরিসে।	সেই ক্ষ্যনে কৈন্যা পুনি তুল্হিয়া রথএ।
	করিয়া গন্ধর্ব্ব বিহা আনিল দেসএ ॥
গুয়াইল অনেক দিন নানা রঙ্গরসে ॥	তবে জর্ম্মজয় রাজা আনন্দিতে আইসে।
কুমারিয়ে রাত্রিদিন করহে ভকতি।	হেনমতে কতদিন গেল ক্রিড়ারসে ॥
সকলের মুর্ক্ষ্য তানে করিল নৃপতি ॥	কুমারিএ অর্নে দিন মহারাজা সেবি।
বিধার্ত্তা নির্ব্বন্দ কেবা খণ্ডাইতে পারে।	সকলের মুখ্যা হয়া হৈল পাটেশ্বরি ॥
বিনি ভুগ না হইলে নহে অবসর্রে ॥	বিধার্ত্তার নিবন্দ জে খণ্ডাইব কেবা।
পিত্রিস্রার্দ্ধ করিয়া বসিছে জর্ম্মজয়।	বিনি ভোগ ভুঞ্জিলে জে কর্ম্মে আছে জেবা ॥
বাম পাসে মহাদেবি বসিয়া আছএ ॥	পিতৃশ্রার্দ্ধ করিয়া বসিছে জর্ম্মজয়ে।
হেনকালে স্রিঙ্গস্যঙ্গ বিভাণ্ডকসুত।	বাম পাসে মহাদেবি বসিয়া আছয়ে ॥
দক্ষিনা লহিতে আইল রাজার আগুত ॥	হেনকালে হৃগুশ্রীঙ্গ মুনি তপোধন।
দণ্ড কমণ্ডল হাতে ভেস দিগাম্বর।	দক্ষিণা লইতে আইল রাজার সদন ॥

দুইখান স্রঙ্গ মুনির মাথার উপর ॥
তাহা দেখি মহাদেবি হাসিল কটাক্ষে।
কবো নাই দেখি স্রঙ্গ মুনির মস্তকে ॥

ধ্যান মনে মহামুনি মনে মনে ভাবি।
মুনিয়ে হাসিল জানি সেই মহাদেবি ॥
স্রঙ্গ দেখি আমারে হাসিল দুষ্ট নারি।
মুনিয় হাসিল তার পুর্ব্বকথা স্মরি ॥
তাহা দেখি জর্ম্মজয় অগ্নিহেন জলে।
ক্রোধ করি তখনে মুনির প্রতি বোলে ॥
মুনি হৈয়া কামাতুর লর্জ্জা নাই মনে।
মহাদেবি দেখি মুড় হাস কি কারনে ॥
জ্ঞান নাই অকারনে ব্রহ্মদণ্ড ধর।
তবে কেনে বনে গিয়া মুনিভূর্ত্তি কর ॥
ই বোলিয়া সুবর্ন্নের গাঙ্গু লৈয়া হাতে।
মুনি প্রতি মেলিয়া হানিল কুপচিত্যে ॥
তাহা দেখি স্রিশ্মস্রঙ্গ জলে অগ্নিখণ্ড।
কি জানিয়া মুড়মতি মুরে কৈলে দণ্ড ॥
ব্রর্হ্মবধ করিয়া তিলেক নাই ভয়।
হেন পাপ রাজা নাই পাণ্ডবকুলয় ॥
পরিক্ষিত নৃপতি আছিল তর বাপ।
অস্তিক মুনির গলে বান্দে মরা স্যাপ ॥
তার পুত্রে স্যাপ দিল মনে কষ্ট করি।
সপ্তদিন ভিতরে তক্ষকে খাইল মারি ॥
শ্রীমর্ত্যে মর্ত্যতা হৈয়া আমা না গনছ।
তিলেকের মধ্যে তরে করিতে পারি ভস্ম ॥
প্রানে না মারিব তরে স্তুন পাপমতি।
দণ্ডের উচিত সাস্তি দিবাম সমপ্রতি ॥
বন হতে বেস্সা আনি কর রতিক্রিড়া।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া তোমার হউক ব্যাদি পিড়া ॥
স্রঙ্গমুনির বার্ক্য বের্থ নহে তিন লুকে।
কুষ্ট পিড়া রাজার জে হইল তিলেকে ॥

দণ্ড কমণ্ডুর্ব্ব হাতে মুর্ত্তি দিগাম্বর।
দুই খান শ্রীঙ্গ মুনির মস্তক উপর ॥
তাহা দেখি মহাদেবি হাসিল কটাক্ষে।
কথা নহি দেখি শ্রীঙ্গ মুনির মস্তকে ॥
ধ্যানে জানিল মুনি মনে মনে ভাবি।
মুনিহ হাসিল পাছে চাহি মহাদেবি ॥
আহ্মার দেখিয়া শ্রীঙ্গ কৈলা উপহাস।
বিধাতা নিবন্দ তোর মতি হৈল নাস ॥
তাহা দেখি জর্ম্মজয় অগ্নিহেন জলে।
ক্রোধে অগ্নিবত হৈয়া মুনি প্রতি বলে ॥
মুনি হৈয়া কামভাব লজ্জা নাই মন।
মহাদেবি দেখিয়া হাসিলে কি কারন ॥
জ্ঞান নাই অকারনে ব্রহ্মদণ্ড ধর।
কোন কার্য্যে তুহ্মি সবে মৈনব্রত কর ॥
রাজার মহেসি হৈলে প্রজার জননি।
হেনজন দেখি হাস মেজ্যাদা না জানি ॥
এ বলিয়া জলপানের গাড়ু লইল হাতে।
মুনি প্রতি মেলহিয়া মারিল নরনাথে ॥
কপালে ফুটিল গাড়ু রক্ত পড়ে ধারে।
চাপিয়া ধরিল মুনি ততৈক্ষ্যনে করে ॥
ক্রোধ হইয়া মহামুনি জলে খণ্ড খণ্ড।
কি বুঝিয়া মুঢ়মতি আহ্মা কর দণ্ড ॥
ব্রহ্মবধ করিতে তিলেক নাই ভএ।
তোর সম মূঢ় নাই ই তিন ভুবনএ।
পরিক্ষিত নৃপতি আছিল তোর বাপ।
অস্তিক মুনির গলে বান্দি মৃতা সাপ ॥
তার পুত্রে সাঁপিলেক মনে ক্রোধ করি।
সপ্তদিন ভিতরে তক্ষ্যকে গেল মারি ॥
স্ত্রিমদে মর্ত্ত হইয়া আহ্মা না চিনস।
পুরিসমে সাঁপিয়া করিতে পারি ভর্ষ্ম ॥
প্রানে তোরে না মারিব স্তুন পাপমতি।
দণ্ডের উচিত ফল তোরে দিব সাস্তি ॥

ক্রোধ হনে ধর্ম্মজ্ঞান বোদ্ধি হয়ে নাস।
হিংসা হনে অধুগতি নরকেত বাস॥
ক্ষেমা সৈত্য দড় করি থাকে জার মনে।
তাহার আপদ নাই এ তিন ভুবনে॥
এতেক জানিয়া সবে পরিহর ক্রোধ।
ক্রোধ হতে কার্জ বাদ ধর্ম্মেত বিরূদ॥

বনমৈদ্ধে বেশ্যা পাইয়া তুহ্মি কর ক্রূড়া
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া তোর হউক কুষ্ট পিড়া॥
হৃর্শ মুনির সাঁপ ব্রেথ নহে তিন লোক।
পিড়া হৈল জন্মজয় দেখে সর্ব্ব লোক॥
অচ্ছিদ্র হৈল পিড়া ছিদ্র নাই আর।
শ্রীঙ্গমুনির পাএ পড়ি করে হাহাকার॥
ক্রোধ হতে অধগতি নরকেত বাস।
মহামুনি ব্যাসদেবে কহে ইতিহাস॥
ক্রোধকালে লঘু গুরু না করে প্রকাস।
ক্রোধকালে মহাজনের বুদ্ধি হএ নাস॥
সৈত্য ক্ষোমা দুই কর্ম্ম থাকে জার সনে।
অপায় নাহিক তার ই তিন ভুবনে॥
এতেক জানিয়া মনে ক্ষেমা দেয় ক্রোদ্ধ।
ক্রোধ হতে কায্য নষ্ট ধর্ম্মেত বিরোধ॥

লংঘিয়া ব্যাসের বাক্য ফলিল প্রমাদ।
আকাস ভাঙ্গিয়া জেন পড়িল মাথাত॥
কাতর হইয়া কহে মুনির চরনে।
স্যাপের স্যাপান্ত মুক্ত কহ তপুধনে॥
মুনি বোলে অন্দ হৈয়া আছিলে তগন।
অখনে দেখয় চর্ক্ষে পাইয়া অঞ্জন॥
কর্ম্মগতি পাইলা স্যাপ নাইক খণ্ডন।
ব্যাসদেব হতে সুন বংসের কথন॥
তবে সে বিপদ হতে হইবা মূচন।
খণ্ডাইব আপদ তর ব্যাস তপুধন॥
ই বোলিয়া ত্রিস্যাস্হঙ্গ গেল নিজ স্তান।
চিন্তায়ে আকুল রাজা স্তির নহে প্রান॥
শ্রীভ্রষ্ট হৈয়া রাজা বোদ্ধি হৈল নাস।
ভুমিতে বসিয়া রাজা ছাড়ন্ত নিস্সাস॥
বার্ত্তা পাইয়া ব্যাসদেব আসিল সর্ত্তর।
জথা আছে জর্ম্মজয় হস্তিনানগর॥
প্রনাম করিল রাজা মুনির চরনে।
ব্যাসে বোলে জর্ম্মজয় কহিছি তখনে॥

লংঘিয়া মুনির বাক্য কলাইল কাজ।
আকাস ভাঙ্গিয়া জেন মুণ্ডে পড়ে বাজ॥
আপনা নাসের হেতু করিল প্রকাস।
না সুনি মুনির বাক্য কৈল সর্ব্বনাস॥
অপহ্রাদ কৈলুম মুনি তোমার চরনে।
সাঁপের সাঁপান্ত মাগিএ তোহ্মার স্থানে॥
মুনি বোলে অন্দ হৈয়া আছ কত কাল।
অখনে দেখহ চক্ষু পাইয়া জঞ্জাল॥
কর্ম্মগতি ফলে কায্য তোর কর্ম্মদোসে।
খণ্ডিব সকল তোর ব্যাস উপদেসে॥
এ বলিয়া শ্রীঙ্গমুনি গেল নিজ ঘরে।
ব্যাকুল হইয়া রাজা চিন্তএ অন্তরে॥
শ্রী ভষ্ট হৈয়া রাজা বুদ্ধি হৈল নাস।
ভুমিতে বসিল রাজা হইয়া হতাস॥
বার্ত্তা পাইয়া ব্যাস মুনি আইল সর্ত্তর।
জথাএ আছে জর্ম্মজএ হস্তিনানগর॥
অভ্যান্তরে গিয়া রাজা দেখিলেক ব্যাসে।
জর্ম্মজএ দেখিয়া কটাক্ষে মুনি হাসে॥

পুর্ব্বে তোমা নিসেদিল করিয়া জত্নন।
মর্ত্য হৈয়া না রাখিলা আমার বচন ॥
তারা সব বলবন্ত ছিল ধনুর্দ্ধর।
কেমতে বোঝাইব আমি সতেক বর্ব্বর ॥
রাখিতে না পারি আমি এতেক বোঝাইয়া।
প্রমাদ করিছ মুর বচন লংঘিয়া ॥
মুনিতে কহিল রাজা করিয়া ভকতি।
তোমি বিনে ত্রিভুবনে নাই অভ্যাহতি ॥
জয়মুনি দিলাম রাজা তোমা বিদ্যমান।
কহিব সকল কথা করিয়া বাখান ॥
ই বোলিয়া অন্তরধ্যান হৈল মহামুনি।
জর্ম্মজয় বোলে কথা সুন নৃপমনি ॥ *
(১৫৫০ সংখ্যক পুথি, ২ ক—৩ খ পৃষ্ঠা

দণ্ডবত হৈয়া রাজা পড়িল চরনে।
মুনি বোলে জর্ম্মজয় কি হৈব অখনে ॥
পুর্ব্বে নিসেদিল তোকে না সুন বচন।
মর্ত্ত হইয়া না সুনিলে অভাগ্য কারন ॥
তাহ্রা সব বলবন্ত সুয্যের অধিক।
ইন্দ্রেরে জিনিতে পারে কি বলিব ধিক ॥
সেই সব বলবন্ত আছিল দুর্ব্বার।
বুঝাইতে পারে কেবা সতত বর্ব্বর ॥
রাখিতে নারিল তোকে এতেক বুঝাইয়া।
মনির সহিতে বাদ কর কি লাগিয়া ॥
রাজাএ বোলে তুহ্মি পরে আর নাহি গতি।
আজ্ঞা কর কেমতে পাইব অভ্যাহতি ॥
মনি বোলে সুন তোর বংসের কথন।
খণ্ডিব সকল ব্যাধি পাপ বিমোচন ॥
জয়মনি নামে সিস্য তোহ্মা বিদ্যমান।
তাহা হোতে সুন গিয়া হইয়া সাবধান ॥
মনির মুখের কথা অমৃতের সার।
পদে পদে তাহার ধর্ম্মের অবতার ॥
সুনিলে সম্পদ হয়ে পরলোকে তরি।
বিজএ পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি ॥
সঞ্জয়ের মুখে তবে অমৃতের সর্ব্ব।
ব্যাষ মুনির বাক্যে হৈল অষ্টাদশ পর্ব্ব ॥
(২০২৪ সংখ্যক পুথি, ২ ক—৫ খ পৃষ্ঠা)।

২। শকুন্তলার অঙ্গুরি

সঞ্জয়ী—

এথা সকুন্তলা এড়ি মুনিসিস্য গেল।
কন্দ মুনি আগে গিয়া সকল কহিল ॥
সুনিয়া কান্দিল মুনি বড় পাইয়া তাপ।
রাক্ষস অদিক হৈলাম মুহি তুর বাপ ॥
স্যামান্ন জনের মত দিল পাটাইয়া।
এতেকে ছাড়িল কিবা অপজ্ঞা করিয়া

পরাগলী—

ওথা সকুন্তলা এড়ি সিস্যসব গেল।
মুনির অগ্রেতে গিয়া সকল কহিল ॥
সুনিয়া সিস্যের মুখে কান্দিল বিস্তর।
নয়ানের জল তবে বহে ঝর ঝর ॥
সামান্ত জনের মত দিল পাঠাইয়া।
এতেক ছাড়িল কৈন্যা অবজ্ঞা পাইয়া ॥

* ইহার পরবর্ত্তী পুষ্পিকার অংশটি সঞ্জয়ের পুথিতে নাই; কেবল পরাগলীতে আছে।

ব্রহ্মস্যাপ করি কিছো না করিল ভয়।
ধর্ম্মেত বিমন হৈল হিলিন তনএ॥
অনুসুয়া পৃয়ম্বুদা আনি পুছে মুনি।
কিরূপ প্রসঙ্গ ছিল তাহা কহ স্থনি॥
আদি অন্ত তাহার কহিল দুইজনে।
পাসরিলা রাজায়ে ব্রহ্মস্যাপের কারনে
রাজায়ে অঙ্গোরি এক দিল বির্দ্ধমানে।
সে অঙ্গোরি সকুন্তলা রাখিছে জত্ননে॥
স্যাপের মুচন তবে দিলেক ব্রাহ্মন।
অঙ্গোরি দেখিলে রাজা স্মরিব তখন॥
মুনি বোলে বৃত্তান্ত জে তুমি জান তার।
দুই সখি গিয়া কর তার পৃতিকার॥
তারাহ মানিল তবে মুনির বচন।
রাজপন্তে হাটিয়া চলিল দুইজন॥
আপনার সিস্যসব সঙ্গে দিল মুনি।
নগরেত প্রেভেসিয়া বঞ্চিল রজনি॥
প্রভাতেত সে দুই সৌরিন্দ্রিভেস ধরি।
প্রভেস করিল গিয়া রাজঅন্তপ্পুরি॥
দেখিয়া সকল লুক হৈল চমৎকার।
সেই সকুন্তলা কিবা আইল পুনর্ব্বার॥
পুরবাসি নারিলুকে রাজাতে কহিল।
দেবকৈন্ন্যা হেন দুই কথা হতে আইল॥
রাজার আজ্ঞায়ে নারিসকলে আনিল।
সৌরিন্দ্রি বলিয়া তারা পরিচয় দিল॥
একদৃষ্টে চাহে রাজা সখি দুই জনে।
লক্ষিতে না পারে দেখিআছে কুন্ স্তানে।
স্নেহভাবে পুর্ব্বে রাজার মনে মনে জপে।
স্মরন করিতে নারে বোলে ব্রহ্মস্যাপে॥
রাজা বোলে সৌরিন্দ্রি থাকহ মুর পুরে।
ইচ্ছাচারি হৈয়া থাক সেবিয়া আমারে॥
এই মতে পুরিতে রহিল দুইজন।
কিচারিয় সকুন্তলা না পাইল ত্রসন॥

অনুসুয়া পৃয়ম্বদা আনি পুছে মুনি।
পুর্ব্বের রহস্য কথা কহ চাহি স্থনি॥
মুনিত কহিল বার্ত্তা তারা দুইজন।
পাসরিল রাজাএ ব্রহ্মসাপের কারন॥
রাজার অঙ্গুরি এক অবির্জ্জান ছিল।
সকুন্তলাএ সেই অঙ্গুরি হস্তেত ধরিল॥
সাঁপের সাপান্ত তবে কহিল ব্রাহ্মন।
তাহারে দেখাইলে হৈব রাজার স্মোরন॥
মুনি বোলে তুহ্মি দুই জানহ সকল।
জেনমতে হএ ভাল চিন্তহ কুসল॥
তারা দুই মানিলেক মুনির বচন।
সরিন্দ্রির রূপ ধরি সখি দুইজন॥
সেই নগরে গিয়া বঞ্চিল রজনি।
ঘরে ঘরে স্থনে নারি পুরানকাহিনি॥
রাজার নগরে তবে গেল দুইজন।
নানা নির্ত্ত দেখাইল চাহিল জনে জন॥
পাত্র মিত্র বাড়িতে করিল নানা নির্ত্ত।
অবিরোধে সকলের হরিলেক চির্ত্ত॥
রাজাতে বলিল গিয়া সব বিবরণ।
বিদেসি নির্ত্তকি আইল স্থনহ রাজন॥
রাজাএ বোলে আন নির্ত্ত চাহিব সকলে।
রাত্রিকালে চাহিবম হইয়া কুতুহলে॥
আজ্ঞা পাইয়া দুই জন তথাতে আনিল।
রজনিতে রাজপুরে বহু নির্ত্ত কৈল॥
রাজাএ দেখিল সেই লক্ষ্যি মুর্ত্তিমান।
ব্রাহ্মনের সাঁপে কিছু স্থির নহে জ্ঞান॥
স্থির করিবারে নারে মনে মনে জপে।
না পারে চিনিতে তারে ভ্রমে ব্রহ্মসাঁপে॥
তুষ্ট হই নৃপতি গলার দিল হার।
হার পাই দুইজন হরিষ অপার॥
সেই বস্ত পাইয়া তারা হাসিল কিঞ্চিত।
জোড় হাতে বলিলেক রাজার বিদিত॥

গুপ্তভাবে পুরিতে জিজ্ঞাসে অবিপ্রাএ।
এথা নাই সকুন্তলা ত্যাগিল রা[জা]এ॥

অবিজ্ঞানে না বঞ্চিল কেবা নিস হরি।
সর্জ্জায়ে বিকল কথা লুকাইল সুন্দরি॥
অবিপ্রায়ে জানে সকুন্তলা নাই এথা।
নাছে গায়ে দুইজনে স্মরি পুর্ব্বকথা॥
পুরবাসি লুক সবে দেখন্ত কৌতুক।
স্ত্রি সবে জানাইল রাজার সমখ॥
তুষ্ট হৈয়া নৃপতি গলার দিলা হাড়।
চিনিয়া লাইল হাতে রত্নগ্র স্নুন তার॥
সকুন্তলা প্রতি পুর্ব্বে দিল উর্ব্ব মুনি।
অঙ্গোরির পরিবর্ত্তে আনে নৃপমনি॥
জাতিএ সৌরিন্দ্রি আমি নাছি গিত গাই।
কাহার অদিন নহি ইর্চ্ছায়ে বেড়াই॥
কৌতুকে নাচিতে গেল বরুণের পুরি।
জত্ন করি আমারে রাখিল তার নারি॥
মনি এক দিল সেই বড় জত্ন করি।
আপোনে বরুন দিল হস্তের অঙ্গোরি॥
তথা থাকি তোমার স্নুনিল স্নুচরিত।
কৌতুকে নাচিতে আইলাম তোমার পুরিত
পথক্রমে নগরেত করিল সয়ন।
তস্করে হরিল মুর হস্তের রত্নন॥
সেই হতে বেড়াই আমি হইয়া বিসাদ।
পাইলাম হাড়মনি তোমার প্রসাদ॥
জথাতে পাইল হাড় তথাতে অঙ্গোরি।
তুমা স্তানে পাইবার অনুমান করি॥
অঙ্গোরি পাইলে আমি দেসে চলি জাই।
জথা তথা থাকিয়া তোমার গুন গাই॥
শুনিয়া ই সব কথা রাজা চমৎকার।
কথাতে পাইল মনি নারে চিনিবার॥

অবধান কর রাজা করি নিবেদন।
তোহ্মার নগরে হারাইল এক ধন॥
নির্ত্ত করিবারে গেল বরুণের পুরি।
আপনে বরুনে দিল হাতের অঙ্কুরি॥
হার অঙ্কুরি দুই পাইল তথাত।
তাহার বির্ত্তান্ত এবে স্নুন নরনাথ॥
পথশ্রমে নগরেত করিলুম সয়ণ।
তস্করে হরিল মোর গাঠির রর্ত্তন॥
হার এক পাইলাম তোমার প্রসাদ।
অঙ্কুরির লাগি রাজা পড়িল প্রমাদ॥
একত্রে হারাইল দুই স্নুন নরনাথ।
হার জাহাতে আছে অঙ্কুরি তাহাত॥
স্নুনিয়া রাজাএ তবে হইল লজ্জিত।
পরিনামে কিবা জানি হইব কুৎসীত।
এমত জানিয়া রাজা তাকে না বলিল।
কোতয়াল আনি রাজা নিজ্জনে বলিল॥
নগরের মৈর্দ্ধে রত্ন অঙ্কুরি হরিয়া।
নিলেক কেমন জনে তস্করি করিয়া॥
সিগ্রগতি ধরি আন চোর জথা পাও।
নহে পুনি অপজস হইব এথাও॥
রাজার আদেস পাইয়া সব চরগন।
অন্তে অন্তে নগরেত করএ ভ্রমণ॥
কেহ নির্ত্তকির ভেষ ভিক্ষুকভেস ধরি।
অধম উর্ত্তম জনের প্রবেসিল পুরি॥
এহি মতে বিচার করএ স্থানে স্থান।
বিধিএ পারএ তাহা করিতে সন্ধান॥
জতেক ধিবরগনে জলেত প্রবেসে।
জল মৈর্দ্ধে মৈৎস এক বাজ্বিল বিসেসে॥
কাটিলেক সেই মৈৎস অংস করিবার।
পাইল অঙ্কুরি এক নির্ম্মান সোনার॥
কেহ বোলে হাতে দিব মোহোর রমনি।
পিত্তলের মাঝে ভালা সোভা করে পুনি॥

কেবা আনি দিল মুরে মনিরত্নহাড় ।
অঙ্গোরি না দিলে হয়ে বহুল ধিকার ॥
ভাণ্ডারির তরে রাজা বোলে ডাক দিয়া ।
আনহ অঙ্গোরি ভাল বহুমুল্ল চাইয়া ॥
ভাণ্ডারি আনিয়া দিল অঙ্গোরি অপার ।
রাজা বোলে নেহ চিনি জে হয়ে তোমার ।
কৈর্ন্না বোলে ইয়ার নাইক প্রয়ুজন ।
মির্থ্যা কথা কৈয়া কেনে নিব পরার ধন ॥

কেহ বোলে কাচের হাতেত ভালা সাজে
কেহ বোলে হার গাথিয়া দিব ভুজে ॥
কেহ বোলে ভাল সোভা করে শ্রুতিমুলে
রমনি তুসীতে পারি আর এক পাইলে ॥
এহিমতে সবে মিলি করএ ঝঙ্কার ।
ঝালোয়া মণ্ডলে বোলে করিব বিচার ॥
সরদারে বোলে তবে মনেত ভাবিয়া ।
আহ্মি জেবা কহি সুন সবে মন দিয়া ॥
অল্প বস্ত লাগিয়া বিরোধ না করিব ।
সুঁড়ির ঘরেত নিয়া সবে মদ খাইব ॥
এহিমতে সকলে তথাতে চলি জাএ ।
স্বার্প রাখি অঙ্কুরি সকলে মৈদ্য খাএ ॥

সে অঙ্গোরিরত্ন অন্দকারে প্রকাসন্ত ।
ভ্রম জার থাকে মনে দেখিলে স্মরন্ত ॥
একত্রে হারাইলু দুই সুন নরনাথ ।
হাড় জেই দিয়াআছে অঙ্গোরি তথাত ॥
সুনিয়া রাজার মনে বিস্ময়ে হইল ।
কথাতে পাইল মনি কেবা আনি দিল ॥
কেবা হরি নিল মনি নাইক নির্ন্নএ ।
না পাইলে অপজস সংসারেত রএ ॥
মনে চিন্তিলেক রাজা তাক আস্‌সাসিয়া ।
কহিলেক পাত্র মিত্র প্রজারে ডাকিয়া ॥
অন্তপুরি হনে মুর অঙ্গোরি হরিয়া ।
নিলেক কেমন চোরে পুরি প্রভেসিয়া ॥
জত্ন করি ধরি আন দুষ্ট জথা পাও ।
না পুনি সঙ্কট হৈব সিগ্র চলি জাও ॥
রাজার আদেস পাইয়া কতয়ালগন ।
অনুচর স্তানে স্তানে কৈল নিজ্জজন ॥
নৃর্ত্তকি হইল কেহ ভিক্ষুকভেস ধরি ।
কেহ দ্বিজ ভট্ট হয়ে হস্তে পুথি করি ॥
দু সাধুর স্ত্রি সবে পসার মাথে করি ।
উত্যাম অদম লুকের ফিরে বাড়ি বাড়ি ॥

দৈবগতি সকুবরে জালুয়া সকলে।
বিদিয়ে ঘটাইল তারে পরম জঞ্জালে॥
জালমধ্যে এক মৎস বাঝিল বিসেসে।
বড় মৎস দেখি সব হরিস বিসেসে॥
কাটিলেক মৎস তারা অংস করিবার।
পাইল অঙ্গোরি তাথে নির্ম্মিত সুনার॥
কেহ বোলে হস্তে দিব আমার রমনি।
পিত্যলের মধ্যে সুভে ভাল রাঙ্গাখানি॥
কেহ বোলে হাড় গাথি দিব বামভুজে।
দেখি তুষ্ট হইবেক রমনিসমাঝে॥
কেহ বোলে ভাল সুভা করে স্রোতিমুলে।
রমনি তুসিতে পারি আর এক পাইলে॥
এঁইমতে কন্দল হইল অনিবার।
জালুয়ামণ্ডলে বোলে করিয়া বিচার॥
অল্প বস্তো লাগিয়া বিরোদে কার্জ্য নাই।
সুণ্ডিঘরে বেছি চল সবে মধ্য খাই॥
এই জুক্তি করি সবে নগরেত গেল।
অঙ্গোরি থুহিয়া স্তাপা সবে মধ্য খাইল॥
না নিল অঙ্গোরি আ[র] কৈবর্ত্ত গুয়ার।
সুণ্ডিয়ে নগরে নিল মুর্ল্য দেখাইবার॥
সুনারোবন্নিকে কিছো ধন দিয়া নিল।
আপনা পন্থিত নিয়া জত্ন করি দিল॥
গৃহকর্ম্ম করি সেই বন্নিকের নারি।
ক্ষেনে ক্ষেনে ঘরে গিয়া চাহে সে অঙ্গোরি॥
খেলা হেতু সিসু দেখি কান্দিতে লাগিল।
সিসুহাতে রত্ন দিয়া নিবারন কৈল॥
চপল অজ্ঞান সিসু বোদ্ধি নাই তাত।
খেলা হেতু লড় দিয়া গেল আঙ্গিনাত॥
পাছেত জননি তার ধাএ ত্রস্ত হৈয়া।
বালকের হস্ত হনে আনিল কাড়িয়া॥
হু সাহু ভ্রমিতে আসি দেখে অকস্মাত।
রমনি বালক সঙ্গে রাখে আঙ্গিনাত॥

নানা কথা কহে তবে ধিবর গোঁয়ার।
সুঁড়িএ নিলেক তবে মুলহু দেখাইবার॥
সোনার বনিক্যে পাইয়া কিছু দিয়া লইল।
আপনার গৃহে নিয়া জর্ত্তনে রাখিল॥
গৃহকর্ম্ম করি তবে বনিক্যের নারি।
ক্ষেনে ক্ষেনে ঘরে গিয়া দেখে সেই অঙ্কুরি॥
সেই সে জে অঙ্কুরি তিমির প্রকাসন্ত।
ভ্রম জার থাকে সেই দেখিলে স্মোরন্ত॥
বালকের গলাতে বান্দিয়া দিল তারে।
তাহারে পাইয়া সিসু লাগে খেলাইবারে॥
চপল চঞ্চল সিসু নাহি হিত তাত।
খেলা হেতু লড় দিয়া গেল আঙ্গিনাত॥
পিছে পিছে জননি ধাইল তৈতক্ষণ।
বালকের গলে থুইল করিয়া জতন॥

রাজ অবরন বস্তু জুগ্য নহে তুর।
চোর বোলি বান্ধিলেক বনিক্য নগর॥
বানিয়া নগরে হৈল মহা কুলাহল।
বন্দি করি লৈয়া চলে বর্ন্নিক সকল॥
বিষম সঙ্কট বড় দেখি সেই কাজ।
বর্ন্নিক্যে বান্দিয়া আনে সুণ্ডির সমাজ॥
বান্দিল ভিবর সব সুড়ি উপদেসে।
কতআলে দণ্ডঘাত করিল বিসেসে॥
বন্দি করি লৈয়া জায়ে রাজার গোচর।
বসি আছে নরপতি জেন পুরন্দর॥
হেনকালে দুসাদ্ধ করিল নিবেদন।
আজ্ঞা কর কি সাস্তি করিব চোরগন॥
রাজা বোলে দক্ষিন সাগরে নিয়া মার।
সৈরিন্দ্রিরে আনি দেও অঙ্গোরি তাহার॥
জুড়হস্তে বোলে তবে জালুয়ামণ্ডলে।
দুস গুন নাই জানি ভুগি কর্ম্মফলে॥
ধর্ম্ম সঙ্কোচিতে দেখি তোমার বিচার।
ধর্ম্মেহ না পারে এই কর্ম্ম খণ্ডাইবার॥
হাসিয়া দুস্মান্তে বোলে না মারিব তুকে।
কথাতে অঙ্গোরি পাইলা সৈত্য কহ মুখে।
কহিল সকল কথা জালুয়া প্রধান।
সৌরিন্দ্রিকে অঙ্গোরি দিলেক বিদ্যমান॥
সৌরিন্দ্রিয়ে বোলে পাইল আপনার ধন।
তাহার বিচার আর কুন প্রয়ুজন॥
জদি জানিবারে রাজা চাহ তার গুন।
হস্তেত লহিয়া বোজ জদি লহে মন॥
হাসিয়া অঙ্গোরি দিল নৃপতির হাতে।
সকুন্তলা বৃর্ত্তান্ত রাজা স্মরিল মনেতে॥

১৫৫০ সং পুথি, ১৮—২০ পত্র।

দো সাধু ভ্রমিতে তাহা দেখি অকস্মাত।
কাড়িয়া লইল তবে সে অঙ্কুরি হাত॥
অঙ্কুরি পাইয়া তবে হরসিত হৈল।
চোর বলি সুবর্ন্নবনিক্য বন্দি কৈল॥
বনিক্যের সমাজে বিসম হৈল কাজ।
বনিক্যে বান্দিল গিয়া সুঁড়ির সমাজ॥
বান্দিল ধিবর সব সুঁড়ি উপদেসে।
দণ্ডেকে ভাড়িল কোতআলের নিদেসে॥
বন্দি করি লই গেল রাজার গোচর।
রাজা বসী আছে জেন পুর্ন্ন সসোদর॥
কোতয়ালে বোলে রাজা কিবা হৈল ফল।
চোর সব আনিয়াছি তোমার গোচর॥
রাজাএ বোলে দক্ষিন সমদ্রে নিয়া মার।
সরিন্দ্রিরে রত্ন আনি দেয়ত তৎকাল॥
হস্ত জোড় করি বোলে জতেক মণ্ডল।
কিবা করিআছি পাইতে তার ফল॥
হাসিয়া সরিন্দ্রি বোলে সুনহ রাজন।
তাহার বিচার করি কোন প্রওজন॥
জদি জানিবার চাহ এহার জে মর্ম্ম।
পরসিলে দুর হয়ে সতেক অধর্ম্ম॥
জানিবার চাহ জদি এহার জে গুন।
তবে জানিবা রাজা মহিমা নিপুন॥
হাসিয়া অঙ্কুরি রাজা লইলেক হাতে।
সকুন্তলার বিবরন স্বরিল মনেতে॥

২০২৪ সং পুথি, ৩৮—৪০ পত্র

৩। জাহ্নবীর বানরপতি

সঞ্জয়ে,—

সেবকবৎস্মল হর ত্রিদেসইস্মর ।
তুষ্ট হৈয়া কহে তোমি মাগি লহ বর ॥
বড় তুষ্ট হৈল আমি তুমা ভক্তি দেখি ।
মনের অবিষ্ট বর লহ তোমি মাগি ॥
আর্দ্য অন্ত কহি আমি নাইক সংসএ ।
জেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চ'এ ॥
স্নুনিয়া সিবের আজ্ঞা কপি মহাহরি ।
অতি ভয়ে কহিলেক পুটাঞ্জোলি করি ॥
স্নুনিতে অসর্ক্য কথা কহিতে কুশ্চিত ।
অসঙ্গত কথা কৈতে মনে লাগে ভিত ॥
সঙ্করে বোলেন তোমি ভয় পরিহর ।
সেই চাহ সেই দিব সৈর্ত্য কৈল ধর (—দঢ়)
পাইয়া অভয়ে বর কহে কপিপতি ।
স্নুরেশ্বরি গঙ্গারে অবিষ্ট (—অভীষ্ট) মুর মতি ॥
সঙ্করে বোলেন কপি আজি জাহ ঘরে ।
প্রভাতে আসিয় কালি এই গঙ্গাতিরে ॥
সানন্দিত হৈয়া বানর গেল তথা হতে ।
অপর দিবসে আসি মিলিল প্রভাতে ॥
বৃসেত চড়িয়া তবে পঞ্চবক্ত্র সিব ।
গঙ্গা গৌরা সঙ্গে করি আইল জগজিব ॥
জলেত লামিল সিব দুই ভার্জ্জ্যা লহিয়া ।
পাছেত রহিল কপি সম্ভ্রমিত হৈয়া ॥
পবন স্মরিয়া তবে আজ্ঞা দিল হর ।
জাহ্নভির উরু হতে বস্ত্র কর দুর ॥
হরের আজ্ঞায়ে বায়ু কুণ্ডল আকারে ।
গঙ্গার স্মরির হতে বস্ত্র দুরে করে ॥
পৃষ্টে থাকি তাহারে দেখিল কপিরাজ ।
বিবসন হৈল গঙ্গা বড় পাইল লাজ ॥

পরাগলীতে,—

সেবকবৎসল হর ত্রিলৈক্ষ ইশ্বর ।
তুষ্ট হইয়া বোলে হর মাগী লও বর ॥
বড় তুষ্ট হৈল আহ্মি তোহ্মা ভক্তি লাগি ।
মনের অবিষ্ট বর ঝাটে লও মাগি ॥
সৈত্য পুর্ব্ব বলি আহ্মি নাহিক সংসএ ।
জেই চাহ সেই দিব কহিল নির্চ্চএ ॥
স্নুনিয়া সিবের কথা কপি নাম হরি ।
অতিভয় কহিলেক হস্ত জোড় করি ॥
আপনেহে তুষ্ট হৈয়া দিতে চাহ বর ।
মনের অবিষ্ট কহিতে বাসী ডর ॥
অতিসয় স্নুখ মোর মনের অবিষ্ট ।
স্নুনিতে কুৎসীত বড় লোকেত গরিষ্ট ॥
স্নুরেস্বরি গঙ্গারে অবিষ্ট মোর মতি ।
ভয় পরিহরি বর মাগে কপিপতি ॥
মহাদেবে বোলে কপি চলি জাও ঘরে ।
প্রভাতে আসীয় তুহ্মি এহি গঙ্গাতিরে ॥
আনন্দিত মনে কপি গেল আশ্রমেতে ।
মিলিলেক নদিতিরে রজনি প্রভাতে ॥
বৃসেতে চড়িয়া তবে দেব পঞ্চসির ।
স্নুরেস্বরি গঙ্গা লইয়া গেল নদিতির ॥
জলেত লামিল হর গঙ্গা গৌরা লইয়া ।
পিষ্টভাগে রহে কপি সম্ভ্রম করিয়া ॥
পবন স্মরিয়া তবে আজ্ঞা দিল হর ।
জাহ্নবির অঙ্গ হতে বস্ত্র দুর কর ॥
হরের আর্জ্ঞাএ বাউ কুণ্ডল আকারে ।
গঙ্গার জে অঙ্গ হতে বস্ত্র দুর করে ॥
বিবসন হই গঙ্গা বড় পাইল লর্জ্জা ।
পিষ্টভাগে সঙ্করে দেখিল কপিরাজা ॥

কষ্টমনে গঙ্গারে স্যাপিল পঞ্চসির।
বানরে দেখিল তর গোপ্ত জে স্মরির॥
আমার পাসেত থাকি কুস্থ কার্জ্জ্য নাই।
আজ্ঞা কৈলু জাও তোমি বানরার ঠাই॥
পুনি পুনি আজ্ঞা কৈল দেব ত্রিলুচন।
কর জুড়ে কহে গঙ্গা বিনয়ে বচন॥
এই অপরাদে গোসাই মুরে স্যাপ দিলে।
স্যাপের স্যাপান্ত মুক্ত হৈব কত কালে॥
কৃপা মনে সাপান্ত উপাএ সার্ক্ষ্যাতে দিল হর।
বানর সেবিয়া থাক দ্বাদস বৎস্মর॥
সাপান্ত জে দুর হৈব দ্বাদস বৎস্মরে।
দুর্ক্ষ না ভাবিহ গঙ্গা চলিহ সর্ত্যরে॥
অমুগা তোমার নাম হইব মৈর্ত্যেতে।
পাইবা স্যাপের ফল না দুসিবা তাথে॥
আর এক বাক্য গঙ্গা পালিয় জর্ত্যনে।
অষ্টবসু স্যাপিআছে বসিষ্ট ব্রাহ্মনে॥
বসিষ্টের কামধেনু উর্ব্বসিরে দিল।
অষ্ট গর্ব্বপাত হৈতে বসিষ্টে সাপিল॥
অষ্ট বসু হইলেক হ্রিসির সাপান্ত।
কৃপামনে মহামুনি দিলেন্ত উপান্ত॥
হরস্যাপে গঙ্গা দেবি জাইব ভুবনেত।
সেই গর্ব্বপাত হৈয়া আসিবা সর্গেত॥
এই কহি গঙ্গাদেবি হরে বিসর্জ্জিল।
গঙ্গা লেহ বলিয়া বানরে আজ্ঞা দিল॥
আগে জাএ গঙ্গাদেবি পাছে কপিস্মর।
কত দুরে গিয়া গঙ্গা দিলেক উর্ত্যর॥
কপট করিয়া তাকে করিব বিনাস।
তবে সে জাইতে পারি হরের সম্পাস॥
আদিপর্ব্ব মহাপুতা সুধারসমএ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জএ॥
এত ভাবি গঙ্গা বোলে সুন কপিনাথ।
মনের অবিষ্ট কেনে না কহ আমাত॥

কষ্টমনে গঙ্গারে বলিল পঞ্চসির।
বানরে দেখিল তোহ্মার গুপ্ত সরির॥
আহ্মার পাসেত তোহ্মার রহিতে কায্য নাই।
আজ্ঞা দিল চল তুহ্মি বানরের ঠাই॥
পুনি পুনি বোলে তবে দেব ত্রিলোচন।
কর জোড়ে গঙ্গাএ তবে বলিল বচন॥
এহি অপরাদে মোরে দেয় এহি ফল।
সাঁপের সাঁপান্ত তবে হৈব কতকাল॥
কৃপামনে প্রচ্যাতে সাপান্ত দিল হর
বানর সেবিয়া রহ দ্বাদস বৎসর॥
সাঁপের সাঁপান্ত হইব দ্বাদস বরিসে।
বিনয় তেজিয়া গঙ্গা চলহ হরিসে॥
অমোঘা তোহ্মার নাম হইল মৈর্ত্যলোকে।
পাইলা দোসের ফল না দুসীবা মোকে॥
আর এক বাক্য গঙ্গা পালিবা জর্ত্তনে।
অষ্টবসু সাঁপিয়াছে বসীষ্ট ব্রাহ্মনে॥
বসীষ্টের ধেনু হরি উর্ব্বসিরে দিল।
অষ্ট গর্ব্ভে জর্ম্ম হৈতে বসীষ্টে সাঁপীল॥
তবে অষ্টবসু হৈল রিসীর পাদান্ত।
কৃপামনে মহামুনি দিলেক সাঁপান্ত॥
হরসাঁপে গঙ্গা জাইব মৈর্ত্য ভুবনেত।
তার গর্ব্ভে জর্ম্ম লভি আসিবা স্বর্গেত॥
এহি কথা কহি হর গঙ্গা বিসর্জ্জিল।
গঙ্গা নেয় বলিয়া বানর সম্বোদিল॥
আগে জাএ কপিরাজা পিছে সুরেস্বরি।
কত দুর গিয়া দেবি বুদ্ধি স্থির করি॥
কুপটে (?) ইহারে করিতে পারি নাষ।
তবে সে জাইতে পারি সঙ্করের পাস॥
এত ভাবি গঙ্গাএ বোলে সুন কপীনাথ।
মনের অবিষ্ট কেহ্নে না কহ আহ্মাত॥
কিবা হেতু মোহোরে কথাত জাও লইয়া।
কিবা আছে তোহ্মার মনে না দেয় কহিয়া॥

কুন্ হেতু তোমি মোরে লৈই জাও মাগিয়া ।
আপনা মনের কথা কহত ভাঙ্গিয়া ॥
হাসিয়া বানরে কহে সুন সুরেস্মরি ।
সঙ্কর সেবিয়া পাইছি তোমি হেন নারি ॥
এত সুনি কহে গঙ্গা পরিহরি লাজ ।
হিত উপদেস কহি সুন কপিরাজ ॥
তুমার লুন্তস তনু অঙ্গে না সহিব ।
তুমার সহিতে বোল কেমতে বঞ্চিব ॥
সর্ব্ব লুন্ত ত্যাগ কর আনলে পুরিয়া ।
আমা সঙ্গে ক্রিড়া কর বচন পালিয়া ॥
কামাতুর হৈছি বর সুনহ সুন্দরি ।
তোমি জেই আজ্ঞা কর সেই কর্ম্ম করি ॥
গঙ্গা বোলে আমি বর দিলাম তুমারে ।
আনলের তেজে তোমা কি করিতে পারে ॥
প্রথমে পরিক্ষ্যা বোজ অঙ্গোলি দহিয়া ।
পশ্চাতে সুন্দর হৈবা সর্ব্বাঙ্গ পুরিয়া ॥

তবে অল্প অগ্নি করি পরসিল কায়া ।
অঙ্গোলি নিলুন্ত হৈল গঙ্গা কৈল মায়া ॥
গঙ্গায়ে করিল মায়া পর্ত্যয়ে বানর ।
গঙ্গা বোলে মহাকুণ্ড এবে অগ্নি কর ॥
খনিয়া গহন কুণ্ড আনল জালিল ।
গঙ্গার বচনে কপি তথা ঝাম্প দিল ॥
গঙ্গারে আকাঙ্খি কপি মনে কাম্য করি ।
আনলে পুরিয়া মৈল কপিরাজ হরি ॥
মৃত্তু হৈল কপিরাজ গঙ্গা সতন্তর ।
চলি আইল গঙ্গা দেবি সঙ্কর গোচর ॥
এথাএ দৈবঘটনে তাথে ফলিল অকাজ ।
জেই কুণ্ডে মরিল বানর কপিরাজ ॥
আনল সহিতে তথা উত্যলিল জল ।
মহাকুণ্ড উত্যলিয়া করে টলমল ॥

হাসীয়া বানরে বোলে সুন গঙ্গাদেবি ।
তোহ্মারে পাইল আহ্মি মহাদেব সেবি ॥
তবে গঙ্গাদেবি বোলে পরিহরি লাজ ।
এক নিবেদন মোর সুন কপিরাজ ॥
আহ্মার পবিত্র অঙ্গ তোমার লোমস ।
তোহ্মার আহ্মার অঙ্গ না হএ স্বরূপস ॥
সর্ব্ব অঙ্গ দাহ কর আনল জালিয়া ।
আহ্মা লই ঘর কর হরসীত হৈয়া ॥
হরসীত হই বোলে কপীনাম হরি ।
তোহ্মার অবিষ্ট জেই সেইরূপ করি ॥
কিন্তু এক কথা মোর সুন সাবহিতে ।
আনলের মৈর্দ্ধে অঙ্গ দহিব কেমতে ॥
গঙ্গাএ বোলে আহ্মি বর দিলাম তোহ্মারে ।
আনল পরসে তোহ্মা কি করিতে পারে ॥
প্রথমে পরিক্ষ্যা কর কিছু পরসীয়া ।
প্রচ্ছাতে নিহ্লোম হইবা সমুলে মজ্জিয়া ॥
তবে অল্প অগ্নি করি পরসীল কায়া ।
অঙ্গুলি নিহ্লোম হৈল গঙ্গা করে মায়া ॥
পরিক্ষ্যা পাইয়া পের্ত্য হইল বানর ।
গঙ্গাএ বোলে কুণ্ড করি মহা অগ্নি কর ॥
খনিয়া গহিন কুণ্ড মহা অগ্নি কৈল ।
গঙ্গার বচনে কপী জলে ঝাপ দিল ॥
গঙ্গাএ স্রীজিল মায়া মনস্কাম্য করি ।
আনলে পুড়িয়া মৈল কপীরাজ হরি ॥
মির্ত্তু হইল বানর জাহ্নবি সতন্তর ।
চলি গেল সুরেস্বরি শঙ্কর গোচর ॥
এথা দৈবফলে ঘটীলেক কাজ ।
জেই কুণ্ডে ঝাপ দিয়া মৈল কপীরাজ ॥
আনল সহিতে তথা উথলিল জল ।
মহাকুণ্ড নিবাইল হৈল টলমল ॥

সেই কুণ্ড উত্য'লিয়া ডুবাইল পাড় ।
আনল সহিতে বহে তপ্ত জলধার ॥
সেইত দক্ষিন ভাগে বৈতরনি নাম ।
তাহার দক্ষিনে পুরি জম অনুপাম ॥
তবে মৃত বানর বসিয়া সেই জলে ।
অতি বড় সরির লাগিল দুই কুলে ॥
আটাসি সহস্র মুনি জায়ে তপ হুতে ।
দেখিলেক অগ্নিমহে জল বহে স্রোতে ॥
পরসিতে না পারে অর্ত্তন্ত তপ্ত জল ।
কি হৈল কি হৈল করি ঘুসন্ত সকল ॥
প্রভাতে দেখিল এগা না আছিল পানি ।
অগ্নিময়ে তাথে কেনে ভয়ে তরঙ্গিনি ॥
হেনকালে দেখিলেক মরা এক কপি ।
বান্দিআছে জল সেই দুই কুল চাপি ॥
সেই রার্জ্যে রাজা জে হস্তিনাপুরবাসি ।
জজ্ঞ দান কৈল সেই পুত্র অবিলাসি ॥
সেই বানরে বর করি পার হৈল হেলে ।
হইল আকাসবানি স্থনিল সকলে ॥
উপকারি বানর জে না জাও ছাড়িয়া ।
বেদমন্ত্রে জিয়াইল সকলে বেড়িয়া ॥
পরম সুন্দর হৈল দির্ব্ব কলেবর ।
তারে দেখি মুনি সবে ভাবিল অন্তর ॥
কুরুর বংসেত জন্ম সিবি নৃপবর ।
তাকে দিব এই পুত্র চলহ সত্ত্যর ॥
ই বোলিয়া আনি দিল রাজার গোচর ।
অপুত্রা রাজারে দিয়া দিল পুত্রবর ॥

সান্তোনু ইয়ার নাম তাহার নির্শ্চএ ।
মুনির প্রভাবে রাজা পাইল তনএ ॥
মুনি সবের আসির্ব্বাদে [দে]বতার বরে ।

জল উথলিয়া ডুবাইল চারি পার ।
আনল সহিতে জল বহে তপ্তধার ॥
সেইত দক্ষিন নদি বৈতরনি নাম ।
তাহার দক্ষিনে জম রাজার আশ্রম ॥
তবে মহাবানর ভাসিল মহাজলে ।
অতি বড় সরির বাঝিল দুই কুলে ॥
আটাসী সহস্র মুনি জাএ তপপথে ।
দেখিলেক অগ্নিময় জল বহে তাতে ॥
পরসীতে না পারে অত্যন্ত তপ্ত জল ।
কি হৈল কি হৈল করি ঘোসএ সকল ॥
প্রভাতে দেখিল সবে না আছিল পাহি ।
অগ্নিময় জল বহে কি হেতু না জানি ॥
হেনকালে দেখিলেক মৃতা এক কপি ।
রহিআছে নদির জে দুই কুল চাপী ॥
প্রতিশ্রুবা নামে রাজা হস্তিনাতে বসী ।
পুত্র অভিলাসে রাজা হৈল রাজরিসী ॥
পাত্র স্থানে রায্য দিয়া সেই নরেস্ব'র ।
মুনি স্থানে নৃপতি তপ করে বহুতর ॥
রাজাএ বোলে রিসী সব না ভাবিবা আর ।
এহি বানরেত চড়ি নদি হও পার ॥
রাজার বচন স্থনি সব মুনিবর ।
বানরেত ভর করি তরিল দুস্তর ॥
একে একে পার হৈয়া গেল তপপথে ।
হইল আকাসবানি তাহার অগ্রেতে ॥
উপকারি বানর জে না জাইয় এড়িয়া ।
দেবমন্ত্রে বানরেরে দেয় জিয়াইয়া ॥
পরম সোন্দর বর হৈব নরেস্ব'র ।
অপুত্রা নৃপতি পাইব এহি পুত্রবর ॥
সান্তনু এহার নাম হইল নিচ্চ্যএ ।
তপের প্রভাবে রাজা পাইল তনএ ॥
হেন কালে আকাসেত দেববানি পুনি ।
বানরের পুন শ্রীষ্টি করে মহামুনি ॥

হেন মতে সান্তনু আছয়ে রাজঘরে ॥
এথা গঙ্গা চলি গেল সঙ্করের পাস ।
জানাইল বানরের হইল বিনাস ॥
মহাদেবে বোলে গঙ্গা বানর মারিয়া ।
আমারে ভাড়য় গঙ্গা কপট করিয়া ॥
দেবতার কার্জ্জ্য হেতু পাটাইলু তুকে ।
কপটে বানর মারি বাড় (= ভাঁড়হ) কেন মুকে ॥
চল চল গঙ্গা তোমি শান্তনুর ঘরে

রাজপুত্র হইআছে বদিছ জাহারে ॥
লর্জ্জা পাইয়া জার্হ্নভি জে চলে আরবার ।
হস্তিনাপুরিতে গেল নৃপতির দ্বার ॥

এথা রাজা পুত্র পাইয়া আনন্দ অপার ।
নৃত্ত গিত কুতুহল না[না] ন প্রকার ॥
অস্র সাস্র ধনুর্বিদ্ধা সকল সিখিল ।
নানা দেসে জুর্দ্ধ করি সাসিয়া আনিল ॥
দেখিয়া নৃপতি তবে হরসিত হৈয়া ।
জুবরাজ কৈল তানে পাত্রমিত্র লৈয়া ॥
হেনকালে গঙ্গাদেবি দিল দরসন ।
সভাসদ পাত্রমিত্র আছে সর্ব্বজন ॥
একবস্ত্রে দাণ্ডাইল জান্ন বি রূপবতি ।
সভাতে দাড়াইল কৈর্ন্ন্যা জেহেন পার্ব্বতি ॥
কৈর্ন্ন্যা দেখি রাজা তবে জিজ্ঞাসে কাহিনি ।
দির্ব্ব কৈর্ন্না রূপবতি কাহার নন্দিনি ॥
গন্ধর্ব্বের কৈর্ন্না কিবা হয়ত অপসরি ।
কিবা দেবকৈর্ন্না হয় নও বিদ্যাধরি ॥
পরিচয়ে দেয় মুরে ভ্রম কি কারন ।
কেবা তোমা মাতাপিতা এথা কি কারন ॥
কুন্ জাতি হয় তোমি দেয় পরিচএ ।
দেবকৈর্ন্না হয় কিবা মনে [illegible] লএ ॥

ধরিল সান্তনু নাম রাজার তনয় ।
পুত্র লইয়া গেল রাজা আপন ঘরএ ॥
মুনিলোক আসীর্ব্বাদ দেবলোকবরে ।
হেন মতে সান্তনু হইল রাজঘরে ॥
ওথা গঙ্গা ছলি গেল সঙ্করের পাস ।
কহিলেক জেইমতে বানর হৈল নাস ॥
মহাদেবে বোলে তুহ্মি বানর মারিয়া
আহ্মারে ভাড়হ আসি কপট করিয়া ॥
দেবতার কায্য হেতু পাটাইল তোক ।
কপটে বানর মারি ভাড় আসী মোক ॥
হইছে সান্তনু নাম সেই কপিবর ।
প্রতিশ্রুবা রাজপুত্র হস্তিনা নগর ॥
চল চল গঙ্গা তুহ্মি সান্তনুর ঘরে ।
রাজপুত্র হইছে বঞ্চিলা বানরারে ॥
লজ্জা পাই জাহ্নবি চলিল আরবার ।
হস্তিনা পুরিতে গেল রাজার দ্বার ॥
সভা করি বসিছে সান্তনু নরপতি ।
এক পাস হই রহে জাহ্নবি যুবতি ॥
ত্রিলৈক্ষমুহিনি কৈন্যা আছে নিসবদে ।
কথা হতে কথাএ জাইবা বোলে সভাসদে
উত্তর না দিল কৈন্যা সভার সাক্ষ্যাতে ।
পুর্ব্বকথা কহি সুন সকল পণ্ডিতে ॥
সান্তনু রাজার পুত্র মির্তুএ অপ্‌ছর ।
তান হেতু তপ করি পুজিল সঙ্কর ॥
মহাদেবে বর দিল সেই মোর পতি ।
আজ্ঞা দেহ মোহোর হইব কোন গতি ॥
অমোঘা মোহোর নাম সান্তনুর নারি ।
দেবকৈন্যা তোহ্মারে বরিল কাম্য করি ॥
সুনিয়া দেবের কথা সভা আনন্দিত ।
পরম হরিস হৈল নৃপতির চির্ত্ত ॥
আদেসীল নৃপতি আনিতে যুবরাজ ।
দেবকৈন্যা বিহা কর পরিহরি লাজ ॥

রাজা স্তানে কহে তবে দেবি সুরেস্ব'রি।
সর্ব্বকথা কহে কৈন্ন্যা মনে কাম্য করি ॥
বহু দিন কৈল আমি সিব আরাধন।
সান্তোন্নু আমার পতি তোমার নন্দন।'
অমুগা আমার নাম জর্ম্ম দেব জুতে।
জাতি কুল ধর্ম্ম আমি কহিল তুমাতে ॥

১৫৫০ সং পুথি, ৪০—৪১ পত্র।

ত্রিলৈক্ষমুহিনি কৈন্যা রূপেত অমুল্ল।
বিসেস বাপের আজ্ঞা দেব সমতুল্ হ ॥
বিবাহ হইতে তার হইল সন্মতি।
লগ্ন করি বিবাহ করিল সিগ্রগতি ॥

২০২৪ সংখ্যক পুথি, ৫৫—৫৭ পত্র।

৪। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষয়ক আখ্যানটী দুই গ্রন্থে দ্বিবিধ। উভয় গ্রন্থ হইতে আখ্যানটী উদ্ধৃত হইল।

পরাগলীতে :—

বির্দ্ধ হৈল সান্তনু হইল পরলোক। সৈর্ত্যবতি সনে রাজা পাইলা বড় সোক
করিলেক সতকার পিণ্ড প্রওজন। রাজা হৈল চিত্রাঙ্গদ সান্তনুনন্দন ॥
তির্থ করিবারে গেল ভিস্ম' পিতৃকায্য। রাজা হৈল চিত্রাঙ্গদ পুজে সর্ব্বরায্য ॥
ভিস্মে'র বিক্রমে রাজা হৈল সত্রুহিন। চিত্রাঙ্গদ সুখে রায্য করে কত দিন ॥
দৈবজোগে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের পতি। নাম স্থনি তখনে আইলা সিঘ্রগতি ॥
যুর্দ্ধ আছুতিল হিরণ্য নদিতিরে। চতুরঙ্গ বলে রাজা হৈল বাহিরে ॥
গন্দর্ব্বের সনে রন আছিল বিস্তর। পড়িল অনেক সৈন্য গেল জমঘর ॥
সংপুর্ন্ন বিংসতি দিন আছিল সংগ্রাম। গন্দর্ব্বে মারিল রাজা চিত্রাঙ্গদ নাম ॥
হেন কালে তির্থ করি ভিস্ম' আইল ঘরে। দেখিয়া গন্দর্ব্বপতি পলাইলা ডরে ॥

* * * * * *

তবে ভিস্মে' রাজা কৈল বিচিত্রবির্জ্জক। আপনেহ সর্ব্বকর্ত্তা পৃথিবিপালক ॥

* * * * * *

জয়মুনি বোলেন্ত বিচিত্রবির্জ্জ রাজা। সর্ব্বক্ষন পালিলেক ভিস্ম' মহাতেজা ॥
অভিনব জোবনেত জৈক্ষ্যা রোগ হৈল। না হইতে অপৈর্ত্য বিচিত্রবির্জ্জ মৈল ॥

সঞ্জয়ে ঃ—

বৃর্দ্ধ হৈয়া নরপতি পাইল পরলুক। ভিস্ব সনে সৈত্যবতি পাইল বড় সুক॥
করিল খেত্রিয় কর্ম্ম পিণ্ডপ্রয়ুজন। রাজা হৈল চিত্রাঙ্গদ সান্তনুনন্দন॥

অভিনব জৌবনেত জর্ক্ষ্যা রোগ হৈল। সন্ততি না হৈতে সেই পরলুক হৈল॥
তবে ভিস্মে রাজা কৈল বিচিত্রবির্জ্জক। আপনেহি ভিস্ম বির সমার পালক॥

ভিস্মের প্রসাদে বৈরি নাইক ভুতলে। বিচিত্রবির্জ্জকে কহে ভিস্ম মহাবলে॥
তিন দিগে ভাই তোমি করিয় গমন। কদাচিত্য না করিবা দক্ষিনে ভ্রমন॥
বেন্নুপুরি নাম সেই জানাইল তথা। তথা গেলে মন দুক্ষ পাইবা সর্ব্বথা॥
ই বোলিয়া ভিস্ম বির চলিল তির্থেতে। সংসারেত জত তির্থ ভ্রমে ক্রমাগতে॥
পিত্রিসর্গ হেতু গয়া গেলেন তুরিতে। একে একে পিণ্ডদান দিল বিদিমতে॥
এথাতে বিচিত্রবির্জ্জ তিন পত্নি সাতে। জক্ষ গন্ধর্ব্ব কর লহে হস্তিনাতে॥
ত্রিভুবন বস করি দিছে ভিস্মবিরে। সর্ব্ব রার্জ্জ্যে কর আনি ভেটয়ে তাহারে॥
আর দিন গেল রাজা দক্ষিন দিগএ। বেন্নুপুরি প্রবেসিল রাজা মহাসএ॥
দেখিল বিচিত্র পুরি ভুবনমুহন। রাজা বোলে এথাতে ভিস্মের নারিগন॥
দেখিব কেমত নারি পুরে প্রবেসিয়া। তবে কেনে মহাবিরে নাই করে বিহা॥
ই বোলিয়া চলে বির পুরে প্রবেসিতে। নানা ধাতু সুরম্য দেখয়ে পথে পথে॥
স্থানে স্থানে নানা পুষ্প রম্য সরুবর। চারি পাসে মলয়া জে মধ্যেত কমল॥
কুকিলে করহে নাদ ভ্রমরের রুল। নানা পক্ষি ক্রিড়া করে বোলন্ত সুবোল॥
সেই পুরে প্রবেসিয়া দেখয়ে সুঠান। তার মধ্যে এক গৃহ বিচিত্র নির্ম্মান॥
তাথে এক পালঙ্গ জে সুর্দ্ধ সুভর্ন্নেরে। পঞ্চ সত পার্সে দির্ঘ দুই জে হাজারে॥
তাহার মধ্যেত জান সুবর্ন্ন উপাধান। দুই সত হাত দেখি তাহার প্রমান॥
বিচিত্র কনকঘন্টা সর্জ্জ্যার উপরে। মধুমাসে ভিস্ম বির থাকে সেই ঘরে॥
সেই খাটে ভিস্ম বির করহে সয়ন। ইন্দ্র ঐরাবতে আসি করহে তাড়ন॥
দস দণ্ড ভিস্মেরে তাড়য়ে করিবরে। তার পরে নিদ্রা জায়ে ভিস্ম মহাবিরে॥
ভিস্মের প্রতিজ্ঞা আছে গজের সহিতে ঘন্টা নাড়া দিলে আইসে জায়ে সেইমতে॥
সেই রত্নখাটে রাজা করহে সয়ন। কুতুহলে সেই ঘন্টা নাড়য়ে তখন॥
নৃপতির নিদ্রা আইল বসন্তের বাএ। ভিস্ম জ্ঞানে সেই হস্তি আসিল তথাএ॥
ভিস্ম জ্ঞানে কৈল তারে বহুল তাড়ন। চোর্ন্নবত হৈয়া রাজা তেজিল জিবন॥

শ্রীযুক্ত রমানন্দ ঠাকুর-কৃত "সংক্ষিপ্ত মহাভারতসার" নামক মিথিলাভাষায় লিখিত গ্রন্থে আখ্যায়িকাটী অন্তবিধ।

"কালক্রমে রাজা চিত্রাঙ্গদ মহা দুরাচারী ভৈ গেলাহ ঔর যোজনগন্ধা রাজ্যক বিনাশক সম্ভাবনা দেখি স্বপুত্র ব্যাসজীক স্মরণ কৈলন্হি ঔর ব্যাসজী তৎক্ষণে আবি উপস্থিত ভেলাহ। যোজনগন্ধা হুনকা রাজা চিত্রাঙ্গদকেঁ উপদেশ করৈ কহলথিন্হ্। ব্যাসজী উত্তর দেহথীন্হ জে হে মায়! ও রাজ্যক মদসঁ অন্ধ ভৈ গেল ছথি ঔর হমর কথা নহি সুনতাহ, তেঁ হম অহাঁকেঁ উপদেশ সুনবৈছী ঔর অহাঁ হুনকা কহিঔন্হি। জখন ও একরা স্বীকার কৈলথিন্হ তখন সঁ নিত্য সন্ধ্যা কালসঁ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাসজী অপনা মায়কেঁ রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ সুনাবৈ লগলাহ। নিত্যকের ঈ ব্যবস্থা দেখি রাজাক মনমেঁ ব্যাসজী ঔর মাতাক প্রতি ব্যভিচারক ভ্রম ঔর অসন্তোষ ভেলৈন্হিঁ ঔর মনমেঁ নিশ্চয় কৈলন্হি জে এহি দুরাচারী ব্রহ্মচারীক প্রাণান্ত করী। পরন্তু মনমেঁ বিচার কৈলন্হি জে বেত্রেক পূর্ণ রূপেঁ নিশ্চয় কৈনে ব্রহ্মহত্যা কখনো কর্ত্তব্য নহিথিক তেঁ জাচ করৈক হেতু একান্তমেঁ স্থিত ভৈ এক রাত্রি সুনলন্হি জে ব্যাস হুনকা মায় কহিক ঔর ও হুনকা পুত্র কহিক সম্বোধন করৈছথিন্হ্। তখন যথার্থ ধর্ম্মশালী রাজা চিত্রাঙ্গদকেঁ মিথ্যা আরোপ সঁ অত্যন্ত মনস্তাপ ভেলৈন্হি। ঔর প্রাতঃকালমেঁ ব্যাসজীকেঁ বজাক হাথ জোড়ি কৈ প্রায়শ্চিত্ত পুছলথিন্হ জে হে ঋষে! মিথ্যা আরোপ করবাক কী প্রায়শ্চিত্ত থিকৈক? ব্যাসজী কহলথীনহ জে হে রাজন্! পুরান পীপর ক গাছক ধোধরি মেঁ মিথ্যা আরোপী মনুষ্য প্রবিষ্ট ভৈ আগি লগা কৈ জীবিত হি প্রাণান্ত করৈ. য়েহটা প্রায়শ্চিত্ত ছৈক। ঈ সুনি ও ধার্ম্মিক রাজা চিত্রাঙ্গদ সৈহ কৈলন্হি। ঔর তৎপশ্চাত ভীষ্মজী রাজ্যক অধিকার বিচিত্রবীর্য্যকেঁ দেলথিন্হ পরন্তু দৈবাৎ ও শিকারমেঁ সিংহ দ্বারা মারল গেলাহ।" ৯—১০ পৃষ্ঠা।

৫। অর্জ্জুন ও হনুমান

(সভাপর্ব্ব)

<table>
<tr><td>সঞ্জয়ে ঃ—</td><td>পরাগলীতে ঃ—</td></tr>
<tr><td>কতদিন পরে গেল কদলির বনে।
জে বনে নিবাস করে বির হনুমানে॥
সৈন্য কুলহল সুনি করে অনুমান।
মহাকায় সরির হইল বলবান॥</td><td>জাইতে জাইতে গেল কদলিকাবনে।
হনুমান সনে হইল তথা দরস[ে]ন॥
সৈন্তের কল্লোল সনি বির হনুমান।
মহাকায় হইলেক পর্ব্বত সমান॥</td></tr>
</table>

সরির করিল্ল তবে সমুদ্র সমান।
সব্দ উপ্তেসিয়া রহে মনে করি জ্ঞান ॥
লাঙ্গোড়ে পর্ব্বত নাড়ে বির হনুমান।
তাহা সুনি চমকিত হইল অর্জ্জোন ॥
পথ বিরূদিয়া রহে পবননন্দন।
তাহা দেখি চমকিত যত সর্ন্নগণ ॥
এতেক ভাবিয়া বিরে মনে সার কৈল।
সৈর্ন্ন সব সম্বুদিয়া তখনে কহিল ॥
সুন সুন রাজা সব আমার বচন।
কারন না বোজি হেন কিহেতু কারণ ॥
দেবতা রার্ক্ষস কিবা গন্ধর্ব্ব কিন্নর হএ।
ইয়ার নির্ন্নয়ে জানি আসিবারে হএ ॥
সর্ন্ন সমে থাক সমি সাবহিত হৈয়া।
জাবত আসিয়ে আমি তার বার্ত্তা লৈয়া ॥
মহাবলি ধনঞ্জয়ে নিসঙ্কা রিদএ।
সব্দ উপ্তেসিয়া জাহে তাহার আলএ ॥
হস্তেত বিসাল ধনু জেন পুরান্দর।
প্রভাতের সুর্জ্জ জেন করহে উর্জ্জল ॥
দুরে থাকি চায়ে তারে পবনকুমর।
নিসঙ্কা হইয়া বির আইসে একাস্মর ॥
তারে দেখি হনুমানে করে আলুকন।
দেখিয়ে পার্থের রূপ অতি বিলর্ক্ষণ ॥
প্রসর্ন্ন সরির তার কান্তি কলেবর।
হস্তেত ধনুক করি আইসে ধনুর্দ্ধর ॥
গগনে পরসে ধ্বজ মেরূস্বঙ্গ রেখা।
সঘন বিজুলি জেন গগনেত দেখা ॥
হস্তেত কার্ম্মুক তার দির্ঘ কলেবর।
কর্ন্নেত কুণ্ডল তার সুর্জ সমুস্বর ॥
অর্ক্ষয় বানের টোন অগ্নন কিরন।
দারূকে চালায়ে রথ পবনগমন ॥
ইন্দ্রপুত্র রথে আছে জেন ইন্দ্রতুর্ন্ন।
নরনারায়ন সে জে চাইতে অমুর্ন্ন ॥

লেঙ্গুড় আস্ফালি উঠে বির হনুমান।
লেঙ্গুড়ের বিক্রমে ত্রিভুবন কম্পমান ॥
সব্দ সুনি স্তব্ধ হইল বির ধনঞ্জয়।
বিপরিত সব্দ কেবা করে অবন্যয়ে ॥
চিন্তিত হইল বির ভাবে মনে মন।
বহু বহু বির সবে কহিল বচন ॥
তুহ্মি সব থাক এহি স্থানে সান্ত হইয়া।
জাবত আসিয়া আহ্মি অরন্য বেড়াইয়া ॥
মহাসব্দে ধনঞ্জয় বিসর্ন্ন হৃদয়ে।
একস্বর চলে বির সমরে নির্ভয়ে ॥
জেই দিগে সুনিআছে সব্দ অনুসার।
সেই দিগে চলে বির বিক্রমে অপার ॥
অন্তরে থাকীয়া দেখিল হনুমান।
ভএ না চিন্তিয়া বির করিল পয়ান ॥
হাতে ধনুবান ধরি জাএ একস্বর।
দুরে থাকী দেখীলেক পবন কোঁয়র ॥
অন্তরে থাকিয়া বির করে আলোকন।
দেখেন্ত পার্থের সঙ্গে বিযুলি লৈক্ষন ॥
তেজস্মি সরির দেখে মহাকলেবর।
নিদাগেত দহে জেন দেব দিবাকর ॥
গগনে পরসে ধ্বজ গিরিশৃঙ্গ দেখী।
সঘন পতকা উড়ে বিযুলির রেখী ॥
হাতেত গাণ্ডিব সোভে দির্ঘ সরাসন।
জেন হেন চন্দ্রধনু সোভএ গগন ॥
অক্ষয় সানিতে বান অগ্নন কিরণ।
দারূকে চালাএ রথ পবনগমন।
ইন্দ্রসুত ধনঞ্জয় ইন্দ্র অস্ত্র গম্য।
নরনারায়ন বির বোলে ধৈন্য ধৈন্য ॥

বোদ্ধিবিসারদ বির পবননন্দন।
মনে মনে ভাবে তবে কুন্থ মহাজন॥
কিবা ইন্দ্র কিবা সুর্জ্জ্য কিবা নিসাকর।
নররূপে জর্ম্ম হরি মুনিস্থের ঘর॥
দড়ান না জাএ মন আইসে কুন্ জন।
মনে মনে ভাবে তবে না বোঝি কারন॥
কত ভবিস্মত দেখি নয়নগোচর।
ত্রেতা জোগে কৃষ্ণ জর্ম্ম হইল দ্বাপর॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব জে ইন্দ্র অবতার।
কৃষ্ণ সমে সংসারেত খণ্ডাইতে ভার॥
খাণ্ডবপ্রহস্তে রার্জ্য করে পঞ্চ জন।
রাজস্মহি করিবারে করিছে গমন॥
পিত্রিকুল উর্দ্ধারিতে মনে করি সার।
ধনঞ্জয়ে বির আইসে ধন আনিবার॥
জদুসর্ন্য সঙ্গে তার কৃষ্ণ অনুমতি।
পাটাইয়া দিছে হেন লহে মুর মতি॥
নারায়ন মধ্যে হয়ে অর্জ্যান দুর্ব্বার।
কৃষ্ণের দ্বিতিয় তনু বিদিত সংসার॥
বোজিবাম কেমত তাহার বেবহার।
এত বোলি রহে তথা পবনকুমার॥
অতি ক্ষিন তনু হৈয়া পবনতনয়।
হেনকালে তথা গেল বির ধনঞ্জয়॥
দেখিলেক একজন কপির আকৃতি।
রথ এড়ি তার কাছে জায়ে সিগ্রগতি॥
জুড়হস্ত করি বোলে পাণ্ডোর নন্দন।
নানারূপ ধর তোমি কুন্ মহাজন॥
কুন্ দেব হয় তোমি কাহার নন্দন।
পরিচয়ে দাও মুরে সুন মহাজন॥
হনুমানে কহে আমি জাতে পশু কপি।
বনমধ্যে নির্ভা করি বড় হৈয়া তাপি॥
তোমি কুন্ মহাসএ নাইক নির্ম্মএ।
না কর বিস্ময়ে তোমি দেও পরিচএ॥

বুদ্ধির সাগর বির পবননন্দন।
মনে মনে ভাবে এহি কোন মহাজন।
কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্র কিবা দিবাকর
কিন্তু ভবিস্র্ব ত এক দেখিএ গোচর॥
শ্রুতি গেল দ্বাপর কৃষ্ণ রামবর।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব দেখীল সর্ত্যর॥

কৃষ্ণ সঙ্গে খণ্ডাইব পৃথিবির ভার।
পঞ্চ ভাই বসি আছে খাণ্ডব অধিকার॥
রাজস্থই জৈজ্ঞ করিবারে হইল মন।
ধনের কারনে চলিছে চারি জন॥
পিতৃকুল উদ্ধারিতে যজ্ঞের সম্ভার।
ধনঞ্জয় চলিয়াছে ধন হরিবার॥
যদুসৈন্য নারায়নি কৃষ্ণ অনুমতি।
রাখিবারে দিয়াআছে অর্জ্জুন সংহতি॥
নরনারায়ন বির অর্জ্জুন প্রধান॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় তনু করি অনুমান॥
জানিব তাহার আজি কোন ব্যবহার।
এত বোলি হনুমান হইয়া আগুসার॥
অতি খুদ্র মুর্ত্তি ধরি বানর আকৃতি।

হেনকালে বলিল অর্জ্জুন মহামতি॥
দেখএ জে কপিরূপ বিড়াল সমান।
রথ হতে নামিলেক বিদিত তাহান॥
হস্ত জোড় করি বোলে তুমি মহাজন।
নানারূপ ধর তুহ্মি হও কোন জন॥
কোন দেব হও তুহ্মি কাহার নন্দন।
পরিচয় দেয় মোরে মাঞা ছাড়ি মন॥
হনুমানে বোলে তুহ্মি কোন জন হও।
না কর সম্ভ্রম মনে স্থির হইয়া কহ॥

হাসিয়া অর্জ্জ্যোনে কহে সুন মহাসএ।
কৃষ্ণের সেবক আমি নাম ধনঞ্জয় ॥
পাণ্ডববংসেত জর্ম্ম অর্জ্জ্যোন মুর নাম।
জুদিষ্টিরঅনুজ আমি করি জজ্ঞকাম ॥
ধনরত্ন বহুমুর্ল্ল বিচিত্র ভুসন।
তে কারনে করিআছি লঙ্কাতে গমন ॥
অর্জ্জ্যোনবচন সুনি কপি মনে হাস।
কেনেবা এমত কর্ম্মে তোমার অভিলাস ॥
কত কত কোটি কোটি প্রধান কপিবরে।
নানামতে বান্দিআছে গাছ জে পার্থরে ॥
তবে নরনারায়নে কটক করি পার।
রাবন মারিয়া সিতা করিলা উত্থার ॥
এহেন সাগর তোমি স্মরে বন্দ করি।
ধন আনিবারে বোল গিয়া লঙ্কাপুরি ॥
আজি আমি বোঝিবাম জত সক্তি তুর।
কুনমতে জাও তোমি তরিয়া সাগর ॥
এত বোলি কপিসুত মনেত ভাবিয়া।
অর্জ্জোনকে কহে সে জে বহুল হাসিয়া ॥
কেবল বালক তোমি [illegible]ানিল অথন।
কুন্ স্তানে কার সনে [illegible]রিআছ রন ॥
কু কালে কু কর্ম্ম [illegible] করিছ তোমি।
তুমার চরিত্র জানি কহিআছি আমি ॥
কার্জ্য নাই প্রতিষ্টা করিতে করে ছার।
মুড় সবে জানে কাল ফুটিলে বিসাল ॥
গোনিন জে সব হয়ে গোন করে গুপ।
তাহার প্রতিষ্ঠা জান ঘুসে সর্ব্বলুক ॥
কার্জ্য নাই সাদি আগে করিআছ পন।
এতেকে তুমারে বোলি বিমহিত জন ॥
সিসুবোদ্ধি বোলি তুরে না কহিল আর।
কার্জ্য সিদ্ধি করি কহ তবে জানি সার ॥
কর্ম্ম নহি করি কর আপনা বাখান।
সে পুনি নারকে বসে পুরানপ্রমান ॥

হাসিয়া কহন্ত পার্থ সুন মহাসএ।
কৃষ্ণের প্রসাদে ত্রিভুবনে নাই ভএ ॥
পাণ্ডুবংসে জর্ম্ম মোর অর্জ্জুন মহাসএ।
যুধিষ্ঠিরঅনুজ মুই ইন্দ্রের তনয়ে ॥
রত্নধন বহুমুল্য আনিতে কারন।
এহি হেতু লঙ্কা জাইতে করিছি গমন ॥
অর্জ্জুনবচনে কপি ইসিত হইল হাস।
অসম্ভব কার্জ্জেত তোহ্মার অভিলাস ॥
খর্ব্ব নিখর্ব্ব কোটি প্রধান বানর।
একমাসে পার হইল রাম নৃপবর ॥
তবে প্রভু লঙ্কা গেল সাগর হইল পার।
রাবন সংহার কৈল সিতার উদ্ধার ॥
হেন সিন্ধু বান্ধি বোল লঙ্কা জাইবার।
অহঙ্কার করি বোল ধন আনিবার ॥
আজি বুঝিবার চাহি সক্তি বোল তোর
কোন মতে জাও তুহ্মি লঙ্কার ভিতর ॥

পাণ্ডুবংসে জর্ম্ম তোমার নাই অনাচার।
ভাল না করিছ তোমি করি অঙ্গিকার ॥
তাহা স্নুনি ধনঞ্জয়ে ভাবি কৈল সার।
কপিরূপে ধর্ম্ম আসি হৈল অবতার ॥
বোদ্ধি তার বিচক্ষর্ন নাইক অধর্ম্ম।
বোঝিতে না পারি আমি এই সব মর্ম্ম ॥
এত স্নুনি অর্জ্যোনে জে জুড় করি হাত।
হনুমান স্তানে কহে বিনয়ে পশ্চাত ॥
অর্জ্যোনে কহেন তোমি দেও পরিচয়ে।
স্নুনিয়া আমার মনের খণ্ডোক বিস্ময়ে ॥
বহুত কহিল পার্থে বিনতি করিয়া।
হনুমানে পরিচয়ে দিলেক হাসিয়া ॥
অঞ্জনা আমার মাতা কেসরি জনক।
পবন আমার পিতা ভুবনপালক ॥
হনুমান নাম মুর বিক্ষ্যাত ভুবন।
রামকার্জ্য হেতু মুর জন্ম কপিগন ॥
পিতাসৈত্য হেতু রাম চাল আইল বন।
স্নুন্ত গৃহ পাইয়া সিতা হরিল রাবন ॥
তবে রামসনে হৈল স্নুগৃব দ্রসন।
বালি মারি রাজ্য তবে দিল নারায়ন ॥
লক্ষর্নে বদিল বালি রাম অনুমতি।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে স্নুজ্যের সন্তুতি ॥
রাবন মারিয়া সিতা করিতে উদ্ধার।
কুন্নু কপি না পারে সাগর তরিবার ॥
তবে জুক্তি করি কহে মন্ত্রি জাম্বুবান।
অন্যের নাইক কার্জ্য আন হনুমান ॥
তবে রঘুনাথে মুরে পৃয়বার্ক্য বোলি।
সাগর তরিতে মুরে দিল বাহু তুলি ॥
রামপদে আস করি সাগর তরিয়া।
অসুকবনেত সিতা নির্ন্নয়ে জানিয়া ॥
তবে জানকির সনে করি দরসন।
তার পরে ভাঙ্গিল রাজার মধুবন ॥

পাণ্ডুবংসে জর্ম্ম তোর রাজার কুমার।
অহঙ্কার করি বোল ধন আনিবার ॥

অর্জ্জুনে বোলেন্ত আগে দেয় পরিচয়।
তবে সে আহ্মার মনে হওন্ত প্রর্ত্তয় ॥
বহুল করিল স্তুতি পার্থ মহাসয়ে।
তুষ্ট হইয়া হনুমন্ত দিল পরিচ[ে]য় ॥
অঞ্জনা আহ্মার মাও কেসরি জনক।
পবন আহ্মার পিতা ভুবনপালক ॥
হনুমন্ত মোর নাম খ্যাতি ত্রিভুবন।
রামকার্জ্য করিলাম মারিআ রাবন ॥

দুতে গিয়া জানাইল জথা লঙ্কেশ্বর।
স্থনিয়া পাটায়ে তার পঞ্চ পুত্রবর ॥
রক্তমুখ রক্তজিব্যা রক্ত জে লুচন।
অজয় অক্ষয় সমে এই পঞ্চ জন ॥
তবে তারা বেড়িল রাজার মধুবন।
তারাসব সনে মর হৈল মহারন ॥
একে একে রন করি সভ নাস পাইল।
তার পরে ইন্দ্রজিত তথাতে আসিল ॥
নাগপাসে বন্দি করি নিল লঙ্কাপুরি।
রাজার সভাতে মুরে নিল বন্দি করি ॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল স্থন কপিবর।
লঙ্কাতে আসিলা তোমি কার অনুচর ॥
তবে আমি তার তরে দিল পৈত্যর।
রামদুত হনুমান বায়ুর কুমর ॥
জানিতে সিতার বার্ত্তা দিগদিগান্তর।
সপ্ত দ্বিপ ভরি গিছে শ্রীরামের চর ॥
আমারে পাটাইছে রামে কত ধরাইয়া।*
সিতারে নিবারে কৈল তুর কান্দে দিয়া ॥
এ স্থনি নিসাচর অগ্নিহেন জলে।
রক্তবর্ন্ন কৃড়ি আক্ষি পাক দিয়া বোলে ॥
মার মার বলি কহে রাজা দসানন।
ভিভিসনে বোলে রাজা না হয়ে সুভন ॥
দুত মাইলে অধর্ম্ম লুকেত অপজস।
অসামর্থ বোলি তার ঘুসিবেক জস ॥
তবে আমি তার পাসে কহিল নিগুড়।
মুর মৃত্যু অস্ত্রে নাই স্থন কহি মুড় ॥
জদি মুর লাঙ্গোড়েত বসন বান্দিয়া।
ঘৃত তৈল্ল বহুবিধ তাথে ডালি দিয়া ॥
তবে অগ্নি দিলে হয়ে আমার মরন।
নহে মুরে বধে হেন নাই কুন্থ জন ॥

[এই অংশটী পরাগলীতে নাই।]

[সঞ্জয়ভারতের সভাপর্ব্ব, ঢা, বি, ৯৬৭ সংখ্যক পুথিতেও নাই]

তবে রাজা দসাননে মুরে জিজ্ঞাসিল।
নেঞ্জে অগ্নি তুর মৃত্তু কি হেতু হইল॥
তবে আমি তার পাসে কহিল সত্ত্যর।
সাগর তরিতে মুরে নাগে দিল বর॥
আমারে জিনিয়া জাও জথা লঙ্কেস্বর।
নেঞ্জে অগ্নি দিলে তোর নাসৌক কলেবর॥
তবে রাজা দুত আনি কহিল সত্ত্যর।
বস্ত্র আনি নেঞ্জে তার বান্দয় সমুল॥
তবে বস্ত্র দিয়া নেঞ্জ বান্দিল সকল।
নেঞ্জে অগ্নি দিয়া রাজা হাসে খল খল॥
তবে আমি মায়া করি কান্দিলু বিস্তর।
আর না দেখিল আমি রাম গদাধর॥
আর না দেখিল আমি জত বানর্গন।
তাহা সুনি দসাননে হাসে ঘন ঘন॥
দেখিলাম বর্ন্নি* জদি বড় হৈল তাপ।
সভাতে দহিল আগে রাজার দাড়িচাপ॥
তার পরে অগ্নি দিল ইন্দ্রজিতের পুরি।
সবেমাত্র রৈক্ষ্যা কৈল কুম্ভকর্ণের বাড়ি॥
আর সব নাস করি জত ইতি স্তান।
তবে চলি গেল আমি সিতা বিদ্যমান॥
অগ্নিতাপে প্রানি দহে সুন দেবি আই।
সিতা কহে সুন কপি কহি তুর ঠাই॥
মুখের আমৃত দিয়া তাকে সাম্য কর।
এত সুনি নেঞ্জ দিল বদন ভিতর॥
প্রান রৈক্ষ্যা মুখ পুরা সুন ধনঞ্জয়ে।
আসিয়া কহিল বার্ত্তা রামের পাসয়ে॥
সাগর বান্দিয়া রাম গেল লঙ্কাপুরি।
রাবনের বংস মারি সিতাকে উর্দ্ধারি॥
তবে বির ধনঞ্জয়ে তাকে প্রনমিল।
সমন্দ বিসয়ে জেবা তাহাকে কহিল॥
এতেক সুনিয়া পার্থ করিল প্রনাম।
আসির্ব্বাদ কৈল পুরৈক মনসকাম॥

* বহ্নি।

পবন ঔরসে জন্ম ভিম জেষ্ট ভাই ।
তাহান অদিক তোমি আমার গুসাঞি ॥
অর্জ্যোনে কহেন আমি এই বর চাই ।
তোমা নিজরোপ দেখি সরির জুড়াই ॥
হাসিয়া করিল আজ্ঞা বির হনুমান ।
সকল বাহিনি তবে আইল বিদ্যমান ॥
জথাযুক্ত সম্বাসা করিল সর্ব্বগণ ।
পুনরপি কহে পার্থে কল্পনা বচন ॥
তবে হনুমানে তার নিজমূর্ত্তি ধরে ।
দেখিয়া মুদিল আক্ষি ধনঞ্জয় বিরে ॥
পার্থে বোলে নিবেদন স্থনহ গোসাঞি ।
তোমার আদেস পাইলে বাহিনি চালাই
হাসিয়া করিল আজ্ঞা বির মহাসয়ে ।
লুমাঞ্চিতকলেবর হৈল ধনঞ্জয় ॥
আজ্ঞা কর মহাসহে লঙ্কা জাইবার ।
তথা হনে ধনরত্ন বস্ত্র আনিবার ॥
হনুমানে কহে বির পাসর আপনা ।
সাগর তরিব হেন আছে কুন্ন জনা ॥
হাসিয়া কহিল পার্থ করি অঙ্গিকার ।
আজ্ঞা করি সঙ্গে চল সমুদ্র কিনার ॥
হাসিতে হাসিতে জায়ে পবননন্দন ।
মহদধি সাগরেত জায়ে ততক্ষন ॥
দেখিল অপার সিন্ধো নাই দিবারাত্রি ।
ধুর্ম্মময়ে দেখি সর্ব্ব নাই দেখি স্তিতি ॥
দেখিয়া সকল সর্ব্বে অন্তরে তরাস ।
মুখে ধুলা উড়ে সব জিবন নৈরাস ॥
চারি দিগে হনুমানে করে নিরর্ক্ষন ।
দেখি সর্ব্ব অধুমখি সুসিল* বদন ॥

কিঞ্চিত হাসিয়া কহে পবননন্দন ।
লঙ্কাতে জাইতে পার্থ না কর জতন ॥

পার্থে বোলে মহাসয় জবে আজ্ঞা পাই ।
তোহ্মার সাক্ষ্যাতে সব বাহিনি আনাই ॥
হাসিয়া করিল আজ্ঞা বির হনুমান ।
কুসল বাহিনি আনি কৈল বিদ্যমান ॥
জথাজুক্ত সম্বাসা করিল সেনাগণ ।
পুনরপি বোলে পার্থ পাণ্ডুর নন্দন ॥

আজ্ঞা কর মহাসএ লঙ্কা জাইবার ।
তথা হতে ধন রত্ন জিনি আনিবার ॥
হনুমন্তে বোলে বির পাসর আপনা ।
সাগর লঙ্ঘিব হেন আছে কোন জনা ।
হাসিয়া বোলেন্ত পার্থ করি অহঙ্কার ।
চল সৈন্য সঙ্গে জাই সাগর তরিবার ॥
হাসিতে হাসিতে চলে পবননন্দন ।
মোহদধিতিরে গিয়া বোলে ততৈক্ষন

দেখী সৈন্য অধমুখ সুখাইল বদন ।
সাগরতরঙ্গ জদি দেখীল তখন ॥
অর্জ্জুনক বো[ে]ল তবে পবনতনয় ।
লঙ্কাপুরি জিনিতে জিবন সংসয় ॥

* শুষ্ক ।

হাসিয়া কহিল পার্থ না কর বিস্ময় ।
বান্ধিব সাগর আমি দিয়া স্মরচয় ॥
কিন্তো এক নিবেদন করি তুমা পাস ।
লঙ্কা জেই দিগে তোমি করি দেও আস ॥
আপনে জাইবা তোমি স্মরবন্ধ দিয়া ।
তোমারে স্ময়ায়ে* রত্ন আনিবাম গিয়া ॥
ক্রোধ করি হনুমানে কহে আরবার ।
তব † তোমি বাক্য বল সিন্দো তরিবার ॥
অর্জ্যোনে কহেন আগে দেব জগন্নাথ ।
তাহান প্রসাদে আর তোমা আসির্ব্বাদ ॥
আজ্ঞা কর স্মরে বান্দি রামবন্দ সম ।
দেখ দেখ মহাসয়ে আমার বিক্রম ॥
পুর্ব্বকথা স্থুনিয়া মনেত ডুক্ষি বড়ি ।
স্মরে সিন্দো না বান্দিল রাম নরহরি ॥
বানর সবেরে ডুক্ষ দিল অকারন ।
স্মরে সিন্দো না বান্দিল রাম নারায়ন ॥
ই বোলিয়া অর্জ্যোনে ধনুতে দিল গুন ।
অস্ত্র সব শিক্ষ্যা তার সংগ্রাম নিপুন ॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দ্দন স্মরে ধনঞ্জএ ।
বর দেও লঙ্কা গিয়া করিয়ে বিজয় ॥
খাণ্ডব দহিলা হরি বনে অগ্নি দিয়া ।
তোমার প্রসাদে আছি ইন্দ্রেরে জিনিয়া ॥
এত বোলি ধনঞ্জয়ে এড়ে স্মড় চাপ ।
গগন সমান উঠে সাগরের ঝাপ ॥
মহা কুলাহল দেখি করহে সাগর ।
পাসে সিন্দো বন্দ করে দস প্রহর ॥
নরনারায়ন সে জে পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
নিমেসে বান্দিল সিন্দো দস প্রহর ॥
দুই দিগে বান্দিআছে স্রোতে নাই লড়ে ।

হাসিয়া বোলেন্ত পার্থ নাহিক সংসয় ।
[illegible] ॥
আপনে জাইবা সঙ্গে বনপথে দিয়া ।
আসিব তোহ্মার বলে ধন রত্ন লইয়া
ক্রোর্দ্ধি [হই] হনুমানে বোলে আরবা
কোন দর্পে বোল সাগর হইতে পার
অর্জ্জুনে বোলেন্ত আছে কৃষ্ণ ভগবান্
তাহান প্রসাদে কহি তোহ্মা বিগ্তমা:
আজ্ঞা কর সেতু বান্দম রামচন্দ্র সম
দেখ দেখ মহাসয়ে আমার বিক্রম ॥
কি কারনে ডুক্ষ পাইল রাম ভগবন্ত
তুহ্মি সব সঙ্গে ছিলা বিক্রমে মোহন্ত
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরিয়া গাণ্ডিবে জোড়ে স্ব
লঙ্কা পরি জাইবার দেয় ক্রম বর ॥
খাণ্ডব দাহন জেই বান সান্দি ছিল ।
এড়িল জে মহাসর দক্ষিন পাসে গেল
তখন পাতাল দেস ছাড়িল সাগর ।
দেখে দস জোজন জুড়িল দির্ব্ব সর ॥
এড়িলেক মহাসর মহদধি কাপে ।
গগন গঘনে জেন মহামেঘ চাপে ॥
পাসে দস জোজন কৈলা সরে আবরিয়া
দুই দিগে পথ কৈল সর পত্র দিয়া ॥
[illegible]

* সহায়ে ।   † তবু ।

দুই দিগে মহা ডেউ [উ]ঠিয়া আছাড়ে
না পারে লাড়িতে বন্দ হাসে ধনঞ্জয়।
মনেত বিস্ময়ে তবে পবনতনয়ে ॥
অর্জ্যোনে কহেন তবে সুন হনুমান।
মুর এক নিবেদন কর অবধান ॥
অনুগ্রহ কর জদি করু নিবেদন।
সর্ব্ব সমে আগে তোমি করহ গমন ॥

নিশ্চয়ে বন্দিল দস জোজন সাগর ॥
নরনারায়ন রূপ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ডণ্ডেকে বান্দিলা বির গহিন সাগর ॥
সম্পূর্ণ বন্ধন কৈল স্রোত নাহি চলে।
দুই দিগে মহা ঢেউ সমুদ্র উথলে ॥
না পারে নাড়িতে সর হাসে ধনঞ্জয়।
ক্রোধে মোহশ্চিত কপি পবনতনয় ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত সুন ভাই হনুমান।
আপনে অর্থরে (?) কিছু কর অবধান ॥
আপনে চলহ আগে কর অনুগ্রহ।
সর্ব্ব সৈন্য সমুদিতে লঙ্কাতে চলহ ॥

তবে হনুমান বির ক্রোধ গুরুত্তর।*
পার্থেরে গর্জ্জিয়া কহে বার্ক্য বহুত্তর ॥
কেবল বালক তোমি নাই দেখ রন।
আমার সাক্ষ্যাতে কহ এতেক বচন ॥
কৃষ্ণের পরম বন্দো জানি তুর রিত।
তে কারনে মুর পাসে কহ বিপরিত ॥
আর জন হৈত জদি নহিত জিবন।
আর কেহ নাই কহে এমত বচন ॥
সুমেরু সমান সে জে গন্ধমাধন।
সাথে করি নিল আমি লঙ্কার ভুবন ॥
তাহা হনে ঔসদ দিয়া লক্ষন প্রানি রাখি
ইয়াকে জে নাই জান না জানিয়া সাক্ষি ॥
কৃষ্ণবরে সিন্দো বান্দিআছ সিসুবর।
সর্ব্ব সমে মুরে দেও তাহার উপর ॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তারে কহে হনুমান।
মহাকায় করে বিরে পর্ব্বত সমান ॥
লুম গোটা করে তার সাল তরু সম।
দ্বিগুন রূসিয়া করে অতুল বিক্রম ॥
দুই চক্ষু হন্তে অগ্নি উঠে ঘন ঘন।
গগনে বিজুলি জেন ছটকে সগন ॥

তাহা সুনি হনুমন্তে ক্রোধে গুরুতর।
পার্থেরে গর্জ্জিয়া বোলে বাক্য খরতর ॥
স্বরূপ ছাওয়াল তুহ্মি না দেখীছ রন।
আহ্মার সাক্ষ্যাতে বোল অযুক্ত বচন ॥
কৃষ্ণের পরম বন্দু সেই সে কারন।
আর জন হইত জদি লইতাম জিবন ॥

সমেরু পর্ব্বত সমে গন্ধ জে মাদন।
উফাড়িয়া নিয়া কৈল লক্ষন জিবন ॥
আপনা বিক্রম হতে এড়িলুম সাগর।
লঙ্কাপুরি পুড়িয়া সকল নিসাচর ॥
সরে সর দিয়া তুহ্মি বান্দিলা সাগর।
আহ্মি পার হইতে বোল তাতে করি ভর ॥
গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ক্রো[ে]ধ বাড়ে হনুমান।
মহাকায় হইল জে শুমেরু সমান ॥
পাসে হইল কপিরাজা ত্রিদস জোজন।
দির্ঘ সত জোজন হইল সরির সোভন ॥
তাল বৃক্ষ সম লোম সরির কিরন।
দ্বাদস ভাস্কর জিনি সরির সোভন ॥

* গুরুতর।

হনুমান তেজ দেখি কাঁফে সন্তগন।
হাসিয়া কহিল পার্থ বিনতি বচন॥
ক্রোধ ছাড় মহাবির সাস্ত্র অদিরাজ।
লঙ্কাপুরি প্রভেসিয়া সিদ্ধি কর কাজ॥
অর্জ্যোনমুখেত সুনি বিনতি বচন।
ক্রোধ করি উঠে তবে পবননন্দন॥
লম্প দিয়া উঠে বির সরের উপর।
পার্থরে না নড়ে জেন সুমেরূ সিথর॥
পৃথিবি চলিতে পারি মুর বাহুবলে।
না জানিল তার তর্ত্ত ভাবে মহাবলে॥
স্মরের উপরে হাটে হনুমান বির।
দেখিয়া লুমাঞ্চ তার সকল সরির॥
মধ্যসাগরে জায়ে বির হনুমান।
সহিতে আছয়ে ভার দেখে বিগ্যমান॥
মনে মনে হনুমানে চিন্তিল তখনে।
মুর ভার সহিতে না পারে ত্রিভুবনে॥
স্মরমুলে সক্তি আছে সহে মুর ভার।
না জানি ইয়াত আছে কেমত প্রকার
এমত ভাবিয়া বিরে মধ্যখানে গিয়া।
জলেত পড়িল বির তাগে ঝাম্প দিয়া॥
বিস্মাম্বর রূপ ধরি স্মরমুলে হরি।
এক এক স্মরে আছে এক কৃষ্ণে ধরি॥
জত দুর স্মরবন্দ সাগর প্রমান।
তথ দুর ধরিআছে কৃষ্ণ ভগভান॥
চতুর্ভুজ মুর্ত্তি ধরি রূপ জে অনন্ত।
স্তোতি করে তথা থাকি বির হনুমন্ত॥
তোমার অপার মায়া জানে কুন্থ জন।
জারে তোমি কৃপা হয় সে পুনি সুজন॥
স্তোতি করি তথা হনে উঠিল সত্যর।
সদয়ে হইয়া গেল পার্থের গোচর॥
ধৈন্য ধৈন্য বোলি তারে দিল আলিঙ্গন।
সাত্যক সাদনা কর ইন্দ্রের নন্দন॥

হনুমানমুর্ত্তি দেখি কাপে সৈন্যগন।
হাসিয়া বোলেন পার্থ বিনয়বচন॥
ক্রোধ এড় মহাবির চাহিতে ধর্ম্মরাজ
লঙ্কাপুরি পার কর সিদ্ধি কর কাজ॥

ক্রোধে লম্প দিয়া পড়ে সরের উপর
পথক্রমে চলি যেন শুমেরূশিখর॥

সরপথে চলি জাএ হনুমন্ত বির।
দেখী লোমাঞ্চিত হইল বিরের সরির॥
মৈদ্ধে সাগর গেল বির হনুমান।
না ভাঙ্গে শরের বন্দ ভাবে অপমান॥
মনে মনে হনুমান ভাবে ততৈক্ষন।
মোর ভর সহিতে না পারে ত্রিভুবন॥
মনিস্যের সরবান্দে সহে মোর ভর।
না বুঝি এহাতে আছে কেমত প্রকার
স্থির করিবারে নারে মনেত ভাবিয়া।
সাগরের জলমৈদ্ধে পড়ে ঝাপ দিয়া॥
ডুব দিয়া চাহে সব বির হনুমন্ত।

চতুর্ভুজ দেখীলেক মুর্ত্তি অনন্ত॥
জত দুর সরবন্দ সাগর প্রমান।
তত দুর যুড়িয়া রহিছে ভগবান॥
বিশ্বরূপ হইয়া প্রভু ধরিছেন বান।
ইসিত হাসিয়া বোলে বির হনুমান॥
উঠ উঠ মহাপ্রভু বোলে হনুমন্ত।
তোহ্মার সকল মাঞা বিজয় অনন্ত॥
তোহ্মার সেবক আহ্মি জানে ত্রিভুবন।
মনিস্যের সঙ্গে লর্জ্জা দেয় কি কারন॥
সর এড়ি মহাপ্রভু অন্তর হও এবে।
অর্জ্জুনের দর্পচুর্ন্ন করিবম তবে॥
হাসিয়া বোলেন প্রভু সুন হনুমান।
আহ্মার সেবক তুহ্মি জগত বাখান॥
ধরনি ধরিতে পার তোহ্মার সকতি।
অর্জ্জুন আহ্মার দাস শুন মহামতি॥

অনাদি নিধন হরি ভুবনের সার।
জাহার স্মরনে হয়ে পাতকি নিস্তার ॥
তোমার সকতি নাই ই কর্ম্ম করিতে।
কৃষ্ণের এমত ক্রিপা না পারি বোজিতে ॥
করপুটে বোলে পার্থে তোমি মহাজন।
রামের সেবক তুমি পবননন্দন ॥
তোমি কর জার পুজা আমি তান দাস।
ইয়লুকে পরলুকে তান পদে আষ ॥
আমারে সদায় তোমি হয়ত করুন।
এত বোলি তার পদে ধরিল অর্জ্যোন ॥
সদয়ে রিদয়ে হৈয়া দিল আলিঙ্গন।
চল পার্থ সর্ন্ন সমে লঙ্কার ভুবন ॥
এত বোলি হনুমান চলে ততর্ক্ষন।
সংহতি চলিল পার্থ নরনারায়ন ॥
১৫৫০ সং পুথি, ৫—৭ পত্র।

লঙ্কাপুরি জাও তুহ্মি আহ্মার আদেস।
তোহ্মা হতে ধনঞ্জয় না হএ বিসেষ ॥
বিষ্ণু প্রনমিয়া বির উঠিল সত্বর।
সদএ হইয়া গেল অর্জ্জুন গোচর ॥
ধন্য ধন্য করি বিরে বলিল বচন।
সার্থক অর্জ্জুন তুহ্মি ইন্দ্রের নন্দন ॥
অনাথের নাথ হরি ত্রিভুবনে সার।
জাহারে ভাবিলে হএ ভবিস্বত পার ॥
তোহ্মার সকতি নাই করিতে এহি কর্ম্ম।
কৃষ্ণের প্রেভাবে কর জানিলাম মর্ম্ম ॥
সাগরের জলে আহ্মি দিয়াছিল ডুব।
ধরি আছে ভগবানে হইয়া বিস্বরূপ ॥
জলমৈদ্ধে ভগবান ধরি আছে সর।
তে কারনে তোর বান্দে সহে মোর ভর ॥
করপুটে বোলে পার্থ সুন মহাজন।
শ্রীরামসেবক তুহ্মি পবননন্দন ॥
প্রভুর সেবক তুহ্মি আহ্মি তান দাস।
ইহলোকে পরলোকে আহ্মি তান দাস ॥
আপনে স্বরূপ তুহ্মি হও সকরুন।
এ বোলিয়া পাএ তান ধরিল অর্জ্জুন ॥
সকরুনে হনুমানে করিল অঙ্গিকার।
সৈন্য সমে চলে পার্থ সহিতে আহ্মার ॥
এ বোলিয়া হনুমানে চলে ততৈক্ষন।
সবান্ধবে গেল তবে লঙ্কার ভুবন ॥
২০২৪ সং পুথি, ১১২—১১৪ পত্র।

৬। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ *

(ভীষ্মপর্ব্ব)

সঞ্জয় হইতে ঃ—

তারে দেখি ক্রোধ হইলা কৃষ্ণ ভগবন্ত।
আজি ভিস্ম মারিয়া করিমু জুদ্ধ অন্ত ॥
ধৃতরাষ্টের পুত্র সব করিমু সংহার।
জুধিষ্ঠিরেত সমর্পিমু জত রায্যভার ॥
এতেক বোলিয়া কৃষ্ণ দেব মহাবির।

পরাগলীতে ঃ—

দেখহ সাত্যকী মুই চক্র লইলাম হাতে
ভিস্ম দ্রোন কাটি পাড়িমু রথ হতে ॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সব করিমু সংহার।
জুধিষ্টির নৃপতিক দিব রার্জ্জভার ॥
এত কহি সাত্যকীক কৈল সম্বোধন।

* দীনেশ বাবু তাঁহার সঞ্জয়-ভারতের পুথিতে এই অংশটী পান নাই। তাই লিখিয়াছেন ঃ—
"শ্রীহরি যে স্থানে স্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের একেবারে উদয় হয় নাই।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৭ পৃঃ (৪র্থ সং)।

হাতে বজ্র (চক্র ?) ম্লসিলা মারিতে ভিস্ববির
রথে হতে লামি জাএ চক্র করি হাতে।
ভিস্বকে মারিতে জায়ে দেব জগন্নাথে॥
ক্রোধে পদভরে কাপে সর্ব্ব রনস্থলি।
মৃগেন্দ্র মারিতে জায়ে সিংহ জেন চলি॥
দেখি ভিস্বে ছাড়িল হাতের ধনুবান।
জুড়হস্ত করি রহে হৈআ স্তবমান॥
ভিস্বে বোলে মহাভাজ্ঞ হৈল আজি মর।
নিজ হস্তে কৃষ্ণ দেব মাথা কাট মর॥
ইহলুকে জস পুনা মুক্তি পরলুকে।
ত্রিভুবনে ক্ষ্যাতি ধর্ম্ম ঘোসিবেক মকে॥
দেখিআ কৃষ্ণের কুপ অর্জ্জুনে তখন।
রথ হইতে লামি ধাইয়া পড়িল চরন॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫৬ সং পুথি
(সঞ্জয়কৃত ভীষ্মপর্ব্ব) ২৯ পত্র।
(তাং ১২১৭।১০ ফাল্গুন।)

হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দ্দন॥
সুর্জ্জের সমান তেজ সত বজ্রসম।
চারি পাসে খুর তেজ জেন কাল জম॥
রথ হতে ফাল দিয়া চক্র লইয়া হাতে।
ভিস্বক মারিতে জাএ ত্রিজগতনাথে॥
কৃষ্ণঅঙ্গে পিতবস্ত্র সোভিছে তখন।
বিদ্যুত সহিতে জেন আকাসে সোভন॥
তা দেখিয়া সর্ব্বলোকে কহএ কথন।
কৌরবের ক্ষয় আজি দেখীএ লৈক্ষন॥
পদভরে কৃষ্ণের কাপএ বসুমতি।
গজেন্দ্র ধরিতে জেন জাএ মৃগপতি॥
সম্ভ্রম না করে কৃষ্ণ হাতে ধনুসর।
নির্ভয় সরির ভিস্ব সংগ্রাম ভিতর॥
জগতের নাথ আইসে মারিবারে মোক।
রথ হতে ফালাএ দেখউক সর্ব্ব লোক॥
তুহ্মি মোরে মারিলে তরিমু পরলোক।
ভুবন মৈদ্ধেত জান ক্ষ্যাতবন্ত মোক॥
জুঝিবার শ্রধা নাই কহিছম অখন।
তোহ্মাকে বুঝাইমু আহ্মি প্রতিজ্ঞাবচন॥
এতেক কহিল জদি ভিস্ব মহাসএ।
রথ হতে নামে তবে বির ধনঞ্জয়॥
সেবকবৎসল কৃষ্ণ করুনাসাগর।
কৃপা করি জাএ কৃষ্ণ করিতে সমর॥
রাখীবারে জত্ন করে না পারে রাখিতে।
ক্রোধে আকুল তনু অর্জুন সহিতে॥
বাউ জেন অন্তকালে বহে উড়াইয়া।
তেনমতে ধাবাএ কৃষ্ণ অর্জুন লইয়া॥
এহিমতে দস পদ গেল জদি হরি।
আগু হইয়া পাএ ধরি রাখে জত্ন করি॥
মুকুট কাঞ্চনমালা লাগএ ভুমিতে।
সম্বর সম্বর কোপ দেব জগন্নাথে॥
প্রতিজ্ঞা করিছি আহ্মি তোহ্মার সাখাতে।
পুত্রের সবদ লাগে ভিস্বক মারিতে॥
সর্ব্ব বির মারিলে কৌরব হইব ক্ষয়।
তোহ্মার প্রসাদ হইব সংগ্রামেত জয়॥
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা সুনিয়া দামুদর।
ক্রোধ ছাড়ি পুনি উঠে রথের উপর॥

ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ১৯৪-৯৫ পত্র।

কর্ণ ও শল্য *

(কর্ণপর্ব্ব)

সঞ্জয়ে :—

কর্ণ্যে পুনি কটকের রঙ্গ বাড়াইতে।
একে একে সমাকে জে লাগিলা বলিতে॥
জে মরে অর্জ্জুন আজি দেখাইতে পারে।
কটক (শকট ?) ভরিয়া রত্ন ধন দিমু তারে
অর্জ্জুনকে আজি মরে পারে দেখাইতে।
লেঞ্জ কালা ধবল ঘুড়া বহে দির্ব্ব রথে॥
সবৎছ তরুনি ধেনু দিমু এক স[]ত।
তাকে দিমু অর্জ্জুনকে দেখাইআ দেয় মতে॥
রথ হস্থি ঘটক সকট ভরি সুনা।
তারে দিমু অর্জুন দেখায়ে জেই জনা॥
মনি মুক্তা হার অলঙ্কার সতে সতে।
তারে দিমু অর্জুন দেখায় জে আমাতে॥
স্যামল তরুনি গিত গায় সুললিত।
এ সকল কৈর্ন্যা দিমু সুবর্ণ্যে ভুসিত॥
সাগরের তিরে দির্ব্ব দেখিতে উত্তম।
হেনমত গ্রাম দিমু ইন্দ্রপুরি সম॥
অর্জ্জুনকে আমারে দেখায়ে অবিলম্বে।
ঝাটে চল সর্ব্বলুক না সহে বিলম্বে॥
মনিমুক্তা অবরন দেম দির্ব্ব হার।
এই মত বাক্য পুনি বলে বার বার॥

*   *   *   *

সুনিয়া ই সব সৈল নারে সহিবার।
বলিতে লাগিলা কিছু হৃদ্য বলিবার॥
কর্ণ্যে জত বলে সব না সহি পরানে।
কৃষ্ণার্জুন মারিতে বিফল আসা কর্ণ্যে॥
ভালমন্দ তুমি কিছু নাহি বুঝ ভালে।
দুই সিংহ মারিতে চাএক হি স্রকালে॥
অসম্ভব কথা কহ সুনিতে অনুচিত।
জিব জে তাহার নহে এমত উচিত॥
গলাএ পার্থর বান্দি সাগরে সাতুরে।
গিরি হনে লম্পে পড়ে ভুমির উপরে॥
সেই মত বুজিলু তুমার অভিলাস।
মর বুলয় রাখ জিবনের আস॥

পরাগলীতে :—

পাণ্ডববাহিনি কর্ন্নে সমুখে দেখিয়া।
অহঙ্কার করি কর্ন্নে বুলিল ডাকিয়া॥
জে মোরে দেখাইতে পারে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এক সত গ্রাম দিমু পরম সোন্দর॥
পঞ্চ সত রথ দিমু হিরাএ মণ্ডিত।
দুই সত রথ দিমু কাঞ্চনে ভুসিত॥
জে মোহে দেখাইতে পারে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
চারি সত ধেনু দিমু তাহারে নিশ্চ্যএ॥
তিন সত কৈন্যা তানে দিমু জে নির্শ্চএ।
দুই সত হস্তি দিমু মহা তেজমএ॥
রাঙ্গা কালা হস্তি দিমু কাঞ্চনে জড়িয়া।
জেই জনে অর্জ্জুনেরে দিব দেখাইয়া॥
তিন লৈক্ষ সেনা দিমু হিরাএ সহিত।
জেই জনে অর্জ্জুনেরে দেখাএ বিদিত॥
অর্জ্জুন সহিতে কৃষ্ণে করিয়া সংহার।
জত ধন পাই আক্ষি সকল তাহার॥
সঞ্জয়ে বোলেন্ত সল্যে কুপিল তখন।
কর্ন্নক আক্ষোপি বোলে কুৎসিত বচন॥
জত ধন দেয় মুঢ় এক জৈজ্ঞ হএ।
অকারনে ধন কেহে দিবারে দুষ্যয়॥
অখনে দেখিবা পার্থ খেনেক হও স্থির।
সিংহ জেন দেখিবা অর্জ্জুন মহাবির॥
কি কারনে ধন দিবা দেখিবা অর্জ্জুন।
বিপাক হইলা তোর সুতপুত্রে সুন॥
কৃষ্ণ সনে অর্জ্জুনেরে করিবা সংহার।
হেনমতে বুদ্ধি তোরে দিল কোন্ ছার॥
সিংহে জদি শ্রীকাল মারিতে পারে রনে।
তবে সে অর্জ্জুন বধ সুনহ অখনে॥
পালাইয়া পার্থ সনে জাও বারে বার।
কেমন পৈরস তাকে নিন্দ দুরাচার॥
মরিবার কালে হএ বুদ্ধি বিপরিত।
জানিলাম অর্জ্জুন হাতে মরিবা নিশ্চিত॥
বুদ্ধিমন্ত বন্ধু নাই কহিতে কথন।
বিপরিত বুদ্ধিদোসে হইবা নিধন॥

* দীনেশবাবু এই প্রসঙ্গটী সঞ্জয়ের নিজস্ব বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। ব, ভা, সা, ১৩৯ পৃঃ (৪র্থ সং)।

কুপ বাড়াইতে সৈর্ন্য লাগে বলিবার।
ফুটিলে অর্জুনবান না রহিবা আর॥
দির্ব্ব ধনু লৈআ জদি সুর্ন্য কৈলা ক্ষয়।
তবে সে জানিবা তুমি বির ধনঞ্জয়॥
মায়ের কুলেত জেন বসিআছে আনে।
চন্দ্র ধরিবারে জেন চায় বামনে॥
হেন মতে কর্ণা তুমি বলহ দারুন।
মারিবারে চাহ তুমি কৃষ্ণ অর্জ্জুন॥
লেঙ্গুড় লাড়এ জেন কালসর্পকায়।
ছাআল হৈয়া হরিন সিংহকে বুলায়॥
মৃগমাংস্য খাইআ জেন স্রীকালের স্থল।
সিংহসনে জুদ্ধ চাহ হৈতে নিমুল॥
সুতপুত্র তুমি বল রাজপুত্র কেনে।
কুকুর হৈআ জুদ্ধ মল্ল হস্তি সনে॥
গাতে কাল সর্প কেনে লাড় হাত দিআ।
সিংহকে আস্ফাল কর স্রীকাল হৈআ॥
সর্পে গড়ুরকে ধায় বৎস জে বৃসকে।
সেইমতে কর্ন্যে আস্ফালিলে অর্জুনকে॥
চন্দ্র উদিতে জেন বাড়এ সাগর।
বিনা নাএ ভাস তুমি সুনরে বর্ব্বর॥
বড় ব্যাঘ্র দেখি জেন গর্জ্জএ কুকুরে।
বিড়াল দেখিআ জেন আস্ফালে উন্দুরে॥
তেন হি তুমার কথা বুজিলু মনয়।
শ্রীকাল হইআ তাকে দেখিলে রনয়॥
ব্যাঘ্র কুকুরে যেন উন্দুর বিড়ালেত।
অর্জ্জুন তুমার তেন ভেদ এই মত॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬৫ সং পুথি,
(সঞ্জয়কৃত কর্ণপর্ব্ব) ৪৭-৪৮ পত্র।
[১৫৫০ সং পুথির ৫—৬ পত্রেও এই আখ্যানটি আছে।]

গলাএ পল্লভ বান্ধি জাও পার্থ স্থানে।
জদি ভাগ্য থাকে মূঢ় বাচিবা পরানে॥
মহাব্যাঘ্র পার্থ বির তুমি মৃগছাও।
ত্র অর্জ্জুন কম্পিত হইব গাও॥

দুর্জ্জোধনপুর্য্য তুহ্মি হিত চাও তাক।
মরিবা জে সুতপুত্র দৈবের বিপাক॥
ধন কেহ্নে দিয়া মূঢ় দেখিবা অর্জ্জুন।
বিভিসিকা করি কেহ্নে দেখাও নিপুন॥
জদি বজ্র হাতে করি আইসে পুরন্দর।
তবো না জিনিবা তুহ্মি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
মৃগ হইআ দেখাওসি ব্যাঘ্রেরে ভাবকি।
ই ভাবকি ভাঙ্গিবেক অর্জ্জুন ধানুকি॥
হে[ন] মতে সল্যে তারে বোলএ নিষ্ঠুর।
থর থর কাপে তবে কর্ন্ন মহাসুর॥
ধৃতরাষ্টে বোলে সৈল্যে বোলে বিপরিত।
ই সব রহস্য তবে না হএ উচিত॥
মহাবংসে জর্ম্ম কর্ন্ন বুদ্ধি অনুমানে।
জাহাকে পরসুরামে পঠাইল আপনে॥
অস্ত্রে সাস্ত্রে দাতাবন্ত (?) রনেত চতুর।
এমত জনেরে সল্যে বোলএ নিঠুর॥
তবে কি বোলিল কর্ন্নে কহত সঞ্জয়।
কর্ন্নহ পাড়িব রনে মোর মনে লএ॥
সঞ্জয় বোলেন্ত কর্ন্নে চক্ষু পাক দিয়া।
সর্প হেন উঠে বির সল্যেরে কুপিয়া॥

ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি (পরাগলী মহাভারত), ৩৩৭ পত্র।

যদিও সঞ্জয়ভারতের সহিত পরাগলী ভারতের ভাব ও ভাষার আশ্চর্য্যরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তথাপি স্থানে স্থানে অমিলও আছে। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষয়ক আখ্যানটীতে অমিলের কথা ইতিপূর্ব্বেই উদাহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অশ্বমেধপর্ব্বের সমস্তটাই সঞ্জয়ভারতে পৃথক্। পরাগলী বা ছুটীখানী অশ্বমেধপর্ব্ব সঞ্জয়ভারতে গৃহীত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ষষ্ঠীধরসুত গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধপর্ব্বটি সঞ্জয়ভারতে সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পরাগলী অশ্বমেধপর্ব্ব অপেক্ষা গঙ্গাদাসী অশ্বমেধপর্ব্ব কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। সুতরাং যিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার রসবোধ আছে। ইহা ছাড়া আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশুক। মোটের উপর পরাগলী ভারত অপেক্ষা সঞ্জয়ভারতে কিছু বেশী কথা আছে। ইহাকে ভবিষ্যৎ সংযোজন বলা যায়।

পরাগলী মহাভারতেই বহু স্থানে সঞ্জয়ের ভণিতা পাওয়া যায়। কতিপয় স্থানে এই 'সঞ্জয়' ধৃতরাষ্ট্রসহচর। ইঁহারই নিকট ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন,—

তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

আবার কতিপয় স্থানে সঞ্জয় 'পয়ার' বা 'পাঁচালী' রচনা করিতেছেন। আরও অনেক স্থলে সঞ্জয় শব্দ দ্ব্যর্থবোধক। কয়েকটী উদাহরণ দেখুন।

ভারতের পুন্যকথা অমৃতের ধার। ধন্দ হইয়া পাপি স্ুনে তথাপি নিস্তার॥
মহাপুন্য কথা এহি সুধারসময়। ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥
কর্ণপর্ব্ব সাঙ্গ জদি হইল এতদূরে। সঞ্জয়ে কহন্ত কথা মধুর পয়ারে॥
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি। সমরে পড়িল জদি কর্ন্ন মহামতি॥
তার পরে কি করিল পুত্র দুর্জ্জোধন। জানিলাম আজি পুনি সমুলে মরন॥
মহারনে বিক্রম দুর্জ্জয় ধনঞ্জয়। আপনা ইচ্ছাএ মোর সন্ত করে ক্ষএ॥
প্রসংসিতে জুক্ত নিন্দন অনুচিত্তা। সঞ্জয়! কি যুক্তি তারা কৈল সে রাত্রিত॥
সঞ্জয়ে বোলেন্ত তোহ্মার সেনা গড়ে পসি। যুক্তি করে বিরগনে একখানে বসি॥"

—পরাগলী ভারতের ২০২৪ সং পুথি, ৩৬১ খ পৃষ্ঠা।

"সঞ্জয়ে কহেন্ত কথা ধৃতরাষ্ট্রে স্নুনে। জয়মনি কহন্ত কথা জর্ম্মজয় স্থানে॥
ভিস্ম পর্ব্বে দস দিন যুদ্ধ সমাধান। সঞ্জিতা ভাঙ্গিয়া ভাসা করিল বাখান॥
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি। সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
কবিন্দ্র কহেন কথা সুন মহামতি। জেনমতে রন কৈল কৌরবের পতি॥

—২০২৪ সং পুথি, ২৪৪ ক—খ পৃষ্ঠা।

ভারতের পুন্যকথা, বিচারি পুরান পোথা, লোকে স্নুনি হইল মুহিত।
পাঞ্চালি প্রবন্ধ করি, সঙ্গিতা সঞ্জয় পুরি, পুন্যকথা স্নুনহ নিচ্চিত॥

—ঐ, ৪০ খ পৃষ্ঠা।

সর্ব্বলোকে বুঝিবারে, পয়ারে রচিল তারে, বিরচিয়া কহিল সঞ্জএ।
ভারত অমৃতধার, ভবভয় তরিবার, কেবল গোবিন্দ মধুময়॥

—ঐ, ৯৫ ক—খ পৃষ্ঠা।

পরাগলী ভারতের এই ভণিতাগুলিতে সঞ্জয় শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ এগুলি প্রকৃত ভণিতা নহে। ইহার উপর কবীন্দ্র বা শ্রীকরের ভণিতা পৃথক্ আছে।* যদি শ্রীকর বা কবীন্দ্রের ভণিতাগুলি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এইগুলিই প্রকৃত ভণিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এবং তাহা হইলে এই পরাগলী মহাভারতই সঞ্জয়-নামা কোনও

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একজন কুমিল্লাবাসী ছাত্রের আনীত একখানি পরাগলী ভারতের পুথিতে 'কবীন্দ্র' ও 'সঞ্জয়ের' ভণিতা একত্র পাইয়াছেন। আমার পুথিগুলিতেও তাহাই পাইতেছি। তবে তাঁহার পরাগলী ভণিতাগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত দেখিলাম।

বঙ্গীয় কবির রচিত মহাভারতে পরিণত হইতে পারে। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। পরাগলী ভারতের ভণিতিসমূহ বাদ দিয়াই সঞ্জয় মহাভারতের উৎপত্তি হইয়াছে। নতুবা ভাষার অবিভিন্নতা ঘটিবার আর কোনও উপযুক্ত কারণ দেখান যায় না।

ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের নিকট আমি প্রথম শুনি যে, এ পর্য্যন্ত যে পাঁচখানি সঞ্জয়ভারতের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং পরাগলী ভারতের পুথি ঐ অঞ্চলের দক্ষিণে চট্টগ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে।

ভট্টশালী মহাশয়ের উক্তি হইতে একটা নূতন বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে। যদি পরাগলী মহাভারত দক্ষিণে চট্টগ্রাম হইতে এবং সঞ্জয়-ভারত উত্তরে শ্রীহট্ট বা ত্রিপুরা হইতেই পাওয়া যায়, তবে এই উভয় স্থানকেই উভয় গ্রন্থের উৎপত্তিস্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। যদি ত্রিপুররাজ্যে সঞ্জয়-ভারতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে সঞ্জয়ভারত হইতে পরাগলী ভারতের ভণিতা বাদ যাইবারও একটা কারণ অনুমিত হইয়া পড়ে। পরাগলের বংশের সহিত ত্রিপুররাজবংশের প্রাচীন বিরোধের কথা পরাগলী ভারতেই উক্ত হইয়াছে। * ত্রিপুরার হিন্দু রাজা হয় ত মহাভারতের গান শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং কোনও চতুর গায়ক পরাগলী মহাভারতের ভণিতা বাদ দিয়া, ঐ গ্রন্থেরই একটা সঙ্কলন ত্রিপুররাজকে গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন। যদিও এটী একটী অনুমান মাত্র, তথাপি উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

সঞ্জয়-ভারত ও পরাগলী ভারতের কাব্যের মত সমগ্র গ্রন্থের পাঠের মিল কোনও দুই কবির কাব্যে কোনও কালে বা কোনও দেশে দেখা যায় না। এইরূপ মিলবশতঃই দীনেশবাবু বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতখানিকে পরাগলী ভারত হইতে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঠিক সেই কারণেই আমি সঞ্জয়ভারত ও পরাগলী ভারতকে অভিন্ন বলিতে সাহস করিতেছি।

আমার বোধ হইতেছে, পরাগলী মহাভারত হইতে সর্ব্বপ্রথম যে সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রকাশিত মহাভারতখানিতে মোটের উপর পাওয়া যাইতেছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার মিউজিয়মে কিঞ্চিদধিক দেড় শত পত্রে সম্পূর্ণ একখানি ভণিতাবিহীন মহাভারত সংগৃহীত হইয়াছে। ভণিতার স্থানে "বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী" ইত্যাদি ভণিতিপুষ্পিকা তাহাতে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত একখানি 'ভীষ্মপর্ব্ব' ও একখানি 'স্বর্গারোহণ পর্ব্ব'ও এইরূপ সংক্ষিপ্ত ও ভণিতাবিহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই দুইখানিই বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা হইতেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের পুথি তিনখানির

---

* ত্রিপুরার নরপতি ভয়ে ছাড়ে দেস।
পর্ব্বতকন্দরে গীয়া করিল প্রবেশ। ইত্যাদি।

ভণিতাই বিকৃত হইয়াছে। কারণ, অন্য কোনও পুথিতে সেই বিকৃতি-দোষ দেখা যাইতেছে না। এই "বিজয় পাণ্ডবকথা" (বা বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত) কোনও গায়কবিশেষের হস্তে অতিরিক্ত সংযোজন দ্বারা বিপুলায়তন সঞ্জয়মহাভারতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে সেই গায়ক বা সঙ্কলনকর্ত্তা সঞ্জয়নামাও হইতে পারেন, অথবা অজ্ঞাতনামাও হইতে পারেন। তবে প্রথমে নামহীন সঙ্কলনটিতে উত্তরকালে পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম জুড়িয়া দিয়া ধর্ম্মগ্রন্থখানির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও উপাদেয়তা সম্পাদনও গায়কের অভিপ্রেত হইতে পারে। পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত গ্রন্থখানিতে নিজের নাম জুড়িয়া দিলে চোর বলিয়া ধরা পড়িবারও বোধ হয় আশঙ্কা থাকিতে পারে। সেই জন্যই সম্ভবতঃ পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম হইতে পয়ার-পাঁচালী-প্রণেতা সঞ্জয়নামক অজ্ঞাতকুলশীল কবিবিশেষের জন্মলাভ হইয়া থাকিতে পারে। কারণ, আমরা সঞ্জয়ের কোনও পরিচয় জ্ঞাত নহি। কিন্তু শ্রীকর নন্দী তাঁহার স্বপরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং সঞ্জয়মহাভারতের বিষয়ে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কথাগুলি জানা যাইতেছে :—

(১) সঞ্জয়মহাভারত ও পরাগলী মহাভারত অভিন্ন গ্রন্থ। কেবল সঞ্জয়মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বটি গঙ্গাদাস সেনের রচনা।

(২) ধৃতরাষ্ট্রসহচর সঞ্জয়ের নামের সহিত সঞ্জয়ের ভণিতা অনেক স্থলে মিশিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ বাঙ্গালা মহাভারতখানি সেই পৌরাণিক সঞ্জয়ের রচনা বলিয়া প্রচার করিবার একটা উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন দেখা যায়।

(৩) পরাগলী মহাভারতের পুথি চট্টগ্রাম হইতে ও সঞ্জয়ভারতের পুথি তদুত্তরবর্ত্তী ত্রিপুর-রাজের অধিকার ও কুমিল্লা এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে পাওয়া যাইতেছে।

(৪) "বিজয় পাণ্ডবকথা" (বা বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত) নামে পরাগলী মহাভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন পাওয়া যাইতেছে।

(৫) ত্রিপুরার হিন্দু রাজার আশ্রয়ে পরাগলসম্পর্কবর্জ্জিত এবং ভণিতাবিহীন এই "বিজয় পাণ্ডবকথা" সম্ভবতঃ কোনও চতুর গায়ক কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।

(৬) উত্তরকালে সংযোজনাদির দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া ঐ 'বিজয়পাণ্ডবকথা'ই বিপুলায়তন 'সঞ্জয়-মহাভারতে' পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য ইহার সহিত গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধপর্ব্বটিও সংযোজিত পাওয়া যাইতেছে।

(৭) সুতরাং সঞ্জয়-মহাভারত পরাগলী মহাভারতেরই একখানি সঙ্কলনগ্রন্থ এবং উত্তরকালীয়।

(৮) পরাগলী মহাভারত সঞ্জয়-মহাভারতের বিকাশ নহে। বরং সঞ্জয়-মহাভারতকে পরাগলীর বিকাশ বলা যায়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়স্ত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

ফ

ব

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রয়স্ত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুস্ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল।

বিশেষ ঘটনা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য এবং পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের জন্য কলিকাতা করপোরেশনের ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দানপ্রাপ্তি পরিষদের জীবনে একটি অন্যতম প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। বহুদিন হইতে পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য এবং ইহার সুবৃহৎ পুস্তকালয়টিকে সুবিন্যস্ত করিবার জন্য অর্থাভাবে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অথচ ভিক্ষা দ্বারা সত্বরে এত টাকার সংস্থান করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। এমন কি, এই অর্থচিন্তাতে পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে এতদূর উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কিছুকালের জন্য ক্ষুণ্ণ করিতে হইয়াছিল। অর্থাগমের নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াও যখন কোন স্থানেই আশানুরূপ সফলতালাভের সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয় কলিকাতা করপোরেশনে পরিষদের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া এক আবেদন করেন। করপোরেশনের সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক পরিষদ্ মন্দির রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পরিষৎকে ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতার এই অন্যতম প্রধান জাতীয় অনুষ্ঠানটিকে এই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া করপোরেশন উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ এবং বঙ্গদেশবাসী ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই করপোরেশনের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য ও করপোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পরিষদের এই দান প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাহায্য পরিষৎ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন।

এই সাময়িক দান ব্যতীত করপোরেশন প্রতিবৎসর পরিষৎকে তাহার পুস্তকালয়ের পুস্তক খরিদের জন্য ৬৫০৲ দান করিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষেও এই টাকা পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। পরিষৎ এই দানের জন্য করপোরেশনের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সকল অর্থদান ব্যতীত কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ তজ্জন্য করপোরেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরিষৎ আশা করেন যে, ভবিষ্যতেও করপোরেশনের উপযুক্ত মেয়র, অল্ডারম্যান এবং কাউন্সিলারগণ এই ভাবে পরিষৎকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন বান্ধব হন নাই। নিম্নোক্ত তিন জন বান্ধবই পূর্ব্ব হইতে আছেন,—

মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর
মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

সদস্য

আলোচ্য বর্ষারম্ভে পরিষদের সদস্যসংখ্যা এইরূপ ছিল,—

(ক) বিশিষ্ট—		৯
(খ) আজীবন—		৫
(গ) অধ্যাপক—		৫
(ঘ) মৌলভী—		
(ঙ) সহায়ক—		১৯
(চ) সাধারণ—		২১৮৩
কলিকাতা—	১৩৪৯	
মফস্বল—	৮৩৪	
	২১৮৩	২২২১

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য, (খ) আজীবন-সদস্য ও (গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

(ঘ) দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষেও কেহ মৌলভী-সদস্য-পদ গ্রহণ করেন নাই।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য ১৯ জনের মধ্যে ৮ জনের ৫ বৎসর স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় ৭ জন পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ১ জনের নাম বাদ গিয়াছে এবং ৩ জন নূতন সহায়ক-সদস্য হইয়াছেন। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা ২১ হইয়াছে।

(চ) সাধারণ-সদস্য (কলিকাতা)—বর্ষারম্ভে ১৩৪৯ জন কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের মধ্যে ১৯ জন পরলোকগত হইয়াছেন, ৫ জন মফস্বল হইতে আসিয়াছেন, এবং ১৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন। উদ্বৃত্ত ১৩২১ জনের মধ্যে চাঁদা অনাদায় হেতু ও সদস্যপদে থাকিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় ৫০৮ জনের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ৭৬ জন নূতন সদস্যপদ

গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮৮৯ হইয়াছে।

(মফস্বল)—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮৩৪ জন ছিল। তন্মধ্যে ৮ জনের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, ৫ জন কলিকাতা আসিয়াছেন এবং ১৪ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে গিয়াছেন। পদত্যাগ করায় এবং চাঁদা অনাদায় হেতু ৪১৫ জনের নাম বাদ গিয়াছে এবং ২৩ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সদস্য-সংখ্যা ছিল ৪২৫ জন।

অতএব শ্রেণীভেদে বর্ষশেষে সদস্যসংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক) বিশিষ্ট— ৯
(খ) আজীবন— ৫
(গ) অধ্যাপক— ৫
(ঘ) মৌলভী— ০
(ঙ) সহায়ক— ২১
(চ) সাধারণ—১৩১৪

কলিকাতা— ৮৮৯
মফস্বল— ৪২৫
১৩১৪

১৩৫৪

সাধারণ সদস্যগণের এত সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় পরিষদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বহু দিন হইতে এই সকল সদস্য চাঁদা দান সম্বন্ধে এত উদাসীনতা দেখাইয়া আসিতেছিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বাধ্য হইয়াই তাঁহাদের নাম সদস্যতালিকা হইতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ দিয়াছেন। তথাপি পরিষৎ আশা করেন যে, এই সকল সদস্য পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

পরলোকগত সদস্য

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে,—

১। অমুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল
৩। রায় অবিনাশচন্দ্র বসু মল্লিক বাহাদুর এম এ, পি আর এস
৪। অভয়াচরণ রায়
৫। কালিদাস রায় চৌধুরী বি এ
৬। কালীকুমার বসু
৭। কালীকৃষ্ণ সেন বি এল্

৮। কুঞ্জবিহারী আচার্য্য জ্যোতিষী

৯। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বি এ

১০। নিত্যধন মুখোপাধ্যায়

১১। পূর্ণেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ

১২। ডাঃ প্রভাতচন্দ্র মিত্র

১৩। প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

১৪। প্রিয়নাথ দত্ত

১৫। রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর

১৬। বিজয়কুমার মল্লিক

১৭। রায় বিপিনবিহারী গুপ্ত বাহাদুর এম এ

১৮। ভৈরবচন্দ্র দত্ত

১৯। রসিকলাল দত্ত এম এস্‌সি

২০। রায় রামচরণ মিত্র বাহাদুর এম এ, বি এল, সি আই ই

২১। ললিতমোহন দত্ত

২২। সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ

২৩। ডাঃ সরোজিনীনাথ বর্দ্ধন এল এম এস, বি এ

২৪। সহায়নারায়ণ পাল

২৫। রায় সুরেশচন্দ্র সেন বাহাদুর এম এ

২৬। হরগোপাল দাস কুণ্ড

২৭। কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন

ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষভাবে দুঃখিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। ইহঁাদের পরিবারগণের নিকট পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

এই সকল সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুর পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইঁহাদের অনেকেই পূর্ব্বে পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরিষৎ ইঁহাদের মৃত্যুতে বিশেষভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহঁাদের শোকাভিভূত পরিজনবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন,—

১। স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

২। স্যর কৈলাসচন্দ্র বসু সি আই ই

৩। কেদারনাথ মজুমদার

৪। কবিরাজ যামিনীভূষণ সেন এম এ

৫। রাজেশ্বর গুপ্ত এম এ

৬। শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

৭। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

৮। হারাণচন্দ্র রক্ষিত

সাধারণ অধিবেশন—(ক) বার্ষিক

আলোচ্য বর্ষে ১৬ই শ্রাবণ তারিখে পরিষদের দ্বাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণী বিজ্ঞাপিত হইলে সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন হয়। তৎপরে ৫ জন সাহিত্যিকের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়। অতঃপর দ্বাত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে সেই সম্বন্ধে কতিপয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হয়। তৎপরে ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। কতকগুলি উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ৮টি মাসিক অধিবেশন হয়। পরিষদ্ মন্দির মেরামতের কার্য্যের জন্য পরিষদের হল এবং পরিষদের অধিকাংশ দ্রব্যাদি রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করার জন্য রমেশ-ভবনের হল অধিবেশনের জন্য পাওয়া যায় নাই। ঐ জন্য আরও দুইটি বিজ্ঞাপিত মাসিক অধিবেশন হয় নাই। নিম্নে এই আটটি মাসিক অধিবেশনের তারিখ, সভাপতির নাম এবং পঠিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের নাম লিখিত হইল। এই সকল মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলি সাহিত্যাদি শাখাকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।

প্রথম মাসিক অধিবেশন—২৩এ জ্যৈষ্ঠ, সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, প্রবন্ধ—অসুর জাতি, লেখক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১২ই আষাঢ়, সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, প্রবন্ধ—প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল, লেখক—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৯ই আশ্বিন, সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই, প্রবন্ধ—(ক) ভাটপাড়ার কবি ৺ আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের জীবনী ও কাব্যালোচনা, লেখক—শ্রীযুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম এ, এবং (খ) খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা, লেখক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৬ই আশ্বিন, সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি (এডিন), এফ আর এস ই, প্রবন্ধ—প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গী, লেখক—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—১৯এ অগ্রহায়ণ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, প্রবন্ধ—হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী, লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিট্।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৬এ অগ্রহায়ণ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই, প্রবন্ধ—কবীন্দ্র রমাপতি, লেখক—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২২এ ফাল্গুন, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই, প্রবন্ধ—দীন চণ্ডীদাস, লেখক—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৩ই চৈত্র, সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, প্রবন্ধ—বাঙলায় নারীর ভাষা—লেখক—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

(গ) বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১১টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ১২শ অধিবেশনটি বক্তা মহাশয়ের অসুবিধাবশতঃ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। নিম্নে এই ১১টি বিশেষ অধিবেশনের তারিখ, সভাপতির নাম, আলোচ্য বিষয় ও বক্তা বা লেখকের নাম লিখিত হইল।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, আলোচ্য বিষয়—বৌদ্ধধর্ম্ম (তৃতীয় বক্তৃতা), বক্তা—সভাপতি মহাশয় স্বয়ং।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, আলোচ্য বিষয়—৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কবিতা পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রস্তাবগুলির সম্পর্কে নিম্নলিখিত মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার গুণাবলী কীর্ত্তন করেন—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা আষাঢ়, সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস। আলোচ্য বিষয়—প্রাচীন গৌড়ের ভাস্কর্য্য (Sculptures in Ancient Gauda) বক্তা—শ্রীযুক্তা ডাঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ পি-এইচ ডি

(Dr. Stella Kramrisch, Ph. D.)। এই বক্তৃতা ইংরাজিতে হয় এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শিত হয়।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—১৪ই আষাঢ়, বিষয়—মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব। এই দিন প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোড, গবর্মেণ্ট সিমেট্রিতে কবিবরের সমাধি-ক্ষেত্রে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবির স্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা হয়। শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর একটি কবিতা পাঠের পর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ, শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারি-লাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন।

এই দিন অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে এই উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতি—শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল। শ্রীযুক্ত সিতেশরঞ্জন ঘোষ মহাশয় একটি গান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় কবির রচনা আবৃত্তি করেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল মহাশয় কবির কাব্য আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২৬এ আষাঢ়, সভাপতি—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ। আলোচ্য বিষয়—বেতারের আবিষ্কার (Discovery of Wireless), বক্তা শ্রীযুত ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্‌সি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—১২ই অগ্রহায়ণ, সভাপতি—স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন, এম এ, বি এল, এল এল ডি, সি আই ই, সি বি ই। প্রবন্ধ—বাস্তব জীবনে ফলিত-জ্যোতিষের স্থান, লেখক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—৩০এ মাঘ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই। আলোচ্য বিষয়—ছাতনায় চণ্ডীদাস বিষয়ে বক্তৃতা, বক্তা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুর।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—২৭এ ফাল্গুন, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই। প্রবন্ধ—জ্ঞান-উৎপাদ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, লেখক—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

নবম বিশেষ অধিবেশন—৫ই চৈত্র, সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। প্রবন্ধ—প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব, লেখক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

দশম বিশেষ অধিবেশন—১৯এ চৈত্র, সভাপতি—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী। প্রবন্ধ—প্রাচ্য দর্শনে মুক্তি-তত্ত্ব (প্রথমাংশ) লেখক—শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

একাদশ বিশেষ অধিবেশন—২৩এ চৈত্র, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই। আলোচ্য বিষয়—'সরস্বতী' বিষয়ে বক্তৃতা (প্রথমাংশ), বক্তা—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সান্ধ্য-সম্মিলন

পরিষদের মন্দির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও ইহার চিত্রশালা এবং গ্রন্থাগারের অবস্থা দেখাইবার জন্য করপোরেশনের মেয়র ও চীফ একজিকিউটিব অফিসার, অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণকে আলোচ্য বর্ষের ২৩এ ফাল্গুন সোমবার সন্ধ্যা ৭টার সময় পরিষদের এক সান্ধ্য-সম্মিলনে আহ্বান করা হয়। মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় ও অন্যান্য কাউন্সিলারগণ এই সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ উপস্থিত থাকিয়া সকলকে পরিষদ্ মন্দিরের আশু সংস্কারের আবশ্যকতা, গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার স্থানের ও আধারের অভাবের বিষয় বুঝাইয়া দেন। তাঁহারা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া করপোরেশনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যে পরিষদের ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মতপ্রকাশ করেন।

এই সান্ধ্য-সম্মিলন সম্পন্ন করিতে প্রায় তিন শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় প্রত্যেকে এই জন্য ১০০৲ দান করিয়াছিলেন।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ—

মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্নি

ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন এম এ, বি এল, এল এল ডি, সি আই ই, সি বি ই, এটর্নি

শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু রসায়নাচার্য্য বাহাদুর, সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ব্যারিষ্টার

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এটর্নি

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, এডভোকেট

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর পরিষদের যাবতীয় অর্থের ব্যয় পরিচালনের এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর আয়-বিভাগের ভার অর্পিত ছিল, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী মুদ্রণ-বিভাগের এবং স্মৃতিরক্ষা বিভাগের ভার অর্পিত ছিল, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর সাহিত্যিক অনুসন্ধান বিভাগের পত্রব্যবহারের ভার এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয়ের উপর শাখা-পরিষৎ ও কার্য্যালয় পরিদর্শনের ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সাধারণ পত্রব্যবহারের ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু নিজের বিভাগ ব্যতীত পরিষদের আয় বৃদ্ধির বিষয়েও সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় ত্রয়স্ত্রিংশ ভাগ পত্রিকার চারি সংখ্যা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের ধনরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন, ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ছাত্রসভ্যগণকে প্রয়োজনমত উপদেশাদি দান করিয়া তাঁহাদিগকে সাহিত্যিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় পরিষদ্ মন্দির হইতে চিত্রশালার দ্রব্যাদি রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু দ্রব্যগুলি মিলাইয়া শ্রেণীভেদে সুবিভক্ত করিবার সুযোগ পান নাই। যেহেতু রমেশ-ভবনে আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সকল প্রকার দ্রব্যই অস্থায়িভাবে রক্ষিত হওয়ায় তথায় নিতান্তই স্থানাভাব ঘটিয়াছে। গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ও পরিষদের পুস্তকালয়টির প্রায় সমস্ত পুস্তকই রমেশ-ভবনে অস্থায়িভাবে স্থানান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ জন্য গ্রন্থাগারের তালিকা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য, বিশেষতঃ 'সাহিত্য-সভা' হইতে প্রাপ্ত পুস্তকগুলি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। স্থানাভাবে তাঁহার বিভাগের কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। আয়ব্যয়পরীক্ষক শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্

২। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি

৩। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ

৪। " রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ

৫। " জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

৬। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন)

৭। " ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি

৮। " বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

৯। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

১০। " ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস-সি, এফ জেড এস

১১। " লেপ্‌টানেণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ

১২। " ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ

১৩। " মন্মথমোহন বসু এম এ

১৪। " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

১৫। " বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ

১৬। " অমলচন্দ্র হোম

১৭। " হেমচন্দ্র সরকার এম এ

১৮। " নরেন্দ্র দেব

১৯। " নিবারণচন্দ্র রায় এম এ

২০। " ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ ডি

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

২। " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ

৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
৪। " ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল
৫। " আশুতোষ চৌধুরী
৬। " মহেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১২টি সাধারণ এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং তিন বার সার্কুলার দ্বারা সমিতির সভ্যগণের মত লইয়া কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। সমিতিতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ও কতকগুলি আলোচিত বিষয়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—

১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়-ব্যয়-সমিতি, ৬। চিত্রশালা-সমিতি, ৭। পুস্তকালয়-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। পরিষদ্ মন্দির সংস্কার-সমিতি, ১০। বিনয়কুমার সরকার সংবর্দ্ধনা-সমিতি, ১১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি—চিত্রনির্ব্বাচন-সমিতি, ১২। পুরস্কার-প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি, ১৩। ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান-সমিতি, ১৪। আয়-বৃদ্ধি ও ব্যয়-সংক্ষেপ সমিতি, ১৫। বার্ষিক-কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

(খ) চণ্ডীদাসের পদাবলী, বিদ্যাপতির পদাবলী ও গৌরপদতরঙ্গিণী পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(গ) চন্দননগর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রদর্শনীতে এবং কলিকাতায় শ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দিরের প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা হইতে কোন কোন দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী ই, বি, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক গ্রহণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার এবং ঐ বাড়ী Ancient Monuments Act অনুসারে সংরক্ষণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(ঙ) পুনার মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলনে, হুগলী জেলা ঐতিহাসিক ও পাঠাগার সমিতির অধিবেশনে এবং মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়।

(চ) পরিষদ্ মন্দির মেরামতের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে দুই মাসের জন্য পুস্তকালয়ের পুস্তক আদান প্রদান বন্ধ রাখা হইয়াছিল এবং পরিষদের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

(ছ) পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য শ্রীযুত কে সি ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর ১১৫১৫৵৹ এষ্টিমেট মনোনীত হইয়া তাঁহাদিগকেই মেরামতের কার্য্যভার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

(জ) কলিকাতা করপোরেশন হইতে যে ২৫০০০৲ দান পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণের দরুন কণ্ট্রাক্‌টারের দেনা মিটাইবার জন্য উক্ত রমেশ-ভবনে ১০০০০৲ হাওলাত দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

(ঝ) করপোরেশনের উক্ত দানের টাকার মধ্যে ১০০০০৲ হাওলাত দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত ১৫০০০৲ বাড়ী মেরামতের কার্য্যে ব্যয় করিবার পূর্ব্বে সেণ্ট্রাল ও লয়েডস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ঐ ব্যাঙ্ক হইতে আবশ্যকমত এই কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য টাকা উঠান হইবে, তাহাও স্থির হইয়াছিল।

(ঞ) কলিকাতাবাসী যে সকল সদস্য নূতন নিয়মানুসারে ১২৲ চাঁদা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন নাই, তাঁহাদের নিকট হইতে সম্মতিপত্র আনিবার জন্য একজন অস্থায়ী লোক ২৫৲ বেতনে ও ট্রামের ভাড়া ১০৲ দিয়া নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

(ট) পরিষদের সাধারণ তহবিলে এ পর্য্যন্ত যে সকল গচ্ছিত তহবিলের অর্থ হাওলাত লওয়া হইয়াছিল, তাহা সমস্তই শোধ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তাহা শোধ দেওয়া হইয়াছে।

(ঠ) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের পুথি ও অন্যান্য দ্রব্যগুলির শ্রেণীবদ্ধ তালিকা করিবার জন্য উক্ত শাখার অনুরোধে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয়কে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ড) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "কমলা লেক্‌চারশিপ কমিটি"তে ও "জগত্তারিণী সুবর্ণপদক" সমিতিতে যথাক্রমে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

(ঢ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় শুক্রনীতিসার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া এবং নিজব্যয়ে ছাপাইয়া পরিষৎকে দান করিবেন। এই গ্রন্থ পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

(ণ) পরিষদের আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার জন্য আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় এই বিষয় আলোচনা করিয়া মন্তব্য দিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান-শাখা-সমিতি

অধিবেশন-সংখ্যা—সাহিত্য-শাখা—৪
ইতিহাস-শাখা—১
দর্শন-শাখা—২
বিজ্ঞান-শাখা—৩

মনোনীত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

সাহিত্য-শাখা—

(১) গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি-লিট্।

(২) খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা—লেখক ঐ।

(৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গী—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

(৪) হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিট্।

(৫) কবীন্দ্র রমাপতি—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

(৬) ভাটপাড়ার কবি ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের জীবনচরিত্র এবং তাঁহার কাব্যালোচনা—শ্রীযুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম এ।

(৭) বাঙলায় নারীর ভাষা—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

(৮) দীন চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ।

(৯) বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর ধারণা—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

এই শাখায় স্থির হইয়াছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা' নামক পুথিখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক।

ইতিহাস-শাখা—

(১) বৌদ্ধধর্ম্ম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

দর্শন-শাখা—

(১) জৈনদর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচর্য্য এম এ, বি এল।

(২) প্রাচ্য-দর্শনে মুক্তিতত্ত্ব—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(৩) জ্ঞান উৎপাদ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞান-শাখা—

(১) ব্রহ্মাণ্ড সসীম, কি অসীম—ডাঃ শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন সেন এম এ, পি-এচ ডি।

(২) কয়লা ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার—শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম এ, এম এস্-সি।

(৩) ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস-সি, এফ জেড্ এস্।

(৪) রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ—লেখক ঐ।

(৫) জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

(৬) প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব—লেখক ঐ।

এই শাখার কর্ত্তৃত্বে যে বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কাজ হইতেছিল, তাহা এখনও শেষ হয় নাই এবং রসায়ন গ্রন্থ প্রকাশের আলোচনাও শেষ হয় নাই।

উক্ত চারি শাখার সভাপতি ও আহ্বানকারিগণের নাম—

সভাপতি—

সাহিত্য-শাখার—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

ইতিহাস-শাখার— ঐ ঐ

দর্শন-শাখার—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল্।

বিজ্ঞান-শাখার—শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, ডি এস্‌সি।

আহ্বানকারী—

সাহিত্য-শাখা—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ।

ইতিহাস-শাখা—শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট্‌।

দর্শন-শাখা—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

বিজ্ঞান-শাখা—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্‌সি, এফ জেড্‌ এস্‌।

জ্যোতিষশাখা

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার একটি অধিবেশন হইয়াছিল। স্থির হইয়াছে যে, বৎসরের মধ্যে অনধিক ছয়টি জ্যোতিষিক প্রবন্ধ পাঠের জন্য বিশেষ অধিবেশন এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনার জন্য চারিটি বৈঠকের ব্যবস্থা হইবে। ঐ সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ অধিবেশনে দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

চিকিৎসা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

পুঁথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পুথিশালার র‍্যাক্‌ ও আলমারীগুলি রমেশ-ভবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই জন্য পুথিশালার কোন কার্য্যই হয় নাই। গত বৎসর নানা স্থান হইতে যে সকল প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল, সেগুলিও তালিকাভুক্ত করিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে পুথিসংগ্রহের কার্য্য আশাপ্রদ হয় নাই। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন দুইখানি পুথি দান করিয়াছেন এবং কলিকাতার সাহিত্য-সভা হইতে তিনখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তালিকাভুক্ত পুথির সংখ্যা যাহা গত বর্ষশেষে দেখান হইয়াছিল (৪৬৯৪ খানি), তাহাই রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পুথিশালার প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভূতপূর্ব্ব পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং বর্ত্তমান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের সংকলিত।

এতদ্ব্যতীত পুথিশালার শ্রেণীভেদে পুথির তালিকা-প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রন্থাগার

পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের উন্নতি-বিধানার্থ পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতা করপোরেশন হইতে বর্ত্তমান বর্ষেও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। করপোরেশন-প্রদত্ত অর্থে যথাসময়ে পুস্তকাদি ক্রয় করা হইয়াছে।

করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে ওয়ার্ড-কাউন্সিলার ডাঃ শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু এম বি মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন। করপোরেশনের নব-নির্ব্বাচিত অন্যতম ওয়ার্ড-

কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট পুস্তকসংখ্যা ১৯,০২৩; তন্মধ্যে বাঙ্গালা ১০,১২৮, ইংরাজি ৬৮৮৪ এবং বাঁধান মাসিক পত্রিকা ২০১১ খানি। বর্ত্তমান বর্ষে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে ৬৬ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ৩০০ খানি উপহৃত। ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ১০৪ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১২১ খানি উপহারপ্রাপ্ত। বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত ৫৯১ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক)	পূর্ব্বোল্লিখিত	১৯০২৩
(খ)	বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(গ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার	২২৬০
(ঘ)	রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার	৭৩২
(ঙ)	সাহিত্য-সভার পুস্তকালয়	২৫৪০
	সর্ব্ব মোট	২৮১০১

পূর্ব্বে প্রাপ্ত ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের, শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের এবং বান্ধব পুস্তকালয়ের পুস্তকগুলি পরিষদের সাধারণ পুস্তকালয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত ১৯০২৩ খানির মধ্যেই এই সকল বই রহিয়াছে।

স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার কর্তৃপক্ষ গত ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে সাহিত্য-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদন অনুসারে সভার পুস্তকালয়ের ১১টি আলমারী সমেত ২৫৪০ খানি পুস্তক পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে পরিষৎ বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

পরিষদের হিতৈষী সদস্য, গ্রন্থকার এবং প্রকাশকগণ গ্রন্থসংগ্রহকার্য্যে এবং গ্রন্থাদি উপহার দিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে। পরিষদের পরমহিতৈষী প্রাচীন সদস্য শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় মহাশয় দুইটি আলমারী সমেত ১৭৬ খানি বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহরমপুর—রাধারমণ যন্ত্রে প্রকাশিত বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, এটর্ণী মহাশয় বাঙ্গালা ১৩ খানি ও ইংরাজী ৪৭ খানি, মোট ৬০ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলি পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলীর সহিত বিনিময় করিতেছেন।

আমেরিকার Smithsonian Institution তাঁহাদের প্রকাশিত ১০ খানি মূল্যবান্ পুস্তক ও পুস্তিকা উপহার পাঠাইয়াছেন। আমেরিকার Museum of Fine Arts,

Anthropological Association এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Oriental Studies তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইয়াছেন।

সাময়িক পত্রের মধ্যে ৪ খানি দৈনিক, ৫০ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, ১১১ খানি মাসিক, ২ খানি দ্বৈমাসিক ও ৬ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেট ও কলিকাতা করপোরেশন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটখানি নিয়মিত পাঠাইতেছেন। দৈনিক পত্রের মধ্যে The Englishman ও The Statesman এবং মাসিক পত্রের মধ্যে Indian Antiquary, The Modern Review ও মাসিক বসুমতী ক্রয় করা হইয়াছিল। [সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয় সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, আগামী বর্ষমধ্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটি পুস্তকাধার প্রস্তুত করা হইবে। বাড়ী মেরামত কার্য্য শেষ হইলেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে ৩১৮ জন সদস্য পুস্তক পাঠার্থ বাড়ীতে পুস্তক লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ৫৭১১ বার পুস্তক পাঠার্থ দেওয়া হইয়াছিল। মন্দির মেরামতের জন্য গ্রন্থাগার দুই মাস বন্ধ থাকার দরুন প্রতিদিন গড়ে ৫০ জন পাঠক ও সদস্য পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠের জন্য আসিয়াছিলেন।

পরিষদের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট ছুটীর দিন ও বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ ২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার কার্য্য একরূপ বন্ধই রহিয়াছিল। পরিষৎ মন্দিরের ছাদ খারাপ হইয়া পড়ায় বৃষ্টির জল চিত্রশালার প্রায় সর্ব্বত্রই পড়িতে থাকে। এই জন্য চিত্রশালার দ্রব্যাদি রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেও স্থানাভাবে সেগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পরিষৎ মন্দির মেরামত হইলে চিত্র-শালার দ্রব্যাদি রমেশ-ভবনেই সাজাইয়া রাখিতে পারা যাইবে।

আলোচ্য বর্ষে সুষঙ্গাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর পরিষৎকে বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দান করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় ৪টি পাথরের গোলা, ১টি বিষ্ণুমূর্ত্তির ভগ্ন নিম্নাংশ এবং একটি পোড়া মাটির দ্রব্য দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ সুষঙ্গাধিপতির নিকট এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

রমেশ-ভবন

গত বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্যের যেটুকু বাকী ছিল, তাহা শেষ করিতে পারা যায় নাই। যে পর্য্যন্ত নির্ম্মাণকার্য্য হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ১০,০০০৲ টাকার

কিঞ্চিদধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় নয় হাজার টাকা কণ্ট্রাক্টার মহাশয়দের নিকট দেনা রহিয়াছে। তাঁহাদের বিশেষ তাগাদায় পরিষৎ হইতে ১০,০০০৲ টাকা হাওলাত লইয়া তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। রমেশ-ভবনের সহকারী সভাপতি মহাশয়ের চেষ্টায় এবং ভূতপূর্ব্ব মাননীয় বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন্ মহোদয়ের অনুগ্রহে বেঙ্গল গবর্মেণ্ট আগামী বর্ষে রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের সাহায্য বাবদ ১৬০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা হস্তগত হইলে পরিষদের উক্ত টাকা শোধ দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট টাকা রমেশ-ভবন নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতে পারিবে।

এত অসুবিধা সত্ত্বেও সত্বরে রমেশ-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন সম্পন্ন করিবার জন্য রমেশ-ভবনের সভাপতি মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বরোদার মহারাজ বাহাদুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বরোদারাজ দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা আগমন সম্ভবপর হইবে না।

স্মৃতিরক্ষণ

আলোচ্য বর্ষে চিত্রপ্রতিষ্ঠার দ্বারা নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষা করা হইয়াছে,—

(ক) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (তৈলচিত্র)—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত।

(খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (রঙ্গীন ব্রোমাইড)—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রদত্ত।

(গ) অদ্বৈতচরণ আঢ্য (তৈলচিত্র)—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রদত্ত।

(ঘ) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ব্রোমাইড)—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন।

(ঙ) কবিগুণাকর রায় নবীনচন্দ্র দাস বাহাদুর (ব্রোমাইড্)—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত।

(চ) জ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত (ব্রোমাইড্)—ঐ ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। কি ভাবে ইঁহার স্মৃতিরক্ষা করা হইবে, তাহা ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বিশেষ অধিবেশনে গঠিত স্মৃতি-সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইবে।

(খ) চণ্ডীচরণ সেন—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বগৃহীত মন্তব্যানুসারে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অদ্য বার্ষিক অধিবেশনে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ক) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (ব্রোমাইড)—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই ছবি প্রস্তুতের জন্য নিম্নলিখিত চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যা—১০৲,

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—৫৲, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৫৲ ও শ্রীযুক্ত রামাপদ বসু—৫৲, মোট ১৫৲।

(খ) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (ব্রোমাইড)—শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু এই চিত্রখানিও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষার জন্য যে সকল ভাণ্ডার স্থাপিত আছে অথবা তজ্জন্য যে সাময়িক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(ক) কাশীরাম স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ৩০৩৶৯। বর্ষমধ্যে কোন আয়-ব্যয় নাই।

(খ) হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল—বর্ষমধ্যে আয় ৩৵০। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৭০০॥৵৩।

(গ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১৮৯২॥৶৯ ; বর্ষমধ্যে কোন আয়-ব্যয় হয় নাই।

(ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—বর্ষারম্ভে উদ্বৃত্ত ৯৬॥৴৯, ব্যয় ১৮৴৩, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৭৩॥৬।

(ঙ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৬৫।০, বর্ষমধ্যে কোন আয়-ব্যয় নাই।

(চ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার—বর্ষমধ্যে আয় ৫০৲, ব্যয় ৫০৲।

(ছ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ২৫০৲, আয় ১০৲, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ২৬০৲।

(জ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে পূর্ব্ববর্ষের উদ্বৃত্ত ১০০৲ মৌজুদ রহিয়াছে।

(ঝ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে ৫০৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে ; কোন আয়-ব্যয় হয় নাই।

(ঞ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ১৪৫৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। কোন আয়-ব্যয় হয় নাই।

(ট) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে পূর্ব্ববৎসরে সংগৃহীত ৩৯৲ টাকাই উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। মৃত মহাত্মার চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হইয়াছিল। একজন চিত্রকরকে তৈলচিত্র প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, চিত্রকর মহাশয় যে তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহা মনোনীত হয় নাই। উহা সংস্কারের ব্যবস্থা হইতেছে।

(ঠ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে প্রতিশ্রুত চাঁদার মধ্যে পূর্ব্ববৎসরে সংগৃহীত ৬৫৲ টাকাই উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। কোন আয় আলোচ্য বর্ষে হয় নাই।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষেও করিতে পারা যায় নাই।

অনেক হিতৈষী সদস্য ইঁহাদের কাহারও কাহারও চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষৎকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া একটু চেষ্টা করিলেই চিত্র বা অন্য কোনরূপ কার্য্যদ্বারা ইঁহাদের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে।

(ক) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, (গ) রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, (ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (ঙ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (চ) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (ছ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (জ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (ঝ) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (ঞ) প্রাণনাথ দত্ত, (ট) চারুচন্দ্র ঘোষ, (ঠ) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, (ড) রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, (ঢ) অশ্বিনীকুমার দত্ত, (ণ) ললিতচন্দ্র মিত্র, (ত) স্যর আশুতোষ চৌধুরী, (থ) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, (দ) মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, (ধ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ন) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (প) মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, (ফ) দামোদর মুখোপাধ্যায়।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষে তৃতীয় (৯ই আশ্বিন) ও পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১৯এ অগ্রহায়ণ) কতক-গুলি নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়াছে। নিম্নে সেগুলি লিপিবদ্ধ হইল। ১৫শ নিয়মটি ১৩১৪ বঙ্গাব্দের প্রথম হইতে প্রযুজ্য হইবে এবং অপরগুলি যে যে অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, সেই অধিবেশনের দিন হইতে কার্য্যকরী হইবে—ইহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

৯ম নিয়ম—যাঁহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য এককালে অন্যূন ২৫০৲ টাকা পরিষৎকে দান করিবেন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিলে, তাঁহারা পরিষদের আজীবন-সদস্য গণ্য হইবেন।

১৫শ নিয়ম—প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ টাকা দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক ১২৲ টাকা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।

১৬শ নিয়মের—"সাধারণ-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবেন" এই কথার পরবর্ত্তী অংশ উঠিয়া যাইবে।

১৬শ নিয়মের পর নূতন নিয়ম,—

১৬ (ক)—যে সদস্য অন্যূন ছয় মাস কাল সদস্যশ্রেণীভুক্ত না আছেন এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল চাঁদা না দিয়াছেন, তিনি কোন নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।

২৭শ নিয়মের পরিবর্ত্তে এই নূতন নিয়ম বসিবে—

২৭। ১লা চৈত্র তারিখে যে সদস্যের চাঁদা ৬ মাস বাকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না, কিংবা কোন কর্ম্মাধ্যক্ষপদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

২৭ (ক)। ১লা চৈত্র তারিখে যে সদস্যের চাঁদা নয় মাস বাকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি পরবর্ত্তী বৎসরের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনিয়োগ সম্বন্ধে ভোট দিতে পারিবেন না।

২৭ (খ)। ১৬ (ক) ও ২৭ (ক) নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সম্পাদক ১৫ই চৈত্রের মধ্যে ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া নোটিস্-বোর্ডে বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্তি পর্য্যন্ত টাঙ্গাইয়া রাখিবেন। যে কোন সদস্য এই ভোটারের তালিকার নকল লইতে পারিবেন।

৩০এ চৈত্র পর্য্যন্ত ঐ তালিকায় কোন ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইলে এবং তাহা সম্পাদকের গোচর করিলে তিনি তাহার সংশোধন করিবেন। তৎপরে ঐ তালিকা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩২শ নিয়মের ২১ স্থলে ১৯ হইবে, সহকারী সম্পাদক ৬ স্থলে ৪ হইবে এবং "দ্রষ্টব্য" অংশ উঠিয়া যাইবে।

৩৩ (ক) নিয়মের ১২শ পঙ্‌ক্তির "হইবে" এই কথার পর নিম্নোক্ত তিনটী নূতন নিয়ম বসিবে,—

৩৩ (খ)। ভোটারের তালিকাভুক্ত উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যকে সেই দিনকার সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত এক একখানি ব্যালটপত্র দেওয়া হইবে এবং তিনি তাহা পূরণ করিয়া স্বহস্তে সভাপতির সম্মুখস্থ কোন একটী ব্যালট্-বাক্সে রাখিবেন। ভোট দিবার সময় কোন সদস্য ভোটারশ্রেণীভুক্ত কি না, এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে সভাপতি তাহার মীমাংসা করিবেন এবং সে মীমাংসা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৩ (গ)। অতঃপর ভোট গণনার জন্য সভাপতি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ভোট-পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন এবং তিনি বা তাঁহারা ভোট গণনা করিয়া গণনা-ফল সভাপতির গোচর করিবেন। ভোট গণনাস্থলে পদপ্রার্থী স্বয়ং অথবা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং কোনরূপ আপত্তির বিষয় থাকিলে তৎক্ষণাৎ সভাপতির গোচর করিবেন। ঐ আপত্তি সম্বন্ধে সভাপতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৩ (ক) নিয়মের শেষ ৪ পঙ্‌ক্তি ("এইরূপে" হইতে "হইবে" পর্য্যন্ত) ৩৩ (ঘ) নিয়মরূপে গণ্য হইবে।

৩৩ (ঙ)। বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ব্যক্তিকে যে কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন সদস্য তাহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইবেন না।

৩৬ (ক) ধারার ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তির "সপ্তাহের" স্থলে "দশ দিনের" হইবে এবং ১১শ পঙ্‌ক্তির "পরে সদস্যদিগের নিকট" অংশ হইতে ১৫শ পঙ্‌ক্তির "করিবেন" পদের স্থলে এইরূপ বসিবে,—

"পরে সম্পাদকের সম্মুখে ঐ ভোট-পরীক্ষকগণ ভোটের সমষ্টি গণনা করিয়া, ভোটের সংখ্যার

ক্রম অনুসারে নাম সাজাইয়া, কে কত ভোট পাইয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, নিজ নিজ নাম স্বাক্ষরে ভোটসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি বাক্সে তালা বন্ধ ও শিল মোহর করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিবেন। বার্ষিক অধিবেশনে সদস্যগণের সম্মুখে সম্পাদক ঐ বাক্স খুলিবেন এবং যে ২০ জন অধিক ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া সভাপতি বিজ্ঞাপিত করিবেন।"

৩৬ (ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে,—

"বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ২০ জন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

৪২ (ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে,—

"কিন্তু কেহ কোন প্রস্তাব পাঠাইলে তাহা সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আগামী বা তৎপরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য যথাসম্ভব শীঘ্র প্রস্তাবকর্ত্তার গোচর করিবেন।"

৪২ (খ) নিয়মের "উপযুক্ত সময়ের মধ্যে" স্থলে "আগামী বা তাহার পরবর্ত্তী" হইবে।

৫৩ (খ) নিয়মের "২০" স্থলে "৩৫" হইবে এবং "যথোপযুক্ত দিনে" স্থলে "দুই মাস মধ্যে" হইবে।

৬৯ নিয়ম নিম্নোক্তরূপ হইবে,—

"সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিচারের জন্য প্রেরিত পত্রাদি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সমীপে উপস্থাপিত করিবেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এক্ষণে পরিষদের নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে শাখা রহিয়াছে,—(ক) রঙ্গপুর, (খ) গৌহাটী, (গ) চট্টগ্রাম, (ঘ) ত্রিপুরা, (ঙ) বরিশাল, (চ) কৃষ্ণনগর, (ছ) উত্তরপাড়া, (জ) বর্দ্ধমান, (ঝ) কাল্না, (ঞ) মেদিনীপুর, (ট) ভাগলপুর, (ঠ) কাশী, (ড) মীরাট, (ণ) দিল্লী এবং (ত) কটক। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গের নিম্নলিখিত জেলাগুলিতেও পরিষদের শাখা ছিল,—(ক) বহরমপুর, (খ) ময়মনসিংহ, (গ) রাজসাহী, (ঘ) বাঁকুড়া ও (ঙ) মানভূম। বর্ত্তমান শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, কাশী, চট্টগ্রাম ও কৃষ্ণনগর শাখার কার্য্যকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখাগুলির বিশেষ কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। বঙ্গের বাহিরে দিল্লী-শাখার অস্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু তথায় বিশেষ কিছু কাজ হয় কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। এই সকল শাখা, প্রবাসী বাঙ্গালীর মাতৃভাষানুরক্তির ফলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আশা করা যায়, তাঁহারা ভবিষ্যতে শাখাগুলিকে বজায় রাখিয়া প্রবাসে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বজায় রাখিবেন। বঙ্গদেশের শাখাগুলির নীরবতার

কারণ অনুসন্ধান করিয়া সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে। আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন, আশা করি।

ছাত্র-সভ্য

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভ্যগণের তিনটী অধিবেশন হইয়াছিল। এই তিন অধিবেশনে ছাত্র-সভ্যগণকে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশে নিম্নলিখিত সাহিত্যিক অনুসন্ধান কার্য্য করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের আলোচনা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষারম্ভে ৩৫ জন ছাত্র সভ্য ছিলেন। বর্ষশেষে এই সংখ্যা ৪৯ হইয়াছে।

ছাত্র-সভ্য	বিষয়	অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায়	পদার্থবিদ্যা	শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।
,, নীরজভূষণ ঘোষ	বাঙ্গালা সাহিত্য	,, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
,, সুধাংশুকুমার বসু	,,	,, রমেশ বসু
		,, বসন্তরঞ্জন রায়
,, প্রফুল্লভূষণ মিত্র	জাতিবিজ্ঞান ও	
	গণিত জ্যোতিষ	,, ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
,, বিদ্যাপতি ঘোষ	মুরশিদাবাদের	
,, গিরিজাপ্রসন্ন সিংহ	রেশমের ব্যবসা	

পরিষদ্ মন্দির সংস্কার

বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে জানান হইয়াছিল যে, পরিষদ্ মন্দিরের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপভাবে এই মন্দিরের মেরামতের কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়গণ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে মন্দির পরীক্ষা করেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার মন্দির দেখিয়া, ইহার কোন কোন আশঙ্কাজনক স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করিবার আদেশ দেন। অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদক মহাশয়কে পরিষদ্ মন্দির মেরামতের ব্যবস্থা করিবার ভারার্পণ করেন। পরে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়কেও এই সমিতিতে লওয়া হয়। আলোচনার পর পরিষদ্ মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে মেরামত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মেরামতের জন্য যে সকল এষ্টিমেট পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি বিচার করিয়া, যাঁহারা পূর্ব্বে পরিষদ্ মন্দির একবার মেরামত করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই শ্রীযুক্ত কে, সি, ঘোষ এণ্ড কোম্পানী কণ্ট্রাক্টরগণের ১১৫১৫৮/০ টাকার এষ্টিমেট গৃহীত হয় ও কার্য্যপ্রাপ্তির পর তিন মাসমধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া দিবার সর্ত্তে তাঁহাদিগকে কার্য্যভার দেওয়া হয়। গত ২৬শে চৈত্র তারিখে তাঁহাদিগকে কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে।

কন্ট্রাক্টারগণকে মেরামতের কার্য্য করিবার আদেশ দিবার বহু পূর্ব্ব হইতে এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী অর্থের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষরূপ চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছিল। বিগত বর্ষে সাধারণ-সদস্যগণের সম্মতিক্রমে পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে ২৫০০৲ ধার করিয়া, এই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে স্থির হইয়াছিল; কিন্তু তাহা হইলেও অবশিষ্ট টাকার ব্যবস্থা এবং এই ধার শোধের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষের চৈত্রমাস মধ্যে হয় নাই। তৎপূর্ব্বে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে কতিপয় উৎসাহী সদস্য নানাস্থানে অর্থ ভিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় গবর্নমেণ্ট ও কলিকাতা করপোরেশনের সহিত এ সম্বন্ধে পত্রব্যবহার হয়। তৎপরে সৌভাগ্যের বিষয়, কলিকাতা করপোরেশন পরিষৎকে ২৫০০০৲ দান করেন। এই টাকা পাইয়াই পরিষৎ তাঁহার মন্দির রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। পরিষৎ এই মহৎ দানের জন্য করপোরেশনের নিকট কতখানি ঋণী, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। পরিষৎ এক্ষণে ভরসা করেন যে, পরিষদের মন্দির মেরামত ও ইহার পুস্তকালয়ের আধার নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য এই অর্থের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, করপোরেশন হইতে এই দানপ্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত সহৃদয় বন্ধুগণ পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জী, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন, শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত বারাণসী-বাসী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্র। ইহাঁদিগকে পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কয় সংখ্যা পত্রিকায় শ্রেণীভেদে যে কুড়িটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি সমস্তই সাহিত্যাদি চারি শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির নাম ও তাহাদের লেখকগণের নাম লিপিবদ্ধ হইল।

প্রাচীন সাহিত্য—১। দীন চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয়-লিখিত।

পুস্তক ও প্রাচীন পুথির বিবরণ—১। সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয়—লেখক মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল্, ২। ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ও আলোচনা—লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ; ৩। হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী—লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিট্।

ভাষাতত্ত্ব—১। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা—লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট; ২। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গী—লেখক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ; ৩। বাঙলায় নারীর ভাষা—লেখক ঐ।

প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব—১। গ্রাম্য শব্দসঙ্কলন—লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্, ২। শব্দ সংগ্রহ—মোল্লা শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহ্মদ।

ইতিহাস—১। প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল—লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, ২। বাঙ্গালা ভাষায় আসামের ইতিহাস—লেখক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূইঞা এম এ, বি এল, ৩। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই; ৪। বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা—লেখক শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

জীবনী—১। ৺ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দর্শন—১। প্রমাণ—লেখক শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল।

বিজ্ঞান—১। ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়—লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্ সি, এফ জেড এস।

জীব-বিজ্ঞান—১। রোমাদিগের শ্রেণীবিভাগ—লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এসসি, এফ জেড এস।

বাণিজ্যতত্ত্ব—১। কয়লা ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার—লেখক শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম এ, এম এস্‌সি।

জ্যোতিষ—১। ব্রহ্মাণ্ড সসীম, কি অসীম—লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার নিখিলরঞ্জন সেন এম এ, পি-এচ ডি; ২। জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

এই সকল প্রবন্ধ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষের পত্রিকায় বিগত বর্ষের পত্রিকার শব্দসূচী প্রকাশিত হইয়াছে। এই শব্দসূচী পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

ছাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির কর্তৃত্বাধীনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়স্ত্রিংশ ভাগের চারি সংখ্যায় ৩১৷৷০ ফর্ম্মা, মাসিক, বিশেষ ও সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ ৩৬ ফর্ম্মা

২ পেজ * পত্রিকার সূচী ১ ফর্ম্মা এবং বিজ্ঞাপন, মলাট প্রভৃতি ৫ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নিম্নলিখিতরূপ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।—

১। পদকল্পতরু, ৪র্থ খণ্ড ৫ ফর্ম্মা (২৮—৩২), ২। ন্যায়দর্শন, ৪র্থ খণ্ড ২৪ ফর্ম্মা (২৬—৪৭ মূল, সূচী ২, মলাট ও টাইটেল), ৩। সংকীর্ত্তনামৃত ৪ ফর্ম্মা (৬—৯), ৪। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল ভূমিকা, সূচী, মলাট প্রভৃতিতে ২॥০ ফর্ম্মা, ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮ ফর্ম্মা (১৫-২২), ৬। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ২৬॥০ ফর্ম্মা, ৭। কৌলমার্গ-রহস্য ৫ ফর্ম্মা (৫—৯)—মোট ৭৫ ফর্ম্মা। ইহার মধ্যে ১। ন্যায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড, ৪। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, ৩। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস এবং ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ,—এই চারিখানি বই আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির ৩টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং বিজ্ঞাপন-পত্র দ্বারা সভ্যগণের মতামত জানিয়া দুইবার অধিবেশনের কার্য্য সমাধা করা হইয়াছিল। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে,—

(ক) ন্যায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত।

(খ) শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত।

(গ) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ অনূদিত।

(ঘ) প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা—

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত।

নিম্নোক্ত তিনখানি গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য পরিচালিত হইয়াছে,—

(ক) পদকল্পতরু ৪র্থ খণ্ড —শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ সম্পাদিত।

(খ) সংকীর্ত্তনামৃত— শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত।

(গ) কৌলমার্গ-রহস্য — ৺ সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ-লিখিত।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে মহাভারতের আদিপর্ব্বের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় ইহার মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত "রসায়ন" নামক গ্রন্থের মুদ্রণ এবং বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতকার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

* ৩১শ বার্ষিক মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ৫ ফর্ম্মা ২ পেজ,
৩২শ " " " " ১২ ফর্ম্মা,
৩১শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৬ ফর্ম্মা, ৩৬ ফর্ম্মা ২ পেজ।
৩২শ " " ৬ ফর্ম্মা ৪ পেজ
৩৩শ বার্ষিক মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ৬ ফর্ম্মা ৪ পেজ

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বসমেত আয় ৪০৭৯০৮/৩ টাকা এবং ব্যয় ২৫৫৯৬৬৶৯ টাকা হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের সাধারণ-তহবিলের উদ্বৃত্ত ছিল ৫৪০॥৶৭, উহাতে বর্ত্তমান বর্ষের আয় যোগ ও ব্যয় বাদ দিয়া বর্ষশেষে সাধারণ-তহবিলের ১৫৬৩৪॥৴১ টাকা এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৬৬০৮৴৯ টাকা—সর্ব্বসমেত পরিষদের ৪২২৪০॥৶১০ টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বজেটে ধৃত চাঁদা সংগ্রহ না হওয়ায় পূজার সময় পাওনাদারগণের বিলের টাকা মিটাইবার জন্য বাধ্য হইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ১৫০০৲ টাকা হাওলাত গ্রহণ করিয়াছেন। বজেট অপেক্ষা ১২৮৭৲ টাকা চাঁদা আদায় কম হইয়াছে। ৫৮০ জন সদস্যের চাঁদা বহুদিন হইতে অনাদায় থাকায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদিগকে সদস্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই সকল সদস্যের ১৪,৬৪৬৶৹ চাঁদা বাকী ছিল। এতদ্ব্যতীত মৃত সদস্যগণের বাকী চাঁদার পরিমাণ ১৬৬॥০ টাকা। বর্ষারম্ভে ১৫,১৯২৶৹ সকল সদস্যের চাঁদা বাকী ছিল। তাঁহাদের বর্ত্তমান বর্ষের দেয় চাঁদার পরিমাণ ৯৪৮০৲। উক্ত বাকী চাঁদা (১৫, ১৯২৶) এবং বর্ত্তমান বর্ষের দেয় চাঁদা ৯৪৮০৲ যোগ করিলে বর্ষশেষে সদস্যগণের নিকট ২৪,৬৭২৶৹ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে মাত্র ৫৪৬৩৲ আদায় হইয়াছে এবং ১৪,৮১৩॥৶৹ টাকা অনাদায় থাকায় উহা প্রাপ্য চাঁদার তালিকা হইতে বাধ্য হইয়া বাদ দিতে হইয়াছে। এক্ষণে বর্ষশেষে যে ৪৩৯৬॥৹ টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, উহা বর্ত্তমান সদস্যগণের নিকট আদায়ের সম্ভাবনা আছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে সদস্যগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের আপন আপন বকেয়া ও হাল চাঁদা বর্ষমধ্যে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে চাঁদা আদায় খাতে বহু অর্থ আদায় হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেনার পরিমাণ কমিয়া গিয়া পরিষদের আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা লাভ হয়। সদস্যগণ বিশেষভাবেই অবগত আছেন যে, পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় সদস্যগণের বার্ষিক দেয় চাঁদার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। বর্ষারম্ভে চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া বজেট প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু বর্ষশেষে বজেট অনুযায়ী আয় না হইলে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—যদিও বর্ষমধ্যে একবার বজেট সংশোধিত হয়। তজ্জন্য সদস্যগণের নিকট আমরা সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছি, যেন তাঁহারা নিজ নিজ দেয় চাঁদা বর্ষারম্ভেই শোধ করিয়া দেন।

ঋণ-শোধ—বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ-তহবিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যে সকল ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান বর্ষে পরিশোধ হইয়াছে। যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ না হওয়ায় মাত্র পরিষদের সাধারণ স্থায়ী তহবিলের ৪৬২৯।০ হাওলাত রহিয়া গেল। তিনটি বিশিষ্ট ভাণ্ডারের যে ২৬৮৶৹ (১। লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল ১৯০৶৩, ২। মাইকেল মধুসূদন

দত্ত স্মৃতি-তহবিল ১৩৶১ এবং ৩। দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার—৬।৶১ মোট ২৬৮৸৵০) টাকা ঋণ দেখান হইয়াছে, তাহা ঋণ নহে। কারণ, সেই সেই ভাণ্ডারের কার্য্য-পরিচালনের জন্য ঐ টাকা সাধারণ-তহবিলে আমানত দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণ স্থায়ী-তহবিলের ৪৬২৯।০ ঋণ শোধ করিতে পারিলেই এবং পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের চল্‌তি কাজের বাজার-দেনা ও ব্যক্তিগত হাওলাত ৩৯৫২৶০ মোট ৭৫৮১।৶১ শোধ করিতে পারিলে পরিষৎ ঋণমুক্ত হইতে পারেন।

ঋণপরিশোধের জন্য বর্ত্তমান বর্ষে ৩০৩৭৲ আদায় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে এই জন্য মোট ৬৭৪৭৲ সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহাদের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে এবং পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, যাঁহারা ঋণ-পরিশোধ-তহবিলে দান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। ঋণ-পরিশোধ-সমিতির সভ্য-গণের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, তাঁহারা আর একবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া পরিষদের বাকী ঋণের টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষৎকে ঋণমুক্ত করুন।

পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পরিষদের যাবতীয় হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। অন্যতম হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাথ বাবু এক মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও সদস্যগণের অবগতির জন্য প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহারা পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ-ভাজন।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির ৫টি অধিবেশন হইয়াছিল।

পরিষদের আয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি কথা নিবেদন করা বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইতেছে। নবপ্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের চাঁদা বার্ষিক ১২৲ ও মফঃস্বলবাসী সদস্যের চাঁদা ৬৲ ধার্য্য হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী সকলেই পরিষদের হিতৈষী, তাহা আমরা অবগত আছি। এক্ষণে যাঁহারা এখনও পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহা-দিগকে সদস্যপদ গ্রহণে অনুরোধ জানাইতেছি। পরিষদের কতিপয় সদস্য মাসিক ৩৲, ৪৲ ও ৫৲ হিসাবে চাঁদা দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে এই অনুপাতে চাঁদা দিতে পারেন, এরূপ বাণী ও রমার বরপুত্রের অভাব নাই। পরিষদের এই আবেদন তাঁহাদের নিকট এই সুযোগে জানাইতেছি।

পূর্ব্বে আজীবন-সদস্যগণের এককালীন চাঁদা ৫০০৲ নির্দ্ধারিত ছিল। এক্ষণে সাধারণের সুবিধার জন্য ২৫০৲ দিয়া আজীবন-সদস্যপদগ্রহণের নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। পরিষৎ আশা করেন যে, বঙ্গবাণীর পৃষ্ঠপোষক ধনিসম্প্রদায় এই শ্রেণীর সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া পরিষদের বল বৃদ্ধি করিবেন।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-সদস্যগণের চাঁদা, গবর্মেন্ট ও মিউনিসিপালিটির বার্ষিক দান এবং

কোম্পানীর কাগজের সুদ ব্যতীত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের জন্য কতকগুলি দান পাওয়া গিয়াছিল। পরিষৎ এই সকল চাঁদাদাতৃগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

(ক) পরিষদ্ মন্দির মেরামত ও পুস্তকালয় সংরক্ষণের জন্য দান।

(খ) পরিষদের ঋণ পরিশোধের জন্য দান।

(গ) গ্রন্থ-প্রকাশার্থ দান।

(ঘ) পুস্তক খরিদের জন্য দান।

(ঙ) সাধারণ-তহবিলে দান।

(চ) পত্রিকার মলাট মুদ্রণের জন্য দান।

(ছ) ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ খরিদের জন্য দান।

(জ) কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণকে সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

পরিশিষ্টে চাঁদার পরিমাণ ও দাতৃগণের নাম প্রদত্ত হইল।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় আলোচ্য বর্ষে "মাথুর-কথা" নামক পরিষদ্গ্রন্থ মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে জমা হইবে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর কাগজের সুদ ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে সদস্যগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলির বিক্রয় দ্বারা ৭১৵০ আয় হইয়াছিল। এই অর্থ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুঃস্থা কন্যাকে মাসিক সাহায্য দেওয়ার পর বর্ষশেষে ২৩৬৪৶৩ এই ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে তাঁহাকে ৬০৲ এবং তিনি গত বৎসর কলিকাতায় না থাকায় সেই বৎসরের তাঁহার প্রাপ্য বাকী ২৪৲ আলোচ্য বর্ষে দেওয়া হয়। তিনি আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসমেত ৮৪৲ পাইয়াছেন।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

৺অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ১০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ সমেত বর্ষশেষে এই ভাণ্ডারে ১১৯৫৲ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই অর্থের দ্বারা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কোন কার্য্যই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই।

পরিষদ্ মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে পরিষদের মন্দির ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

পদক ও পুরস্কার

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও পদকের জন্য নির্ব্বাচিত বিষয়ে আশানুরূপ প্রবন্ধ পাওয়া যাইতেছিল না। এই জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রবন্ধগুলির বিষয় পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠন করিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং সম্পাদক। ইঁহারা যে ভাবে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। আলোচ্য বর্ষে রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বাহাদুর একটি সুবর্ণ-পদক শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ এটর্ণি মহাশয় একটি সুবর্ণ-পদক দান করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় ৫০৲ টাকার একটি পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া অগ্রিম ৫৲ দিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কোন অধিবেশন হয় নাই। পাবনাবাসিগণ পাবনায় অষ্টাদশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় অন্তর্বিপ্লবের জন্য পাবনা-বাসিগণ এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া আলোচ্য বর্ষে পাবনায় অধিবেশন হয় নাই। আগামী বর্ষে পাবনায় অধিবেশন হইবে কি না, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

গত রাধানগর অধিবেশনের মন্তব্যানুযায়ী হুগলী উত্তরপাড়ায় হুগলী জেলা ঐতিহাসিক-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উত্তরপাড়া-শাখার চেষ্টায় এই অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধি-বেশনের সময় একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল।

উপসংহার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল। বিগত দ্বাত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণের উপসংহারে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, "পরিষদের হিতৈষী কর্ম্মিগণের চেষ্টা ও উদ্যম পরিষৎকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য এবং পরিষদ্ মন্দিরের রীতিমত সংস্কার সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।" আলোচ্য বর্ষেও এই কথারই পুনরুক্তি করিতেছি। এবং আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের স্থায়ী তহবিল ব্যতীত অন্যান্য গচ্ছিত তহবিলের ঋণ শোধ হইয়াছে এবং মন্দির সংস্কারেরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, সাধারণ-ভাণ্ডারের আয় আশানুরূপ না হওয়ায় স্থায়ী-তহবিল হইতে এবারেও হাওলাত লইতে হইয়াছে।

একটি কথা এই স্থলে বিশেষ করিয়া পরিষদের হিতৈষী ও বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানাইতেছি। পরিষদের ঋণ শোধের জন্য এবং পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় পরিষদের সভাপতি মহাশয় যেরূপ অক্লান্ত যত্ন ও কায়িক পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা পরিষদের শুভার্থিগণের ও বিশেষভাবে ইহার কর্ম্মিগণের অনুকরণীয়। ইহা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় ও প্রেরণায় পরিষদের পরিচালকগণ পূর্ব্বো-ল্লিখিত ঋণশোধে ও মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

আর একটি বিষয় না জানাইলে এই উপসংহার অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। পরিষদের কার্য্য পরিচালনের জন্য যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ, শাখা-সমিতিগুলির আহ্বানকারিগণ এবং কোন কর্ম্মাধ্যক্ষপদে না থাকিয়াও যে সকল সহৃদয় সদস্য সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই সম্পাদক এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। সম্পাদককে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, লাঞ্ছনা, অসুবিধা অস্বচ্ছলতার মধ্য দিয়া পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছে; তজ্জন্য নানা বিষয়ে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে। সম্পাদক এই জন্য বিশেষ দুঃখিত।

পরিশেষে, যে সকল সহৃদয় উদারচেতা দাতা পরিষৎকে বিবিধ প্রকারে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

নানা কারণে এই বার্ষিক অধিবেশন এত বিলম্বে আহ্বান করিতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বাধ্য হইয়াছেন। তজ্জন্য সমিতির পক্ষ হইতে সম্পাদক সদস্যগণের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষের অর্দ্ধেক প্রায় গত হইল। সম্পাদক আশা করেন যে, এই বৎসরের অপরার্দ্ধ কালে নূতন উৎসাহী কর্ম্মিগণের চেষ্টায় পরিষদের অস্তিত্বের আবশ্যকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ৭ই আশ্বিন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। Amrita Bazar Patrika, ২। The Bengalee, ৩। The Calcutta Exchange Gazette, ৪। The Englishman *, ৫। The Forward, ৬। The Statesman *, ৭। আনন্দ-বাজার পত্রিকা।

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette, ২। The Calcutta Municipal Gazette, ৩। East Bengal Times, ৪। Indian Messenger, ৫। The Mussalman, ৭। Navavidhan, ৮। The Telegraph, ৯। আত্মশক্তি, ১০। আর্য্যাবর্ত্ত, ১১। এডুকেশন গেজেট, ১২। খাদেম, ১৩। খুলনা-বাসী, ১৪। গৌড়ীয়, ১৫। চারুমিহির, ১৬। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ১৭। জনমত, ১৮। ঢাকা-প্রকাশ, ১৯। ত্রিস্রোতা, ২০। নবযুগ, ২১। নাচঘর, ২২। পল্লীবাসী, ২৩। ফরিদপুর-হিতৈষিণী, ২৪। বঙ্গবাসী, ২৫। বঙ্গ-রত্ন, ২৬। বার্ত্তা, ২৭। বীরভূম-বার্ত্তা, ২৮। বিশ্ববার্ত্তা (হিন্দী), ২৯। মুক্তি, ৩০। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ৩১। মোহাম্মদী, ৩২। শক্তি, ৩৩। শিশির, ৩৪। সচিত্র শিশির, ৩৫। সঞ্জয়, ৩৬। সঞ্জীবনী, ৩৭। সময়, ৩৮। স্বরাজ, ৩৯। স্বায়ত্ত-শাসন, ৪০। হিতবাদী, ৪১। হিন্দু।

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সম্মিলনী।

মাসিক

১। American Anthropologist, ২। The Calcutta Medical Journal, ৩। The Calcutta Review, ৪। Commercial India, ৫। Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, ৬। Health and Happiness, ৭। Indian Antiquary*, ৮। Indian Medical Record, ৯। Industry, ১০। Journal of Ayurveda, ১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, ১২। Modern Review*, ১৩। The Vedant Kesari,

* তারকাচিহ্নিতগুলি ক্রীত হইয়াছিল।

১৪। Welfare, ১৫। অর্চ্চনা, ১৬। আর্য্য-দর্পণ, ১৭। আর্থিক উন্নতি, ১৮। ইসলাম-দর্শন, ১৯। উৎসব, ২০। উদ্বোধন, ২১। কংস-বণিক্-পত্রিকা, ২২। কায়স্থ-পত্রিকা, ২৩। কায়স্থ-সমাজ, ২৪। কালি-কলম, ২৫। কৃষি-সম্পদ্, ২৬। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ২৭। গল্প-লহরী, ২৮। চিকিৎসা-প্রকাশ, ২৯। জন্মভূমি, ৩০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩১। তন্তু ও তন্ত্রী, ৩২। তাম্বুলী পত্রিকা, ৩৩। ত্রিশূল, ৩৪। প্রজাপতি, ৩৫। প্রবর্ত্তক, ৩৬। প্রবাসী, ৩৭। বঙ্গবাণী, ৩৮। বাণিজ্য-বার্ত্তা, ৩৯। বাঁশরী, ৪০। ব্রহ্মবাদী, ৪১। ব্রহ্মবিদ্যা, ৪২। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ৪৩। ভক্তি, ৪৪। ভারতবর্ষ, ৪৫। ভারতী, ৪৬। মাতৃমন্দির, ৪৭। মাধবী, ৪৮। মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৪৯। মাসিক বসুমতী, * ৫০। মাহিষ্য-সমাজ, ৫১। যোগিসখা, ৫২। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, ৫৩। সন্দেশ, ৫৪। সবুজপত্র, ৫৫। সাধনা, ৫৬। সাহিত্য-সংবাদ, ৫৭। সুবর্ণবণিক্-সমাচার, ৫৮। শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ ৫৯। সৌরভ, ৬০। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬১। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬২। গৌড়প্রভা।

দ্বৈমাসিক

১। প্রকৃতি, ২। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

১। কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (কানাড়ী), ২। নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী), ৩। পুরাতত্ত্ব (হিন্দী), ৪। প্রকৃতি, ৫। প্রতিভা, ৬। রবি, ৭। Indian Historical Quarterly, ৮। Quarterly Journal of the Mythic Society.

বার্ষিক

* বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩২, ১৩৩৩।

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ

সাহিত্য-শাখা

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
" মণীন্দ্রমোহন বসু

শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
" শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" নরেন্দ্র দেব
" চারুচন্দ্র মিত্র
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার
" প্রফুল্লকুমার সরকার
" ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মণীন্দ্রমোহন বসু
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
" নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
" রমেশ বসু
পরিষদের সভাপতি
" সম্পাদক

ইতিহাস-শাখা

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ

সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার
" যদুনাথ সরকার
" কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা
" ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন
" ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
" অজিত ঘোষ
" বিমলাচরণ লাহা
" মণিমোহন সেন
" মন্মথমোহন বসু
" হিরণকুমার রায় চৌধুরী
পরিষদের সভাপতি
" সম্পাদক

দর্শন-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

সভ্যগণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
" রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
" রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
" ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
" পূরণচাঁদ নাহার
" ডাঃ অভয়কুমার গুহ
" মাধবদাস চক্রবর্ত্তী
" সুশীলচন্দ্র মিত্র
" রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ
" মনীষিনাথ বসু সরস্বতী
পরিষদের সভাপতি
" সম্পাদক

বিজ্ঞান-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
" নিবারণচন্দ্র রায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
" ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী
" ডাঃ সত্যচরণ লাহা
" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর
" রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু
" ডাঃ সুশীলকুমার বসু
" ডাঃ সহায়রাম বসু
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
" দেবপ্রসাদ ঘোষ
" নরেন্দ্রকুমার মজুমদার
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ যতীন্দ্রনাথ শেঠ
পরিষদের সভাপতি
" সম্পাদক

পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
" নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
" বলাইলাল দত্ত
" জিতেন্দ্রনাথ বসু
" পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
মৌলভী মোজাম্মেল হক
শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধীরকুমার বসু
" ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিষদের সভাপতি
" সম্পাদক
শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী আহ্বানকারী

চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
" রমেশ বসু
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
" রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর
" অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
" কুমার শরৎকুমার রায়
" পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
খান বাহাদুর মৌলভী হেদায়েত হোসেন
শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ
পরিষদের সভাপতি
" সম্পাদক
শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ—আহ্বানকারী

ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
" হিরণকুমার রায় চৌধুরী
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
" নরেন্দ্রনাথ বসু
" উপেন্দ্রনাথ সেন
" নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
" জিতেন্দ্রনাথ বসু
" সতীশচন্দ্র বসু
" প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
পরিষদের সভাপতি
" সম্পাদক
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—সম্পাদক

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার

চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি

১। পরিষদের সভাপতি
২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
৩। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
৪। " নগেন্দ্রনাথ সোম
৫। পরিষদের সম্পাদক

পুরস্কার-প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-সমিতি

১। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
২। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
৩। পরিষদের সম্পাদক

আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু
" নিবারণচন্দ্র রায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
" ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
" অনাথবন্ধু দত্ত
" অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
" রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
" বিনয়কুমার সরকার
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
" সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিষদের সভাপতি
" সম্পাদক
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—আহ্বানকারী

আয় বৃদ্ধি ও ব্যয়-সঙ্কোচ-সমিতি

১। পরিষদের সভাপতি
২। শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী
৩। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। " নিবারণচন্দ্র রায়
৫। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
৬। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
৭। পরিষদের সম্পাদক

বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি

১। পরিষদের সভাপতি
২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
৪। পরিষদের সম্পাদক

মন্দির সংস্কার সমিতি

১। পরিষদের সভাপতি
২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার
৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়
৫। পরিষদের সম্পাদক

বিনয়কুমার সরকার সংবর্দ্ধনা সমিতি

১। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী
২। " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
৩। " রমেশ বসু

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিসভার আয়োজনার্থ

আনুষ্ঠানিক সমিতি

১। পরিষদের সভাপতি
২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩। " রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর
৪। " রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
৫। " শিশিরকুমার ভাদুড়ী
৬। " অমৃতলাল বসু
৭। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। " নরেন্দ্র দেব
৯। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
১০। " ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা
১১। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১২। " নগেন্দ্রনাথ সোম
১৩। " কিরণচন্দ্র দত্ত
১৪। " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
১৫। " বাণীনাথ নন্দী
১৬। পরিষদের সম্পাদক

১৩৩৩ চৈত্রশেষে কার্য্যালয়ে মজুত গ্রন্থাবলীর হিসাব।

সংখ্যা	পুস্তকের নাম	গত বর্ষের মজুত	বর্ত্তমান বর্ষের খরচ	মজুত
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	১১	০	১১
২।	পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী	১৪	০	১৪
৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	০	০	০
৪।	ছুটীখানের মহাভারত	১৩	০	১৩
৫।	বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	৫৫	০	৫৫
৬।	বাসুঘোষের পদাবলী	৫৫	০	৫৫
৭।	চৈতন্যমঙ্গল	১৬	০	১৬
৮।	মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল	২১	১	২০
৯।	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	১৯	০	১৯

সংখ্যা	পুস্তকের নাম	গত বর্ষের মজুত	বর্ত্তমান বর্ষের খরচ	মজুত
১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	১৩	০	১৩
১১।	কাশী-পরিক্রমা	২২	০	২২
১২।	রাধিকার মানভঙ্গ	৬৫	৩	৬২
১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব, ১ম ও ২য় খণ্ড	৬	০	৬
১৪।	রাধিকা-মঙ্গল	২২	০	২২
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৬৮	১	৬৭
১৬।	ব্রজ-পরিক্রমা	২৭	০	২৭
১৭।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৪৫	১	৪৪
১৮।	শূন্যপুরাণ	১৪	০	১৪
১৯।	নবদ্বীপ-পরিক্রমা	২	০	২
২০।	শতপথব্রাহ্মণ, ১ম খণ্ড	২৯	০	২৯
২১।	” ” ২য় খণ্ড	২০	০	২০
২২।	চন্দ্রনাথ বসু	০	০	০
২৩।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৩৩	১	৩২
২৪।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	১৪৩৪	৩	১৪৩১
২৫।	মায়াপুরী	১৫১	৪	১৪৭
২৬।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	৩৫	০	৩৫
২৭।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৫	০	৫
২৮।	কবি হেমচন্দ্র	৯২	৫	৮৭
২৯।	শ্রীভাষ্য, প্রথম খণ্ড	১	০	১
৩০।	শ্রীভাষ্য, ২য় খণ্ড	২১	১	২০
৩১।	” ৩য় ”	৩৭	১	৩৬
৩২।	” ৪র্থ ”	৩৯	১	৩৮
৩৩।	” ৫ম ”	৫৪	১	৫৩
৩৪।	বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা, ১ম খণ্ড	১	০	১
৩৫।	” ” ২য় ”	১৮	২	১৬
৩৬।	” ” ৩য় ”	৫৪	২	৫২
৩৭।	” ” ৪র্থ ”	২২১	২	২১৯
৩৮।	শব্দ-কোষ, ১ম খণ্ড	৩৬	৩	৩৩
৩৯।	” ২য় ”	৪৭	৩	৪৪
৪০।	” ৩য় ”	৭২	৪	৬৮

সংখ্যা	পুস্তকের নাম	গত বর্ষের মজুত	বর্ত্তমান বর্ষের খরচ	মজুত
৪১।	শব্দ-কোষ ৪র্থ খণ্ড	১৬১	৪	১৫৭
৪২।	বাঙ্গালা ব্যাকরণ	৩৬	২	৩৪
৪৩।	মহিলা ব্রতকথা	৬	০	৬
৪৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	৮	০	৮
৪৫।	কল্কিপুরাণ	৫৯	১	৫৮
৪৬।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৪৩	৫	১৩৮
৪৭।	প্রাচীন পুথির বিবরণ			
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	৩৯	৫	৩৪
৪৮।	ঐ ঐ, ২য় সংখ্যা	৫২	৪	৪৮
৪৯।	ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা	২২৬১	১	২২৬০
৫০।	ঐ ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা	৫০০	৪০	৪৬০
৫১।	দুর্গামঙ্গল	১২৭	৩	১২৪
৫২।	সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম, ১ম খণ্ড	৮৫২	০	৮৫২
৫৩।	" " ২য় "	৮৪৬	০	৮৪৬
৫৪।	" " ৩য় "	৮২০	০	৮২০
৫৫।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	৬	০	৬
৫৬।	তীর্থমঙ্গল	৩৭৪	৪	৩৭০
৫৭।	মৃগলুব্ধ	২৪০	৩	২৩৭
৫৮।	সত্যনারায়ণের পুথি	৬৯	১৫	৫৪
৫৯।	পদকল্পতরু, ১ম খণ্ড	৫৯৬	২৩	৫৭৩
৬০।	" ২য় "	১৩৯৭	২৮	১৩৬৯
৬১।	" ৩য় "	১৪৪৯	১৯	১৪৩০
৬২।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৪০৭	০	৪০৭
৬৩।	তীর্থভ্রমণ	২৪২	১	২৪১
৬৪।	গঙ্গামঙ্গল	৭০	৪	৬৬
৬৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	১০৩	৭	৯৬
৬৬।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৩৬৭	৩	৩৬৪
৬৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৭৫	০	৭৫
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	৩৬৭	১৫	৩৫২
৬৯।	জ্ঞানসাগর	১৩৪	৩	১৩১
৭০।	সারদামঙ্গল	১৪৭	৪	১৪৩

সংখ্যা	পুস্তকের নাম	গত বর্ষের মজুত	বর্ত্তমান বর্ষের খরচ	
৭১।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১২৭	৩	১২৪
৭২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	১২০	১	১১৯
৭৩।	ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড	৪১২	১৯	৩৯৩
৭৪।	" ২য়	৬৬৯	২০	৬৪৯
৭৫।	" ৩য়	৯৪৯	১৭	৯৩২
৭৬।	গোরক্ষবিজয়	৬৭৫	৪	৬৭১
৭৭।	শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস	৩৭০	৪	৩৬৬
৭৮।	সর্ব্বসংবাদিনী	৮২৬	১৬	৮১০
৭৯।	মনোবিজ্ঞান	৮৩১	১	৮৩০
৮০।	চিত্রশালার তালিকা	৫৮৭		৫৮৭
৮১।	উদ্ভিদ্‌জ্ঞান (প্রথম পর্ব্ব)	৯৪৫		৯৪১
৮২।	উদ্ভিদ্‌জ্ঞান (২য় পর্ব্ব)	৯৮৪	২	৯৮২
৮৩।	লেখমালানুক্রমণী	৮৯৯	৩	৮৯৬
৮৪।	রসকদম্ব	৪৬৬	৩	৪৬৩
৮৫।	নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	৪৮	০	৪৮
৮৬।	সাধক-রঞ্জন	৫০০	৩৪	৪৬৬
৮৭।	মাথুর কথা	৪০০	৩৮	৩৬২
৮৮।	শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল	১০০০	৫১	৯৪৫
	দুস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের গ্রন্থ			
১।	বৃন্দাবন-কথা	১২২	৪	১১৮
২।	মেঘদূত	৩০	৩	২৭
৩।	ঋতুসংহারম্	১৪১	৪	১৩৭
৪।	পুষ্পবাণবিলাসম্	১৪২	১	১৪১
৫।	উত্তরপাড়া-বিবরণ	৪৩		৪৩
৬।	ভারত-ললনা	১০০		১০০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রয়স্ত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৫৪৬৩৲
২।	প্রবেশিকা	৯৯৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৩৬৪/৯
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭১৯৸০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৭৮৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৭৩০৲
৭।	এককালীন দান	২১১৬।০
৮।	গবর্ণমেন্টের বার্ষিক দান	১২০০৲
৯।	কর্পোরেশনের বার্ষিক দান	৬৫০৲
১০।	কর্পোরেশনের এককালীন দান	২৫০০০৲
১১।	স্মৃতি-রক্ষার আয়	৬৩৵০
১২।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	১৭।/৬
১৩।	বিবিধ আয়	১৯৲
১৪।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার	৭১৵
১৫।	আমানত জমা	৩৲
১৬।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	৮৫০৲
১৭।	পরিষদের ঋণশোধের বাবদে দান	৩০৪৭৲
১৮।	সংবর্দ্ধনার আয়	৩০০৲
		৪০৭৯০৸/৩

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৪২১৭৵০
২।	পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ	১৮২৮/৬
৩।	পুস্তকালয়	১৪১১॥।/০
৪।	পুথিশালা	৩২৭॥।/০
৫।	চিত্রশালা	৩৸০
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	১৫১।/৬
৭।	ডাকমাশুল	৭৮২৸।/৯
৮।	বাড়ী মেরামত	৮৬৪৸।/০
৯।	আলোক ও পাখার বিল	১৬৩।/০
১০।	আলোক ও পাখা মেরামত বিল	৫৭৲
১১।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৮৬৲
১২।	" পোষাক	৩৬৲
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	৮৮॥৬
১৪।	নূতন আসবাব	২১/০
১৫।	গাড়ী ভাড়া	৯৫/৯
১৬।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২০॥০
১৭।	স্মৃতি-রক্ষার ব্যয়	৯৬৲
১৮।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	১৩৸৬
১৯।	হাওলাত শোধ	৫৬৬৲
২০।	বেতন	২৯২৭৸/৯
২১।	কমিশন	৪১৫॥৩
২২।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৮৪৲
২৩।	বিবিধ ব্যয়	১০০।/০
২৪।	ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ খরিদ	১৬৬৸৵০
২৫।	হাওলাত দাদন	১০,২০১৸৬
২৬।	আমানত শোধ	১৬৫৲
২৭।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে খরচ	৩৪॥০
২৮।	কোম্পানীর কাগজ খরিদ	৪০০৲
২৯।	কোম্পানীর কাগজ খরিদ জন্য সুদ বাবদ খরচ	২৯।/০
৩০।	" " ব্যয়	২৪॥০
৩১।	ঋণশোধের ব্যয়	৩৪৸/০
৩২।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	২৯৯৸/৯
		১৫,৫২৬[illegible]

কৈঃ—

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত	২৭৪৬২।৶৪
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ-তহবিলের আয় (বাদ ডাকঘর হইতে ৮৫০৲ জমা)	৩৯৯৪০৸৴৩
	৬৭৪০৩৶৭
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ-তহবিলের ব্যয় (বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য ৩৪।০ খরচ)	২৫৫৬২।৶৯
	৪১৮৪০॥৶১০
এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর কাগজ মজুত	৪০০৲
উদ্বৃত্ত	৪২২৪০॥৶১০

উদ্বৃত্ত টাকার আয়—

(ক) বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার- ২৬৬০৬৵৯

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ	১৫১০০৲
৪৲ " পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲
৫৲ " ওয়ার-লোন	৭০০৲
৫৲ " ওয়ার-বণ্ডস্	১০০০৲
৫৲ " ইণ্ডিয়ান্ ওয়ার-লোন	৪৮০০৲
ডাকঘরে মজুত	৬৵৯
	২৬৬০৬৵৯

(খ) সাধারণ-তহবিল- ১৫৬৩৪॥৴১

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে মজুত	১৪৯৯৯৲
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	২২৬॥৶১
কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	৪০৪৶৯
ডাকটিকিট মজুত	৪॥৵৩
	১৫৬৩৪॥৴১

৪২২৪০॥৶১০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক,
আয়-ব্যয় বিভাগ

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী,

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৩৩শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি। ৪।৫।৩৪

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

পরীক্ষান্তে হিসাব নির্ভুল প্রতিপন্ন করিলাম।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
৫।৫।৩৪

বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ—১৩৩৩

	বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	বর্ষ শেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা				
							কোং কাগজ	ব্যাঙ্ক	ডাকঘর	কোষাধ্যক্ষ	পরিষদের সাধারণ তহবিলের হাওলাত
১	সাধারণ স্থায়ী তহবিল	৯৬৩৫।৵৯	০	৯৬৩৫।৵৯	০	৯৬৩৫।৵৯	৫০০০৲	০	৬৵৯	০	৪৬২৯।০
২	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	১৩০০০৲	৫২৫৵৬	১৩৫২৫৵৬	৩৩৪।৵০	১৩১৯০৸৵৬	১৩০০০৲	০	০	০	১৯০৸৵৬
৩	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি "	৬৯৭।৴৩	৩৵০	৭০০॥৴৩	০	৭০০॥৴৩	৭০০॥৴৩	০	০	০	০
৪	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "	৬৫।০	০	৬৫।০	০	৬৫।০	৬৫।০	০	০	০	০
৫	অক্ষয়কুমার বড়াল "	২৫০৲	১০৲	২৬০৲	০	২৬০৲	২৬০৲	০	০	০	০
৬	মাইকেল মধুসূদন দত্ত "	৯১॥৴৯	০	৯১॥৴৯	১৮৴৩	৭৩।৬	৬০৴৩	০	০	০	১৩।৴৩
৭	অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তহবিল	১১৯৫৲	০	১১৯৫৲	০	১১৯৫৲	১১৯৫৲	০	০	০	০
৮	কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল	৩০৩৴৯	০	৩০৩৴৯	০	৩০৩৴৯	৩০৩৴৯	০	০	০	০
৯	গ্রন্থ-প্রকাশার্থ বিনয়কুমার সরকার তহবিল	২২১৮৸৵০	০	২২১৮৸৵০	৯৬৩৸০	১২৫৪৵০	১২৫৪৵০	০	০	০	০
১০	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	১৮৯২॥৴৯	০	১৮৯২॥৴৯	০	১৮৯২॥৴৯	১৮৯২॥৴৯	০	০	০	০
১১	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	২৩৭৭।৴৩	৭১৵০	২৪৪৮।৴৩	৮৪৲	২৩৬৪।৴৩	২৩০০৲	০	০	০	৬৪।৴৩
১২	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল	৫০৲	০	৫০৲	০	৫০৲	৫০৲	০	০	০	০
১৩	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি " "	১০০৲	০	১০০৲	০	১০০৲	১০০৲	০	০	০	০
১৪	সাহিত্য-সংরক্ষণ সমিতি	১৭০৲	০	১৭০৲	০	১৭০৲	১৭০৲	০	০	০	০
১৫	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল	১৪৫৲	০	১৪৫৲	০	১৪৫৲	১৪৫৲	০	০	০	০
১৬	স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৩৯৲	০	৩৯৲	০	৩৯৲	৩৯৲	০	০	০	০
১৭	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি তহবিল	৬৫৲	০	৬৫৲	০	৬৫৲	৬৫৲	০	০	০	০
১৮	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার	০	৫০৲	৫০৲	৫০৲	০	০	০	০	০	০
		৩২২৯৫৸৵৬	৬৫৯।৴০	৩২৯৫৫।৵০	১৪৫১৴৩	৩১৫০৪।৯	২৬৬০০৲	০	৬৵৯	০	৪৮৯৮৵০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহঃ সম্পাদক, রামেন্দ্রসুন্দর
ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক,
আয়-ব্যয় বিভাগ।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল

আয়	ব্যয়
কোম্পানী কাগজের সুদ আদায়——৪৫৫৲	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়——৩৩৩৪।০
এই তহবিল হইতে প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয়——৭০৶৬	
৫২৫৶৬	

কৈঃ——

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত— -১৩০০০৲

বর্ত্তমান বর্ষের আয়——৫২৫৶৬

১৩৫২৫৶৬

বাদ ব্যয়——৩৩৪।০

১৩১৯০৸৶৬

কোম্পানীর কাগজ——১৩০০০৲

পরিষদের সাধারণ তহবিল——১৯০৸৶৬

১৩১৯০৸৶৬

১৩২৩ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা——২৭০৸০

বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা——৩৲

২৭৩৸০

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ——১৬৫৲

১০৮৸০

জায়-

১। পাঁচু জমাদারের জামিন—— ৫০৲

২। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী— ৪॥০

৩। পুস্তকবিক্রেতা প্রবষ্টাইন এণ্ড কোং, লণ্ডন—৫০৲

৪। পুস্তক বিক্রয় বাবদ— ১।০

৫। পুস্তকালয়ের পুস্তক আদান প্রদানের খরচ জমা———৩৲

১০৮৸০

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন	১০১৵৯
* বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন	১০,২০১৸৬
	১০,৩০২৸৶৩

* রমেশ-ভবন সমিতিকে উক্ত টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
৫।৫।৩৪

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক,
আয়-ব্যয় বিভাগ।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী,
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
৫।৫।৩৪

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৩৩শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।

এককালীন দান

(ক) পরিষদ্ মন্দির মেরামত ও পুস্তকালয়সংরক্ষণ জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের দান ২৫,০০০৲

(খ) পরিষদের ঋণ পরিশোধার্থ দান ৩,০৪৭৲

রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা বাহাদুর	১,০০০৲
মাননীয় " ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র	৫০০৲
" শরচ্চন্দ্র বসু ব্যারিষ্টার	৫০০৲
" কুমার শরৎকুমার রায়	৫০০৲
" সিদ্ধেশ্বর ঘোষ	২০০৲
" রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর	১০০৲
" যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ব্যারিষ্টার	১০০৲
" যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০৲
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	২৫৲
" অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী	২৫৲
" অজিত ঘোষ এডভোকেট	২০৲
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১১৲
	৩,০৩১৲

২৮,০৪৭৲

জের ২৮,০৪৭৲

জের	৩০৩১৲	
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	৬৲	
" ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৲	
" দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲	
	৩০৪৭৲	

(গ) সাধারণ তহবিলে দান ২১১৬।০

১।	শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	৭৮৭৲
২।	মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২৫০
৩।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	
৪।	রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	
৫।	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু	১৮২।০
৬।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২য় দফা)	১০
৭।	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়	১০০৲
৮।	" রায় বিপিনবিহারী বসু	১০০৲
৯।	" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	১০০৲
১০।	সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক	১০০৲
১১।	হরিহর শেঠ	১০০৲
১২।	রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	৬৭৲
১৩।	ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	৫০৲
১৪।	ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী	৪৪৲
১৫।	গোকুলচন্দ্র লাহা	২৫৲
১৬।	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	২২৲
১৭।	মৃত্যুঞ্জয় ভড়	২০৲
১৮।	অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	২০৲
১৯।	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২য় দফা)	১৭৲
২০।	কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৬৲
২১।	কিরণচন্দ্র দত্ত	১০৲
২২।	হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়	৬৲
		২১১৬।০

মোট ৩০,১৬৩।০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৩ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার মন্তব্য

১৩৩২ সালের উদ্বৃত্ত——(Opening Balance) টাকা ২৭৪৬২।৵৪

১৩৩৩ সালের আয়——৩৯৯৪০৸/৩

১৩৩৩ সালের ব্যয়——২৫৫৬২।৶৯

টাকা ১৪৩৭৮।/৬

মোট ৪১৮৪০॥৶১০

১৪০০৲ টাকার মধ্যে ক্রীত কোম্পানী কাগজ জন্য ক্যাশ হইতে প্রদত্ত জমা কাগজ ৪০০৲

১৩৩৩ সালের উদ্বৃত্ত মোট (Closing Balance) ৪২২৪০॥৶১০

১৩৩৩ সালের বৎসর শেষে

ক্যাশে মজুত————(Closing Balance) টাকা ১৫৬৩৪॥/১

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত————	১৪৯৯৯৲
মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত	২২৬॥৶১
কার্য্যালয়ে মজুত	৪০৪৶৯
ডাক টিকিটে	৪॥৵৩
	১৫৬৩৪॥/১

মজুত

কোম্পানী কাগজে	২৬৬০০৲	
ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে	৬৵৯	২৬৬০৬৵৯

Closing Balance as at ৩১এ চৈত্র ১৩৩৩, ৪২২৪০॥৶১০

১৩৩৩ সালে বিশিষ্ট ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত টাকা (Closing Balance) ৩১৫০৪।৯

কোম্পানী কাগজে	২৬৬০০৲
ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে	৬৵৯
পরিষদ্ তহবিলে	৪৮৯৮৵০
	৩১৫০৪।৯

(Opening Balance)

১৩৩২ সালের বিশিষ্ট-ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত টাকা	৩২২৯৫৸৵৬
১৩৩৩ " " আয়	৬৫৯।৶৬
	৩২৯৫৫।৵০
ঐ ঐ ঐ ব্যয়	১৪৫১/৩
Closing Balance as at ৩১এ চৈত্র ১৩৩৩	৩১৫০৪।৯

হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইয়া নির্ভুল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কোম্পানী কাগজের দরুণ মজুত টাকা ২৬৬০০৲। ঐ টাকার কোম্পানী কাগজ মিলাইয়া দেখা হইয়াছে। গত বর্ষের ওয়ার-বণ্ডের ১০০০৲ টাকা যাহা ঐতিহাসিক মৌলিক গবেষণার জন্য মাননীয় স্বর্গীয় অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গান হইয়া মাননীয় কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত ছিল। এই বৎসরে ঐ ১০০০৲ টাকা এবং ক্যাশ হইতে প্রদত্ত ৪০০৲ টাকা মোট ১৪০০৲ টাকার ৫৲ টাকা হার সুদের ওয়ার-লোন ক্রয় করা হয়। মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গত বর্ষের দরুণ ১০০০৲ টাকার ওয়ারবণ্ড ভাঙ্গান টাকা এ বৎসরের Opening Balance ২৭৪৬২।৵৪ টাকার মধ্যে থাকায় এ বৎসর হিসাবের মধ্যে কেবল মাত্র ৪০০৲ টাকার কোম্পানী কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে দেখান হইল।

মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত টাকা ২২৬।।৵১ তাঁহারই স্বাক্ষরিত পাশ বইয়ের রসিদে দেখিয়াছি। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে ৬৵৯ মজুত আছে এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে ১৪৯৯৯৲ মজুত আছে দেখিলাম। কার্য্যালয়ে ৪০৪৴৯ টাকা মজুত আছে। ক্যাশে এত বেশী টাকা মজুত থাকায় কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয় কলিকাতায় না থাকায় কোন বাবদে হঠাৎ বেশী খরচের সম্ভাবনা বিবেচনায় ঐ ৪০৪৴৯ ক্যাশে মজুত ছিল, পরে কোষাধ্যক্ষ মহাশয় কলিকাতায় আসিলে পরে খরচখরচা বাদে উদ্বৃত্ত টাকা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ঐ ৪০৪৴৯ টাকা ১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসের শেষে কার্য্যালয়ে মজুত ছিল কি না, এই সম্বন্ধে আমি মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইতে ইচ্ছুক নই, কারণ, সম্পাদক মহাশয় ১৩৩৩ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাবে নাম স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ টাকা পরে অন্য টাকার সহিত মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পাঠান হইয়াছে, ইহাও দেখিয়া লইয়াছি।

পরিষদের ঋণ পরিশোধার্থে এককালীন দানের তালিকায় ভুলক্রমে রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের নিকট হইতে দুই দফে ৫০৲ টাকা করিয়া ১০০৲ টাকা দেখান হইয়াছিল এবং ঋণ পরিশোধ খাতে ঐ ১০০৲ টাকা ভুলক্রমে লেখা হইয়াছে, কিন্তু চুণী বাবুর নিকট হইতে কেবল মাত্র ৫০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং ঋণ পরিশোধ খাতে ঐ ৫০৲ টাকা খরচ হয়। এই ভুল সংশোধন হওয়ায় হিসাবের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, উহা আমার জ্ঞাতসারে হইয়াছে।

বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ৪৮৯৮৷৵০ টাকা পরিষদ্ তহবিলে আছে দেখিলাম। ঐ টাকা পরিষদের দেনা। ক্যাশে ১০৬৩৪।৴১ মজুত আছে। ঐ টাকার মধ্যে মন্দির মেরামত জন্য করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত ৯৫০০০৲ এবং অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৩০৪৭৲ টাকার কিছু অংশ আছে। মন্দির মেরামত বাবদে কত খরচ হইবে, এখন বলা সম্ভবপর

নহে। পরিষদ্‌গৃহ সংস্কার অন্তে ক্যাশে কত মজুত থাকিবে এবং তাহা হইতে বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের জন্ম দেনা ৪৮৯৮৵০ এবং আরও যদি কিছু দেনার সম্ভাবনা হয়, তাহা পরিশোধ হইবে কি না, তাহা বলা দুরূহ। তবে পরিষৎ 'রমেশ-ভবন'কে ১০৩০৯৸৶৩ দাদন দিয়াছেন দেখিলাম।

উপরোক্ত বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের জন্ম দেনা ব্যতীত পরিষদ্ আমানত জমা (Deposit) হিসাবে ১০৮৸০ লইয়াছেন। এই টাকা পরিষদ্‌কে ভবিষ্যতে প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং ইহাও পরিষদের দেনা (Liabilities)।

এই দেনা ব্যতীত বাজারে ২৭২৪৷৵০+৮৫০৲ টাকা পরিষদের দেনার (Liabilities) তালিকায় দেখিলাম।

পরিষদের পাওনা (Assets)—চাঁদা পাওনা হিসাবে মোট ১৬০০০৲ টাকা সাধারণ সভ্যগণের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে দেখিলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঐ ১৬০০০৲ টাকার দশ ভাগের একভাগ আদায় হইবে না। আমার অনুরোধ, চাঁদা আদায় বিভাগের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক মহাশয় মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, ঐ টাকার মধ্যে যাহা কখনও আদায়ের সম্ভাবনা নাই, তাহা বাদ দিবেন।

পুস্তক ক্রয়—টাকা ৬১১৸৶৬

প্রতি বৎসরে ক্রীত পুস্তক একখানি খাতায় লেখা আবশ্যক মনে করিয়া একখানি নূতন খাতা আনাইয়া দিতে গত বৎসরে পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এ বৎসর তিনি ঐ খাতা আনাইয়া দিয়াছেন। এবং ঐ খাতায় এ বৎসরে ক্রীত ৬১১৸৶৬ টাকার পুস্তক লেখা হইয়াছে। আমি ভাউচার দেখিয়া তালিকা মিলাইয়া লইয়া পরিষদের প্রধান পুস্তকের তালিকায় (Main Catalogue) ভুক্ত রহিয়াছে পরীক্ষা করিয়াছি।

হিসাব পরীক্ষা সময়ে আমাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। সুদক্ষ হিসাব-রক্ষক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বাবু সুন্দরভাবে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন এবং আমার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

বঙ্গদেশের গৌরব, সমুদয় বঙ্গবাসীর চিরআদরের বস্তু, সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণের দ্বারায় পরিচালিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির উপর প্রদান করায় আমি সমুদয় সভ্যগণের নিকট আন্তরিক চিরকৃতজ্ঞ। আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং তাঁহাদের জন্ম এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম আমি সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছি, এই নিমিত্ত আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমার পরীক্ষার মন্তব্য সহ অদ্য আমি আমার প্রণম্য সভ্যগণের সকাশে উপনীত হইলাম।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
২৬।৮।২৭

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬০০০৲
২।	প্রবেশিকা	১০০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৩০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭০০৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৭৫৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	১১৯৪৲
৭।	এককালীন দান	৪১৫০৲
৮।	স্মৃতি-রক্ষার আয়	১০০৲
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২৫৲
১০।	বিবিধ আয়	২৫৲
১১।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার	৭৫৲
১২।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১৫৪০৪৶৯
		২৮১৪৮৶৯

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৫০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৩৫০৲
৪।	পুথিশালা	৩৫০৲
৫।	চিত্রশালা	১০০৲
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	১৫০৲
৭।	ডাকমাশুল	৭৫০৲
৮।	ইলেকট্রিক আলোক ও পাখার বিল	১৭৫৲
৯।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৬০৲
১০।	" পোষাক	৪০৲
১১।	দপ্তর সরঞ্জামী	৫০৲
১২।	নূতন আসবাব	২৫৲
১৩।	গাড়ী ভাড়া	১২৫৲
১৪।	সাহিত্য-সম্মিলন	২৫৲
১৫।	স্মৃতি-রক্ষার ব্যয়	১০০৲
১৬।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২৫৲
১৭।	বেতন	৩০০০৲
১৮।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৫০০৲
১৯।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে	১০৫০৲
২০।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৬০৲
২১।	বিবিধ ব্যয়	১০০৲
২২।	মন্দির মেরামত ও তারবদল প্রভৃতি	১৩০০০৲
		২৬১৩৫৲

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৩৩শ বার্ষিক অধিবেশনের
সভাপতি।

শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা—২২শ বর্ষ ১৩৩৩

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সভাপতি মহাশয় ৫০০৲ দিয়া আজীবন-সদস্যপদ ও পৃষ্ঠপোষকের পদ গ্রহণে সম্মতি দান করিয়াছেন।

স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড শাখার চিত্রশালাটী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৫৲ হিসাবে এক বৎসর ৩০০৲ বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব-সরস্বতী এম এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শাখার বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছিল।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন-সদস্য—১, বিশিষ্ট-সদস্য—৩, সহায়ক-সদস্য—৪, অধ্যাপক-সদস্য—৪, এবং সাধারণ-সদস্য—১২০।

স্মৃতি-রক্ষা—৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য রাধাবল্লভের জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় ১০০৲ দান করিয়াছেন এবং এই টাকা ভাস্করকে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে।

অধিবেশন-সংখ্যা—বিশেষ ১, মাসিক—৭।

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। কঙ্কাল-মঙ্গল আবৃত্তি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এম এ।

২। গোবিন্দদাসের কড়চা গ্রন্থের প্রতিবাদ—শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায় বি এল।

৩। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব-সরস্বতী এম এ।

৪। শেষ যুগে উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যচর্চ্চা ও সাহিত্যসেবী—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু।

৫। সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের জীবনী—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

৬। 'মাল্য', 'মালঞ্চ' ও 'সাগর-সঙ্গীতে'র সমালোচনা—শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ সেন।

৭। রঙ্গপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী।

৯। মৎস্যের চাষ—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে।

১০। গো-পালন— ঐ ঐ।

শোক-সভা—(ক) ৺হরগোপাল দাস কুণ্ডু, (খ) ৺শরৎচন্দ্র চৌধুরী বি এ, (গ) ৺খান

বাহাদুর তস্‌লিম্‌-উদ্দীন আহম্মদ বি এল এবং (ঘ) ৺হরিমোহন বসু মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক-সভা আহূত হইয়াছিল।

আয়-ব্যয়—গত বর্ষের তহবিল ১০১৬৷৶৩, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ২১১।৵০ মোট আয় ১২২৭৷৶৩, বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয় ২১১।৵০। উদ্বৃত্ত ১০১৬৶৩ টাকার মধ্যে জমিদারী ব্যাঙ্কে ১০০০৲ জমা দেওয়া আছে এবং ১৬৶৩ সম্পাদকের হস্তে আছে।

গৌহাটি-শাখা—১৮শ বর্ষ, ১৩৩৩

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

সম্পাদক— " শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

অধিবেশন-সংখ্যা—৬। পঠিত প্রবন্ধ, কবিতা এবং লেখকগণ—

১। রবীন্দ্রনাথের সহনশীলতা—শ্রীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।
২। হিমালয় ভূগোল— " সত্যভূষণ সেন।
৩। ব্রজগোপীর সাধনা ও সিদ্ধি— " হরিজীবন গোস্বামী।
৪। চুরির উপদ্রব (গল্প)— " সত্যভূষণ সেন।
৫। জাপানে শিক্ষার ইতিহাস— " ভুবনমোহন সেন এম এ।
৬। বঙ্গ-সাহিত্যে আর্ট— " তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।
৭। শ্যাকল্‌টনের দক্ষিণ মেরু অভিযান— " সত্যভূষণ সেন।
৮। বৈজ্ঞানিক চুটকী— " সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।
৯। আহোম ব্রিটিশ ইতিহাসের কয়েকটি কথা— " ভুবনমোহন সেন এম এ।
১০। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী— " তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ।
১১। বাংলা সাহিত্যের গতি ও পরিণতি— " তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।
১২। বিজ্ঞানানন্দের স্বপ্ন— " সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।
১৩। কবিতা— " সত্যভূষণ সেন।
১৪। স্মৃতি (কবিতা)— " হরিজীবন গোস্বামী।

মেদিনীপুর-শাখা—১৪শ, বর্ষ ১৩৩৪

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল।

সম্পাদক— " নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা ১৪৭, অধিবেশন-সংখ্যা ৫৩ (সাপ্তাহিক ২৭, মাসিক ৩, কার্য্যনির্ব্বাহক-

সমিতি ৭, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ৭, নাট্য-সমিতি ৪, অভ্যর্থনা-সমিতি ৩, বিশেষ সাধারণ অধিবেশন ১ এবং অনুসন্ধান-সমিতি ১)। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১২৭০।

শাখার চতুর্দ্দশ বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আয়-ব্যয়—আয় ২৬৯৸৴০, ব্যয় ২৪৬৸৶২৷০।

নদীয়া-শাখা—১৩৩৪

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম বি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল।

সদস্য-সংখ্যা—৩৪, অধিবেশন-সংখ্যা—৬, আয়—৪৭৲, এবং ব্যয় ৪৭৲।

পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাশ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক।

২। সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা— ঐ ঐ।

৩। রামায়ণ (আদিকাণ্ড)—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম বি।

৪। কর্ত্তব্য-সমস্যা—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এতদ্ব্যতীত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বি এ মহাশয়া সভার নেতৃত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন এবং বালিকাগণ শরৎ-বন্দনার গান ও আবৃত্তি করেন।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের বিদেশযাত্রা উপলক্ষে অভিনন্দন দেওয়া হয়। তিনি সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত কাজি নজরুল ইস্‌লাম ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার গান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত সুহৃদ্‌কুমার রায় ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় ব্যঙ্গ-কৌতুক করেন।

এতদ্ব্যতীত ৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করা হয়।

উত্তরপাড়া (হুগলী)-শাখা—বঙ্গাব্দ ১৩৩৪

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী।

সম্পাদক— " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সদস্য-সংখ্যা—৮০, পরিচালন-সমিতির সভ্য-সংখ্যা—১২।

অধিবেশন-সংখ্যা—পরিচালন-সমিতি—১০ এবং সাধারণ অধিবেশন—৪।

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। সমবায় ও গ্রামের উন্নতি—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্-সি।

২। পূজা ও জন-সেবা— " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

এতদ্ব্যতীত বিজয়া দশমীতে সঙ্গীত-সম্মিলনী হয় এবং শ্রীপঞ্চমীতে 'বাণী-বন্দনা' কবিতা পাঠ এবং আবৃত্তি প্রভৃতি হয়।

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের আয়োজনে 'হুগলী জেলা পাঠাগার-সম্মিলনে'র দ্বিতীয় অধিবেশন উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্‌সি মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। হুগলী জেলার ৪০টি পাঠাগার হইতে প্রতিনিধি এবং কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক এই সম্মিলনে যোগদান করেন। অধিবেশনে বহু প্রবন্ধ পঠিত হয় ও বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা করেন। এই সম্পর্কে একটি প্রদর্শনী হয়। তাহাতে বরোদা রাজকীয় পাঠাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চন্দননগর পুস্তকালয়, বাঁশবেড়ে পাঠাগার, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদর্শনের জন্য পুস্তকাদি ও লাইব্রেরী গঠন ও উন্নতি সম্পর্কীয় চিত্র ও পুস্তক আসিয়াছিল।

পুস্তক-সংখ্যা—বর্ষশেষে প্রায় ৩৫০০ পুস্তক পাঠাগারে রক্ষিত ছিল।

পরিষদ্ মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোক সংযোজিত হইয়াছে।

আয়-ব্যয়—আয় ৪৪১৶৯, ব্যয় ৪১৭৸৩ উদ্বৃত্ত ২৩৷৶৬।

এতদ্ব্যতীত উক্ত সম্মিলন সম্পর্কে ১২৫৲ বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহা উক্ত কার্য্যেই ব্যয়িত হইযাছে।

চতুস্ত্রিংশ ভাগ] [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ২১০০৲ দুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা হয়।...

(ক) বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত। মূল্য—সাধারণ পক্ষে ২॥০ সদস্য পক্ষে ১৸০

(খ)	মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ		১৲	৸০
(গ)	ঋতু-সংহারম্ (মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ)	,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৲	১৲
(ঘ)	পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ)	,, বিধুভূষণ সরকার	।৵০	।৵০
(ঙ)	উত্তরপাড়া-বিবরণ	,, অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	।০	।০
(চ)	ভারত-ললনা	,, রামপ্রাণ গুপ্ত	।/০	।/০

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত **মন্দিরা** পরিষৎকে দান করিয়াছেন। মূল্য ॥০

পরিষদের সাধারণ-ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাঁহার রচিত **ভাষাতত্ত্ব** (১ম ও ২য় খণ্ড) দান করিয়াছেন। মূল্য ১৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি-প্রণীত **গৌড়ের ইতিহাস**, ১ম খণ্ড—হিন্দু রাজত্ব—১৲ এবং ২য় খণ্ড—মুসলমান রাজত্ব ১॥০।

"অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী" ও "রস-মঞ্জরী"

যাঁহারা বৈষ্ণব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের "গীতগোবিন্দ," "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদাবলী-পূর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিকা, পদ-সূচী, রস-সূচী ও শব্দ-কোষ-সম্বলিত "অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী" ও রস-শাস্ত্রে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভানুদত্তের রস-মঞ্জরীর বিস্তৃত ভূমিকা, সূচী ও রস-বিশ্লেষণ-সম্বলিত সুমধুর পদ্যানুবাদ পাঠ না করিলে চলিবে না। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'বাঙ্গালা ও সংস্কৃত' শাখার বি, এ পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রসংশা-সূচক অভিমত হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে; এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"—রবীন্দ্রনাথ

"এই সকল অপরিচিত পদ-কর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্ব-রস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"—প্রবাসী

"রস-মঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে। সেই বিবরণী অপূর্ব্ব কবিত্ব রসে মণ্ডিত। * * * রস-শাস্ত্রবিষয়ক এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।"—ভারতী

"অনুবাদে সতীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বর্দ্ধিতই হইয়াছে। এই রস-মঞ্জরীতে কেবল আদিরসেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়া রুচি-সংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ করি।"—হিতবাদী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক)

চতুস্ত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৪

গ্রাহক পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা]   [মফঃস্বলে ৩।৶০ তিন টাকা ছয় আনা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

চতুস্ত্রিংশ ভাগের সূচী

সরস্বতীর বলি

দেবীত্রয়

প্রধান যাগের পূর্ব্বে কতকগুলি যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠেয় যাগের বৈদিক নাম 'প্রযাজ'। ইষ্টিযজ্ঞে এই রকম প্রযাজ পাঁচটী, পশুযাগে এগারটী। এগারটী প্রযাজে এগার জন দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। এই যাজ্যামন্ত্রের নাম 'আপ্রীমন্ত্র', আর এই এগার জন দেবতাকে বলে 'আপ্রীদেবতা'। একাদশ আপ্রীদেবতার নাম—ইড়, ত্বষ্টা, দেবীত্রয় (ইড়া, ভারতী, সরস্বতী), উষাসানক্তা, তনূনপাৎ, দৈব্যহোতারা, নরাশংস, বর্হিঃ, বনস্পতি, সমিৎ ও স্বাহাকৃতি। অষ্টম প্রযাজের দেবতা ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। এই প্রযাজে এই তিন দেবীর যজন হয়।* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১০ সূক্ত আপ্রীসূক্ত। ইহার ৮ম ঋক্ ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী,—এই দেবীত্রয়ের মন্ত্র। এই মন্ত্র উপদেশ করে—

"আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেতু ইড়ামনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু ॥"

দেবী ভারতী শীঘ্র আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; মনুষ্য যেমন আগমন করে, তেমনই দেবী ইড়া এই যজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়া আগমন করুন। তাঁহারা দুই জন এবং সরস্বতী চমৎকার কর্ম্মকারিণী, এই তিন দেবী আগমন করিয়া সম্মুখের সুখপ্রদ কুশাসনে উপবেশন করুন।

ইড়া ও ভারতী বৈদিক সরস্বতীর নিত্যসহচরী। সরস্বতীসূক্ত বাদ দিয়া অন্যান্য সূক্তের ৪০টি মন্ত্রে সরস্বতীর স্তুতি আছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ মন্ত্রেই সরস্বতীর সঙ্গে ইড়া ও ভারতীর নাম পাওয়া যায়। আচার্য্য সায়ণ ১.১৩.৯ ঋগ্‌ভাষ্যে বলেন, "ইড়াদি-শব্দাভিধেয়াঃ বহ্নিমূর্ত্তয়স্তিস্রঃ"—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিনটী শিখা বা মূর্ত্তি-বিশেষ। তিনি ১. ১৮৮. ৪ ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া পৃথিবীসম্বন্ধিনী, ভারতী আদিত্য-সম্বন্ধিনী এবং সরস্বতী দ্যুলোকসম্বন্ধিনী বাগ্‌দেবী। তিনি আবার ১. ১৪২. ৯ ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, এই দেবীত্রয় আদিত্যেরই প্রভাবিশেষ। অন্যত্র ১. ১৩. ৯ ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া বিষ্ণুপত্নী পৃথিবী, ভারতী ভারতপত্নী এবং সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই তিন দেবী সম্পর্কে বলিয়াছেন,— প্রাণ, অপান ও ব্যানই এই তিন দেবী।

ঋগ্বেদের একটী ঋকে (১. ১৪২. ৯) ইড়া, ভারতী, মহী ও সরস্বতী, এই চারি দেবীর

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২য় পঞ্চিকা, ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

নাম একসঙ্গে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। একটী (১. ১৩. ১) ঋকে আবার ভারতীকে বাদ দিয়া ইড়া, সরস্বতী ও মহীর স্তব করা হইয়াছে।

ইড়া, ভারতী, সরস্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দেবী সরস্বতীতে সকলের গুণ আরোপিত হইল। দেবী সরস্বতী প্রধানা হইলেন। ভারতবাসী বৈদিক যুগ হইতে এই সরস্বতীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। আজও সমগ্র ভারত তাঁহার ভক্ত। বৈদিক দেবদেবী সম্মানে, পূজায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সরস্বতী সুদূর বৈদিক কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

সারস্বত সত্র

বৈদিক যুগের ঋষিরা, রাজারা এবং সাধারণ লোকেরা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিত। আর সে সময় পাঁচটী জাতি সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিত। এই "পঞ্চজাতা বর্দ্ধয়ন্তী" (৬. ৬১. ১২) সরস্বতীর বরে তাহারাও বড় হইয়া উঠিল। পাঁচটী জাতির উল্লেখ আমরা অনেকবার বেদে পাইয়াছি। তাঁহাদিগকে বেদে 'পঞ্চজাতাঃ', 'পঞ্চজনাঃ', 'পঞ্চজনয়ঃ', 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই পঞ্চজাত যে কাহারা, তাহা লইয়া অনেক তর্ক আছে। কেহ বলেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্ব, পিতৃ, দেব, অসুর ও রাক্ষস। কেহ বলেন, তাঁহারা চারি জাতি ও নিষাদ। কেহ আবার অন্য রকমও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে বৈদিক উক্তির সঙ্গতি আদৌ হয় না। বেদে কয়েক জায়গায় পাঁচটী জাতির নাম একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পাঁচটী জাতি—অনু, দ্রুহ্যু, পুরু, তুর্বসু ও যদু। খুব সম্ভব ইহারাই পঞ্চজাতা। ইহাদের পুরোহিত ছিলেন ঋষি 'অত্রি'। ইহারা অগ্নি, সোম, মিত্র, ইন্দ্র ও সরস্বতীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিত। আবার বেদে পাওয়া যায়, "পঞ্চজনয়া বিশা" (৮. ৫২. ৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিত, ইন্দ্র ছিলেন 'সৎপতিঃ পঞ্চজনয়ঃ' (৫. ৩২. ১১); অগ্নি ছিলেন 'পঞ্চজনয়ঃ পুরোহিতঃ' (৯. ৬৬. ২০); বেদে (১. ১১৭. ৩) অত্রিকে বলা হইয়াছে 'ঋষিং পঞ্চজনয়ম্'। এই পঞ্চ জাতি সরস্বতীর অতিপ্রিয় ভক্ত ছিল।

ঋষিরা সরস্বতীর উপাসনা করিতেন, তাঁহার তীরে যজ্ঞ করিতেন। ক্রমে তাঁহারা সরস্বতীর জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যে স্থানে সরস্বতী বালুকামধ্যে লুপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম হইল 'বিনশন'। এই বিনশনের দক্ষিণ কূলে ষষ্ঠী তিথিতে সারস্বত সত্রের ব্যবস্থা ঋষিরা করিলেন। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র (১০. ১৫. ১) উপদেশ করিলেন,—"দক্ষিণে তীরে সরস্বত্যা বিনশনস্য দীক্ষেরন্ সারস্বতায় ষষ্ঠ্যাং পক্ষস্যেতি গৌতমঃ।" এই সারস্বত সত্রে পত্নীশালা, শামিত্র, সদঃশালা, আগ্নীধ্র, সমস্তই চক্রাকার করিয়া তৈরী করা হইত।

সদো যজ্ঞাগারং চক্রীবদাকারং ভবতি।—শা. শ্রৌ. সূত্র ১৩. ২৯. ৭
আগ্নীধ্রমপ্যাগারং তথৈব চক্রীবদাকারং ভবতি।—১৩.২৯.৮
উলূখলবুধ্নাকারো যূপো ভবতি।—১৩.২৯.৯

এই সারস্বত সত্রে সরস্বতীর জন্য একটী 'মেষী' বলি দিবারও ব্যবস্থা হইল। এই বলি সৌত্রামণীযাগেই বিহিত হইল। শাঙ্খায়ন ব্যবস্থা দিলেন,—

"তস্য সৌত্রামণস্যাশ্বিনঃ পশুর্লোহিতেন বর্ণেন বিশিষ্টঃ সারস্বতী চ মেষী ইত্যেতৌ পশূ উপালম্ভৌ সবনীয়স্য।—১৩ ১৩.১

নানা দেবতার নিকট অনেক রকম বলির ব্যবস্থা আছে। ইন্দ্রের নিকট গো ও মহিষ বলি দেওয়া হয় (শ ব্রা. ৫. ৫. ৪. ১)। অশ্বমেধযজ্ঞে সোমও পূষার নিকট ঘনধূসর বর্ণের ছাগ (শতপথ-ব্রা—১৩.২.২.৬) অগ্নির নিকটও ছাগ—তবে তার ঘাড়টী কাল হওয়া চাই (ঐ. ১৩.২.২.৩); অশ্বিদ্বয়ের নিকট লোহিত ছাগ, তবে নীচের দিক্‌টা কাল (ঐ ১৩. ২.২.৫), বায়ু ও সূর্য্যের নিকট সাদা ছাগ, যমের বলিতে কৃষ্ণছাগের প্রয়োজন (ঐ ১৩. ২.২.৭)। বিশেষ লোমশ উরুযুক্ত ছাগ না হইলে ত্বষ্টার বলি হইবে না (ঐ ১৩.২.২.৮)। সরস্বতীর সাধারণতঃ মেষী—ছাগ হইলেও চলে (ঐ ১৩. ২.২.৪)।

কৌষীতকি, লাট্যায়ন, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র এই সমস্ত বিধির অনুমোদন করিলেন।

সরস্বতীযাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগ্রন্থে অনেক আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

সোমক্রয়ে সরস্বতী

সোমযাগে সোম না হইলে চলে না। এই সোমকে বৈদিক সাহিত্যে রাজা বলিয়া বর্ণনা করাও হইয়াছে। একটা প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে, দেবতারা রাজা সোমকে পূর্ব্বদিকেই ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে নিয়মই হইয়া গেল যে, ঋত্বিকেরা প্রাচীন বংশের পূর্ব্বদিকেই সোমক্রয় করিবে [ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, তৃতীয় অধ্যায়]। যাহা হউক, রাজা সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাদের নিকট সোমকে আনিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেখানে বাগ্‌দেবী বাক্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, দেখ, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীকামী; আমাকেই তোমরা সোমের মূল্যস্বরূপ কর। দেবগণ কিন্তু বাক্‌কে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী নন। তখন বাগ্‌দেবী বলিলেন, তোমরা আমাকে দিয়াই সোম ক্রয় কর; যখনই তোমাদের দরকার হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট আসিব। অগত্যা দেবতারা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বাগ্‌দেবী মহতী নগ্নরূপধারিণী হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের নিকট গমন করেন, তবে তিনি অগ্নিপ্রণয়নের সময় পুনরায় ফিরিয়া আসেন [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৫ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড]। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৬.১৬.৫), মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৩.৭.৩) ও শতপথব্রাহ্মণে আখ্যানটী রূপান্তরিত। শতপথের আখ্যানটী এই,—

শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন (৩.৫.১.১৩)—পূর্ব্বে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণই ছিলেন। অঙ্গিরোগণ প্রথমে যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহারা আয়োজন শেষ করিয়া তার পরদিন আসিয়া যজ্ঞ করাইবার জন্য অগ্নিকে তাঁহাদের আহ্বান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আদিত্যগণ কিন্তু পরামর্শ করিল যে, তাঁহারা অঙ্গিরোগণের নিকট যাইবেন না, বরং তাঁহারাই তাঁহাদের নিকট আসিবেন। তাঁহারা সোমযাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহারা সেই দিনই যজ্ঞের আয়োজন করিয়া অগ্নিকে বলিলেন, আজই আমরা যজ্ঞ করিব, ইহা আপনি ও অঙ্গিরোগণ জানিয়া রাখুন। তবে আপনাকে আমাদের যজ্ঞে হোতা হইতে হইবে। আদিত্যগণ অন্য কাহাকে দিয়া অঙ্গিরোগণকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা অগ্নির উপর বেজায় চটিয়া গেলেন। অগ্নি বলিলেন, তিনি কি করিবেন, নিরপরাধ আদিত্যগণ তাঁহাকে বরণ করিলেন, তিনি তাঁহাদের কথা ফেলিতে পারিলেন না। অগত্যা অঙ্গিরোগণ উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আদিত্যগণকে যজ্ঞ করাইলেন। আদিত্যগণ দক্ষিণা-স্বরূপ দিবার জন্য বাক্‌কে আনয়ন করিলেন। অঙ্গিরোগণ বাক্‌কে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না ; বলিলেন, ইঁহাকে গ্রহণ করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। কিন্তু দক্ষিণা ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না। কাজেই তাঁহারা সূর্য্যকে আনিলেন, অঙ্গিরোগণ সূর্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাক্ বড়ই রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, সূর্য্য কোন্ গুণে আমার চেয়ে বড় যে, তাঁরা আমাকে গ্রহণ না করিয়া সূর্য্যকে গ্রহণ করিলেন ? এই কথা বলিয়া তিনি ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। আদিত্যগণ বলিলে দেবতাদের বোঝায়, অঙ্গিরোগণ অসুর। বাক্ ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহীরূপ ধারণ করিলেন।* দেবাসুরদের মধ্যে যাহা কিছু সম্মুখে পাইলেন, তাহাই নষ্ট করিতে লাগিলেন। দেবাসুররা অস্থির হইয়া পড়িলেন। দেবতাদের পক্ষ হইতে অগ্নি এবং অসুরদের পক্ষ হইতে সহরক্ষ দূতরূপে প্রেরিত হইলেন। বাকের ইচ্ছা, দেবতাদের নিকট ফিরিয়া যান। তাই তিনি দেবতাদের বলিলেন, তোমাদের নিকট গিয়া আমার লাভ কি ? দেবগণ বলিলেন, তিনি এমন কি, অগ্নিরও আগে যজ্ঞাহুতি পাইবেন। তখন বাক্ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণেরই নিকটে গমন করিলেন।

সোম ছিলেন দিব্যধামে, আর দেবতারা ছিলেন এই পৃথিবীতে। দেবতাদের ইচ্ছা হইল, সোম তাঁহাদের নিকট আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যজ্ঞের সুবিধা হইবে। গায়ত্রী সোম আনিবার জন্য আকাশে ছুটিলেন। সোম লইয়া যখন তিনি আসিতেছিলেন, তখন গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু তাহা অপহরণ করিলেন। দেবগণ সমস্ত সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীকামুক ; বাক্‌কে তাহাদের নিকট পাঠান যাক্, তিনি সোম লইয়া আমাদের নিকট আসুন। বাক্ প্রেরিত হইয়া গন্ধর্ব্বদের নিকট হইতে সোম লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

---

* জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও (৩. ১৮৭) সিংহীরূপ ধারণের কথা আছে।

গন্ধর্ব্বগণ পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া বলিল, 'সোম তোমাদের, বাক্ কিন্তু আমাদের।' দেবগণ বলিলেন, আচ্ছা, তাই হউক, তবে বাক্ যদি এখানে আসেন, তোমরা জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইও না; এস, আমরা উভয়েই তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করি। তাহাই হইল। গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার নিকট বেদপাঠ করিতে লাগিল। দেবগণ বীণার সৃষ্টি করিয়া বসিয়া বসিয়া বীণা বাজাইয়া ও গান করিয়া তাঁহাকে প্রমোদিত করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, আমরা তোমারই গান করিব, তোমাকেই প্রমোদিত করিব। সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধা বাক্ দেবগণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।--এইরূপে বাক্ ও সোম দেবতাদের নিকট রহিলেন।—শতপথব্রাহ্মণ, ৩.২.৪.১-৬।

এই আখ্যানটী তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। কিন্তু অতি সামান্য ও অন্যরূপ। তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বীণার কোন উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বাকের বীণার কথা আছে। একবার বাক্ যজ্ঞের কার্য্যে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়া দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া যান। বৃক্ষস্থিত শব্দরূপা বাক্ই দুন্দুভি, বীণা ও তূনবের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। নৈঘণ্টুকে (৫. ৫; নিরুক্ত ১১. ২৭) বাক্‌কে অন্তরীক্ষ-দেবতাদিগের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আর নিরুক্তে আমরা পাই, বজ্রই অন্তরীক্ষদেবতা বাক্। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের (১২.২) 'সরস্বতীতি তদ্দ্বিতীয়ং বজ্ররূপম্' এই উক্তি নিরুক্তসিদ্ধান্তের বীজ বলিয়া মনে হয়।

সরস্বতীর বলি

শতপথব্রাহ্মণে সরস্বতীর বলি কেমন করিয়া হইল, সে সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে, তাহা এইরূপ:—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বরূপের বিবাদ ঘটে, ফলে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে নিহত করেন। বিশ্বরূপ হত হইলে ত্বষ্টা ইন্দ্রের উপর খুব চটিয়া গেলেন। ইন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য আশ্চর্য্য যাদুশক্তিসম্পন্ন সোমরস তিনি আনয়ন করিলেন। ইন্দ্র যাহাতে তাহা পান করিতে না পারেন, তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন।[১] ইন্দ্র কিন্তু তাহা পান করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলেন। তিনি যজ্ঞার্থ আনীত ত্বষ্টার এই সোমরস জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া সমস্ত পান করিলেন। কাজটা ভাল হইল না; তাহাতে যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল। আর এই কার্য্যের ফল ইন্দ্রের নিকট অতি সাঙ্ঘাতিক হইল। তিনি এই

১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড, ৩৫ অধ্যায়) ব্যাপারটী অন্য রকমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী হন। ত্বষ্টা তখন বৃত্র নামক ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র তাহাকেও হত্যা করেন। ইন্দ্র যতিবেশী রাক্ষসদের মারিয়া বুনো কুকুরদের দিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশধারী অরুর্ম্মঘদের বধ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই পাঁচ অপরাধে দেবতারা ইন্দ্রকে বর্জ্জন করিলে ইন্দ্র সোমপানে বঞ্চিত হন। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যানগুলি আছে।

সোমরস পানের ফলে ছটফট করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে বীর্য্য (ইন্দ্রিয়) খসিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্র তাঁহার তেজ, বলবীর্য্য সব হারাইয়া ফেলিলেন[২]।

অসুর নমুচি ইন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি এই সময় ঝোপ বুঝিয়া কোপ পাড়িলেন[৩]। নমুচি ইন্দ্রের শারীরিক দৌর্ব্বল্য দেখিয়া তাঁহাকে সুরার সাহায্যে বিশেষরূপে বলহীন করিয়া সোমের প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবতারা হায় হায় করিতে লাগিলেন। দেবতারা বলিলেন, যিনি ইন্দ্রকে আরাম করিতে পারিবেন, তাঁহারা তাঁহাকে পশুবলি প্রদান করিবেন। শেষে তাঁহারা স্থির করিলেন, অশ্বিদ্বয়কে ছাগ এবং সরস্বতীকে মেষ বলি দেওয়া হইবে।[৪] এদিকে ইন্দ্র রোগমুক্তির জন্য ভিষকের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার বোধ হয় মনে করিলেন। বৈদিক যুগে ভিষক্ ছিলেন অশ্বিদ্বয়। তাহার পরেও বরাবর তাঁহাদের ভিষক্ বলিয়া খ্যাতি আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সরস্বতীকেও ভিষক্ বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, ভিষক্ যে অশ্বিদ্বয়, যজুর্ব্বেদ সরস্বতীকে তাঁহাদের পত্নীও বলিয়াছেন। নদীরূপা সরস্বতীর সুস্থতাসম্পাদনকারিণী শক্তির পরিচয়ও আছে। অশ্বিদ্বয় যখন নমুচির নিকট হইতে সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবী সরস্বতী তাহা সংস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর নিকট গমন করিলেন। শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করুন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন,—আমি নমুচির নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, দিবসে কিংবা রাত্রিকালে আমি নমুচিকে নিহত করিব না। দণ্ডাঘাতে, ধনু দ্বারা, মুষ্টি কিংবা হস্ত দ্বারা তাহাকে মারিব না। শুষ্ক কিংবা আর্দ্র দ্রব্য দ্বারা তাহাকে মারিব না। তবুও সে আমাকে বলহীন নিস্তেজ করিল। আমি যাহাতে আমার বল ফিরিয়া পাইতে পারি, আপনারা তাহার উপায় করিয়া দিন। সরস্বতী ইন্দ্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সৌত্রামণী যাগের সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র নীরোগ হইয়া তেজোলাভ করিলেন। সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় জলাভিসেচনপূর্ব্বক ইন্দ্রের জন্য বজ্র তৈরী করিয়া দিলেন। তখন ইন্দ্র নমুচিকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে অথচ সূর্য্যও উদিত হয় নাই, এমন সময় ইন্দ্র না-শুষ্ক না-আর্দ্র অভিষিক্ত ফেনের দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন।[৫]

সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সৌত্রামণী যাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মেষ বলিস্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাই সৌত্রামণীযাগে ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়ের বলির সহিত সরস্বতীর উদ্দেশে মেষ বলিও দেওয়া হইত।

২। শতপথ-ব্রাহ্মণ ১২. ৭. ১. ১-২

৩। ঐ ১২. ৭. ১. ১০

৪। শতপথব্রাহ্মণ ১২. ৭. ১. ১০-১২

৫। „ ১২. ৭. ৩. ১—৪

শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন উপদেশ করেন যে, সোমযাগে বিভিন্ন দেবতার নিকট জীববলি দিতে হয়। কেশবপনীয়ের একমাস পরে অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১. ৮. ১৯) মতে পক্ষান্তে অমাবস্থার দিন ও শুক্লা প্রতিপদে "ব্যুষ্টিদ্বিরাত্র" করিতে হয়। ব্যুষ্টিদ্বিরাত্র করিতে হইলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র সোমযাগ করিতে হয়। অতিরাত্রের সঙ্গে ষোড়শী যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। ষোড়শীতে ইন্দ্রের দাবী। তাঁহার নিকট তিনটি বলি দিতে হয়। কাত্যায়নসূত্রের (৯. ৮. ৫) নির্দ্দেশ এই যে, অতিরাত্রে সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। তারপর একমাস পরে অথবা শ্রাবণী পূর্ণিমায় 'ক্ষত্রধৃতি' নামক অগ্নিষ্টোম করিতে হয়। তারপর কৃষ্ণপক্ষে সৌত্রামণী যাগ। সৌত্রামণী যাগে অনেক বিশেষ করণীয় আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ (৫. ৫. ৪. ১) বলিতেছেন,—

"শ্বেত আশ্বিনো ভবতি। শ্বেতাবিব হ্যশ্বিনাববিপ্রলিহা সরস্বতী ভবত্যষভমিন্দ্রায় সুত্রাম্না আলভতে তুর্ব্বেদা এবং সমৃদ্ধাঃ পশবো যদ্যেবং সমৃদ্ধান্ন বিন্দেদপ্যজানে বালভেরংস্তে সুশ্রপতরা ভবন্তি স যদজানা লভেরং লোহিত আশ্বিনো ভবতি তদ্‌যদেতয়া যজতে।"

অশ্বিদ্বয় লোহিতাভ শ্বেত বলিয়া তাঁহাদের নিকট লোহিতাভ শ্বেত ছাগ বলি দিতে হয়। সরস্বতীর নিকট মেষ (এড়ক) বলি দিতে হয়।

সম্পূর্ণ সোমযাগের সাতটি অঙ্গ। সপ্তম ও শেষ অঙ্গ হইল বাজপেয়। অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম ছাড়া বাজপেয় একটি স্বতন্ত্র যাগ। বাজপেয়েও ষোড়শী যাগ করিয়া তিনটি বলি দিতে হয়। তারপর সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে মধ্যম দিনে নানা দেবতার উদ্দেশে অন্যূন ৩৪৯ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু যূপে ও যূপান্তরালে বাঁধিয়া রাখা হইত। যাহাদের যূপে বাঁধা হইত, তাহাদের মধ্যে সকল রকম পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গই থাকিত। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার ন্যায় বাক্ ও সরস্বতীর জন্য পৃথক্ বলির ব্যবস্থা ছিল। সরস্বতীর জন্য মেষী, বৎসতরী প্রভৃতি গ্রাম্য পশু এবং পুরুষবাক্ অর্থাৎ মানুষের মত কথা কহিতে পারে, এমন শারিকা প্রভৃতি আরণ্য পশু থাকিত। গ্রাম্য পশুগুলিকে সত্য সত্যই বলি দেওয়া হইত, আর আরণ্য পশুগুলিকে মন্ত্রবলি দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সরস্বতীর বলির একটা ব্যবস্থা আছে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি ভালরকম কথা বলিতে না পারে, তাহাকে সরস্বতীর জন্য একটি মেষী হনন করিতে হইবে। কারণ, সরস্বতীই বাক্। সরস্বতীর নিকট মেষী বলি দিলে সে ব্যক্তি দেবীর প্রসাদে বাগ্‌বিভব লাভ করিবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে একটি মেষী সরস্বতীর বলি। ইহাকে ঘোড়ার হনুর নীচে বাঁধিবার নিয়ম [৬]।

সরস্বতীর বলি সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে আর একটী আখ্যান আছে। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্লান্তি নিবারণের জন্য তিনি প্রযত্ন করিলেন। প্রজাগণ তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে নিকটে আনিতে

৬। শতপথব্রাহ্মণ, ১৩. ২. ২. ৪

প্রযত্ন করিলেন। তিনি এগারটী বলির পশু ঈক্ষণ করিলেন। তাহাতে নিজের মধ্যে বলাধান হইল। প্রজাগণ তাঁহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বলি প্রদান করিয়া তিনি অধিকতর সুস্থতা লাভ করিলেন। এই জন্য যজমান প্রজা ও ধনলাভ করিবার জন্য একাদশটী বলি দিয়া থাকে। প্রথম অগ্নির বলি, দ্বিতীয় সরস্বতীর বলি, তৃতীয় পূষার বলি। এইরূপে সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বেদেব, ইন্দ্র, মরুৎ, ইন্দ্রাগ্নি, সবিতা ও বরুণের বলি দিতে হয়।[৭] সরস্বতীর বলি দিতে হয়, কেন না, শতপথ বলেন, সরস্বতীই বাক্। এই বাকের দ্বারা প্রজাপতি পুনরায় বলসঞ্চয় করিলেন। বাক্ তাঁহার দিকে ফিরিলেন, বাক্ আপনাকে তাঁহার বশবর্ত্তিনী করিলেন। বাকের দ্বারা তিনি শক্তিমান্ হইলেন।[৮]

শতপথব্রাহ্মণ সরস্বতীকে চরু দিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া বজ্রের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। বাক্ দেবগণকে ("বৃত্রকে) প্রহার কর, বধ কর" এই কথা বলিয়া অনুমোদন ও উৎসাহদান করিয়াছিলেন। আর বাক্ই সরস্বতী; সুতরাং সরস্বতীর জন্য চরুর ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই জন্য সাকমেধ যজ্ঞে মহাহবির মধ্যে সরস্বতীকে চরু দিতে হয়।[৯]

যে সমস্ত দেবতার কাছে সংসৃপ্ হবি দেওয়া হয়, কৃষ্ণযজুর্বেদে তাহাদের একটী তালিকা আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা (১.৮.১৭) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৮.১) এইরকম তালিকা আছে। তালিকায় দেবতার নাম, যথা—অগ্নি, সরস্বতী, সবিতা, পূষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

সরস্বতীর নিকট পশুবলির কথা আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও (৩.৯.২) আছে।—

আশ্বিন সারস্বতৈন্দ্রাঃ পশবঃ। বার্হস্পত্যো বা চতুর্থঃ। ২

এখন আমরা বৈদিক সাহিত্য হইতে দুইটী জিনিস পাইলাম। সরস্বতীর নিকট পশুবলি এবং তাঁহার জন্য চরু দানের ব্যবস্থা। দুইটীই যে প্রথারূপে পরযুগেও প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন আছে। পতঞ্জলি ১৫০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রণীত মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"সারস্বতীম্। 'যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।—

আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেদিতি।' প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।"

আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারস্বতী ইষ্টি করিবে। প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।

দেখা যাইতেছে, লোকে যজ্ঞ করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া ফেলিত। অপশব্দ প্রয়োগ করিলে প্রয়োগকর্ত্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সেই

৭। শতপথব্রাহ্মণ ৩. ৯. ১. ৮। শতপথব্রাহ্মণ ৩. ৯. ১. ৭. ৯। শতপথব্রাহ্মণ ২. ৫. ৪. ৫,

প্রায়শ্চিত্তের নাম সরস্বতী-যাগ বা সারস্বতী ইষ্টি। মনুসংহিতায়ও এই সারস্বত-যাগের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও এই যাগের উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু তাহা অপশব্দ প্রয়োগের জন্য নয়—সত্যের অপলাপের জন্য, সাক্ষ্য দিতে গিয়া সত্য কথার পরিবর্ত্তে মিথ্যা কথা বলার জন্য। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া এমন একটী কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিল, যাহার ফলে তাহাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। মনু বলেন (৮. ১০৪), যেখানে সত্যকথা বলিলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইবে, সেখানে মিথ্যা কথা বলাই উচিত। এখানে মিথ্যা সত্য অপেক্ষা প্রশস্ত। যাজ্ঞবল্ক্যও (২.৮৩) এই ভাবের কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু যিনি মিথ্যা কথা বলিবেন, তাঁহাকে এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন,—

"বাগ্‌দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্বাণো নিষ্কৃতিং পরাম্॥" ৮।১০৫

এইরূপ মিথ্যাকথার জন্য যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান, তাঁহাদিগকে চরু দিয়া সরস্বতীযাগ করিতে হইবে। সরস্বতীযাগে চরুই বিধি। চরু-বিধির উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। ভরত মুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। ভরতের উক্তি এইরূপ :—

"ব্রহ্মাণং মধুপর্কেণ পায়সেন সরস্বতীম্।
শিববিষ্ণুমহেন্দ্রাদ্যাঃ সম্পূজ্যা মোদকৈরথ॥" ৩.৩৭

সরস্বতীর নিকট বলির প্রথা এখনও লোপ পায় নাই। ভদ্রকালীর নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। ভদ্রকালী সরস্বতী—নীলাভ। বাঙ্গলার বরিশাল অঞ্চলে আজও সরস্বতীর নিকট সাদা ছাগ বলি দেওয়া হয়। মাদারিপুর সবডিভিজনের অন্তর্গত কার্ত্তিকপুরেও সরস্বতীপূজার দিন সরস্বতীর নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। মাদারিপুরের অন্যান্য জায়গায় এ প্রথা প্রায়ই নাই। পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সরস্বতীপূজায় সাদা ছাগল বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। বরিশালে, মাদারিপুরে এবং পূর্ব্ববঙ্গের আরও দুই এক জায়গায় ছাত্রেরা পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিতে সরস্বতীর নিকট পাঁঠা বলির মানস করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতীপূজার দিন নিরামিষ ভোজনই বিধি। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলায়, বিশেষতঃ বরিশাল, রহমৎপুর, গৈলা প্রভৃতি স্থানে সরস্বতীপূজার পূর্ব্বে কাহারও বাড়ীতে ইলিশ মাছ আসে না। ঐ দিন প্রথম ইলিশ মাছ আনিয়া খাইতে হয়। জলাবাড়ীতে ঐ দিন ইলিশ মাছ খায় এবং পাঁঠা বলি দেয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমায়, বিক্রমপুর, মৈমনসিংহে ঐ দিন গৃহস্থগণ প্রথম ইলিশমাছ খায়। চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়ায়ও ঐ দিন কেহ মাছ খায় না। কুমারখালি ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমায় অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান

অধুনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের প্রথানুসারে সরস্বতীপূজার দিন প্রথম ইলিশ মাছ ভক্ষণের নিয়ম বজায় রাখিয়াছে।

মাদারিপুর সবডিভিজনে অধিকাংশ জায়গায়ই সরস্বতীপূজার দিন জোড়া ইলিশমাছ খাওয়ার নিয়ম আছে। যদি জোড়া ইলিশমাছ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটী মাছের সঙ্গে একটী লম্বা আস্ত বেগুন একসঙ্গে করিয়া জোড়া করিয়া লওয়া হয়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন কেহ কেহ জোড়া ইলিশ মাছ বাড়ীতে আনিয়া থাকেন। ইঁহারা পরেও ইলিশমাছ খাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ দিন জোড়া ইলিশ না আনেন, তাঁহারা সরস্বতীপূজা পর্য্যন্ত আর ইলিশ মাছ খাইতে পারেন না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি*

গত কয়েক বৎসর যাবৎ সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নানা স্থান হইতে প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগৃহীত হইতেছে। বর্ত্তমানে আমার উপর সেই পুথির বিবরণ প্রস্তুত ও প্রকাশের ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুথিগুলি আলোচনা করিবার সময় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালা পুথি আমার দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত পুথির সঙ্গেই সেগুলি পরিষদে আসিয়া পড়িয়াছিল। মুখ্যতঃ সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করাই পরিষদের উদ্দেশ্য। তাই এতদিন এগুলি কাহারও তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাহা ছাড়া সংখ্যায়ও এগুলি খুব বেশী নহে।

কিন্তু সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাদেরই মধ্যে কয়েকখানি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও নূতন তথ্যপূর্ণ পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণকে কিছু জানান কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্যেই পরিষৎসংগৃহীত বাঙ্গালা পুথির মধ্যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি বাছিয়া লইয়া নিম্নে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রদান করিতেছি।

সেই বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে সাধারণভাবে পরিষদের পুথিগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সংগ্রহের মধ্যে খুব প্রাচীন পুথি কিছু নাই। ১১৮১ সনে লিখিত মহাভারতের আদিপর্ব্ব, ১১৮৪ সনে লিখিত আশ্রমবাসিক পর্ব্ব এবং ১১৯৮ সনে লিখিত বিরাটপর্ব্ব, এই তিনখানি বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত পুথিই প্রাচীনতম। ইহা ছাড়া প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কয়েকখানি পুথিও আছে। নূতন পুথির মধ্যে জয়গোপাল দাসের গোবিন্দমঙ্গল ও বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। এতদ্ভিন্ন ভাষাসংক্ষেপাশৌচপ্রকরণ, রোগনির্ণয়, ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ (আংশিক), রাধাবল্লভ কবিশেখরকৃত ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কবিচন্দ্রকৃত অক্রুর আগমন, প্রহ্লাদচরিত্র ও ভরতসংবাদ পরিষৎসংগ্রহে আছে।

বৈষ্ণবগ্রন্থের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সুপরিচিত গ্রন্থ ছাড়া দুইখানি নূতন গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুইখানিই নরোত্তম দাস-রচিত। একখানি বৈষ্ণবামৃত এবং আর একখানি রসসার। বৈষ্ণবামৃতে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং বিষ্ণু-ভক্তের নানা প্রশংসা করা হইয়াছে। রসসারের বিবরণ নিম্নে অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণের সহিত প্রদত্ত হইবে।

---

* ২০এ ফাল্গুন, ১৩৩৪, মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এইবার কয়েকখানি পুথির বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। **গোবিন্দমঙ্গল।** জয়গোপাল দাসরচিত। এখানি ভাগবতের অনুবাদ নহে। ইহা কৃষ্ণমঙ্গলজাতীয় গ্রন্থ; ইহাতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতা শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। লেখক পশ্চিমবঙ্গের লোক হইতে পারেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোথাও এই পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

জৈর্ন্ন শ্রুতং ভাগবতং পুবাণং নারাধিতো জৈ পুরুসঃ পুরাণং।
অথেগুতং জৈর্ন্ন ধরামরাণাং স্তেসাং ব্রেথা জন্ম নরাধমানাং ॥
নারায়ণঃ নাম নরোবরাণাং প্রশীদ্ধচৌর কথিত পৃথিব্যাং।
অনেকঃ জন্মার্জ্জিতঃ পাপসঞ্চয়ং হরিত্যসেসং স্মৃতিমাত্রকেবলং ॥

প্রণমহো নারায়ণ অনাধিনিধন।
শ্রিষ্টিস্থিতিপ্রলয় জাহার কারণ ॥
রশীক জনের সঙ্গে বশীলা সকল।
মন দিঞা সুন কীছু গোবিন্দমঙ্গল ॥
এ জয়গোপাল দাষ কহে শাস্ত্রমতে।
গোবিন্দমঙ্গলকথা সুনহ জগতে ॥

মধ্য :—

কানাই হে দেও খেয়া বাহিয়া সকালে।
মথুরা জাইব বিকে সব সখি মেলে ॥ ধুয়া ॥
ঘাটেত নৌকাখানি চাপত্তি বনমালি।
ঘাটে বহি ডাক পাড়ে রাধিকা নহলি ॥
জোগানে উৎসুক মতি হইছে আমার।
জাইব মথুরা পুরি ঝাট কর পার ॥
আইস আইস বোলি গোপী দেয় হাতসান।
নেউটীবার বেলায় আনিঞা দিব গুয়া পান ॥
সুগন্ধি চাঁপার ফুল আনিব কৌতুরি।
তোমারে আনিয়া দিব সুনহ কাণ্ডারি ॥
সুনিঞা না সুনে বোলে দেখিঞা না দেখি।
মুচকী হাশীঞা কৃষ্ণ হাশে আড় আখি ॥

এ জয়গোপাল দাষ গাইল আনন্দে।
নৌকাখানি বান্ধিঞা কৃষ্ণ আইসে এ বন্ধে॥
(পত্র– ১৭৭খ – ১৭৮ক)

শেষ :—

এ জয়গোপাল দাষ গাইল কৌতুকে।
গোবীন্দমঙ্গলকথা ষুন সর্ব্বলোকে॥
গোবিন্দমঙ্গলকথা জেই জনা ষুনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার বিনিত সাধনে॥ ইতি কংসবধ॥

মল্লার রাগ॥

আন নারে আরে গোবিন্দ রাম জয়।
ষুনিলে কৃষ্ণের কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ ধুয়া

তথাহি॥ নারায়ণো নাম নরোবরাণাং ইত্যাদি।

ভবিষ্যতে গ্রন্থখানির বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

২। **কালিকামঙ্গল**। কবিশেখরকৃত। গ্রন্থকারের পূর্ণ নাম বোধ হয়, বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখর। গ্রন্থপ্রারম্ভেই বলরাম চক্রবর্ত্তী, এই নাম পাওয়া যায়।

"বলরাম চক্রবর্ত্তি মাগে তব পদে ভক্তি
কর প্রভু কৃপাবলোকন।"
"কালিপদসরসিজে করিয়া প্রণাম।
দিগ্‌বন্দনা গান দ্বিজ বলরাম॥" (পত্র ৫ক)

গ্রন্থমধ্যে ভণিতায় শুদ্ধ কবিশেখর, এই নামই পাওয়া যায়। তবে এই কবিশেখর কে এবং কোন্ স্থানের লোক, তাহা বলিবার উপায় নাই। কবিশেখর একটী উপাধি এবং এই উপাধি একাধিক ব্যক্তির থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা কবিশেখর, সংস্কৃত প্রহসন শঠভাবোদয়ের রচয়িতা কবিশেখর, এই দুই কবিশেখরের কথা আমরা অবগত আছি।

এই গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দিগ্‌বন্দনায় বঙ্গদেশের নানা দেবীমন্দিরের উল্লেখ আছে। রচনার নমুনা,—

সাজে কন্যা বিদ্যা সতি রাজহংসি জিনি গতি
চরণে নুপুর ঘন বাজে।
কদম্ব কোরক কুচ গজকুম্ভ জিনি উচ্চ
মধ্যদেস গঞ্জে মৃগরাজে॥
সমর্পিল পূজা কিছু করিল ভক্ষণ।
শুইল খট্টায় চারি ভিতে সখিগণ॥

কৌতুকে মদন কড়ি দিয়া নিজ কর্ণে।
বসন্ত আলাপে গীত গায় নানা বর্ণে॥
মধুর বচনে মোহে জত সখিগণ।
প্রেমে গদগদ চিত্ত হরল গেয়ান॥
সব সখিগণ রঙ্গে মদন মোহিত।
রাধার মঙ্গল গায় বিরহচরিত॥
কালিপদ-সরসিজ-মধু-লুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারথি॥ (পত্র—২৭ ক)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবিশেখররচিত একখানি দেবীমঙ্গল আছে। এই গ্রন্থখানি আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি হইতে স্বতন্ত্র; ইহা সপ্তশতী চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ।

সেহি বাক্য মনে ধরি শ্লোক অর্থ অনুসারি
সপ্তসতি করিল পয়ার॥

দেবীমঙ্গল ১৬৫২ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল।

পক্ষ ভূত রিতু চন্দ্র সকের বরিষে।
বৈসাখ মাসের চতুর্ব্বিংসতি দিবসে॥

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লইয়া রচিত বহু কবির বহু গ্রন্থের সংবাদ ইতঃপূর্ব্বেই জানিতে পারা গিয়াছে। তবে আলোচ্য গ্রন্থখানির খবর ইতঃপূর্ব্বে কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। ভবিষ্যতে এ গ্রন্থখানির বিস্তৃত বিবরণ দিবার ইচ্ছা আছে।

৩। **রসসার**—নরোত্তম দাসকৃত। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের রসতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। গুরুর প্রয়োজনীয়তা, সাত্ত্বিক গুণ, স্থায়িভাব, রস, দক্ষিণাদি নায়ক, নায়িকাভেদ, বিকৃতিরস, প্রেমবৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে দেখা যায়। গ্রন্থশেষে সহজমতের কথা আছে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপলক্ষেই রামী ও চণ্ডীদাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ ইহার পরকীয়াতত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিজাতিয় সাধুসঙ্গ না করিয় কভু।
সঙ্গ করিবা জেবা মানে নিজপ্রভু॥
পতি উপক্ষি সতি হয় সর্ব্বনাস।
পতিহিন সতিজনে সদত নৈরাস॥
পরকিয়া রস জিবে সম্ভব না হয়।
তদ্ভাবভাবিত বিনা অন্তে না ঘটয়॥
পতিসঙ্গ করি উপপতি করে ভাব।
সে জন অসেষ পাপি পাপমাত্র লাভ॥

তবে জদি কেহ বলে ব্রজে গোপীগণে।
পতি ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্গ কৈল কি কারনে॥
দুর্গম নিগূঢ় ইহা কহিব সংখেপে।
সংখেপার্থ করি কহি বুঝ কোনরূপে॥
নিজাঙ্গ সঙ্গে রসে ভিন্যাঙ্গ নয়।
আত্মসঙ্গিত স্বাঙ্গি ভিন্য নাহি কয়॥
তদাশ্রীত জন বিনা কে বুঝিতে পারে।
চৈতন্যের ক্রিপা ভাবি হৈয়া থাকে জারে॥
নিজঙ্গে রাধাঙ্গ একাঙ্গ হৈয়া।
আস্বাদিলা তদ্ভাব অবতারি হৈয়া॥
সবে রায় রামানন্দ জানয়ে অন্তর।
আর জানয়ে সরূপ দামোদর॥ (পত্র—১৫ক)

৪। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুবাদ।** ষষ্ঠ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় পত্র নাই। অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় নাই। অনুবাদ সর্ব্বত্র মূলানুযায়ী নহে।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায়॥

অথো শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাভাষা লিক্ষতে॥

জিনিতে জমের দায়　　ধরণী লোটায়্যা কায়
বন্দো গুরুদেবের চরণ।
জাগ জোগ কর্ম্মজ্ঞান　　শ্রবণ মঙ্গল ধ্যান
গুরুভক্তি মুক্তির কারণ॥

মধ্য:—

কৌমার জৌবন জরা শরীরে যেমন।
বিনা জত্নে হয় জায় না রহে কখন॥
দেহান্তরে প্রাপ্তী হেন মত ব্যবহার।
পণ্ডিতে না ভুলে ভেদ জানিয়া তাহার॥
ইন্দ্রিয়গণের হেন বিষয় সংজোগ।
তবে হয় সিত উশ্মা সুখদুঃখ ভোগ॥
রৌদ্রেতে রহিলে জেন উশ্মা পীড়া করে।
সিত লাগে রহিলেই জলের ভিতরে॥

অন্ত :—

দেহ গ্রিবা মস্তকাদি কিছু না চালিবে।
কেবল নাসীক অগ্র দৃষ্টীকে রাখিবে॥

ইন্দ্রিয় মনের চেষ্টা দূরে তেয়াগিবে।
স্ত্রিলোকের না করিবে মুখাবলোকন।
ভয় তেজি বিশয়ে বিরক্ত হবে মন॥
আমাতে রাখিবে

৫। **যুক্তিকল্পতরু** ভোজরাজপ্রণীত সংস্কৃত যুক্তিকল্পতরুর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। অনুবাদকের নাম পুথিতে নাই। পুথিখানি অসম্পূর্ণ। ইহাতে 'রাজগৃহযুক্তি' পর্য্যন্ত আছে। অনুবাদ সকল স্থলে মূলের ঠিক অনুরূপ নহে। ভাবানুবাদই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। রচনার নমুনা :—

জগতের সৃষ্টিরক্ষা বিনাশ কারণ।
প্রথমে প্রণাম করি তাঁহার চরণ॥
শাস্ত্রকর্ত্তৃচরণ বন্দিয়া বার বার।
মুনিকৃত শাস্ত্র যত তার লইয়া সার॥
ভোজরাজপ্রকাশিত যুক্তিকল্পতরু।
মনোঽভীষ্টফলদাতা নীতিশাস্ত্রগুরু॥ ইত্যাদি

এ জাতীয় গ্রন্থ বাঙ্গালায় খুব কমই পাওয়া যায়।

৬। **ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপ।** রাধাবল্লভ কবিবাগীশরচিত।

একদিন বাঙ্গালাসাহিত্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে বিশেষ অনাদৃত ও অবজ্ঞাত ছিল। অন্য শাস্ত্রগ্রন্থের ত কথাই নাই—পুরাণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। শুধু শুষ্ক নিষেধ নহে—তাহার সহিত ভীতিপ্রদর্শন ছিল—ভাষায় পুরাণ পাঠ করিলে নরকে বাস করিতে হইবে।

তবে কালক্রমে ব্রাহ্মণপণ্ডিতসম্প্রদায়ের এ মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের কারণ পুরাপুরি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগ বলিয়া বোধ হয় না। অব্রাহ্মণ গ্রাম্য কবির চেষ্টায় বাঙ্গালাসাহিত্য দিন দিন যে প্রসার লাভ করিতেছিল, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা তাঁহাদের সামর্থ্যের অতীত ছিল। সেই জন্য তাঁহারাও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সংস্কৃতশাস্ত্র সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছিলেন। তাহা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সংস্কৃতশিক্ষার অল্পবিস্তর অবনতি যে না হইতেছিল, তাহা নহে। ফলে সাধারণের কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃতজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দল সৃষ্টি হইয়াছিল। ইঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য স্মৃতি ও জ্যোতিষের সাধারণ বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ লোপ পাইবার আশঙ্কা ছিল।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি এইরূপ উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রাধাবল্লভের ভাষাস্মৃতির উল্লেখ ১৭২৮ শকাব্দে রচিত রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল' গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে।* পৃথ্বীচন্দ্রের উল্লিখিত রাধাবল্লভই বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা কি না, তাহা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ, রাধাবল্লভের নামীয় স্মৃতিবল্লক্রম নামে আর একখানি বাঙ্গালা স্মৃতিগ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন।† এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌খানি পৃথ্বীচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

আলোচ্য গ্রন্থে অশৌচ, শ্রাদ্ধ ও তিথি, এই তিনটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার রচনার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"তত্রাদৌ সপিণ্ডাদিব্যবস্থা। সপিণ্ডদানব্যতিরেকে অশৌচ নির্ণয় করিতে না পারে অতএব প্রথম সপিণ্ডাদি বিচার করিতেছি। তাহাতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পুরুষের সপিণ্ড হয়। ইহার মধ্যে যদি পিতা পিতামহ জীবদ্দশাতে থাকে তবে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড হয়॥"

৭। কাশীদাসী মহাভারত। নূতন গ্রন্থ বলিয়া এখানির উল্লেখ করিতেছি না। তবে ইহার শেষে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহা আলোচনার বিষয়। এ জন্য উহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শকাব্দা বিধিমুখ করহ তৃগুণ।
রুক্মিনিনন্দন অঙ্ক জলনিধি পুন ॥
বৃসরাসি বহির্ভূত মাস সনিশ্চিতে।
ভালি দিন চন্দ্রহিন গগনবিদিতে॥
মৃগাঙ্কমুদিতপক্ষ এক অঙ্কস্থিতে।
সসিযুত বাসরে দিজাম দিন হৈতে॥
কাসির কৃত [ক]াব্য এই চরিত্র পাণ্ডব।
সাধুগন উপাক্ষন তরিবারে ভব॥
আদিপর্ব্ব ভারথ কেবল সুধাসিন্ধু।
সংসারসাগরে ভাই তরিবারে বন্ধু॥
এতদূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত॥

কবিত্র অনুসারে সকাব্দা ১৬৬৪।৩।১৫॥

লিখিতং শ্রীহিদয়রাম মিত্র নিবাস গোলপুর পাটনার্থে শ্রীসাকহি রামবল্লিক নিবাস নিজগ্রাম সন ১১৮১ সাল মাহ বৈশাখ ৭ দিনে পুস্তক লেখা সমাপ্ত॥ বার সনিবারে বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল॥

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (৩য় বর্ষ, পৃঃ ৫০)।

† Notices of Sanskrit Manuscripts (New Series)—Vol II. p. 256.

এই স্থলে তিনটী তারিখ দেওয়া হইয়াছে—একটী অক্ষরে এবং দুইটী সংখ্যায়। শেষের তারিখটী লিপিকরের, তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কিন্তু অপর তারিখ দুইটী কাহার, তাহা বুঝা যায় না। প্রথম তারিখটী শক ত্রয়োদশ শতাব্দীর। সুতরাং উহা কাশীদাসের সময় হইতে পারে না। কাশীদাস উহার দুই তিন শত বৎসর পরের লোক। দ্বিতীয় তারিখটীও কাশীদাসের পরের। সুতরাং উহা কাহাকে নির্দ্দেশ করে, বলা কঠিন।

৮। **ভরতসংবাদ**। কবিচন্দ্রকৃত। পুথিখানি ১২৪৬ বঙ্গাব্দে লিখিত। পুস্তকের নাম কোথাও দেওয়া নাই। তবে বনগত রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ, ভরতকৃত রামের পাদুকাগ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার ইহাতে বর্ণিত থাকায় ইহা রামায়ণের ভরতসংবাদ বলিয়াই মনে হয়। এই গ্রন্থে একটী নূতন কথা আছে—ইহাকে 'দশম স্কন্ধের কথা' বলা হইয়াছে।

'দশম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ গায়' (৯খ, ১০ পত্র)

রামায়ণের এই অংশকে 'দশম স্কন্ধের কথা' বলিবার কারণ কি, বুঝিলাম না।

৯। **সত্যনারায়ণের পাঁচালী**। রামকান্তরচিত। ইহার পরিচয় গ্রন্থ-শেষে এইরূপ দেওয়া আছে,—

"রামকান্ত মন্দিঘাটি আঁধারে মানিকে বাটী
দেবের আদেশ পেয়ে কয়।"

গ্রন্থখানি বোধ হয়, রাজসাহী অঞ্চলে রচিত। এ জাতীয় পাঁচালীতে প্রসিদ্ধ কাঠুরিয়াগণকে পাহাড়পুর অঞ্চলের বলা হইয়াছে। 'পাহাড়পুরের কাঠুরিয়া যত।' সাধু ঢাকানিবাসী স্বর্ণবণিক্ রূপসাহা।

সেই দিন এক সাধু ঢাকা হত্যা ডিঙ্গা
লাগায়েছে কুলে।
হৈম বান্যা জাতে রূপসাহা নাম
নিবাস গৌড় বাদসাহি॥

সাধুর কন্যা মনোরমা। বল্লভ শেঠের পুত্র কালীকান্তের সহিত তাহার বিবাহ হয়।

আদিশূরধাম বঙ্গে গ্রাম পঞ্চসার।
লক্ষ টাকা পাঠাইয়া করিল সমাচার॥
বল্লভ সেটের সুত কালিকান্ত নাম।

স্থান ও পাত্রপাত্রীর এইরূপ নাম এ জাতীয় অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

সাধুর নানা জাতীয় বহু ডিঙ্গা ছিল। যথা—খুরশান, হংসরাজ, ঢোলপাটী, জঙ্গীউঠ, বাঘঝাপি, সোনাভাষী, জয়রাজ ইত্যাদি (পত্র—৬ ক—খ)। সিংহলযাত্রার পথে অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ, নবদ্বীপে বুড়াশিব, গোপতিপাড়ায় রঘুনাথ, ফুলিয়ায় আবাডুক (?), ত্রিবেণীতে দরফ খাঁ, রাজাফলায় কানুরায়কে প্রণাম করিবার কথা আছে। প্রসঙ্গক্রমে

কম্পাশ যন্ত্র, দূরবীণ ও মাদ্রাজ নগরের উল্লেখ আছে। ইহাতে গ্রন্থখানিকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।

শিবচন্দ্রপ্রণীত একখানি স্বতন্ত্র সত্যনারায়ণের পাঁচালীও পরিষৎসংগ্রহে আছে। তবে তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই।

১০। **প্রেমভক্তিসার**—গুরুদাস বসুকৃত। এই গুরুদাস বসু কলিকাতা শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত কতকগুলি গান আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইঁহার রচনার ভাষা সুললিত, কোথাও কষ্টকল্পনা বা কাঠিন্য নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তিতত্ত্ব সরল বাঙ্গালা পদ্যে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

রচনার নমুনা—

কল্পবৃক্ষের রত্নযোগ পীঠের উপর।
কায়মনে ভজ মন কিশোরি কিশোর॥
পূর্ব্বাপর বেদশাস্ত্রে আছয়ে সকল।
পরে গোস্বামিপাদে তাহা করিলা উজ্জ্বল॥
তাহার কিরণ লাগে ভক্তগণের গায়।
মূর্খ বুঝাইতে তাঁরা বর্ণিলা ভাষায়॥
তার লেশ বর্ণিতে যে হয় মোর মন।
পঙ্গু যেন চায় গিরি করিতে লঙ্ঘন॥ (৬ খ পত্র)

যদি রিপু হবে জয়ী মনোযোগে শুন কহি
শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসারোদ্ধার।
রক্ষক করহ ভক্তি রিপু হউক হীনশক্তি
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা তুচ্ছ কর॥ (৮খ পত্র)

বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার নিজের উক্তিগুলি প্রমাণিত করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত একটী গানের নমুনা নীচে দেওয়া হইল,—

প্রাণসখি আদি শ্রীমতির জত পৃয়া।
রাধার মন্দিরে সভে মিলিল আশিয়া॥
সভে পুছে দূতি গো গিয়াছে কতদিন।
অন্তরে উথলে আজি দেখি শুভদিন॥
সুখভরে বুক কাঁপে দোলে হিয়ার হার।
রাই বলে কালী হৈতে অমনি গো আমার॥

কেহ বলে বাম অঙ্গ লাগিছে নাছিতে।
রাই বলে অমনি আমার তিন দিন হইতে॥
আপনা হইতে আজি হৃদপদ্ম ফুটে।
তাহা হইতে কতোই বা সুখের গন্ধ উঠে॥
এত দিনে বিধি বুঝি হইল সদয়।
অদূরে মাধব বসু গুরুদাসে কয়॥

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন *

সূচনা

বঙ্গভাষায় রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনকে আদিগ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচনা আমরা পাই নাই। এই শ্রেণীর সাহিত্যে সুধু বঙ্গদেশে নয়, বঙ্গদেশের বাহিরেও চণ্ডীদাসের ন্যায় গীতি-নাট্যকার বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ইহার সাহিত্যিক দিক্‌টাকে ততটা মর্য্যাদা দান করেন নাই, যতটা ইহার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহার পরে এ গ্রন্থ লইয়া যত আলোচনা হইয়াছে, তাহাও সুধু ঐ দিক্ হইতে। আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন যখন সাহিত্য-গ্রন্থ, তখন সাহিত্য হিসাবেই ইহার বিচার হওয়া আগে দরকার।

কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন নাই দেখিয়া গত ১৩২৮ সালে (ইং ১৯২১-২২) যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে গবেষণার জন্য রামতনু লাহিড়ী-রিসার্চ্চ স্কলার নিযুক্ত হই, তখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের সাহিত্য-বিচারের দিক্‌টা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে ও আমি যথাসাধ্য অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। সেই সময়ে আমি যে সব বিষয় এই গ্রন্থ সম্পর্কে লক্ষ্য করি, তাহা এখন আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আশা করি, আপনাদের বিচার ও আলোচনার দ্বারা আমার ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইবার উপায় হইবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটা বিশিষ্টতা ও অসামান্যতা আছে, যাহা কোন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত অনুরূপ গ্রন্থে দেখা যায় না। আমরা বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধসমূহে দেখিতে পাইব, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন পুরাণে ও কাব্যে কৃষ্ণকথা যে যে স্তরের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল, তাহা প্রায় সমস্ত কৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ত্তমান আছে। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ মন্থন করিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার গীতিনাট্যখানি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সাহিত্য ব্যতিরেকে অন্যান্য পুরাণ, যথা—অগ্নি, পাদ্ম প্রভৃতির অনেক কথা চণ্ডীদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আবার অন্য দিকে কাব্য ও লৌকিক উপাখ্যান হইতেও চণ্ডীদাস যথেষ্ট মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দের অনেকগুলি গানকে ত তিনি সুন্দর অনুবাদ করিয়া

---

* ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৪ তারিখে পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

নিজ গ্রন্থে চালাইয়া দিয়াছেন। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্ম-পূজাবিধান গ্রন্থে যেখানে যেখানে কৃষ্ণের কথা আছে, তাহা চণ্ডীদাসের অনেক কথার সঙ্গে মিলিয়া যায়। মোটামুটি বলিতে গেলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভবের আগে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবতা কি আকার ও স্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন সব কথা আছে, যাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের গ্রন্থে কোথাও ইহার নাম পাওয়া যায় নাই। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় ইহার নাম দিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"। এই নাম লইয়া একটু গণ্ডগোল আছে। কীর্ত্তন শব্দ দ্বারা আমরা পদাবলীসাহিত্য বুঝিয়া থাকি। কিন্তু চণ্ডীদাসের এই গ্রন্থ গান হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুমোদিত কীর্ত্তন নহে। সুতরাং মনে হয়, নামের জন্য এ গ্রন্থ আলোচনায় অসুবিধাও কম হয় নাই। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণের সমবায়ে গঠিত বলিয়া ইহাও পুরাণ আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বাস্তবিক বঙ্গভাষায় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যদি কোন মৌলিক পুরাণ থাকে, তবে তাহা এই কৃষ্ণকীর্ত্তন। ইহার অনেকগুলি খণ্ড ছিল, সবগুলির উদ্ধার না হওয়াতে এই গ্রন্থের পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইহার রচনা দেখিয়া মনে হয়, ইহার মথুরাখণ্ডে কংসবিনাশের কথাও ছিল। যাহা হউক, ইহাকে পুরাণ বলিলে ইহার ঠিক প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। তুলনা হিসাবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গলার মঙ্গল কাব্যগুলি আমাদের লৌকিক পুরাণ, যথা—ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ত্তন এই ধরণের উচ্চশ্রেণীর মিশ্র পুরাণ।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত একটি বিষয় এই যে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুকে এমন ভাবে জড়ান হইয়াছে যে, দুই জনকে পৃথক্ করা যায় না। এই জন্য স্থানে স্থানে সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণের বিষয়বস্তুর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এই কথাটি মনে রাখিলে চণ্ডীদাসের গ্রন্থ যে যুগে লিখিত হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব মিশ্রণের ফল।

কৃষ্ণকীর্ত্তন ঠিক রকম বুঝিতে হইলে ইহার আলোচনাপদ্ধতির দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনকে বিশ্লেষণ করিয়া (analysis) ইহার উপাদানগুলির বিশিষ্টতা কি, ধরিতে চেষ্টা করা দরকার, তারপর অনুরূপ সাহিত্যের মালমশলার সহিত ইহার উপাদানগুলির সংশ্লেষণ (synthesis) না করিলে ইহার স্থান ও মৌলিকতা বুঝিতে পারা যাইবে না।

এই জন্য আমি কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে চাই।

প্রথম ভাগে ইহার বিশিষ্ট উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। কৃষ্ণ এবং রাধা সম্বন্ধে কোন্ কোন্ কথা কোন্ কোন্ মূল গ্রন্থ বা স্তরবিভাগের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহা এই ভাগে আলোচিত হইবে। অত্রকার প্রবন্ধে শুধু কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

দ্বিতীয় বিভাগে গীতিনাট্য হিসাবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ আলোচিত হইবে। আমার মনে হয়, এ দিকে লক্ষ্য না দেওয়ায় আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের মর্য্যাদা মোটেই রক্ষা করি নাই। বাঙ্গলা দেশের সঙ্গীতের ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থ অমূল্য।

তৃতীয় বিভাগে ভারতীয় কৃষ্ণ-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করা যাইবে। সংস্কৃতে ও দেশীভাষায় প্রবল কৃষ্ণ-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের একটি নিজস্ব মহিমা আছে, তাহা দেখাইতে পারিলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

এবার অগ্রকার বিষয় লইয়া উপস্থিত হইতেছি।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপাদান

কৃষ্ণের নানা নাম

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের নানা নাম পাওয়া যায়, ইহাদের সকলের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার কোন সম্পর্ক নাই। বিষ্ণুর নানা অবতার ও নাম কৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণকে যদি গোপীনাথ, গোবিন্দ, গোপাল, নন্দের নন্দন, বসুলকুমার, বালগোপাল প্রভৃতি বলা হয়, তবে তাহাতে স্বাভাবিক চিন্তার কোন বাধা হয় না, কিন্তু তাঁহাকে যদি পদ্মনাভ, চক্রপাণি, গদাধর, সারঙ্গধর, মধুসূদন, মুরারি, নরসিংহ, হৃষীকেশ, গরুড়বাহন বলা যায়, তবে বুঝিতে হইবে, কবি ইহা চাহেন যে, আমরা কৃষ্ণের উপস্থিত ললিতলীলার মধ্য দিয়াও বিষ্ণু-দেবতার শৌর্য্য ও বীর্য্যপ্রকাশক কার্য্যাবলীর যোগ রক্ষা করি। এই নামগুলির মধ্যে সারঙ্গধর শব্দটির অর্থ আমরা পরে আলোচনা করিয়াছি।

এই নামগুলি ছাড়া আর যে সব নাম কৃষ্ণকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীধর, শ্রীনিবাস, দেহের দেবতা, মদনমুরুতী ও মাহাকোল শব্দগুলি লক্ষ্য করা দরকার।

শ্রীধর শব্দদ্বারা কৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধ অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। প্রাচীন পুরাণে ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে লক্ষ্মী আসিয়া রাধা হইয়াছেন, এরূপ আছে; কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধাকে লক্ষ্মী হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ তাঁহার রাধাকে বলিতেছেন,—আপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ।—পৃঃ ১২৯। এই শ্রীধর শব্দ বিষ্ণুপুরাণেও (১.৮.২৩) অনুরূপভাবে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের (১৮.১৫) "বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী" কথার এবং ভাগবতের "গাত্রলক্ষ্মী" কথার ধ্বনি চণ্ডীদাসে পাওয়া যায়,—

শ্রীধররূপেঁ হরিআঁ নিবোঁ তোরে।—পৃঃ ১২৭

কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণকে 'দেহের দেবতা' ও 'দেহার দেব' বলা হইয়াছে।—দেহের দেবতা তোহ্মে জগতের নাথ।—পৃঃ ১০৫। দেহার দেব…(পৃঃ ১৩২)। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা হইলে এ ধারণার মূল কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মদনমুরুতী শব্দের তাৎপর্য্য ও মূল পরে আলোচিত হইয়াছে।

বিষ্ণুর বরাহ অবতার বুঝাইতে মাহাকোল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।—মাহাকোল-রূপেঁ দন্তে মেদিনী উঠায়িলোঁ।—পৃঃ ২৩৫। সংস্কৃত অভিধানে বরাহ অর্থে কোল শব্দ পাওয়া যায়; প্রাচীন পুরাণেও বরাহ অবতারকে মহাকোল বলা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, চণ্ডীদাস ছাড়া আর কোন কবি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না, সন্দেহ।

অবতার

বিষ্ণুর নানা অবতার পৌরাণিক সাহিত্যের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। বৈদিক বিষ্ণু হইতে পৌরাণিক অবতারগুলির ধারণা কি করিয়া আসিয়াছে, তাহার আলোচনা অনেকেই করিয়াছেন। প্রাচীন ও মধ্যকালের মূল সংস্কৃত গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে নানা তথ্য ছড়াইয়া আছে। সৃষ্টিরক্ষার কাজে বিষ্ণুকে বারে বারে ভূভার হরণের জন্য অবতরণ করিতে হইয়াছে। অবতারের বার সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, বিষ্ণুর অবতার ২৪টি, কেহ ২২টি। শেষকালে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কাছাকাছি বিষ্ণুর দশটি অবতার মাত্র সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখা যায়।

চণ্ডীদাস বিষ্ণুর অবতার কিরূপভাবে ধরিয়াছেন, আমরা এবার তাহা দেখিব। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ১০১-২ পৃষ্ঠায় আছে,—মুরারী [মীন], রাম, বরাহ এবং নরসিংহ; ১২৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়—বামন, মীন, শ্রীধর [অর্থাৎ কৃষ্ণ], বরাহ এবং শ্রীরাম। আর ২৩৫ পৃষ্ঠায় দশটি অবতারের নাম এইরূপ আছে,—মীন, কচ্ছপ, বরাহ, নরহরি, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী। এখানে 'শ্রীধর' শব্দ দ্বারা এবং "এবেঁ উপজিলা কংস বধের কারণ" হইতে কৃষ্ণকেও বিষ্ণুর অবতার হিসাবে ধরা হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতেও বুঝা যায় যে, কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মনে করাটা খুবই চলিত ছিল।

(১) সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলী॥—পৃঃ ৬

(২) তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল।—পৃঃ ১০৩

(৩) আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরালী ল
যুগেঁ যুগে অবতার করী ল—পৃঃ ৩৬১

তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে "ধর্ম্মপূজাবিধানে" আমরা দেখিতে পাই,—

সপ্তম মুরুতে গোশাঞি বলালে গোপি কান্ [—কৃষ্ণ]।
বিপ্রকুলে জন্মিঞা গোয়ালাকুলে নাম॥—পৃঃ ২১৪

কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর একজন অবতার, এ কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থেও আছে। যথা—হরিবংশ

(১.৪২), মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব), মৎস্যপুরাণ (২৫৮.১০) ইত্যাদি। ভাগবতেও দুই জায়গায় এইরূপ কথা পাওয়া যায়,—

(১) রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরং।—১.৩.২৩.

(২) কৃষ্ণাবতারঃ... ... .. ।—১০.৩.৯.

এই কথা বলিয়াও ভাগবত পরে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের উপরে কৃষ্ণের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (১.৩.২৮) এই ধারণার মূলে মধ্যযুগের নব-বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনেকটা কাজ করিয়াছিল। এই নবপ্রস্থানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কৃষ্ণ সুধু সকল দেবতার নয়, এমন কি, বিষ্ণুর উপরেও স্থান পাইলেন, সেই জন্য আর আগের মত দশ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণের নাম আসা অসম্ভব হইল। গীতগোবিন্দ (১.৫—১৬) ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তাই অবতারের মধ্য কৃষ্ণের নাম নাই।

এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কথা মানিয়া, কৃষ্ণকে অবতার না ধরিয়া অবতারী করিয়া তুলিয়াছেন। চণ্ডীদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় তিনি প্রাচীন গ্রন্থের অনুসারে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মান্য করিয়াছেন। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে দশ অবতারের মধ্যে বলরামও আছেন, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে বলরাম অবতার নহেন।

বয়স

বৈষ্ণবদের কারবার কিশোর কৃষ্ণকে লইয়া, তাই তাঁহারা "বয়ঃ কৈশোরকমে"র গুণ গাহিয়াছেন। এখানে আমরা কৃষ্ণ ও রাধার বয়সের তুলনা করিতে চাই; কারণ, নানা গ্রন্থে এই বয়স নানা ভাবে বলা হইয়াছে।

পুরাণমধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধার নাম পাওয়া যায়, ইহার কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে কৃষ্ণকে 'বালঃ' ও 'মায়াবালকবিগ্রহঃ' বলা হইয়াছে; আরও পাওয়া যায় যে, এই বালক কৃষ্ণকে বয়স্কা রাধা কোলে করিয়াছিলেন—তার পর অবশ্য কৃষ্ণ হঠাৎ কিশোর হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাধার বয়স্কা হওয়ার কারণ, তিনি শ্রীদামের শাপের জন্য আগেই পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম লইয়াছিলেন। সুতরাং যখন কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন রাধা বেশ বড়ই ছিলেন।

জয়দেব এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অনুসরণ করিয়া গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে রাধাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে আর কোনই উল্লেখ নাই।

কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে এ সব কিছুই নাই, বরং কৃষ্ণ কিছু বড় হইয়া গোচারণ আরম্ভ করিলে পর রাধার জন্ম হয়।

(১) নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।—পৃঃ ৬

(২) লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥ আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।—পৃঃ ৬

ভাগবতে (১০.১৫.১) পাওয়া যায়, কৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়সে অর্থাৎ ছয় বৎসর হইতে গোচারণ করিয়াছিলেন, টীকায় সনাতন গোস্বামীও এ কথা বলিয়াছেন। আবার কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ নিজের বয়সের কথা রাধাকে এইরূপ বলিতেছেন,—বএসেঁ জ্যেষ্ঠ—পৃঃ ৪০। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মত চণ্ডীদাস অলৌকিকতা দেখাইতে যাইয়া অস্বাভাবিকতা আনিয়া ফেলেন নাই।

শরীরের বর্ণ

কৃষ্ণের শরীরের বর্ণ নানা গ্রন্থে কোথাও 'কৃষ্ণ', কোথাও 'শ্যাম' এবং কোথাও 'নীল' শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। নীলবর্ণ বুঝাইতে ভাগবতে (১০.২৩.১৬ অথবা ২২) শ্যাম শব্দ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বর্ণের দিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত গ্রন্থে (১০.২৬.১৬) "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" অতি পরিস্কার ভাবে বলা হইয়াছে। তুলনা করিতে যাইয়া পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে দুই জায়গায় কৃষ্ণকে 'ইন্দীবরদলশ্যামঃ' (২৩৫.৪৪) ও 'ইন্দ্রনীলমণিশ্যামঃ' (২৩৯।১১) রূপে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে 'শ্যামসরোজ' (১১.১১.) ও "নীলনলিনম্" (১১.২৬), অথবা একেবারে 'নীলকলেবর'ই আছে।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা পাই 'কাল' (পৃঃ ৩৮, ৮০, ২৯৫ ইত্যাদি), এবং 'নীল' (পৃঃ ৩০২)। চণ্ডীদাসের নামীয় প্রাচীন পদাবলীতে কৃষ্ণের তুলনা দিতে অতসী ফুলের নাম পাওয়া যায়। অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনাগর।—চণ্ডীদাস (নীলরতন) পৃঃ ৩১৬। প্রাচীন কালে অতসী ফুল যে নীলবর্ণের হইত, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতেই জানা যায়,—

(১) নীল অতসীর ফুল তাহে ছিল।—চণ্ডীদাস (নীলরতন) পৃঃ ৫২।

(২) অতসীর ফুল তুলি মনোহর
যতন করিয়া পরি।—ঐ পৃঃ ২৫০.

প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যাতেও অতসীকে পরিষ্কার ভাবে 'নীলপুষ্প' বলা হইয়াছে। তার পর, নানা গ্রন্থেও অতসী ফুলের নীলবর্ণের কথা আছে—

(১) অতসীকুসুমশ্যামঃ।—বৃহৎসংহিতা – ৫৮.৩২.

(২) অতসীপুষ্পসঙ্কাশং – পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৭৩.২.২১২,৩৬; বৃহন্নারদীয়পুরাণ ১৫।৬৮, ৩৬।৪০ ; এমন কি, ধর্ম্মপূজাবিধানেও আছে – অতসীপুষ্পসঙ্কাশং। – পৃঃ ৫৪।

এই নীলবর্ণ অতসী পরবর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে পীতবর্ণরূপে গণ্য হইয়াছে। এখন আমরা যে অতসীর কথা জানি, তাহা পীতবর্ণ। রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, তিন শত বৎসর হইতে অতসীর সাহিত্যিক বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তিনি কবিকঙ্কণচণ্ডীর নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে দেখাইয়াছেন, অতসী তখন পীতবর্ণরূপে গণ্য হইয়াছে— অতসীকুসুম বর্ণ।—কবিকঙ্কণচণ্ডী (বঙ্গবাসী সং) পৃঃ ৫৮।

আমার মনে হয়, অতসী নীল ও পীত, দুই রকমেরই ছিল। পূর্ব্বে সুধু নীল অতসীর কথাই বেশী ব্যবহৃত হইত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা 'বন সোনাকড়ী' পাই (পৃঃ ২০৭), ইহার অর্থ বন্য অতসী। ইহার নাম হইতে মনে হয়, ইহা পীতবর্ণের ছিল। ইহা বন্য বলিয়াই হয় ত পূর্ব্বে বেশী আদৃত হইত না। তারপর কৃত্তিবাসে পাওয়া যায়,—

অতসী অপরাজিতা যাতে দুর্গা হরষিত।—রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড। এখানে অতসী নীলও হইতে পারে, পীতও হইতে পারে।

চণ্ডীদাসের পর আর কোনও কবি কৃষ্ণকে অতসী ফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন কি না, আমি জানি না। যদি না করিয়া থাকেন, তবে ইহা চণ্ডীদাসের প্রাচীনতার একটি পরিচয় মনে করা যাইতে পারে।

ভঙ্গি

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, বিষ্ণুর মূর্ত্তি সমপদস্থানক ভঙ্গিতে অর্থাৎ সোজাসুজি দাঁড়ান, অথবা গরুড়ের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় থাকে। বিষ্ণুর অবতারদেরও কোন বিশিষ্ট ভঙ্গির উল্লেখ নাই। কৃষ্ণের নানা রকমের লীলার মধ্যে বংশীবাদনকে একটু বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাই অন্যান্য লীলার কোন ভঙ্গির উল্লেখ না থাকিলেও বংশীবাদনের বেলায় ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমার আমদানি করা হইয়াছে। ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে বংশীবাদনের সময়ে চক্ষু ও ঠোঁটের অবস্থার কথা পাওয়া যায়, কিন্তু শরীরের কোন ভঙ্গির উল্লেখ নাই। চণ্ডীদাস এ ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন,তাই তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে ত্রিভঙ্গের কথা পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী পদাবলীকারদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পার্থক্য এখানেও দেখা যায়। তাঁহাদের ত ত্রিভঙ্গ ছাড়া কথাই নাই। এমন কি, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতেও ত্রিভঙ্গ পাওয়া যায়,—

ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশী সনে কথা কও...।—(নীলরতন সং—পৃঃ ২০৮)। ধর্ম্মপূজা-বিধানেও এই ত্রিভঙ্গের উল্লেখ আছে,—

মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনম্।—(পৃঃ ৫৬.)

কৃষ্ণের এই ত্রিভঙ্গ, যাহা আমরা প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাই না, কোথা হইতে আসিল, এ বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। আমার আপাততঃ মনে হয়, ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর তান্ত্রিকতার প্রভাব হইতে হইয়াছে।

হাত

বিষ্ণুর নিজ কাজ উদ্ধারের জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণের কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কাজ ত প্রায় বাঁশী বাজানোতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই তাঁহার দুইখানা

হাতের চেয়ে বেশী দরকার হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রাচীন কালে যখন কৃষ্ণের হাতে আয়ুধ দিতে বৈষ্ণবদের কোন দ্বিধা হইত না, তখন তাঁহার চারিখানা হাতের কথাই পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের এই শ্লোকটি আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা বড় সহজ নয়,—

কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্যতে।
যথেচ্ছয়া শঙ্খচক্রে চোপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥—২৫৮.১০.

অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণেও এই কথার অনুমোদন আছে।

ভাগবত নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষ্ণের অবতারের উপযুক্ততাকে খর্ব্ব করিয়াছে। তাই প্রথম চারি হাত স্বীকার করিয়া লইয়া লীলাপুষ্টির জন্য সুধু দুই হাত বজায় রাখা হইয়াছে। ভাগবতে আছে (১০.৩), বিষ্ণু যখন কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার চারি হাত ও উহাতে চারিটি আয়ুধ ছিল, কিন্তু দেবকীর অনুরোধে কৃষ্ণ-অবতারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলিয়া দুই হাত ও অস্ত্রগুলি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের চারিটি আয়ুধের কথাও যেমন আছে, তাঁহার বাঁশী ও লগুড়ের কথাও তেমনি আছে, অথচ হাতের সংখ্যা দেওয়া নাই। আমার মনে হয়, চণ্ডীদাস এ বিষয়ে প্রাচীন পুরাণ ও ভাগবত, দুইয়েরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া পরিষ্কার কিছু বলেন নাই।

আয়ুধ

বিষ্ণু ভূভার হরণের জন্য অর্থাৎ দৈত্য-দানব বধের জন্য অবতীর্ণ হন বলিয়া তাঁহাকে আয়ুধ গ্রহণ করিতে হয়। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন অনুসারে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, তাই অন্যান্য অবতারের ন্যায় কৃষ্ণকেও আয়ুধ বহন করিতে দেখা যায়। কৃষ্ণের সম্পর্কে আমরা বাঁশীর কথাই মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, সুতরাং চণ্ডীদাসের এই আয়ুধ-আয়োজন দেখিয়া আমরা অনেকেই হয় ত হতাশ হইব। যাহা হউক, তিনি বহু জায়গায় চারিটি আয়ুধেরই নাম করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলায় আয়ুধ ব্যবহারের স্থান নাই বলিয়া এগুলি খাপছাড়া হইয়াছে।

(১) যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খচক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥—পৃঃ ৪

(২) শঙ্খচক্র আহ্মে গদা শারঙ্গ ধরী।—পৃঃ ৮৫

(৩) আহ্মে দেব শারঙ্গধরে।—পৃঃ ২৮৮

এখানে শারঙ্গ শব্দের আলোচনা আবশ্যক। কৃষ্ণের হাতের আর তিনটি জিনিস সামরিক আয়ুধ, সুতরাং শারঙ্গও সেরূপ কিছু হইবে, এ কথা সহজেই মনে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধারণা অনুসারে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম, এক সঙ্গেই মনে আসিয়া পড়ে। সেই জন্য শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধরিয়া লওয়া খুবই স্বাভাবিক। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনেকার্থকোষ এবং বিদ্যাপতির "সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ" কথা হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধরিয়াছেন। এ ধারণায় ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সাহায্য করিয়াছে,—

শঙ্খশক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্। - ১০.৩.২৬

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডেও বিষ্ণুর হাতে 'পঙ্কেরুহ' বা পদ্ম দেখা যায়। আমাদের ধর্ম্মপূজাবিধানেও আছে,—

শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং...(পৃঃ ৫৪)

চণ্ডীদাস শারঙ্গ শব্দ দ্বারা খুব সম্ভবতঃ পদ্ম মনে না করিয়া যুদ্ধাস্ত্রই মনে করিয়াছেন। ভাগবতেও আমরা পাই, কৃষ্ণের হাতের সব কয়েকটিই আয়ুধ ছিল, পদ্মফুল ছিল না—

চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।—১০.৩.৮.

কৃষ্ণের এই শারঙ্গ বা শার্ঙ্গ কিরূপ অস্ত্র, তাহাও জানা গিয়াছে। বৃহৎগৌতমীয় তন্ত্রে অতি পরিষ্কারভাবে শার্ঙ্গধনুর কথা উল্লিখিত আছে,—

দক্ষস্যোর্দ্ধে স্মরেচ্চক্রং গদাঞ্চ তদধঃকরে।
বামস্যোর্দ্ধে শার্ঙ্গধনুঃ শঙ্খঞ্চ তদধঃ স্মরেৎ॥

সুপ্রসিদ্ধ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় যেন প্রচলিত পদ্ম স্থানে শার্ঙ্গ দেখিয়া খুসী হইতে পারেন নাই, তাই লিখিয়াছেন,—"কিন্তু শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজং ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেন শার্ঙ্গস্থানে পদ্মং জ্ঞেয়ং। তত্র তু শার্ঙ্গোপদেশাপসনা বিশেষার্থমেব। ভগবতি তু সর্ব্বদা সর্ব্বসমাবেশাৎ নাসম্ভবমিতি।" আমরা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, প্রাচীন কালে বিষ্ণুর হাতে পদ্ম ছিল না। কোন কোন বিষ্ণু-মূর্ত্তিতেও পদ্ম থাকে না, তার বদলে শার্ঙ্গধনু থাকে, তাহাদের মূর্ত্তিতত্ত্বানুযায়ী নাম—ত্রৈলোক্যমোহন, হরিশঙ্করক।* আমার মনে হয়, চণ্ডীদাসও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ধনু অর্থে শারঙ্গ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

বাঁশী

কৃষ্ণের কথা বলিতে গেলেই তাঁহার বাঁশীর কথা আসে। মধ্যযুগের বৈষ্ণবেরা যেমন রাধাকে ঠিক সৃষ্টি করিয়া না থাকিলেও তাঁহার লীলা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, বাঁশীও সেইরূপ তাঁহাদেরই দান। কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্য বাঁশী খুব আবশ্যক মনে অবরহইয়াছিল, তাই বিষ্ণুতারদের হাতে যুদ্ধোপযোগী আয়ুধ থাকিলেও কৃষ্ণের হাতের আয়ুধগুলিকে সুধু মাত্র দুই একবার উল্লেখ করিয়া তাঁহার লীলার জন্য বাঁশীই প্রাধান্য পাইয়াছে। বাস্তবিক ব্রজব্যাপারে বাঁশী ছাড়া অন্য কিছুর সামঞ্জস্যও ত হয় না।

---

* বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়—পৃঃ ২৩-২৪।

চণ্ডীদাস বাঁশীকে কিরূপভাবে দেখাইয়াছেন, তাহা বুঝিবার আগে বৈষ্ণব-সাহিত্যে বাঁশীর ইতিহাস আলোচনা করা দরকার।

প্রথমেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, বিষ্ণুপুরাণে বাঁশীর নামগন্ধই নাই। এমন কি, রাসলীলার সময়েও বাঁশী দরকার হয় নাই।

(১) জগৌ কলপদং শৌরির্নানাতন্ত্রী-কৃত-ব্রতম্।—৫.১৩.১৬

(২) রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণঃ।—৫.১৩.৫৫

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ মুখে রাস-উৎসবের উপযোগী পদ গান করিয়াছিলেন, তার সঙ্গে নানা তারের যন্ত্র বাজান হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এই গ্রন্থের 'কলপদং' পদ হইতে নানা কথা আসিয়া পড়িয়াছে।

ভাগবতেই প্রথম বেণুর কথা পাওয়া যায়। ইহা বাঁশীর প্রকার-ভেদ, তাহা পরে দেখা যাইবে। ভাগবতের কথাগুলি এইরূপ,—

(১) চুকূজ বেণুম্।——১০.২১.২

(২) কলবেণুগীতম্।——১০.২১.১৪

(৩) জগৌ কলম্।————১০.২৯.৩

এই বেণু কি, বুঝাইতে যাইয়া ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থে এইরূপ বলিয়াছেন,—

বংশ্যা অপি বৈশিষ্ট্যমস্তি। যথোক্তং।—

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোম্মানং তারাদিবিবরাষ্টকং।
ততোঽঙ্গুলান্তরে যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলং॥
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা।
নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥
দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ।
মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ॥
ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেৎ তত আকর্ষণী মতা।
আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি॥
গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা।
ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা॥ ইতি

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, বাঁশী তিন প্রকারের হইত—মণি, স্বর্ণ ও বেণু দ্বারা নির্ম্মিত। ভাগবতে কিন্তু বেণুই বলা হইয়াছে।

তারপর বাঁশীর গানের কথা। ভাগবতে 'কলবেণুগীতম্' আছে, এবং তাহাকে 'গীতম্ অনঙ্গবর্দ্ধনম্' এই অবধি মাত্র বলা আছে। তাহা হইতে পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যেরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, তাঁহারা সাম্প্র-

দায়িক সিদ্ধান্ত অনুসারেই ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলম্ শব্দটির ধ্বনির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী উহার এইরূপ শ্লিষ্টার্থ করিয়াছেন,—'অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যং। যতো বামদৃক্‌সম্বন্ধি যত্তৎ সহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতং।' (বৈষ্ণবতোষিণী)। অর্থাৎ কলম্ বলিতে ক, ল ও ম্ আছে, ইহারা হইতেছে বৈষ্ণবদের কামবীজ বা মহামন্মথমন্ত্র অর্থাৎ ক্লীং ধ্বনির প্রথম তিনটি অক্ষর। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, যদিও ভাগবতকার অনঙ্গবর্দ্ধন গীতের কথা বলিয়াছেন (এবং রাসলীলায় উহা খুবই স্বাভাবিক), তথাপি তিনি গোস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা মানিতে পারিতেন কি না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার উপর যে তান্ত্রিকতার প্রভাব পড়িয়াছিল, ইহা তাহার ফল বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি জয়দেব কৃষ্ণের বাঁশীকে কাব্যের মাধুরী বাড়াইবার কাজে লাগাইয়াছেন।

(১) কলস্বনবংশে।—১. ৪৫.

(২) নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।—৫. ৯.

এখানে বাঁশীতে রাধার নাম ধরিয়া ডাকিবার ও তাঁহাকে সঙ্কেতস্থানে মিলিত হইবার ইঙ্গিতের কথা পাওয়া যাইতেছে। নায়ক ও অভিসারিকা নায়িকার সঙ্কেতস্থলে মিলিত হইবার বহু রকমের ইঙ্গিত সংস্কৃত-সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন লীলাকমল দেখান। এই বাঁশীর সঙ্কেতও একটি। এখানে একটি কথা একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলা যাইতে পারে যে, জয়দেব সাধারণতঃ প্রাচীন পুরাণ অপেক্ষা অলঙ্কারশাস্ত্রেরই বেশী অনুগামী হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস বাঁশীর কথা কি বলেন, এবার তাহা দেখিবার সময় আসিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি এ বিষয়ে প্রাচীন পুরাণ ও লৌকিক কল্পনার সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুই দিক্ রক্ষা করিতে গিয়া বিভ্রাটও ঘটাইয়াছেন। প্রথম আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ গোচারণের আদি হইতেই বাঁশী বাজান আরম্ভ করিয়াছিলেন,—

(১) পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে।—পৃঃ ৬.

(২) কদম তলাত　　বসিআঁ কাহ্নাঞি
নাকে মুখে বাঁশী বাএ।—পৃঃ ৮০.

কিন্তু যখন রাধাকে ভুলাইবার জন্য কৃষ্ণ চেষ্টিত হইলেন, তখন আগে অন্যান্য যন্ত্র বাজাইয়া তাহাতে কাজ না হওয়ায় বাঁশীর সৃষ্টি করা হইল, এইরূপ কথা কৃষ্ণকীর্ত্তনের শেষের দিকে পাওয়া যায়,—

(১) খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।—পৃঃ ২৯৩.

(২) আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ।
পতি দিনে নানা ছন্দে বাএ সেই ঠাঁই॥—পৃঃ ২৯৩.

এ কথা মোটামুটি বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে মিলে। কেবল বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য তারযন্ত্রের বদলে খোল করতাল দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই সব যন্ত্রের পর আসিল বাঁশী—সেই জন্য বংশীখণ্ড নামে একটি নূতন পালার উদ্ভব হইল,—

তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের রাণী।
স্থজি কাহ্নাঞি তবে মোহন বাঁশী॥
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।—পৃঃ ২৯৩.

মোহনের কাজের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা মোহন-বাঁশী নামে পরিচিত, ইহাকেই সনাতন গোস্বামী সম্মোহিনী বলিয়াছেন।

কৃষ্ণের এই বাঁশী কিরূপ ছিল, তাহাও কৃষ্ণকীর্ত্তনে দুই রকমের পাওয়া যায়। এক হইতেছে, ইহা মণি ও স্বর্ণের নির্ম্মিত ছিল,—

(১) সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী।—পৃঃ ২৪২.
(২) সুবন্নের সাম্বী হিরার বান্ধিল কাম।—পৃঃ ২৯৩.

আবার পাওয়া যায়, ইহা আড়বাঁশী (পৃঃ ৩০৬) ছিল। আড়বাঁশী বাএ মধুরে।—পৃঃ ৩৩৪*। ধর্ম্মপূজাবিধানে আমরা পাই—কলবেণুবাদনপরং (পৃঃ ৫৩), আড়বাঁশী ত বেণু বা বাঁশেরই হইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে আড়বাঁশীই বেশী প্রচলিত, সুতরাং চণ্ডীদাস বোধ হয়, বাঁশের বাঁশীই এ স্থলে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনি সনাতন গোস্বামীর উল্লিখিত তিন রকমের বাঁশীর কোনটাকেই বাদ না দিয়া সবগুলিকে একত্র মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তারপর, বাঁশীর ধ্বনি সম্বন্ধে চণ্ডীদাস এমন একটী কথা বলিয়াছেন, যাহা বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, গীতগোবিন্দ অথবা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন, কৃষ্ণের বাঁশীতে ওঙ্কার ধ্বনিত হইত ও চারি বেদ গীত হইত।

(১) হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞি তাহাত ওঁকার।—পৃঃ ২৯৩
(২) ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব
চারী বেদ গাওঁ মোঁ বাঁশীর সরে।—পৃঃ ৩২৩

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদেও পাওয়া যায়,—

রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওরা ধ্বনি···।—চণ্ডীদাস (নীলরতন সং)—পৃঃ ২০৯.

আমার মনে হয়, ইহা ওঙ্কারধ্বনি, এইরূপ হইবে।

চণ্ডীদাস নানা জায়গা হইতে তাঁহার গীতিনাট্যের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া

---

* কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের এই অংশের সহিত নীলরতনবাবুর সংগৃহীত অনুরূপ পদের "আর বায় বাঁশী সুমধুরে" তুলনা করিয়া স্পষ্টই ধরা যায় যে, পরবর্ত্তী কথাগুলিই পূর্ব্ববর্ত্তীর বিকৃত রূপ মাত্র।

তাঁহার গ্রন্থে নানা রকমের কথা আসিয়া জুটিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কৃষ্ণই বাঁশীর উদ্ভাবন করেন, আবার এক জায়গায় বলিতেছেন, উহা হরগৌরীর বরে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ নহে।

বাঁশী পাইল হরগৌরী বরে।—পৃঃ ৩১৪.

কৃষ্ণের বাঁশীর কথা উঠিলেই বাঙ্গালীর কাছে যমুনা উজান বহার কথা মনে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২১ ও ২৯ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, সমস্ত জীব ও জড়জগৎ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি দ্বারা বিচলিত হইত। এমন কি, নদীতেও আবর্ত্ত লক্ষিত হইত,—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।—১০. ২১. ১৫.

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, গীতগোবিন্দ বা কৃষ্ণকীর্ত্তনে কোথাও এরূপ কথা নাই। অথচ অসম্ভব কিছু বুঝাইতে কৃষ্ণকীর্ত্তনে "যদি গাঙ্গ উজান বহে" (পৃঃ ৫৪) পদ পাওয়া গিয়াছে। এ দিকে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে যমুনা উজান বহার কথা খুবই পাওয়া যায়, এমন কি, চণ্ডীদাসের নামীয় পদেও আছে,—

রাধাশ্যাম বলি বাজয়ে মুরলী
যমুনা উজান ধরে।—(নীলরতন সং—পৃঃ ২১০).

তান্ত্রিক সাধনায় উজান বহার কথা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে বৈষ্ণবদের এই ভাবটী এরূপ মিলে যে, মনে হয়, বৈষ্ণবেরা তান্ত্রিক সাধনার এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদেরও এইরূপ ধারণা জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধ গানে আছে,—কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ—বৌ. গা. দো. পৃঃ ৫৯।

ফুলধনু

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে কত প্রাচীন বিষয় লুকাইয়া আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগ না দিলে চোখেই পড়ে না। পরবর্ত্তী সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না, এমন সব কথা চণ্ডীদাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তার মধ্যে একটী হইতেছে—চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে "মদন মুরুতী" (পৃঃ ৩৫৪) বলিয়াছেন। প্রথম হয় ত এ কথা নিছক কবিত্ব বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনেই কৃষ্ণের হাতে মদনের ফুলধনু ও পাঁচবাণ দেওয়া হইয়াছে।

(১) ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুণ॥
শুম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিন বাণে লঅ রাধার পরাণে॥—পৃঃ ২৬৮.

(২) জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে।—পৃঃ ২৭২.

(৩) সরূপে ফুলের ধনু জুড়িল পাঁচ বাণে।—পৃঃ ২৭৪.

(৪) বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।—পৃঃ ২৮০.

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সংস্কৃত শ্লোকেও এই কথা আছে,—

পঞ্চবাণশরৈশ্চক্রে রাধিকামারণে মতিম্ ॥—পৃঃ ২৬৮.

কৃষ্ণের হাতে আয়ুধের মধ্যে আমরা শার্ঙ্গধনু পাইয়াছি, আর এখন পাইতেছি ফুলধনু। ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও ইহার পৌরাণিক মূল খুঁজিয়া বাহির করা গিয়াছে। বিষ্ণুর একটি রূপের বর্ণনার সঙ্গে উপরের কথাগুলিও মিলিয়া যায়। অগ্নিপুরাণে এই মূর্ত্তির বর্ণনার প্রধান কথাগুলি এই,—(১) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং প্রাপ্তবয়োলাবণ্যযৌবনং, (২) মদাঘূর্ণিত-তাম্রাক্ষমুদারং স্মরবিহ্বলং, (৩) পঞ্চবাণধরং, ও (৪) ধনু...বিভ্রতং...(৩০৬ অধ্যায়, শ্লোক ১৩-১৭)।

বাহন

বিষ্ণুর নিজের বাহন গরুড়, তাঁহার কোন অবতারের যে আবার বাহন আছে, এ কথা আমাদের জানা নাই। কৃষ্ণের প্রচলিত আখ্যানগুলিতে কোন বাহনের কথা পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস প্রাচীন পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণের হাতে আয়ুধ বজায় রাখিয়াছেন, সুতরাং কাজে না লাগিলেও তিনি গরুড় বাহনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কালীয়দমনের বেলায় বীরত্ব দেখাইতে যাইয়া সুধু বাঁশীর কথা না বলিয়া গরুড় ও আয়ুধের উল্লেখ স্বাভাবিক হইয়াছে মনে হয়।

(১) চঢ়িলা কালীয়নাগ শীরে।
গরুড়বাহন মহাবীরে ॥—পৃঃ ২৩৫.

(২) শঙ্খচক্র গদা করে গরুড়বাহন ল
আঙ্খে দেব সারঙ্গধরে।—পৃঃ ২৮৮.

পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের আয়ুধ ও বাহনকে বাতিল করিয়া দিলেও গীতগোবিন্দে (১. ১৯) গরুড়াসন কথা আছে। আমাদের ধর্ম্মপূজাবিধানেও কৃষ্ণকে স্পষ্টতঃই 'মহাগরুড়-বাহনং' বলা হইয়াছে।

প্রসাধন

চণ্ডীদাস পৌরাণিক সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার গ্রন্থের নানা স্থান আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই। কৃষ্ণলীলার অতি প্রাচীন কোন কোন চিহ্ন তাঁহার গ্রন্থে লুকাইয়া আছে। কিন্তু তিনি পণ্ডিত হইয়াও কবি ছিলেন, তাই কাব্যের অনুরোধে তাঁহার শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কৃষ্ণকে তাঁহার সময়ের গ্রাম্য যুবকরূপে দেখাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। এ বিষয়ে আর কোন কবি তাঁহার সমকক্ষ আছেন কি না, জানি না। তাঁহার কৃষ্ণের প্রসাধনের দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) কৃষ্ণের "নীল কুঞ্চিত ঘন দীর্ঘ কেশের" কথা শুনিলে অবশ্য খুব আভিজাত্যেরই সূচনা করে। এই কথা মাত্র একবার আছে ও হরিবংশ হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে বার বার তাঁহার ঘোড়াচুলের উল্লেখ আছে (পৃঃ ১০৭,২৬৫.)। এই ঘোড়াচুল এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে খুব চলিত ছিল। একজন সিদ্ধা বা নাথপন্থী যোগীর নাম ছিল ঘোড়াচুলী। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অমরকোষের বাঙ্গালী টীকাকার সর্ব্বানন্দ এই শব্দকে সংস্কৃত করিয়া ঘোটাচুড় রূপ দিয়াছেন, এবং অর্থ করিয়াছেন,—"কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচুড় ইতি খ্যাতে। ক্ষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্যে।" ঘোড়ার মত বড় চুল রাখা লোকে একটা বাহার মনে করিত। মারামারির সময়ে এই চুল বড় বিপদের কারণ হইত।

কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে।—কৃ. কী. পৃঃ ২৬৫. এই লম্বা চুল দিয়া চূড়া বান্ধিবার কথা খুব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চণ্ডীদাস জটা বান্ধিবার কথাও বলিয়াছেন,—

ময়ূর পুছে বান্ধি চূড়া　　　কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধি জটা।—কৃ. কী. পৃঃ ৩৪৬.

(২) চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে মগর খাড়ু বা মকরমুখী খাড়ু পরাইয়াছেন (পৃঃ ৩০২)। এক সময়ে এইরূপ খাড়ু বাঙ্গলাদেশে খুবই প্রচলিত ছিল।

(৩) মকরখাড়ুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের ঘাঘর উল্লিখিত হইয়াছে। "ঘাঘর মকর পাএ" (পৃঃ ৩৪৬)। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বানন্দের টীকায় এই শব্দটি ঘাঘরীরূপে পাওয়া যায়, এবং তিনি ইহার অর্থ করিয়াছেন,—কিঙ্কিণী। সে কালে পুরুষেরাও যে কিঙ্কিণী পরিত, তাহা বোধ হয়, আর কোথাও পাওয়া যায় না।

(৪) চণ্ডীদাস কৃষ্ণের হাথে বলয়া দিয়াছেন (পৃঃ ৩০২)। সে কালে বালকেরা বলয় পরিত, এখনও পশ্চিম অঞ্চলে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। ধর্ম্মপূজাবিধানেও কৃষ্ণের কথায় কঙ্কণের উল্লেখ আছে,—

করে কঙ্কণং।—পৃঃ ৫৪.

(৫) কৃষ্ণকে রাখাল বালক সাজাইতে যাইয়া সুধু নাগর করিয়া না রাখিয়া তাঁহার হাতে যথোপযুক্তভাবে লগুড়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

হাথেতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।—কৃ, কী, পৃঃ ৩৩৯

মহাযোগ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণকে মহাযোগেশ্বর বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণলীলা-সাহিত্যে কোথাও তাঁহাকে যোগিরূপে বড় একটা দেখা যায় না। কারণ, তাঁহার ললিত ও বিদগ্ধ নায়ক-ভাবের সঙ্গে যোগের কোন মিল নাই। শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তির মধ্যে যোগের নির্লিপ্ততা ঘটিবার অবকাশ কোথায়? কিন্তু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে দিয়া যোগধ্যান করাইয়াছেন,—

(১) আন্ধে হরী আন্ধে হর আন্ধে মহাযোগী।—পৃঃ ১৯৮

(২) আহো নিশি যোগ ধেআই।—পৃঃ ৩৫৮

তারপর, কৃষ্ণের যে নিদ্রার কথা পাওয়া যায় (পৃঃ ৩১১), তাহা যোগনিদ্রা কি না, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গলা দেশে যে কোন কোন সময়ে কৃষ্ণকে যোগী মনে করা হইয়াছে, তাহা আমরা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। ধর্ম্মপূজাবিধানে (পৃঃ ৫৪, ৫৫) দুই জায়গায় পরিষ্কারভাবে কৃষ্ণকে বলা হইয়াছে,—(১) যোগনিদ্রাসমাশ্রিত ও (২) ধ্যায়ী। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে কোথাও এ ভাব দেখা যাইবার উপায় নাই।

বিষ্ণুর একটি অসাধারণ মূর্ত্তি আছে, তাহার নাম 'যোগস্বামী'। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের এই রূপের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (১ম অধ্যায়) পাওয়া যায়,—

পদ্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্চিন্মীলিতলোচনঃ।
ঘোণাগ্রে দত্তবৃত্তিশ্চ শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতঃ॥
বামদক্ষিণগৌ হস্তৌ উত্তানাবেকভাগগৌ।
তৎকরদ্বয়পার্শ্বস্থে পঙ্কেরুহমহাগদে॥
ঊর্দ্ধে করদ্বয়ে তস্য পাঞ্চজন্যঃ সুদর্শনঃ।
যোগস্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যো মোক্ষার্থিযোগিভিঃ॥

দেহের দেব

চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে কয়েক জায়গায় 'দেহের দেব' এইরূপ কথা বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে অনুরূপ ধারণা থাকিলেও ঠিক এইরূপ কথার প্রয়োগ পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কালের উপনিষদেও এই ধরণের কথা পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের ১৮ অংশে আছে,—'স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ'... ভারতীয় চিন্তায় এই ধারণার খুবই প্রভাব বাড়িয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের সহজিয়াদের হাতে ইহা খুবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীরমেশ বসু

অনুমতি দেবী

যাঁরা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান (Science of Religion) আলোচনা করেছেন, তাঁরাই অল্প বিস্তর জানেন যে, যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস ও কল্পনা-শক্তির প্রসারতা বা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে দেবতাদিগেরও প্রকৃতি, সত্ত্ব ও গরিমার কেমন তারতম্য ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন বরুণদেব, ইনি আদিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের দেবতারূপে পূজিত হয়ে, পরবর্ত্তী আখ্যানে প্রকাশ পেলেন জল-সমূহের দেবতারূপে। অথবা অশ্বিদ্বয়, এঁরা দিন ও রাত্রির প্রতিনিধিস্বরূপ প্রথমে গৃহীত হয়ে, পরে দেববৈদ্যরূপে আদৃত হলেন। এই রকম, অনেক দেব-দেবীরই দেবত্ব বিষয়ে প্রাথমিক কল্পনা সকল যুগে সমান গ্রাহ্য হয়নি। এই তারতম্য যে কেবল হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধেই আবদ্ধ বা প্রযোজ্য, তা নয়। যাই হোক্, অনুমতি দেবীর ইতিহাস আলোচনা করতেও যদি প্রকৃতিগত এরূপ পরিবর্ত্তন বা অসামঞ্জস্যের ধারা লক্ষিত হয়, তবে বিস্ময়ের কোনও কারণ থাক্‌তে পারে না। অনুমতির (অনু+মন্‌+অধিকরণে ক্তিন্‌) শব্দগত অর্থ সম্মতি, অনুজ্ঞা, অনুমোদন ইত্যাদি, অর্থাৎ মানসিক একটী বৃত্তি-বিশেষ। দেখা যায়, শ্রদ্ধা, ধারণা, 'মেধা' প্রভৃতি বৃত্তিতে যে ভাবে দেবীত্ব আরোপ করা হয়েছে, 'অনুমতি'র উপরেও তেমনি ভাবেই হয়েছে। সাধারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, মানসিক বৃত্তির উপর পরিকল্পিত যে সকল দেব-দেবী, তাঁদের উদ্ভাবনা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে হয়েছিল; অন্ততঃ মানবীয় সভ্যতার একান্ত শৈশবাবস্থায় নয়। কারণ, আগে মানুষের বাহিরের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবে, স্থূলের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হবে, তবে সে ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করবার যোগ্যতা পাবে, সূক্ষ্মের ধারণা করতে সক্ষম হবে। ক্রমশঃ মানুষ বহিঃপ্রকৃতির স্থূল ঘটনা বা অবয়ব দেখে, সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়েই হ'ক, অথবা ভয়ে আবিষ্ট হয়েই হ'ক, দেব-দেবীর কল্পনা বা আখ্যান সৃষ্টি করেছিল, তার পরে ক্রমশঃ অন্তর্জ্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করবার মত পরিপুষ্ট জ্ঞান বা শক্তি লাভ করেছিল। এ স্বীকার না করলে মানবের আত্মপ্রকাশের যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস বা ক্রমসূত্র আছে, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই প্রকৃতির রূপ বা রহস্যের পরিকল্পনায় সৃষ্ট দেব-দেবী অপেক্ষা, এই মনোবৃত্তি-নিষ্পন্ন অনুমতি দেবীকে কিছু আধুনিক সৃষ্টি বলে মেনে লওয়া চলে। কত আধুনিক, তা কেউ বল্‌তে পারে না; পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন, মনের বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-বিশেষকে দেবতার স্বরূপ দান করার প্রথা আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করার আগেও অভ্যাস করেছিলেন, এ বৈদিক যুগের নিজস্ব কোনও বিশিষ্ট উদ্ভাবনা নয়।

অনুমতিকে দেবীরূপে কল্পনা করে বলা হয়েছে, ইনি দেবতাদের সম্মতির বা

অনুগ্রহের দেবী। মানেটা যে খুব পরিষ্কার, তা নয়। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, ইনি দেবতাদের প্রসন্নতার সহিত পূজা ও অর্ঘ্য গ্রহণ করার প্রতিনিধান করেন। যাই হোক্, চরিত্রের এই এক বিশেষত্বে এঁকে আগাগোড়া যে দেখতে পাব না, এ আভাস আগেই দেওয়া হয়েছে। ধাতুগত অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে অনুমান হয়, এঁর প্রথম রচনা এরূপ কল্পনা থেকেই হয়েছিল। পরবর্ত্তী কল্পনায় ইনি প্রকাশ পেলেন—চন্দ্রের একটী কলার দেবীরূপে। চন্দ্রের আরও তিনটী কলার দেবী বৈদিক যুগে ন্যূনাধিক প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, যথা—সিনীবালী, কুহূ ও রাকা। অষ্টকাদের ভিতরেও কেউ কেউ যে আর্য্যদের নিকটে কতক পরিমাণে আদৃতা না হয়েছিলেন, তা নয়; কিন্তু সে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে। অনুমতি, সিনীবালী, কুহূ ও রাকা, এঁদের ভিতরে কে কোন্ কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তার সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে অল্প-স্বল্প বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বেশীর মতে অনুমতি দুই প্রহর চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমার দেবী এবং সিনীবালী, কুহূ ও রাকা যথাক্রমে চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যা, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দেবী। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা যাঁকে নিয়ে, তাঁর সম্বন্ধে মতান্তরের কথাই আমরা বলব। যজুর্ব্বেদের ৩।৩।১১ শেষ মন্ত্র অনুসারে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এ স্থলে অনুমতিকে পূর্ণিমার দেবী বলেই ভাবা হয়েছে। এমনটী আর কোথাও দেখা যায় না। অবশ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১১) অনুমতিকে প্রথম পূর্ণিমার এবং রাকাকে দ্বিতীয় পূর্ণিমার দেবী বলে নির্দ্দেশ করেছেন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এখানে বুঝি দুইটী পূর্ণিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা যে নয়, কীথ সাহেবের ব্যাখ্যা থেকেই তা প্রতিপন্ন হতে পারে। তিনি বলেন, একটীতে সূর্য্যাস্তের সময় সূর্য্য এবং পূর্ণচন্দ্রের একই সময়ে নয়নগোচর, এবং অপরটীতে সূর্য্যাস্তের পর পূর্ণচন্দ্রের দৃষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে মাত্র। যাই হোক্, মতাধিক্যের অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত করতে হয়, অনুমতি চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমার দেবী, 'ন্যূনেন্দুকলাপূর্ণিমা'।

চন্দ্রকলাগণ কেন এত লোকপ্রিয় হলেন, তা জান্‌তে কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করাও সোজা নয়। তবে উপনিষদে চন্দ্র বা সোমের সহিত পিতৃপুরুষগণের একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকার কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, উপনিষদের আগের যুগেও চন্দ্রের সহিত পিতৃপুরুষগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ অনুভূত হওয়ায়, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্যের সহিত চন্দ্রেরও একটা সংযোগ ভেবে লওয়া হত। তাই চন্দ্রকলাদেরও সমাদর।

অনুমতি দেবীর প্রথম পরিচয় পাই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে। ১০।৫৯।৬ ঋক্ বলেন, "অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগং। জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরং তমনুমতে মৃড়য় নঃ স্বস্তি॥" ওগো অসুনীতি, আমাদের পুনরায় দৃষ্টিপ্রদান কর, পুনরায় আমাদিগকে প্রাণ দান কর এবং ভোগ করতে দাও। আমরা যেন বহুকাল ধরে ঊর্দ্ধগামী সূর্য্যকে দেখতে পাই। ওগো অনুমতি, আমাদিগকে অনুগ্রহ কর, স্বস্তি দাও॥

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৬৭।৩ ঋকেও অনুমতি দেবী ও বৃহস্পতির শরণ লাভ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। যথা—"সোম এবং বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতি মঙ্গল কচ্ছেন, হে ইন্দ্র, তোমার প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হয়েছি" ইত্যাদি।

সারা ঋগ্বেদে মাত্র এই দুই স্থান ব্যতীত অনুমতির স্পষ্টোল্লেখ আর কোথাও নাই। কিন্তু এ থেকে বোঝা যায় না, অনুমতিকে কি ভাবে, কোন্‌রূপে প্রার্থনা করা হয়েছে। হতে পারে দেবতাদের অনুগ্রহের দেবীরূপে, হতেও পারে চন্দ্রকলার দেবী মনে করে'। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভিতরে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ঋগ্বেদীয় আর্য্যের গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম, সম্যক্ ও গভীর জ্ঞান জন্মেছিল কি না, যার দ্বারা চন্দ্রের কলা-বিভাগ করে তাদের উপর দেবীত্ব আরোপ করতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল, ৭৪ সূক্ত, ষষ্ঠ ঋকের যে টীকা দিয়েছেন, তাতে করে এ সন্দেহ অমূলক মনে হয়। ৯।৭৪।৬ ঋক্ বলেন,—"সহস্রধারেহব তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সংতু রজসি প্রজাবতীঃ। চতস্রো নাভো নিহিতা অবো দিবো হবির্ভরংত্যমৃতং ঘৃতশ্চুতঃ॥" দ্বিতীয় পংক্তির 'চতস্রো' শব্দ সায়নের মতে অনুমতি, সিনীবালী, কুহূ ও রাকা অর্থাৎ চন্দ্রের এই চারি কলার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া রাকা, সিনীবালীর উল্লেখ ঋগ্বেদ নিজেই করেছেন। এ থেকে অনুমান হয়, অনুমতিকে কেবলমাত্র 'দেবতাদের অনুগ্রহের দেবী'রূপে পরিকল্পনা ঋগ্বেদের অন্ততঃ নবম মণ্ডল রচনার পূর্ব্বেই করা হয়েছিল।

কিন্তু ঋগ্বেদীয় যুগে অনুমতি দেবীর প্রাধান্যটা তেমন কিছু অধিক ছিল না। বরঞ্চ মনে হয়, সে যুগে তিনি একজন সামান্যা বা অপ্রধানা দেবী বলে পরিগণিত হতেন। এ শুধু এঁর সম্বন্ধে নয়, ঋগ্বেদের প্রায় সকল দেবীর পক্ষেই এ কথাটা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। একমাত্র উষাদেবী ব্যতীত ঋগ্বেদে পৃথিবী, সরস্বতী, ভূমি, রাত্রি, পৃশ্নি, সরণ্যু প্রভৃতি কোনও দেবীরই নিজের একটা গরীয়সী সত্তা বিশেষ করে প্রকটিত হয় নি। মোটামুটি হিসাবে বল্‌তে গেলে, সে যুগে দেবীর চেয়ে দেবের প্রাধান্য বেশী ছিল। আসীরীয়গণ যেরূপ তাঁদের দেবীগণকে স্বীয় পতি-দেবতাদের (husband gods) ছায়ার মত পরিকল্পনা করতেন, ঋগ্বেদীয় যুগ সম্বন্ধে ঠিক অতখানি বলা না চল্‌লেও, দেবীর স্থানকে যে খাটো করে রাখা হয়েছে, এ কথা স্বচ্ছন্দেই স্বীকার করে লওয়া যেতে পারে। এ ভিন্ন মনোবৃত্তি-নিষ্পন্ন দেবতাদের বিষয়ে আরও বিশেষ করে বলা যায় যে,এঁরা খুব কম জায়গায়ই প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বা কল্পিত দেব-দেবীর সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারেন।

যজুর্ব্বেদের ১।৮।৮ যজুঃ অনুমতি, রাকা, সিনীবালী এবং কুহূ, এই চারিটী দেবীর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের কথা বলেছেন। এখানেও মনে হয়, এঁদের প্রকৃতি কিছু সন্দেহযুক্ত হয়ে আছে। ৩।৩।১১ যজুঃ অনুমতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কতকটা এইরূপ,—"আজ যেন অনুমতি দেবতাদের নিকট আমাদের যজ্ঞ অনুমোদন করেন, এবং তিনি ও অর্ঘ্য-বাহী অগ্নি দাতার আনন্দস্বরূপ হন।" তার পরেই অনুমতিকে স্মরণ করে উপাসনা করা হয়েছে,—"ওগো

অনুমতি, তোমার অনুগ্রহ দান কর, আমাদের সম্পদ্ দাও; প্রেরণা এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য আমাদের প্রণোদিত কর; আমাদের নিমিত্ত আমাদিগের দিন (আয়ু) বৃদ্ধি কর।" পরবর্ত্তী কালে অনুমতির প্রকৃতির নব বিকাশের বা স্ফুরণের যে পরিচয় পাওয়া যায়, ৩.৩।১১ যজুঃ অনুমতি সম্পর্কে আরও যা বলেছেন, তার থেকেই প্রথম আভাস পাওয়া যায়। বলেছেন,—"তিনি (অনুমতি) যেন অনুগ্রহ করে আমাদিগকে অক্ষয় ধন ও বহু সন্ততি দ্বারা অনুগ্রহ করেন; তাঁর বিরাগে যেন আমরা পতিত না হই; এই সহজসাধ্যা দেবী যেন আমাদের রক্ষা করেন।" এখানে লক্ষ্য করার প্রধান কথা হচ্ছে, 'বহু সন্ততি দ্বারা অনুগ্রহ করা'। যিনি কেবলমাত্র 'দেবানুগ্রহের দেবী', যাঁর উপরে দেবতাদের সমক্ষে যজ্ঞ অনুমোদন করে দিবার ভারই কেবলমাত্র ন্যস্ত, তাঁর কাছেই আবার প্রজা-লাভের নিমিত্ত উপাসনা করা হয় কেন? বস্তুতঃ এর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু যদি চন্দ্রকলার দেবী ভেবে নেওয়া যায়, তবে অবশ্য কতকটা সঙ্গতি পাওয়া যায়। কল্পনায় একটা জিনিস প্রথম রচনা করা বা খাড়া করে তোলা যত কঠিন, একবার রচিত হলে তাকেই আবার নানা ভাবসম্পদে সাজিয়ে তার উপর নানা বর্ণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করা ততটা কঠিন নয়। যে ভাবে প্রণোদিত হয়েই হোক্, চন্দ্রকলাকে দেবীত্ব প্রয়োগ করে উপাসনা নিয়ন্ত্রিত হল। কিন্তু চন্দ্রের কিরণে যে সুধা বর্ষিত হয়, যে মাদকতা মানুষের গোপন অন্তরকে চঞ্চল ক'রে তোলে, যে মধু মানবের সারা দেহ মনকে নিভৃতে উদ্‌ভ্রান্ত করে, তাকে উপেক্ষা করে চল্‌তে অশক্ত হয়ে আর্য্যগণ যদি প্রজনন বা উৎপাদিকা শক্তির একটা সংশ্লিষ্টতা মনে মনে এঁকে নিয়ে অনুমতি দেবীর (এবং অন্যান্য কলাদেরও) প্রতি সন্তান-কামনা ক'রে থাকেন, তবেই এর একটা সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

অথর্ব্ববেদে অনুমতি দেবীর চরিত্রের আরও নানা দিক্ বিকাশ পেয়েছে। অথর্ব্ব-বেদকে অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক ক্রমাভিব্যক্তির মূল ধারার কিছু বাইরে বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ, ভাবাত্মকতা বা ভাবের নিগূঢ়তা এর মন্ত্রগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প করে ফুটেছে। পক্ষান্তরে কবি-কল্পনাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে যত দূর নেওয়া যায়, ইনি তা করবার চেষ্টা করেছেন। যথা,—বৃষ ও বশা (গবী), এঁদের বল্লেন, এঁরা ঈশ্বরের সমতুল। দর্ব্বি (হাতা), দর্ভতৃণ-কবচ, পুরোহিত বা মুনিদের জন্য প্রস্তুত যবাদির মণ্ড, যজ্ঞোৎসর্গীকৃত বৃষ, এ সবের ধ্যান কল্লেন আত্ম-শক্তিগণের অনুরূপ চিন্তা করে। কাল (সময়)কে প্রজাপতি জ্ঞানে এবং সর্ব্বলোকসৃষ্টিকর্ত্তারূপে স্তুতিবাদ সুরু করে দিলেন। আর অনুমতি দেবী সম্বন্ধে প্রচার করলেন,—"অনুমতিঃ সর্ব্বং ইদং বভূব যৎ তিষ্ঠতি চরতি যৎ উ চ বিশ্বং এজতি। তস্যাস্তে দেবী সুমতৌ স্যাম অনুমতে অনু হি মঙ্‌সসে নঃ" ॥ (৭।২০।৬)॥ এই যে সর্ব্ববিশ্ব ও চরাচরের সহিত অনুমতি দেবীর একত্ব কল্পনা, এ অথর্ব্ববেদেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। সম্ভবতঃ এরই প্রতিধ্বনি করে শতপথব্রাহ্মণও বলেছেন,— অনুমতিই এই বিশ্ব। (২।৩।৪)॥ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ আর এক দিয়ে বলেছেন,—'যানুমতিঃ সা গায়ত্রী' (৩।৪৭-৪৮)॥

এ ভিন্ন অথর্ব্ববেদ অনুমতি দেবীকে আর কি কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়ানুষ্ঠানে উপাসনা করেছেন, আমরা তা দেখাচ্ছি। সাধারণভাবে প্রার্থনাও করেছেন। ৭।২০।১-২ অথর্ব্বন্ বলেন,—"ওগো অনুমতি, আজকের দিনে দেবতাদের সাক্ষাতে আমাদের যজ্ঞ অনুমোদন কর। ওগো অনুমতি! আমাদিগকে স্বাস্থ্য ও সুখ প্রদান কর। এই উৎসর্গীকৃত যজ্ঞ গ্রহণ কর।" এবং তার পরেই বলেন,—"ওগো দেবি, আমাদিগকে প্রজা (সন্ততি) দান কর।" সন্তান কামনায় সে যুগের জনক জননীও যে কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করতেন, তার আভাস অথর্ব্ববেদও দিয়েছেন। ৬।১১।৩ অথর্ব্বনে দেখা যায়, পুংসবনক্রিয়াকালে সন্তানেচ্ছু, কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্রলাভার্থ প্রজাপতি, অনুমতি ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ভাবার্থ এই যে, গর্ভোৎপাদনের দেবীরূপে অনুমতি ও সিনীবালী যে ভ্রূণ গঠন করেছেন, প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে উহা যেন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। গর্ভ-সঞ্চার ও সহজ-প্রসবের আকাঙ্ক্ষায় প্রাচীন ল্যাটীন্ জাতির ভিতরেও লুসিনা-দেবীর (Lucina, Lucna, Luna, the Moon) নিকট প্রার্থনা জানাবার প্রথা ছিল। ১।১৮।২ অথর্ব্বন্ সবিতৃ, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমন্ এবং অনুমতির নিকট যে উপাসনা ক'চ্ছেন, তার উদ্দেশ্য এই যে, কোনও নারীবিশেষের দেহে অসৌভাগ্যকর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তা বিদূরিত করা এঁদের অনুগ্রহসাক্ষেপ। পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চায় না, অথচ নারী তারই হৃদয়ে লালসাময় প্রেম উৎপাদন কর্ত্তে ব্যগ্র হয়েছে; নারী তখন দেবতাদের ডেকে বল্লে,—"হে দেবগণ, ওঁর প্রাণে লালসা জাগাও; উনি যেন আমার প্রতি ভালবাসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকেন।" অনুমতিকেও স্মরণ করে বল্লে,—"ওগো অনুমতি, তুমি এতে সম্মতি দাও।" (৬।১৩১।১-২ অথর্ব্বন্)॥ এরূপ মন্ত্রপাঠের সহিত সে কালে নাকি একটা অনুষ্ঠানেরও সংযোগ ছিল। যে পুরুষের প্রেম যাচ্ঞা করা হত, তার আসনে, গৃহে বা শয্যায় অথবা সে যে পথে হাঁটে, সেই পথে প্রথমতঃ কতকগুলি মাষ নিক্ষেপ করা হত। এর গূঢ়ার্থ এই যে, মাষ নাকি কামোদ্রেক করে, এবং সে জন্যই কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বদিনে উপবাস কর্ত্তে হলে মধু, মাংস, সুরা, ক্ষার, মাষ প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ। যাই হোক্, অনুষ্ঠানকালে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের একটী প্রতিমূর্ত্তি গড়ান হত। সেটির মুখ থাক্‌ত অনুষ্ঠানকারিণীর দিকে। তার পর কতকগুলি শরাগ্রে আগুন জ্বালিয়ে সেই প্রতিমূর্ত্তির দিকে দিকে স্থাপিত করে তবে মন্ত্রপাঠ করা হত। এ ছাড়া, ৫।৭।৩-৪ অথর্ব্বন্ অনুসারে দেখা যায়, যাজ্ঞিক বা পুরোহিত তাঁর দক্ষিণার পরিমাণ কম্‌তি না ঘটে, এ জন্য সরস্বতী, অনুমতি ও ভগের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

পুরাকালে কৃষি সম্বন্ধীয় কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। গাভীগুলিকে গোচারণে নিয়ে গিয়ে পুনরায় গোশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করাবার জন্য এবং গোধন যাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তার জন্য রীতিমত মন্ত্রপাঠ ও সংস্কারাদি নিষ্পন্ন করা হত। যে সমস্ত দেবদেবীর

নিকট এ জন্য উপাসনা করা হত, তাঁদের মধ্যে অনুমতি দেবী অন্যতমা। ২।২৬।২ অথর্ব্বন্ বলেন,—"এই গোশালায় গাভীগুলি একত্র আগমন করবে; বৃহস্পতি এদের নৈপুণ্য সহকারে চালনা করবেন; সিনীবালী এদের পুরোভাগকে এখানে পথপ্রদর্শন করবেন; ওগো অনুমতি, এরা আগত হলে তুমি এদের যথাস্থানে ধারণ করে রেখো।" সিনীবালী এবং অনুমতি, উভয়েই যখন চন্দ্রকলা এবং উভয় কলাই যখন ন্যূনাধিক কিরণ দান করেন, তখন এঁদের উদয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিরন্ধকার থাকবে, এরূপ কল্পনায় উপরোক্ত প্রার্থনা অস্বাভাবিক নয়। কৃষি সম্বন্ধীয় আরও কয়েকটী অনুষ্ঠান সে কালে যত্ন সহকারে পালন করা হত, তন্মধ্যে হলানুষ্ঠান একটী। হল-যোজনা সাঙ্গ হলে এ অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন করা হত। ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে হলের সম্মুখে, সাধারণতঃ পৃথিবী ও দ্যৌর (আকাশের) উদ্দেশ্যে, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বা অন্য কোনও শুভ দিনে একটী অর্ঘ্য প্রদান করা হত। এ ছাড়া এ উপলক্ষ্যে অন্যান্য উপাস্য দেবতাদের ভিতরে ইন্দ্র, পর্জ্জন্য, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্‌গণ, উদলাকাশ্যপ, স্বাতিকারী, সীতা, অনুমতি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানক্রিয়া সমাপ্ত হলে বৃষগণকে মধু ও ঘৃত আহার করতে দেওয়া হত। এর বিশেষ বিবরণ পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে (২।১৩।১-২) পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদ থেকে আরও একটী তথ্য জানা যায় যে, উৎপাদনের দেবী বলে গাভীরও বন্ধ্যাত্ব দূর করবার অভিপ্রায়ে অনুমতি দেবীর নিকটে প্রার্থনা করা হত।

খাঁটি বৈদিক যুগের পরেও হিন্দুর চোখে অনুমতি দেবীর প্রভাব ও মর্য্যাদা ক্রমশঃ কতখানি পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তার নিদর্শন নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হতে কিছু কিছু সংগ্রহ করা যেতে পারে। এমন কি, রাজসূয়, পুরুষমেধ প্রভৃতি সে কালের বড় বড় যাগ-যজ্ঞেও এ দেবীটিকে বাদ দেওয়া হত না। রাজসূয়যজ্ঞারম্ভে দীক্ষার প্রথম দিনে (১লা ফাল্গুন) কতকগুলি আনুক্রমণিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, দ্বিতীয় দিনেই অনুমতি এবং নির্ঋতিকে অর্ঘ্য প্রদান করার ব্যবস্থা ছিল। ২।৩।১-৪ শতপথব্রাহ্মণ বলেন, অভিষেচনীয়-কালে নরপতিকর্ত্তৃক প্রথম দিন পূর্ণাহুতি প্রভৃতি দান করা হত, পরদিন অষ্টকপালে অনুমতি দেবীর যজ্ঞাহারের নিমিত্ত পিণ্ড প্রস্তুত করা হত; কারণ, অনুমতিই এই পৃথিবী; এবং যিনি স্বীয় অভিলষিত ক্রিয়া সম্পন্ন করতে জানেন, তাঁর নিমিত্তই তিনি (অনুমতি) অনুমোদন করেন; এই জন্যই তিনি (নরপতি) তাঁকে (অনুমতিকে) প্রসন্ন করেন, এই ভেবে যে, "আমি যেন অনুমতির দ্বারা অনুমোদিত হয়ে সংস্কৃত হতে পারি।" ১৬।১০।১১ শাঙ্খায়নসূত্র অনুসারে পুরুষমেধ যজ্ঞনির্ব্বাহকালে অনুমতি, পথের মঙ্গলকারিণী দেবী (পথ্যা-স্বস্তি) এবং অদিতির নিকট এক বৎসর ক্রমাগত দৈনন্দিন অর্ঘ্য প্রদত্ত হত। শাঙ্খায়ন-সূত্র (২।১৪।৪) থেকে আরও জানা যায়, বৈশ্বদেব-যজ্ঞ সম্পাদনকালেও সন্ধ্যায় এবং প্রত্যূষে সোম, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি, বিশ্বদেবগণ, প্রজাপতি, অদিতি, অনুমতি, অগ্নি-স্বিষ্টিকৃৎ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে অর্ঘ্য দান করা হত। পঞ্চ-

মহাযজ্ঞকালেও যে অনুমতি দেবীকে বঞ্চিত করা হত না, ২।৯।২ পারস্কর-গৃহ্যসূত্র হতে তাও জানা যায়। এতদ্ভিন্ন, খাদির-গৃহ্যসূত্র উল্লেখ করেন যে, সোমযজ্ঞের সহিত অগ্নি-বেদীর চতুর্দ্দিকে জলসিঞ্চন করার যে একটী অনুষ্ঠান সম্পাদন করার প্রথা ছিল, সেই সময়েও পশ্চিমমুখী হয়ে অনুমতির সম্মতি ভিক্ষা করা হত (১।২।২৮)।

এমন কি, সে যুগের ছাত্রগণও এ দেবীটির পূজা হতে নিষ্কৃতি লাভ করতেন না। সে কালে এ কালের মত নিত্য পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা ছিল না, মধ্যে মধ্যে সময় ও অবস্থা-ভেদে তাঁদের পাঠ থেকে নিরত থাকতে হত। বৎসরান্তে পাঠারম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ বর্ষাসমাগমে) ছাত্রদিগকে যে অনুষ্ঠানটী সম্পাদন করতে হত, তার নাম ছিল অধ্যায়োপাকর্ম্ম। এই অধ্যায়োপাকরণকালে তাঁরা হয় সমস্ত ঋগ্বেদ, নয় কতকগুলি অধ্যায়ের গোড়ার সূত্রগুলি উচ্চারণ করতেন এবং ঘৃত-দুগ্ধ-বিমিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতেন। বলা বাহুল্য, অপরাপর দেবতার সহিত অনুমতি দেবীও স্থান পেতেন। অনুষ্ঠানশেষে পুনরায় তিন দিন পাঠ বিরাম থাকত। অধ্যায়োপাকর্ম্মে অনুমতী দেবীর উদ্দেশ্যে আজ্য-অর্ঘ্য প্রদান করার কথা কেবল পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে (২।১০।৯) নয়, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রেও (৪।৩।২৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সকল ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্রিয়ার সহিত অনুমতি দেবীর পূজা সংশ্লিষ্ট ছিল। ৪।৩।২৬ আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র বলেন, শ্রাদ্ধার্ঘ্য প্রদানকালে ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী বাম হাঁটু নত করে প্রতিবার 'স্বাহা' উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি, কাম, বসুধা এবং অনুমতির উদ্দেশ্যে দক্ষিণাগ্নিতে আজ্য অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। গোভিল-সূত্রে (২।৩।১৭-২০) নবদম্পতি-কর্তৃকও অগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ এবং অনুমতিকে অর্ঘ্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে দেখা যায়।

মনুও অনুমতি দেবীর উল্লেখ করেছেন। ৩।৮৪ ও ৮৬ শ্লোকে বলেছেন, ব্রাহ্মণ নিজ নিজ গৃহ্যসূত্রানুসারে বৈশ্যদেবের নিমিত্ত পক্বান্নের একাংশ গৃহাগ্নিতে (নিম্নলিখিত) দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করবেন,—প্রথমতঃ অগ্নি, তার পরে সোম, পরে উভয়কে একত্র, তার পরে বিশ্বেদেবগণ, তার পরে ধন্বন্তরি ইত্যাদি, এবং তারপরে কুহূ, অনুমতি, প্রজাপতি, দ্যৌ, পৃথিবী, অগ্নি-স্বিষ্টকৃৎ। (যথা—কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ। সহ দ্যাবা-পৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ ॥ ৩।৮৬।)

সারা মনুসংহিতায় অনুমতি দেবীর নাম কেবল এই একটী স্থানেই খুঁজে পাওয়া যায়। এর পরে কবে থেকে যে এই দেবীটীর খ্যাতি লঘুতর হতে লাগল, তা কিছুই নির্দ্ধারণ করা যায় না। বিষ্ণুপুরাণ রচনাকালেই এঁর নামের সঙ্গে কতগুলি উপাখ্যান বিজড়িত হতে আরম্ভ করেছিল। বিষ্ণুপুরাণের দশম অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, অঙ্গিরা-পত্নী স্মৃতিদেবী সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতিনাম্নী চারি কন্যাকে প্রসব করেছিলেন। ভাগবত-পুরাণ অনুসারে স্বারোচিষ মন্বন্তরে উতথ্য এবং বৃহস্পতি নামধেয় মুনিদ্বয়ও অঙ্গিরসের

পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; অর্থাৎ এঁদেরই ভগ্নী হলেন অনুমতি ইত্যাদি। অথচ কিন্তু বিষ্ণুপুরাণই আবার অষ্টম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমতি প্রভৃতিকে চন্দ্রের কলা-রূপেই ব্যক্ত করেছেন।

যাই হোক্, আজকের হিন্দুসাধারণের নিকট এই দেবীটির নামও অজ্ঞাতপ্রায়। উত্থান ও পতন, সংসারের এই চিরন্তন ধারা থেকে দেবতাদেরও বুঝি নিষ্কৃতি নাই! নইলে এতগুলি বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে, এমন কি, শ্রাদ্ধ এবং বিবাহাদিতেও যিনি হিন্দুর কাছ থেকে সমানে পূজার্ঘ্য দাবী করে আস্‌ছিলেন, সেই 'সহজ-সাধ্যা' দেবীও যে কেন যুগপ্রবাহে অনাদৃতা হতে লাগলেন, এ রহস্য ভেদ করা কঠিন।

শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা*

সম্প্রতি আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় "প্রকৃতি" নামক পত্রিকাতে বাঙ্গালা দেশের সমস্ত মৎস্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই প্রবন্ধগুলি পাঠে একটী বিষয়ে আমি একেন্দ্রবাবুর সহিত একমত হইতে পারিতেছি না এবং সেই বিষয় আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। আমার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলার জন্য গোড়ার কথা সামান্যভাবে বলার প্রয়োজন হইতেছে। জীবজগতের শ্রেণী-বিভাগে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—

Sub-kingdom.
Class.
Sub-class.
Order.
Sub-order.
Super-family.
Family.
Genus.
Species.

এই প্রসঙ্গে বলা কর্ত্তব্য যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই এতগুলি পর্য্যায়ানুসারে শ্রেণীবিভাগ হয় না। ডাঃ ঘোষের মৎস্যশ্রেণীর বর্ণনা-সম্বলিত প্রবন্ধই আমাদের আলোচ্য বিষয়। মৎস্য-শ্রেণী একাধিক শাখা-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং Teleostei তন্মধ্যে অন্যতম। Teleostei দুইটী বর্গে (order) বিভক্ত হইয়াছে এবং Isospondyli, Physostomi বা Malacopterygii তাহাদের অন্যতর। একেন্দ্রবাবু Sub-class ও Order—পরিচায়ক শব্দ দুইটির পরিবর্ত্তে দুইটী বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এই স্থলে মুখ্যতঃ তাঁহার সহিত আমার কোনও মতভেদ নাই। তবে আমি Teleostei শব্দের পরিবর্ত্তে "পূর্ণাস্থিক" শব্দ "অস্থিক" শব্দ অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি; কারণ, Teleostei যে দুইটী শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের একটীর (teleos) অর্থ 'সম্পূর্ণ' ও অপরটীর (osteos) অর্থ 'অস্থি'।

যাহা হউক, এই মতভেদের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

---

* ২১এ চৈত্র ১৩৩৪ তারিখে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Order বা বর্গের পর একেন্দ্রবাবু যে ভাবে শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আমাদের এ দেশের মৎস্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত মৎস্যের দেশজ নাম আছে। একেন্দ্রবাবু সেই সমস্ত নাম genus বা গণ হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন এবং ইহাই আমার আপত্তির বিষয়। বাঙ্গালা দেশের ইলিশ মৎস্য Clupea genusএর অন্তর্গত। একেন্দ্রবাবু এই "ইলিশ" শব্দ genus অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত কি না, তাহাই আলোচ্য। দেশভেদে জীব ও উদ্ভিদের বিভিন্ন নাম আছে, কিন্তু এই সমস্ত দেশজ শব্দ জীব-তত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, তাহা হইলে বক্তব্য বিষয় প্রণিধান করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ Homo sapiensএর কথা বলা যাইতে পারে; কারণ, মানুষ শব্দের পরিচায়ক নানা সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাষাতে থাকিলেও যে ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিত হউক না কেন, বৈজ্ঞানিকগণ Homo sapiens এর প্রয়োগ করিবেন, অপর কোনও শব্দ প্রয়োগ করিবেন না। সুতরাং গণ হিসাবে Clupea শব্দের পরিবর্ত্তে ইলিশ শব্দের ব্যবহার আপত্তিজনক। একেন্দ্রবাবুর মত অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে গণবোধক (generic) নামের ন্যায় জাতিবোধক (specific) নামেরও প্রতিশব্দ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই প্রথা যদি আমাদের দেশের জীব ও উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্‌গণ গ্রহণ করেন, তবে বাঙ্গালা ভাষাতে কখনও উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সৃষ্টি, এবং বলা বাহুল্য যে, বৈজ্ঞানিকের দরবারে জীব-বিদ্যাপ্রভৃতিবিষয়ক বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনও স্থান হইবে না। কিঞ্চিদধিক ২০ বৎসর পূর্ব্বে পরিভাষা-গঠন সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছিলাম এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি।[১]

বাঙ্গালা ভাষাতে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি লিখিবার সময় ক্রমশঃ আসিতেছে। সুতরাং কোন্ কোন্ শব্দের পরিভাষার অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্ কোন্ স্থানে অন্য ভাষাতে প্রচলিত শব্দই রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি মূল-সূত্র প্রণয়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের জন্য একাধিক সমিতি কার্য্য করিতেছেন। সমস্ত প্রদেশেই এক প্রথা অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আশা করি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া যথাবিহিত কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি, এফ জেড এস্ মহাশয়ের মন্তব্য,—

আমি আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃঃ ২৪৮—২৫৩, ১৩১৩।

তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমি Teleosteiএর প্রতিশব্দ দিয়াছি "আস্থিক"। হেমবাবু ঐ শব্দটীর মৌলিক অর্থ ধরিয়া "পূর্ণাস্থিক" নামের পক্ষপাতী। আমি বলি, যদি ছোট কথায় কাজ হয়, তবে বড় কথার দরকার কি ? আর এমন কিছু মানে নাই যে, ঠিক ইংরাজি শব্দটীর অবিকল প্রতিরূপ গ্রহণ করিতেই হইবে। অনেক সময়ে সুবিধামত একটু পরিবর্ত্তন করিলে আরও ভাল দেখায়—শ্রুতিমধুর হয়, অথচ অর্থের কিছু বিপর্য্যয় ঘটে না। হেমবাবু আরও আপত্তি করিতেছেন যে, গণ অর্থাৎ genusএর বাঙ্গালা পরিভাষা হওয়া উচিত নয়। ইহা যে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করা চলিবে না, সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার একমত। তবে আমি মনে করি যে, অনেক ভাষায় যেমন সাধারণের পাঠ্য প্রাকৃতিক ইতিহাসে genusএর দেশীয় নাম ব্যবহার আছে, আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়ও সেইরূপ genusএর নাম গঠিত হওয়া উচিত ; সেই জন্যই আমি গণের প্রতিশব্দ গঠন করিয়াছি। আমার প্রবন্ধটী বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও সাধারণের জন্যও লিখিত।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ *

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশের গ্রাম্য শব্দগুলি সংগ্রহ করিবার একটা চেষ্টা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তবে সকলেই যে, এই সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এমন বলা যায় না। কেহ কেহ আমোদ উপভোগের জন্য—বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে তারিফ লইবার আশায় এরূপ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। কলিকাতা বাগবাজারে গঙ্গা ও মহারাষ্ট্রখাতের সঙ্গমস্থলে বিদেশী নৌকার কুত আদায়ের আফিসের একজন কর্ম্মচারী পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানের মাঝিদিগের ব্যবহৃত শব্দ লইয়া সুন্দর সুন্দর ছড়া রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার নিজ মুখেই একদিন আমি কতকগুলি ছড়া শুনিয়াছিলাম—তাঁহার নিকট হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। নৌকার আফিসে সুদীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া যিনি নানাদেশের মাঝিদের ভাষা সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, শুদ্ধ আমোদের জন্য রচিত হইলেও তাঁহার এই ছড়াগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাষাতত্ত্বা-লোচীর নিকট একটা বড় সম্পদ্ হইবে। আর একজনের কথা জানি। তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালা মিশাইয়া বড় সুন্দর সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়া সাধারণের তৃপ্তি জন্মাইতেন। তিনি একবার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ লইয়া সংস্কৃতভাষায় হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'র অনুকরণে একখানি অভিধানের মত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থও সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। এইরূপ শব্দসংগ্রহ বাঙ্গালাদেশে আর কেহ কোথায়ও করিয়াছেন কি না, জানি না।

যতগুলি শব্দসংগ্রহ এযাবৎ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ক্ষণজন্মা পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃত সংগ্রহই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। উহা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮ম বর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক শব্দসংগ্রহের চেষ্টা সেই প্রথম। তাহার পর হইতে বহু ব্যক্তি কর্তৃক বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহু শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকার যে যে খণ্ডে যে যে জেলার শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎসংগ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য তাহার একটী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বরিশাল (৯ম খণ্ড), ময়মনসিংহ (১২শ খণ্ড, [টাঙ্গাইল] ১৯শ খণ্ড), রঙ্গপুর (১২শ খণ্ড), মালদহ (১৪শ ও ১৮শ খণ্ড), পাবনা (১৪শ খণ্ড), যশোহর (১৫শ খণ্ড), ঢাকা (১৬শ খণ্ড), নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা (১৬শ খণ্ড ও ১৯শ খণ্ড), বগুড়া (১৯শ খণ্ড), মুরসিদাবাদ [জঙ্গীপুর ২২শ] (ঐ [কাঁদি] ৩৩শ ও ৩৪শ খণ্ড) বীরভূম (৩৪শ খণ্ড)। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বসমেত ১০টী জেলার শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও অধিকাংশ জেলারই শব্দ সংগৃহীত হয় নাই।

---

* ১৩৩৪।২৮এ চৈত্র নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিয়াছেন,—যে কয়টী জেলার শব্দ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই সাজাইয়া গুছাইয়া একত্র সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। তাহাতে বাঙ্গালার গ্রাম্য শব্দাভিধানের মূল পত্তন হইবে, সন্দেহ নাই। তবে এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল সাধারণভাবে জেলাগুলির শব্দ সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না—প্রত্যেক মহকুমার—সম্ভবপর হইলে প্রত্যেক পরগণার শব্দ সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহাতে অনেক লোকের, অনেক সময়ের এবং অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে, সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষার Dialectic Dictionary প্রস্তুত করিতে সম্পাদক Professor Wrightকে শুধু শব্দ সংগ্রহ করিবার জন্য এক সহস্র লোকের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। এই বিশাল গ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহ করিতে পঁচিশ বৎসরের নিরন্তর পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিন সহস্রের অধিক শব্দসংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত English Dialectic Society ৮০ খণ্ড শব্দসংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

তবে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান বাঙ্গালা দেশ হইতে কোনও দিন প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হউক আর না হউক, বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার লোকের কর্ত্তব্য, স্ব স্ব জেলার গ্রাম্য শব্দগুলিকে সংগ্রহ করা। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রাম্য শব্দগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এখন হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া পরিষৎপত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া রাখিলে বাঙ্গালা ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাকারীদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই।

এই উদ্দেশ্যেই আমি ফরিদপুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কোটালিপাড়ার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। কোটালিপাড়া ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার সীমাস্থলে অবস্থিত। সুতরাং এখানকার চলিত ভাষায় দুই জেলারই শব্দ অল্পবিস্তর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, এই সংগ্রহে যে সকল শব্দ সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা কেবল কোটালিপাড়ায় প্রচলিত—স্থানান্তরে সেগুলি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত। অবশ্য সেরূপ শব্দও যে ইহার মধ্যে নাই, তাহা বলা চলে না। তবে ইহার অনেক শব্দই অন্য অন্য জেলায় একই আকারে—একই অর্থে অথবা একটু ভিন্ন আকারে এবং ভিন্ন অর্থে প্রচলিত আছে। এ কথা ঠিক যে, শব্দগুলি প্রায় সকলই আধুনিক সাহিত্যে অপ্রচলিত। সাহিত্যে অপ্রচলিত অথচ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় চলিত শব্দগুলি বিভিন্ন জেলার সংগ্রহে সংগৃহীত হইলে এক একটী শব্দের ব্যাপকতা বুঝা যাইবে। তাই আমি সে শব্দগুলি ত্যাগ করি নাই।

গত ২।৩ বৎসর যাবৎ আমি এই সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। যে সকল শব্দ কেবলমাত্র চাষাশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত, সেগুলি এখন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার বর্ত্তমান সংগ্রহ ভদ্রসম্প্রদায়ের ভাষার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে Sir

George Grierson এর Behar Peasant Life গ্রন্থে অবলম্বিত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করা এখানে সম্ভবপর হয় নাই। তবে উহা হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে চাষাশ্রেণীর শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাঁহার গ্রন্থের প্রণালীই অবলম্বন করিব।

এই শব্দ সংগ্রহ করিতে যাইয়া কতকগুলি বিষয়ে আমাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমার মনে হয়, সকল শব্দসংগ্রাহককেই এই জাতীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ভাষাতত্ত্বালোচীদিগের আলোচনার জন্য তাহাদের কতকগুলির আভাস দিতেছি। বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে প্রত্যেক শব্দের (বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের) প্রকৃত উচ্চারণ নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব। পূর্ব্ববঙ্গের অনন্তরার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ ধাতুর পর 'য়া' যোগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে ফরিদপুরের উচ্চারণ প্রকাশিত হয় না। 'দেখ' ধাতু হইতে অনন্তরার্থে অসমাপিকা ক্রিয়ার উচ্চারণ দ্রুত উচ্চারিত 'দেইখ্‌খা' এইরূপ। ফলতঃ, বর্ণমালার সাহায্যে ইহা প্রকাশিত করা দুরূহ। তাহা ছাড়া, পূর্ব্ববঙ্গে বর্গের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ একটু নূতন রকমের—সাধারণতঃ তৃতীয় বর্ণের দ্বারা তাহা সূচিত হয়। তাহা ভুল। উহার উচ্চারণ তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের মাঝামাঝি। ফরিদপুরে—শুধু ফরিদপুরে কেন, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে—চবর্গের উচ্চারণস্থান তালু নহে—দন্তমূল। এই উচ্চারণ নির্দ্দেশ করিবার কোনও নিয়ম বঙ্গীয় বর্ণমালায় করা হয় নাই। হকারের উচ্চারণে উষ্ম বা aspiration অতি অল্প। তবে aspiration একেবারে নাই, ইহাও নহে। সুতরাং অকারের দ্বারা ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। তাহার পর, হ্রস্ব দীর্ঘ, ন ণ, শ ষ স, য জ প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টীকে কোথায় প্রয়োগ করা উচিত, তাহা শব্দের পূর্ব্বরূপ না জানিলে ঠিক করিতে পারা যায় না। সুতরাং এরূপ স্থলে বানান বহু শব্দেই সন্দিগ্ধ থাকিয়া যায়; শব্দের পূর্ব্বরূপ আলোচনা করিয়া এই বানান ঠিক করিতে হইবে। প্রচলিত বাঙ্গালা সাহিত্যেও বানানের এইরূপ গোলমাল যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়—ইহার একটা বিধিব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ জাতীয় শব্দসংগ্রহের আর একটী গুরুতর সমস্যা - প্রতিশব্দ ঠিক করা। আমি অনেক স্থলেই কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার সাহায্যে শব্দগুলির অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অনেক প্রচলিত শব্দ উচ্চারণজন্য অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তনের ফলে একটু নূতন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন জেলায় ব্যবহৃত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবর্ত্তন খুব বেশী না হইলে আমি সে সকল শব্দ প্রায়শঃ গ্রহণ করি নাই।

আমার সংগ্রহ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে বলিতে পারি না —নিত্য নূতন শব্দ চোখে পড়ে। তবে যতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রহের সুবিধা হইবে মনে করিয়াই এগুলি প্রকাশ করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে ফরিদপুর অঞ্চলের ভাষার দুই একটী বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই বিশেষত্বগুলি অনেক স্থলেই শুধু ফরিদপুরেই যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে; পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানেও উহা দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার বৈশিষ্ট্য

চবর্গের, বর্গের চতুর্থ বর্ণের, হকারের এবং অনন্তরার্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিও উল্লেখযোগ্য।

(১) পশ্চিমবঙ্গে যেরূপ অনেক স্থলে অনুনাসিকের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ববঙ্গে সেরূপ দেখা যায় না; পক্ষান্তরে অধিকাংশ স্থলে অনুনাসিকের প্রয়োগ না করায় পূর্ব্ববঙ্গীয়কে পশ্চিমবঙ্গীয়ের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যথা,—'পাঁচ পয়সার বাঁশের বাঁশী ফুঁ দিলে বাজে'—পশ্চিমবঙ্গ; 'পাচ পয়সার বাশের বাশী ফু দিলে বাজে'—পূর্ব্ববঙ্গ।

(২) সমগ্র স্পর্শবর্ণের উচ্চারণেই পূর্ব্ববঙ্গে স্পর্শের শৈথিল্য অনুভূত হয়—পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু স্পর্শ বেশ দৃঢ়।

(৩) পশ্চিমবঙ্গে ভদ্রলোকের মধ্যে ব্যবহৃত বহু শব্দের ন স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে ভদ্রলোকের মধ্যে লকারের প্রয়োগ হয়। আবার ইতরশ্রেণীর লোকের মধ্যে নিয়ম ঠিক উল্‌টা। এইরূপ স্থলে পশ্চিমবঙ্গে ল এবং পূর্ব্ববঙ্গে ন ব্যবহৃত হয়। যথা—নেওয়া (পশ্চিম—ভদ্র), লওয়া (পূর্ব্ব—ভদ্র), নন (পূর্ব্ব—ইতর), লিয়েছে (পশ্চিম—ইতর)। নেবু (পশ্চিম)—লেমু (পূর্ব্ব); নুচি (পশ্চিম)—লুচি (পূর্ব্ব); ন্যাঙ্‌টা (পশ্চিম)—ল্যাঙ্‌ঠা (পূর্ব্ব); ন্যাড়া (পশ্চিম)—লাড়া (পূর্ব্ব)।

(৪) কর্ম্মকারক পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণতঃ 'রে' প্রত্যয় দ্বারা সূচিত হয়। যথা—আমারে, তোমারে ইত্যাদি।

(৫) সম্বন্ধ পদের বহুবচন 'গো' [হিন্দি—কো, পশ্চিমবঙ্গ—র, দের, দিগের] এই প্রত্যয় দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা—রামগো, শ্যামগো, তোমাগো, আমাগো ইত্যাদি। দুইটী সম্বন্ধ প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগও দেখা যায়। যথা—রামেরগো, শ্যামেরগো, তোমারগো, আমারগো, মোরগো [সংক্ষেপে মোগো] ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম শব্দের সম্বন্ধ পদে নিম্ন প্রয়োগগুলি দেখা যায়,—এনার (ইঁহার), তেনার, তান্ (তাঁহার), ওনার ও (ওঁর) ইত্যাদি।

ঘর

খাটাল—মেজে।

হাইতনা—দাওয়া।

পাছদুআর—খিড়্‌কির দরজা।

[দ্রঃ—নাচদুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ)=রথ্যাদ্বার]

ওটা—উঠিবার মৃত্তিকানির্ম্মিত পাদপীঠ।

ওটাচালা—ঘরের সম্মুখে চালবিশিষ্ট ছোট বেড়াশূন্য বারান্দা।

পোতা—উচ্চ ভিত্তি।

ডোআ—ভিত্তির পার্শ্ব।

কুআ—

বাগা—

ছোন—খড়।

গৃহের প্রকার-ভেদ—

জুইতের ঘর—

আটচালা—

দোচালা—

তেচালা—

চৌচালা—

লাকারী

মণ্ডপ—চণ্ডীমণ্ডপ।

উগৈর—ঘরের মধ্যে জিনিষ-পত্র রাখিবার মাচা।

কার—ঘরের চালের নীচে বাঁশের তৈয়ারী জিনিষপত্র রাখার স্থান।

পাটাতন—ঐ তক্তার তৈয়ারী।

আড়—কাপড় প্রভৃতি রাখিবার জন্য গৃহমধ্যে টানান বাঁশ।

আড়া—গৃহের সহিত চাল দৃঢ় সংলগ্ন করিবার জন্য বাঁধা বাঁশ।

ঠ্যাঙ্গা—খিল।

হিস্‌সা } —তরফ।
খোলট }

গিরটী ঘর—বাসগৃহ।

ছায়লা, ছাবরা—সম্পূর্ণরূপে যে গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই; চালা ঘর।

(ঘরের) আন্ধু—ঝুল।

আসবাবপত্র

ডোল—বড় গভীর ঝাঁকাজাতীয়

আগৈল—ঝাঁকা।

গোচৈ—ধুচুনি।

চালৈন—চালুনি।

সেইজ [<শয্যা]—বিছানা।

ঘোনা—মশারি।

চকি—তক্তপোষ।

(চকির) খুড়া—পা।

চক্কি—ছোট ঘটী।

কাকৈ—চিরুণী।

কোলা—বড় জালা।

মাঠী—কাল রঙের প্রকাণ্ড জালা।

পিছা—ঝাঁটা।

ত্যানা—ন্যাকড়া।

কোলবালিশ—পাশবালিশ।

ঝারী—গাড়ু।

ছালা—থ'লে, বস্তা।

ধূপতি—ধুনুচি।

তাওয়া—আগুন রাখিবার মাটির পাত্র-বিশেষ।

পোচ—ঘর নিকাইবার ন্যাকরা।

আর্‌সী - আয়না।

বস্থানি—পুটুলি।

কৌটকা—আকৃশি।

খাবরা, খুলী, চরাটী—সরাজাতীয়

চড়উয়া—ভাত।

ওসার (বি)—ওয়াড়।

ওসার (বিণ)—চওড়া।

ছোরাণী—চাবি।

জোত—কোন কিছু টানাইয়া রাখিবার দড়ি।

খাদা—পাথরের বড় বাটী।

থালী [<স্থালী]—পাত্র।

চুঙা—চোঙ্গা।

ভাণ্ড—বাসন।

গাছা—পিলসুজ।

খোন্তা [<খন্তা*]—সাবল।

পোশাক পরিচ্ছদ

একপাটা—চাদর [দ্রঃ—দোপট্টা বা দোপটা—বিহারী]।

পেরোন—জামা।

জেব—পকেট।

কোছা—কাছা।

গুঠী—কোছা।

আউট—কাপড়ের পাড়।

আঙ্‌রাখা বা আঙরাখা—জামা।

পূজার দ্রব্য

তামী—তাম্রকুণ্ড।

খোলা—দেবস্থান [যথা—শীতলাখোলা, নিশাইখোলা]।

রান্নাঘর

ওর্‌সা—রান্নাঘর।

আখা—উনান।

ঝিক—উনানের উচ্চ পার্শ্ব।

পৈথ্‌না—হাঁড়ি রাখিবার মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ।

পাটা—শিল।

পুতা—নোড়া।

চলা—কাঠ।

পাতিল—হাঁড়ি।

দোআখী—একসঙ্গে দুই উনান।

হাইন্‌শাল [<* হাঁড়িশালা (?)—হাঁড়্‌ শিল্‌—(ময়মনসিংহ)] হেঁশেল।

বাওলি—বেড়ী।

দেরী যাওয়া—এক হাড়ীর ভাতের অর্দ্ধেক সিদ্ধ হওয়া এবং অর্দ্ধেক অসিদ্ধ থাকা।

ছেইমারা—মাছ প্রভৃতি ভাজিয়া রাখা।

খাদ্যদ্রব্য

হুড়ুম—মুড়ি।

পিষ্টক—

চিতৈ—

হাড় ইয়া—

পাটিসাব্‌ডা—

চুষি—

হলুয়া দলুআ—

খুদের জাউ—খুদের তৈয়ারী ফেনা ভাত।

বেনিয়া ভাত—পোড়ো ভাত।

তিতা ঝোল—শুক্‌তানি।

লরা—চচ্চড়ি।

উফ্‌রা—গুড়মিশ্রিত খৈ।

লোআজিমা—ভাত খাইবার উপকরণ।

পানা—সরবৎ [যথা—বেয়ালপানা, মিছরীপানা, চিনিপানা]।

পূরা—খিলি [যথা—পানের পূরা]।

ইচা—চিংড়ি মাছ।

ভাজাপোরা—খৈ, মুড়ি প্রভৃতি।

মোউল্‌খা—যে খৈ সম্পূর্ণ ফোটে নাই।

সম্বন্ধবোধক শব্দ

বৌয়াসিনি—ছোট ভ্রাতার স্ত্রী [বহুআসিন—নূতন্‌ বধূ—বিহারী]।

কোঁদা—খোকা।

পোলা-ছেলে।

কুদী—খুকী।

নয়ু—খোকা।

দুদু—খুড়া, কাকা

ঠাকুরজামাই—ননদপতি।
সৎমা—বিমাতা।
সৎছাওয়াল—সতীনের পুত্র।
ঠাকুরকন্যা—ঠাকুরঝি।
পুতি—কাকা।
খুড়া— " ।

উৎসবাদি

নিতা—নিমন্ত্রণ।
জোকার—উলুধ্বনি।
মুখচন্দ্রিকা—শুভদৃষ্টি।
দধিমঙ্গল—বিবাহাদির দিন প্রাতঃকালে দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করা।
আরোঙ—বাচ।
উঠানী [উত্থানিকা]—আঁতুড় যে দিন শেষ হয়, সেই দিনের কার্য্যাবলী
নারিকেল ভাঙ্গা—গায়ে হলুদের অনুরূপ।
প্যাচ্‌না—রঙ; বিবাহাদিতে গায়ে দেওয়া হয়।
বৌপুচ্ছা [<বধূপৃচ্ছা?]—বিবাহের পর প্রথম বধূকে স্বামীর বাড়ীতে অভিনন্দন করিয়া লওয়া।
ঘটবাজী—তুবড়ী।
রয়ানী—মনসার গান।
থেউর—শারদীয়া পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে মুসলমানগণ যে গান করে।

গ্রাম্য দেবদেবী ও ব্রতাদি

মাঘমণ্ডল, যমপুখৈর—বালিকাদিগের ব্রতবিশেষ
চুঙীর বত্ত—সূর্য্যপূজাত্মক ব্রতবিশেষ।
চাক্‌রী—সূর্য্যোপাসনার প্রকারভেদ।
ক্ষ্যাত্তরের বত্ত—[ক্ষেত্রনাথ শিব]।
বুড়া ঠাকুর—শিব।
নিশাই, নিশানাথ—দেবতাবিশেষ।
আকুলাই, খাড়াকুলাই, অসময় নারায়ণী—গ্রাম্য স্ত্রী দেবতা-বিশেষ।
হালা—কার্ত্তিক পূজায় ব্যবহৃত এক পাত্রে নানা শস্যের চারা।
ভুল উড়ান—কার্ত্তিকপূজার দিন খড়ের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া বাটীর বাহির করিয়া দেওয়া।

নরদেহ

ঘেটি—মাথা।
গোর—গোঁর
গুড়মুড়া—গোড়ালি
কেত্তুলি—বগল।
ঘিলু—মস্তিষ্ক।
ক্যাতর—পিচুটী।
চোপা—(নিন্দাব্যঞ্জক) মুখ।
(চক্ষের) পিছি—চক্ষের লোম
থোৎমা—চিবুক।
পাসর—কোঁক।
রগ—শিরা।
নীলদারা—মেরুদণ্ড।
ড্যানা—হাত।
দুধ—স্তন, মাই।
আলাজি—আল্‌জিভ

রোগাদি

ব্যামো—রোগ।
ডাবা—শিশুদের নিউমোনিয়া।
মাসীপিসী—শিশুদের হাম।
লুন্‌তী—হাম।

ছৌদ—চর্ম্মরোগ বিশেষ।

কুনথী কুনী।

চৌখ খরান—চোখ ওঠা।

ধুম জ্বর—খুব বেশী জ্বর।

হেস্‌কি—হেঁচকী।

বিষম—

হাইম—হাঁই।

দন্তরসা—দাঁতের গোড়া ফোলা।

চম্‌টী—খোসা (খোসের)।

বিষ—ব্যথা।

পোরামালঙ্গী—নারাঙ্গা।

গাছপালা, ফলমূল

ফ্যানা—ছড়া [এক ফ্যানা কলা]।

তালবাগুন—বড় বেগুন।

শোলৈ বাগুন—ছোট বেগুন।

কদু—লাউ, [কাঁঠাল—ঢাকা]।

বুট—ছোলা।

জম্বুরা—পাতিনেবু।

বরই [<বদরী]—কুল।

গুয়া [<গুবাক]—শুপারী।

আচি—নারিকেলের মালা।

মরিচ—লঙ্কা।

পম্ফা—পেঁপে।

পানিতালা—তালশাঁস।

পানিকচু—জলজাত ছোট কচু।

দোমুখি—দোপাটি।

গৈয়া—পেয়ারা।

সন্ধ্যাপ্রকাশ—কৃষ্ণকলি ফুল।

কোষ্ঠা—পাট।

ব্যাতাগ—বেতগাছের শাঁস।

ব্যাতাসি—বেতের খোলা।

বেথৈল—বেতফল।

চালকুমরা—সাঁচি কুমড়া।

আনাজী কলা—কাঁচকলা।

আনাজ—তরকারী।

হ্যালোম্‌চা—হিংচে।

আম্‌সরৎ—আমের পল্লব।

ডাউগ্‌গা—ডগা।

যজ্ঞডুমৈর—যজ্ঞডুমুর।

বড়া বাশ—
তল্লাবাশ— } বাঁশের প্রকারভেদ।

(বাশের) করালি—বাঁশের গোড়া হইতে বহির্গত নূতন বাঁশ।

বাইল্—শুপারী তাল প্রভৃতির খোলা সমেত পাতা।

চোক্‌লা—খোসা।

বৌল—মুকুল।

হালি—গুচ্ছ [এক হালি মুলা]।

ভুচরা—কাঁঠালের পরিত্যক্ত অংশ।

ছের্‌ফল [<শ্রীফল]—বেল।

জামির—নেবুবিশেষ।

করা—কচি ফল [আমের করা, শসার করা]।

ছোবা—ছোবড়া।

বাক্‌তর্‌কারী—ওল।

ক্ষীরৈ—শসাজাতীয় ফলবিশেষ।

চিল্‌পা—কলাপাতার টুক্‌রা।

বৃক্ষের প্রকার-ভেদ—

হিজল—

রয়না—

কাউ—

লতাপাকৈর—

আইষ্ঠালি—

বইন্না—
চৌক্‌খরানি—
বাইর্‌কালি—
ভাইট্‌—
বোগ—মড়া গাছের গোড়া বা কাণ্ড হইতে যে নূতন গাছ বাহির হয়, তাহা।

জীবজন্তু

ত্যালাচোরা—আর্‌সোলা।
উরাস—ছারপোকা।
ওল্লা—ডেয়ো পিঁপ্‌ড়ে।
কোঁতৈর [<কবুতর]—পায়রা।
বল্লা—বোল্‌তা [দ্রঃ—বল্লাশাক]।
জুনী—জোনাকি।
জাতি সাপ—গোখ্‌রো সাপ।
গুইল—গোসাপ।
উড়্‌চুঙা—উচ্চিংড়ী, রুইচিঙ্‌ড়ী।
ম্যান্না—ভেড়া।
পক্‌খী—পাখী।
পাখা [<পক্ষ]—ডানা।
কাউয়া—কাক।
পাতিশিয়াল—
ফৈউচ্‌কা—পক্ষিবিশেষ।
উগানি—পোকাবিশেষ।
চ্যালা—বিছা।
বিছা [<বৃশ্চিক]—শোঁয়াপোকা।
ভাউআ ব্যাঙ্‌—একজাতীয় ব্যাঙ্‌।
আধার—পাখীর খাদ্য।
দাইর্‌আ—বেজীজাতীয়।
বাজকুরাল—বাজ।
ভুতুম—পক্ষিবিশেষ।
স্যাজা—সজারু।

রমণীসম্প্রদায়ে প্রচলিত শব্দ

গতর—শরীর।
ভাতার—স্বামী।
লগগী [লঘ্বী]—প্রস্রাব *।
ফল দেখা }
পুনব্ব দেখা } —প্রথম ঋতুমতী হওয়া।
ফল্‌না—অমুক।
রারী—বিধবা।
ঠাকুরকন্যা—ঠাকুরঝি।
হ্যাদে—হ্যাঁরে।
জিভুতপান—ছেলে পিলে।
কুন্নী—কুঁড়ে (স্ত্রীলিঙ্গ)।
(দুধ) আউটান—জ্বাল দেওয়া।
আইরত—এঁড়েয় পাওয়া।

ক্রিয়াবিশেষণাদি

ক্যাম্বায়—কিরূপে।
য্যাম্বায়—যেরূপে।
অ্যাম্বায়—এরূপে।
ত্যাম্বায়—সেরূপে।
আউ—ছি ছি।
আচক্কা, আচক্কা—হঠাৎ [হিন্দী—অচানক]
হ্যাদে [<হন্দী—প্রাঃ]—হ্যাঁরে।
লগে—সঙ্গে [দ্রঃ—লগে সঙ্গে]।
তমাইত, তমৈ—পর্য্যন্ত [তক—হিন্দী]।
গোরে—নিকটে।
এপিলে—এ রকমে।
সেপিলে—সে রকমে।

* পশ্চিমা পণ্ডিতগণ 'লঘ্বী শঙ্কা' (প্রস্রাব) ও 'গুর্ব্বী শঙ্কা' সংস্কৃতে এই দুইটী কথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

যেপিলে—যে রকমে।

কোন্ পিলে—কোন্ রকমে।

কৈলে, কৈলাম—কিন্তু [যাব কৈলে, যাব কৈলাম]।

তৈলে—তাহা হইলে।

এ্যানে—'খন [যাব এ্যানে—যাবখ'ন]।

একছের—এক টানে।

ঝট্ কইর‍্আ—চট্ ক'রে।

মোনে—[যাই মোনে, খাই মোনে]—যাচ্ছি, খাচ্ছি]।

গাট্ঠা (জুয়ান)—খুব বড় পালোয়ান।

স্যাত—তত।

(বেলা) উদানে—উদিত হইলে, বেশী হইলে।

অনুকরণ শব্দ

ছন্ ছন্ করা।

ঢন্ ঢন্ করা—ঘুরিয়া বেড়ান।

উস্‌খুস্ করা।

মাক্‌খা মাক্‌খি—গোলমাল, ঝগড়া।

রি রি করা—শির্ শির্ করা।

ম্যান্ ম্যান্ করা—অস্পষ্ট কথা বলা।

আমতা আম্‌তা করা।

ফুইটয়া যাওয়া—ভাঙ্গিয়া যাওয়া [হাড়ি ফোট্‌ছে]।

ক্যালো ব্যালো—কিল্ বিল্।

বিবিধ বিশেষ্য

ডিলা—ঢিল।

ঠসক—দেমাক।

ঠার—ইঙ্গিত।

কছম—রকম।

কাঠঘোরা—হাঁড়িকাঠ।

আখৈট—আবদার [আখুটী—কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল]।

খাইট্—দাগ।

মাদ্‌বরি—গৌরব।

ঠোস—ফোস্কা।

ছাতকুরা—ছাতা।

ঢক—রকম।

হাউস—সখ।

সোর—চীৎকার [সোরগোল=গোলমাল—পশ্চিমবঙ্গ]।

শান—পাথর।

প্যাচাল, প্যানা—বাজে কথা [দ্রঃ—প্যাচাল পেটা—বাজে কথা বলা]।

সাউগারী—সাধুতা।

রাগ—তীব্রতা [যথা—রৌদ্রের রাগ]।

দক্—তীক্ষ্ণতা [যথা—চূণের দক্]।

লোকুতা—লৌকিকতা[নৌকতা—পশ্চিমবঙ্গ]।

ভরঙ্—ঢঙ্।

রাও—জবাব।

রত্—শক্তি।

দলা—তাল, পিণ্ড [যথা—এক দলা ভাত]।

গৌণ—দেরী।

তাম্না—হাঙ্গাম, ঝামেলা।

ওক—উঁকি।

খরা—রৌদ্র (বর্ষার বিপরীত)।

কেয়াস—আন্দাজ, অনুমান।

ছিন্দাত—কষ্ট।

অলবড্ড—আগোছালো।

দেউলা—দেয়ালা।

খারাজিল্‌খী—বিদ্যুৎ।

উছাট—হোঁচট।

চার—সাঁকো।

ফ্যাক্‌না—আবদার।

ধোমেকা—দাবড়ি।

দোমোক—দম।
চাটাম—নিজের গৌরবসূচক অত্যুক্তি।
ডর—ভয়।
শিদ্‌লী—স্যাওলা।
ফাইট—ফুরসুৎ।

দিশা—
পাইল— } —রকম।
কছম—

ছিরিক—
জো ত্তর—জুত।
হাবি জাবি—বাজে জিনিষ।
চারা—খোলা।
পাট খরি—প্যাকাটি।
স্যালা—পানা।
বিরুদ—ঝগড়া।
ভাপ—উত্তাপ।
হাই— ঐ।
টান্‌ঠা—ঝঞ্ঝাট।
ডিলা—ঢিল।
কের্‌দারি—ওস্তাদি।
জায়—তালিকা।
আব্‌খোরাকী—বিনাখোরাকী।

ফর্দ্দ—
} —খণ্ড।
ডুমা—

লেইথ—শ্রেণী।
ব্যাস্কম—তফাৎ।
ফারাগ—তফাৎ, দূর।
উঁজঘট—গোলমাল।
নাত—শৃঙ্খলা।
রা খরচ—পথখরচ।
পেরি—কাদা।
ব্যাসাতি—পণ্যদ্রব্য।
ব্যাত্তাসি—বেতের কঞ্চি।
দেওই—মেঘ।
আইর্‌স—পয়।
টুনি—কঞ্চি।
চটা—বাখারি।
কিরা—শপথ।
হদ—গর্ত্ত।
হাইঙ্গা—লতানে গাছের জন্য মাচা।
ঠ্যাকার—ঢঙ্।
আদার—আস্তাকুঁড়।
ছ্যামরা—ছোক্‌ড়া।
পশনকথা—রূপকথা।
তরপথ—তটপথ (দ্রঃ—কৃষ্ণকীর্ত্তন)।
গাঙ্—নদী।
দারা—[<দণ্ড<ডাণ্ডা] দণ্ডবৎ নিস্পন্দ।
[যথা—দারা দিছে]।
আউল—বিশৃঙ্খলতা।
(ধোপার) পুইন—ভাটি।
পাট—ধোপা যাহার উপর কাপড় কাচে।
নিশির—শিশির।
ঠাল—ডাল।
কাইজ্‌আ—ঝগ্‌ড়া।
বাস্‌না—স্নেহ, ভালবাসা।
ছোবা—(নারিকেলের) ছোব্‌ড়া।
উজাগার—জাগরণ।
উদ্ধার—ধার।
টরি—কুন্‌কে।
সরিক—অংশীদার।
ব্যানা—মাটির প্রতিমা তৈয়ার করার পূর্ব্বে খড়ের তৈয়ারী মূর্ত্তি।
পেছোন্দার [<Passenger]—আরোহী।

চয়নদার—নৌকার আরোহী, নৌকারোহিণীর সাথী।

বেতী—ডালা প্রভৃতি বুনাইবার কঞ্চি।

ভর্ত্তব্য—গুণগার।

ছ্যাও—খণ্ড।

ওম্, পোম্—গরম।

পাছার—আছাড়।

চাইন্দ্ আ—নিরর্থক।

মুখটী—আবরণ [যথা—কৌট্ কার মুখটী]।

সিব্ ডি—ছিপি।

ডালাগা—জল টানের সময়।

আখালি—কাঁকর।

কোট—মণ্ডল [court ইং]। [সোনার কোট—লইড়্ আ চইড়্ আ ভইর্ আ ওঠ্]।

গোণ (জল)—অনুকূল (জল)।

কোল—ধার [যথা—খালের উত্তর কোল]।

গোছোর—গরু বাঁধিবার দড়ি।

বারোই—ছুতার।

সরকালি—তুর্পুন্।

হাইতার—নাপিতের যন্ত্রাদি।

নচ্ছার—গালাগালিতে ব্যবহৃত।

(পালার) ফ্যার—পাষাণ।

মাগ্না—বিনামূল্যে।

পোয়া পয়সা—সিকি পয়সা।

রেহাইন্, মার্কিচ্—Mortgage।

আছারি—হাতল।

ফর, পর [<প্রহর<পহর]—প্রহর [এক ফর বেলা, পরখানেক রাত্তির]।

খেদৈর—জলকাদা।

অনায়—অনিষ্ট।

আনাদিন—অন্য দিন।

কুক্—উচ্চ ক্রন্দন

ব্যাপারী—ব্যবসাদার।

সাধ্য—শক্তি।

ছত্তি (ওজন)—কাঁচি।

মুড়িপ্রভৃতি ভাজা

ভাজিবার সরঞ্জাম—

ঝাঝৈর—

ছাপনা—

বাসৈল—

চালৈন—চালুনি।

পোছা—ঝাড়া।

খোলা—ভাজিবার পাত্র।

পুষ্করিণী

ধাপ—পানা।

পুখৈর, পুহৈর—পুকুর।

ব্যার—ডোবা।

জান, জাঙ্গাল—পুষ্করিণী ও খালের সংযোগস্থান।

কুয়াতী—যাহারা মাটি কাটে।

বিয়াতী—যাহারা মাটি তোলে।

ওরা—মাটি উঠাইবার ডালা।

চাষবাস

(ধান) দাওয়া—কাটা।

কাচি—কাস্তে।

হাল [<সংস্কৃত হল]—লাঙ্গল।

খন্দ—শস্যোৎপত্তি।

খন্দের সময়—harvest time।

নৌকাবিষয়ক

ডরা—নৌকার খোল।

গোলৈ—নৌকার অগ্র ও পশ্চাৎভাগ।

চরাট—গোলৈর ধারের পাটাতন।

খেচী—জলসেচনের পাত্র।

পারা দেওয়া—নৌকা নোঙ্গর করা।

কচি—নৌকা বাঁধিবার সময় যে বংশখণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া উহার সহিত নৌকা বাঁধা হয়।

চালি—নৌকার উপর বসিবার বংশনির্ম্মিত আসন।

বাচারি—ছিপ্‌নৌকা জাতীয়।

ঢেকী

ঢেকীর বিভিন্ন অংশ—

কাত্‌লা—

আর্‌সোলা—

মোনা—

গুলা—

লোট—

উথৈল [<উদুখল—সংস্কৃত]।

পার দেওয়া—পা দিয়া ঢেকী চালান।

আলান—, ওছান— } —ভানিবার সময় ধান প্রভৃতি নাড়িয়া গুছাইয়া দেওয়া।

মাছ ধরা

মাছ ধরিবার সরঞ্জাম—

চ্যাওরা—, দুয়ের— } --বংশনির্ম্মিত।

কোচ—লৌহনির্ম্মিত অগ্রভাগবিশিষ্ট।

কলু—ঐ, লৌহ অগ্রভাগ।

অ্যাওরা—

ঝাকিজাল—

পাতিজাল—

ধর্ম্মজাল—

টাজী—ফাত্‌না।

থারৈ—থালৈ।

জিয়ানী—জেলে।

বিশেষণ

আটাশ—আশ্চর্য্যান্বিত।

নোয়া—নূতন।

ড্যাব্‌রা—উল্‌টা।

ম্যালা—অনেক।

ম্যালা—খোলা, যাত্রা করা।

সাজো—টাট্‌কা।

চিকুন—সরু।

ডাঠো—শক্ত।

ড্যাব্‌রা—উল্‌টা।

থাউব্‌আ—গম্ভীর।

লুঞ্জ—জীর্ণ।

রহট—প্রকাশ।

বাতি—পাকা।

থাকৃলা—

শোলৈ—ছোট [যথা—শোলৈ ইন্দুর, শোলৈ বাগুন]।

দোকোর—দ্বিগুণ।

চোআ—পরিষ্কৃত।

ওড়োম্বা—বেহিসাবী, অসাবধান।

পেঙ্‌ঠী—রোগা, হ্যাঙ্‌লা।

আনাঠা—অদ্ভুত।

ত্যারা—বাঁকা।

অব্‌ভ্‌র (দণ্ড)—নিরর্থক।

কাঙ্‌ঠী—কৃপণ।

বারাস্‌ইয়া [<বারমাসিয়া ?]—আকালিক।

ধুরুস—মোটা।

বাগুনব্যাচা, তেতৈলব্যাচা মুখ—ক্রুদ্ধাবস্থায় বিকৃত মুখ।

চশমখোর—নিষ্ঠুর।

আদেইথ্‌লা—অতিলোভী।
ট্যাটন—ধূর্ত্ত, শঠ (দ্রঃ—চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন)।
ঠ্যাটা—যে বাজে তর্ক করে।
খোমা—অভিমানী।
ঠেউড্‌ডা—ধূর্ত্ত।
ঘাউর্‌আ—একগুঁয়ে।
দীঘ্‌লা—লম্বা।
ছচী—নোংরা।
উদ্‌লা—খোলা।
ডুনা—দ্বিগুণ।
ডাঙর [ডাগর—পশ্চিমবঙ্গ]—বড়।
মোনাছিব—মনঃপূত।
ম্যান্‌তামুখা—যে মিন্‌ মিন্‌ করে।
তরস্থ [<তটস্থ ?]- সত্বর, ব্যস্ত।
উনা—অল্প।
জালি কচি।
ভোন্দা-বোকা।
অনাশৃন্য—অনাছিষ্টি।
আকাঠা (বকা)—খুব বেশী।
কাউল্‌আ—ঠাণ্ডা।
বাইষ্ঠা—বাসি।
কসা—আঁটা।
আউন্‌খা—নূতন।
বলদ—বোকা।
রাউআ—অনিমন্ত্রিত, লোভী।
বেবাক—সকল।
চুকা—টক।
উর্ব্বান--রোগজন্য বিকারগ্রস্ত।

ক্রিয়া

ফ্যানাইয়া যাওয়া—অতীত হওয়া।
চুকান—চুক্তি করা।
দরান—জমিয়া যাওয়া।
কচ্‌লান—রগ্‌ড়ান।
বিচ্‌রান—খোঁজা [যথা—বিচারিআঁ—চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন]।
থির দেওয়া [<স্থির]—দাঁড়ান।
হাপুর দেওয়া—হামাগুড়ি দেওয়া।
খাউজান—চুল্‌কান।
বোরা—ডুবিয়া যাওয়া।
উগ্‌লান—উপ্‌ড়ান।
ঘোনান—সমীপবর্ত্তী হওয়া।
বরাত দেওয়া—ভার দেওয়া, ওয়াদা করা।
ছানা—ঘাঁটা।
চিখ্‌রান—চেঁচান।
খ্যাদান—তাড়ান।
ভ্যাঙান—ভিঙ্‌চী কাটা।
তালাস করা - খোঁজা।
ক্যাথ্‌রান—কাতরভাবে গমন।
ঘোঙ্‌রান—গোঁগোঁ করা।
(টাকা) লাগান—সুদে খাটান।
ল্যাচ্‌কা দেওয়া—পা ভাঙ্গিয়া পড়া।
সাব্‌ডাইয়া ধরা—সাপটিয়া ধরা (পুরাণ বাঙ্গালা)।
হ্যালান দেওয়া--ঠেস দেওয়া।
হোক্‌রান—খোঁড়া (২৪ পরগণা)। শিশুদিগের স্বাস্থ্যাদির প্রশংসা করা।
পদান—প্রশংসা করা।
বাইল্‌ দেওয়া—বারবার যাওয়া আসা।
ফিক্‌কা মারা—ছুড়িয়া মারা।
টালান—বিরক্ত করা।
বারান—নূতন জিনিস প্রথম ব্যবহার করা।
ল্যাব্‌রান—ধেব্‌ড়ে যাওয়া।
গুলান—টাটান।
কোপা—পোঁতা।

কোপান [যথা—মাটি কোপান]—কাটা।

ত্যানান—সেঁতিয়ে যাওয়া।

মুল্লা খাওয়া—মুখ থুব্‌ড়ে পড়া।

উভুত হওয়া—উপু হওয়া।

চুবি দেওয়া—উঁকি মারা।

প্যানা পেটা—বাজে বকা।

বলা—বৃদ্ধি পাওয়া। [মাইআভী বল্‌তী রোখের]।

পর দেওয়া—পাহারা দেওয়া।

আল্‌গান—উঁচু করা।

উগ্‌লান—উপ্‌ড়ান।

কৌব্‌লান—প্রতিশ্রুতি দেওয়া, চুক্তি করা।

ব্যাপার করা—ব্যবসা করা, লাভ করা।

তোলা উঠান—বাজার হইতে জমিদারের প্রাপ্য আদায় করা।

সদয় করা—কেনা।

আলান—পচিয়া ওঠা।

টোকান—কুড়ান।

গাবান—বর্ষার শেষে জল পচিয়া যাওয়ায় মাছ ভাসিয়া ওঠা।

খাইট্‌আ—কাষ্ঠখণ্ড।

লড়ান—দৌড়ান।

চ্যাতান—খ্যাপান।

বিচ্‌লান, উগ্‌লান—উপ্‌ড়ান।

আত্তান—আবৃত্তি করা।

উঝ্‌লান—খোলা।

(মুখ) ভ্যাট্‌কান—(মুখ) বিকৃত করা।

পাকাইয়া পরা—ঘুরিয়া পড়া।

পাতন দেওয়া- গোপনে কাহারও কথা শোনা।

ত্যারান—বার বার অনুরোধ করা।

ছ্যাওয়ান [ছেদন করা]—খণ্ড করা।

পাছড়ান—বলির পাঁঠা হাড়িকাঠে চাপিয়া ধরা।

তেয়া পাচা করা—তর্ক করা, দ্বিধা করা।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী